ও বিবিধ প্রসঙ্গ

(ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ)

শিশির কুমার সেন
অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কলিকাতা হাইকোর্ট



সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
কলিকাতা ৭০০০০৬

MAHABHARATER MULKAHINI
O VIVIDHA PRASANGA

ভূমিকা

সৌতি উগ্রশ্রবাকে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ মহাভারতের কাহিনী শোনাতে বললে তিনি বলেছিলেন যে মহাভারত কাহিনী তাঁর পূর্বেও অনেক কবি শুনিয়েছেন, এখনও শোনাচ্ছেন, এবং পরবর্তী কালেও শোনাবেন—

"আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সংপ্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥"—আদিঃ ১।২৬

মহাভারতকাহিনী এতই লোকপ্রিয়। সৌতির এই কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার যতকাল বহু প্রচলন ছিল, মহাভারত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে পুনর্লিখিত হয়েছে, কারণ তালপাতার বা ভূর্জপত্রের পুঁথি ক্রমে ক্রমে জীর্ণ ও নষ্ট হয়ে যায়। পুঁথি পুনর্লিখন কালে কিছু কিছু নূতন উপাখ্যান বা সন্দর্ভ যোগ হয়েছে, এইভাবে মহাভারতের অধ্যায় ও শ্লোক বেড়ে গেছে! তারপরে নানা প্রাদেশিক ভাষার উদ্ভব হলে ও সংস্কৃত জনসাধারণের বোধগম্য না হলে নানা প্রাদেশিক ভাষায় মহাভারত কাহিনী রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় কাশীরাম দাস মহাভারত রচনা করেন, তার অধিকাংশ পয়ার ছন্দে, মধ্যে মধ্যে ত্রিপদী ছন্দ আছে, সবটাই কবিতায়। তবে কাশীরাম দাস তাঁর মহাভারতে বহুস্থলে মূল মহাভারত কাহিনী হতে কিছু ভিন্নভাবে বিবৃত করেছেন, সর্বত্র মূল কাহিনী অনুসরণ করেন নাই। কালী প্রসন্ন সিংহ প্রথমে গদ্যে মূল মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তারপরে রাজশেখর বসু "মহাভারতের সারানুবাদ" রচনা ও প্রকাশ করে মূল মহাভারতের কাহিনী চিত্তাকর্ষকরূপে সাধারণ পাঠকের নিকট তুলে ধরেছেন। এই অবস্থায় মূল মহাভারত কাহিনী বিবৃত করে নূতন একখানি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের কারণ উল্লেখ করা সমীচীন মনে করি।

প্রমাণ মহাভারত পাঠে কতকগুলি অসঙ্গতি মনকে পীড়িত করে—যথা আদিপর্বে প্রথমে বলা হয়েছে যে ঋষিগণ কুন্তী ও পাঁচটি শিশু-পুত্রকে হস্তিনাপুরে ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকট পৌঁছে দিয়ে বলেন যে শিশু-গণ পাণ্ডুর পুত্র, বলেই তাঁরা কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না করে চ'লে গেলেন ; তখন কেহ কেহ বলেছিল যে পাণ্ডু বহুকাল পূর্বে মৃত হয়েছেন, এরা পাণ্ডুর পুত্র কি করে হবে ? তারপরে আদিপর্বেই আবার বলা হয়েছে যে ঋষিগণ কুন্তী ও পাঁচটি শিশুপুত্রকে যখন আনলেন, সেই সঙ্গে পাণ্ডু ও মাদ্রীর দেহও এনে দিলেন, বলে গেলেন যে শিশুরা পাণ্ডুর পুত্র, পাণ্ডু সতেরো দিন পূর্বে দেহত্যাগ করেন এবং তাঁর চিতায় মাদ্রী প্রাণ উৎসর্গ করেন। এইরূপ আরো পরস্পর বিরুদ্ধ কথা আছে, যার জন্য অনেক সময় মনে হয়েছে যে অসঙ্গতিগুলির উল্লেখ করে সেগুলির কোন ভাবে সমাধান করে মহাভারতের কাহিনীর অসঙ্গতি বর্জিত রূপ দিলে ভাল হয়। এই অবস্থায় আমেরিকান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক হপ্‌কিন্সের একটি মন্তব্য চোখে পড়ে। একজন জার্মাণ সংস্কৃতবিদ্ ডঃ রিচার্ড গার্বে (Dr. Richard Garbe) ভগবদ্ গীতার একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন, তার মধ্যে তিনি বলেন যে গীতায় কৃষ্ণ ভগবান্‌রূপে কথা বলেছেন ও নানা তত্ত্ব বিবৃত করেছেন, সেইসব কথা ও বিবৃতির সঙ্গে ব্রহ্ম ও বেদান্ত বাদ নিয়ে যে সব কথা গীতায় আছে, তার সঙ্গতি হয় না, অতএব অনুমান করা চলে যে ব্রহ্ম ও বেদান্তবাদ গীতায় পরে অন্য কোন কবির যোজনা। 'অধ্যাপক হপ্‌কিন্স্ (Prof E. W. Hopkins) গীতার সেই সংস্করণের সমা-লোচনায় বলেন যে ভারতীয় পণ্ডিতগণ কোন কাহিনী বলতে বা কোন তত্ত্বের বিবৃতি দিতে সঙ্গতি বা সামঞ্জস্যের দিকে ততটা লক্ষ্য রাখেন না ; মহাভারত অধ্যয়ন করে তিনি দেখেছেন তার মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ কথা বহু আছে, অতএব অসঙ্গতির উপর নির্ভর করে ডঃ গার্বের সিদ্ধান্ত যে সত্য তা জোর করে বলা যায় না (Journal of the Royal Asiatic Society, 1905' pp. 384-389)। সেই মন্তব্য

প'ড়ে মহাভাবত কাহিনীব একটি অসঙ্গতি বর্জিত এবং অনৈসর্গিক কথা বর্জিত রূপ নির্ণয কববাব ইচ্ছা আমাব মনে প্রবল হযে ওঠে।

ইতিমধ্যে পুনায ডঃ সুকথংকবেব নেতৃত্বে একটি সংশোধক মণ্ডলী নানা প্রদেশে প্রাপ্ত নানা লিপিতে লিখিত মহাভাবতেব পুঁথি সংগ্রহ কবে পাঠ মিলিযে প্রাদেশিক প্রক্ষেপ বা যোজনা বাদ দিযে একটি সর্ব ভাবতীয মহাভাবতেব পাঠ নির্ণযেব কার্যে ব্রতী হন। পুঁথি সংগ্রহ ও অন্যান্য প্রাথমিক কার্য তাঁবা ১৯১৪ খৃষ্টাব্দেব পূর্বেই আবম্ভ কবেন, জার্মাণ-সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেব সহাযতা নেবাব ইচ্ছা তাঁদেব ছিল, তবে মহাযুদ্ধের জন্য তা সম্ভব হয নাই, একজন আমেরিকান পণ্ডিতেব সহাযতা তাঁবা পেযেছিলেন। তাঁদেব নির্ণীত সর্বভাবত সাধাবণ পাঠ যুক্ত মহাভাবত বাইশ খণ্ডে ১৯৩৩ হতে ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দেব মধ্যে প্রকাশিত হয। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের প্রক্ষেপ বা যোজনা তাবা বাদ দিযেছেন, তবে যেসব প্রক্ষেপ বা যোজনা খৃষ্টীয দ্বাদশ ত্রযোদশ শতকেব পূর্বেই নানা প্রদেশেব পুঁথিতে স্থান পেযে গেছে, সেগুলি মূল মহাভাবতেব অংশ নয মন্তব্য কবেও সংশোধক মণ্ডলী তা বাদ দেন নাই। তাঁদেব একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হ'ল প্রতি শ্লোকেব শুদ্ধ পাঠ নির্ণয বা নির্ণয চেষ্টা. এইভাবে তাঁবা বহু শ্লোকের অর্থ পবিস্কাব কবেছেন ও কিছু কিছু প্রক্ষেপেব নিবাকবণ কবেছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেব যোজনা বাদ দিযেও কিছু কিছু অসঙ্গতি দূব কবা হযেছে। কিন্তু তাঁদেব সংশোধিত মহাভারত পাঠ মধ্যেও বহু অসঙ্গতি ও অনৈসর্গিক কথা বযে গেছে।

এই গ্রন্থেব প্রথম খণ্ডে কতবগুলি অসঙ্গতির উল্লেখ কবা হযেছে। দ্বিতীয খণ্ডে পুনায সংশোধিত মহাভাবতে কি পবিবর্তন হযেছে, কোন উপাখ্যান বাদ হযেছে, তাব বিবৃতি দেওযা হযেছে। তৃতীয খণ্ডে মহাভাবতেব মধ্যে কোনটি মূল কাহিনীব অংশ, কোনটি পবেব কালেব যোজনা বা প্রক্ষিপ্ত, তা বিচার কবা হযেছে। এই বিচারে মতভেদ

হ'তে পারে সন্দেহ নাই; আমার নিজের বুদ্ধি বিচার মতে আমি নির্বাচন করেছি। চতুর্থ খণ্ডে নির্ণীত মূল ভারত কাহিনীর সারমর্ম দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের ও প্রমাণ মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বের কাহিনীর মধ্যে যে কত বেশী পার্থক্য আছে, তা দেখান হয়েছে, কাশীরাম দাসের মহাভারত কাহিনী কোথায় কোথায় মূল মহাভারত অনুসরণ করে নি তাও বর্ণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে মহাভারতের চারটি প্রধান চরিত্রের আলোচনা ও মহাভারতে কথিত ধর্ম ও নীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। আশা করি এই গ্রন্থ হ'তে পাঠকগণ কিছু নূতন তথ্য লাভ করবেন ও আনন্দ পাবেন।

পুনা হ'তে রামচন্দ্র শাস্ত্রী কিঞ্জবডেকর সম্পাদিত ও নীলকণ্ঠ টিকা সহ ১৯২৯-১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মহাভারতকে আমি "প্রমাণ মহাভারত" বলেছি ও তুলনা করতে সেটিকে মান রূপে ধরেছি। শ্লোকের উদ্ধৃতিতে প্রমাণ মহাভারতের পর্ব অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, কালী প্রসন্ন সিংহের বাংলা মহাভারতে প্রায়ই তার অনুবাদ সেই অধ্যায়ে, মধ্যে মধ্যে পূর্বের বা পরের অধ্যায়ে, পাওয়া যাবে। প্রয়োজন মনে হলে মধ্যে মধ্যে "কা ম" এই সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করে কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুদিত মহাভারতের অধ্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

২১-১০-১৯৮২ শিশির কুমার সেন

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড : প্রচলিত মহাভারত কাহিনী ও তাতে নানা অসঙ্গতি

দ্বিতীয় খণ্ড : ভাণ্ডারকর গবেষণা কেন্দ্র হতে প্রকাশিত সংশোধিত মহাভারত

তৃতীয় খণ্ড : মহাভারতে মূল ভারত-সংহিতা, যোজনা ও প্রক্ষিপ্ত নির্বাচন

চতুর্থ খণ্ড : মহাভারতের মূল কাহিনী

পঞ্চম খণ্ড : বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রথম খণ্ড

প্রচলিত মহাভারত কাহিনী ও তাহাতে নানা অসঙ্গতি

১. সূচনা

সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের প্রাচীন শ্রেণী বিভাগ মতে মহাভারত ও রামায়ণ 'ইতিহাস' পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। ইতিহাসের সংজ্ঞা শাস্ত্রকারগণ এইভাবে দিয়েছেন, "ধর্মার্থ-কামমোক্ষণামুপদেশসমন্বিতম্। পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষ্যতে"। অর্থাৎ শাস্ত্রকারদের মতে ইতিহাস শুধু পূর্ববৃত্তকথা নয়, তাতে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ প্রাপ্তির উপায় নির্দিষ্ট থাকবে। মহাভারত রামায়ণে বিশেষতঃ মহাভারতে, পূর্ববৃত্ত কথার সঙ্গে বহু উপদেশ গ্রথিত হয়েছে বলে বোধ হয় 'ইতিহাসের' এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে। আমাদের কৌতূহল প্রধানতঃ পূর্ববৃত্ত কথা নিয়ে, যাকে বর্তমানকালে পাশ্চাত্য জ্ঞান অনুসারে ইতিহাস বলা হয়। তবে মহাভারতে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য যে উপদেশ মালা আছে তার ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য অনস্বীকার্য।

মহাভারত প্রধানতঃ পাণ্ডবগণের জীবন বৃত্তান্ত, তার মধ্যে হৃত রাজ্যলাভের উদ্দেশ্যে পাঞ্চালবীরদের সহায়তায় ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের সঙ্গে যে বহুবীরক্ষয়ী যুদ্ধ হল তা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এই যুদ্ধে পাণ্ডবগণের উপদেষ্টা ছিলেন বৃষ্ণিকুলের নেতা কৃষ্ণ, শুধু উপদেষ্টা নয়, তিনি যুদ্ধকালে অর্জুনের সারথিরূপে কাজ করে অর্জুনকে পরিচালিত করেছেন। তার পূর্বে তিনি তাঁর কৌশলে যুধিষ্ঠিরকে উত্তর ভারতের সম্রাটপদে স্থাপন করতে সাহায্য করেছেন। এই যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়ায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নামে পরিচিত। তার ঐতিহাসিকতা এখন সাধারণতঃ স্বীকৃত। বিচিত্রবীর্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের নাম কাঠক সংহিতায় আছে—কাঠকসংহিতা ও মৈত্রায়ণী সংহিতা হ'ল তৈত্তিরীয় সংহিতার পূর্বে সম্পাদিত কৃষ্ণ যজুর্বেদের দুটি পাঠ বা সংস্করণ। রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়ন ভারত কথা পাণ্ডব-কৌরবগণের কাহিনী বিবৃত করেন; বৈশম্পায়ন ছিলেন

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের শিষ্য। তৈত্তিরি বৈশম্পায়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা[১]—তাঁর সম্পাদিত কৃষ্ণযজুর্বেদই তৈত্তিরীয় সংহিতা। কাঠকসংহিতা তার পূর্ববর্ত্তী, অতএব তার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নাম আছে ছান্দোগ্য উপনিষদে—সেখানে তিনি ঘোর ঋষির শিষ্য বলে বর্ণিত হয়েছেন। এই দেবকী পুত্র কৃষ্ণই যে পার্থসারথিকৃষ্ণ, সে সম্বন্ধে বালগঙ্গাধর তিলক,[২] ডক্টর গ্রীয়ারসন[৩] ও আরও বহু বিদ্বান পণ্ডিত ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। দস-ব্রাহ্মণ জাতকে ইন্দ্রপ্রস্থ, যুধিষ্ঠির ও বিদুরের নাম আছে, ঘট জাতকে কৃষ্ণের জন্মকথা ও জীবনী কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়। জাতকগুলি খৃঃ পূঃ পঞ্চম বা চতুর্থ শতকে রচিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলিতে যে কাহিনী আছে তারকাল গৌতম বুদ্ধের জন্মের পূর্বে—কারণ বহু জাতকে বুদ্ধ গৌতমরূপে জন্মগ্রহণের পূর্ব পূর্ব জন্মে কি ছিলেন ও কি করেছিলেন তার কাহিনী দেওয়া হয়েছে। পাণিনি ব্যাকরণে বাসুদেব ও অর্জুনের উল্লেখ আছে, পাণিনির কাল খৃঃ পূঃ পঞ্চম বা চতুর্থ শতাব্দী। পাণিনি ব্যাকরণের উপর পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কৃষ্ণ কর্তৃক কংসবধ বিষয়ক একটি নাটকের উল্লেখ আছে। পতঞ্জলির কাল অনুমান খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষকাল। এই নাটকের সন্ধান বহুকাল পাওয়া যায় নাই। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে গণপতি শাস্ত্রী কেরলে পদ্মনাভপুরমের নিকটস্থ একটি মঠে মালায়ালাম লিপিতে লিখিত কয়েকটি নাটকের পুঁথি পান। তার মধ্যে একটি 'বালচরিতম্'—তাতে কৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যকালের কথা এবং কংসবধের কাহিনী আছে। এই নাটকটী 'ভাস' কবির লেখা বলে স্বীকৃত হয়েছে, তবে তার মধ্যে কিছু প্রক্ষেপ আছে। কালিদাস তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে ভাস কবির নাম করেছেন প্রখ্যাত নাট্যকার বলে কিন্তু তাঁর রচিত সব নাটক কালের গতিতে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরিক্ষিতবংশের উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক প্রাচীনতম উপনিষদগুলির অন্তর্ভুক্ত, তাদের রচনাকাল খৃঃ পূঃ নবম বা অষ্টম শতক বলে অনুমান করা যায়। অতএব কুরুপাঞ্চালগণ যে তার পূর্বে

১। মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৫৬।৯

২। গীতারহস্য হরফ প্রকাশনী, পৃঃ ৪৯৪

৩। Indian Antiquary. Vol. 37, p. 253

বর্তমান ছিলেন, তাতে সন্দেহ নাই। ঋগবেদে রাজা শান্তনুর উল্লেখ আছে,[১] তিনি কুরুবংশের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। কুরু-পাঞ্চাল দেশের কথা যজুর্বেদে আছে। আর্যগণ স্থলপথে দুর্গম পর্বত পার হয়ে প্রথমে সপ্তসিন্ধুর দেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। সপ্তসিন্ধু হল সিন্ধুনদী, বিতস্তা (ঝেলাম), অসিক্নী বা চন্দ্রভাগা (চেনার), পরুষ্ণী বা ইরাবতী (রাভি) বিপাশা (বেয়াস), শতদ্রু (সুতলেজ) ও কুভা বা কাবুল (সিন্ধুনদীর পশ্চিমস্থ উপনদী), সপ্তসিন্ধু দেশ হল পূর্ব আফগানিস্তান এবং পাঞ্জাব। পরে আর্যগণ পূর্বদিকে বিস্তৃত হন এবং কুরু পাঞ্চাল দেশ বা মধ্যদেশ আর্যদের শ্রেষ্ঠ নিবাস বলে খ্যাতিলাভ করে। কুরুদের দেশ ছিল শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী জনপদসমূহ নিয়ে, পাঞ্চালদের দেশ ছিল যমুনা ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্তী জনপদসমূহে;[২] গঙ্গানদীর বামকূলেও পাঞ্চালরাজ্যের অংশ একসময়ে ছিল কারণ মহাভারতে দ্রোণশিষ্যদের নিকট দ্রুপদরাজের পরাজয়ের পরে দ্রোণ গঙ্গা-ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলস্থ সব জনপদ দ্রুপদরাজকে রাখতে দিলেন ভাগীরথীর উত্তর কূলস্থ জনপদ দ্রোণ নিয়ে নিলেন।[৩] এবং হস্তিনাপুর যদি গঙ্গার একটি পুরাতন পরিবাহ বা খাতের তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে[৪] তা হলে কুরুদের দেশ যমুনা নদীর বাম পারেও কিছুদূর বিস্তৃত ছিল বলতে হয়। মোটকথা কুরু পাঞ্চালদের সমৃদ্ধি আর্যগণের ভারতে আগমনের কয়েক শতাব্দী পরে। আর্যগণ বৈদিক যুগে ঐতিহাসিক কালক্রমের কোন ইঙ্গিত দেন নাই। তাই আর্যদের প্রথম ভারতের আগমনের কাল এবং কুরু পাঞ্চালদেশের সমৃদ্ধির কাল নির্ণয়ে বহু মতভেদ। কাল নির্ণয় বর্তমানে পুরাতন মৃৎপাত্রসংলগ্ন ভস্মের রেডিয়ো কার্বন পরীক্ষার ফল থেকে অনেকটা সঠিক ভাবে নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। উত্তর ভারতে হরপ্পা মোহেঞ্জোদারোর প্রাক্ আর্য সভ্যতার পরে আর্যসভ্যতার প্রথম স্তরের নিদর্শন হ'ল কুম্ভকারের চক্রে গঠিত লাল কালো রঙের মৃৎপাত্র বা মৃৎপাত্রখণ্ড—ভিতর দিকে কালো ও বাইরে লাল (B. R = Black and Red): রেডিও কার্বন পরীক্ষায় তার কাল স্থির হয়েছে

---

১ ঋ সং ১০।৯৮

২ Macdonell's History of Sanskrit Literature P.174

৩ মহাভারত আদি ১৩৮।৭০

৪ Apte's Sanskrit Dictionary.

২০০০ খৃঃ পূঃ থেকে ৭০০ খৃঃ পূঃ—তা উত্তর ভারতের বহুস্থানে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় স্তরের নিদর্শন হ'ল চিত্রিত ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্র খণ্ড (P.G=Painted Gray) তা পাওয়া গেছে উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে, অবিভক্ত পাঞ্জাবের পূর্বাংশে এবং রাজস্থানের উত্তরাংশে অর্থাৎ কুরুপাঞ্চাল দেশে, তার কাল স্থির হয়েছে ১১০০ খৃঃ পূঃ হতে ৫০০ খৃঃ পূঃ। তৃতীয় স্তরে পালিশ করা কালোরঙের মৃৎপাত্রখণ্ড (N B P.=Northen Black Polished), তার কাল অনুমিত হয়েছে ৬০০ খৃঃ পূঃ থেকে ৫০ খৃষ্টাব্দ ; সেই মৃৎপাত্র খণ্ড উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র পাওয়া গেছে, তা ছিল মগধ সাম্রাজ্যের যুগ। কুরুপাঞ্চাল সমৃদ্ধির যুগ ১১০০ থেকে ৫০০ খৃঃ পূঃ হলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অনুমান ১০০০ খৃঃ পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল বলা যায় ও কুরুপাঞ্চালদের সমৃদ্ধি শান্তনু রাজার রাজত্বের মধ্যভাগ থেকে ধরা যায়। বিষ্ণুপুরাণ ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে কালক্রম নির্ণয়ের চেষ্টা আছে, তাতে বলা হয়েছে যে পরিক্ষিতের জন্মকাল হতে নন্দের অভিষেক কাল ১০১৫ বৎসর, তার থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি অনুমান করেছিলেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ১৪০০ খৃঃ পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। তবে পুরাণের কাল নির্ণয় অন্য প্রমাণের সমর্থন ছাড়া গ্রহণ করা যায় না, তাই রেডিয়ো কার্বন পরীক্ষার ফলই গ্রহণ করতে হয়।

রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন ভারত কাহিনী শোনান। তারপরে নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকর দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সত্রে লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সেই ভারতকথার পুনরাবৃত্তি করেন। এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী সত্র জনমেজয়ের সর্পসত্রের কতকাল পরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাব সঠিক নির্দেশ পাওয়া যায় না। তবে যদি এই কিংবদন্তী সত্য হয় যে লোমহর্ষণ বলরামকে সম্মান দেখিয়ে উঠে না দাঁডানোতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলরাম তাকে চপেটাঘাত করেন, তার ফলে লোমহর্ষণের মৃত্যু হয়, তা হলে এই সত্র জনমেজয়েব সর্পসত্রের কয়েক বৎসর পরেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকবে। বর্তমানে আমরা যে মহাভারত পাঠ করি, তা এই লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা বা সৌতি কর্তৃক কথিত। ব্যাস কর্তৃক কথিত কিছু পাই না, বৈশম্পায়ন কথিত বলে বহু অধ্যায় আছে, তবে সেগুলি হ'ল সৌতির পুনরাবৃত্তি।

:সৌতি কর্তৃক ভারত-কথা আবৃত্তির পবে তাতে বহু উপাখ্যান ও তত্ত্বকথা যোজিত হয়েছে, যার ফলে ২৪,০০০ শ্লোকে বিবৃত আখ্যান লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারতে পরিণত হয়। লক্ষশ্লোক হয় খিলপর্ব হরিবংশ ধরে ; তা বাদ দিলে উত্তর ভারতের

মহাভারত পুঁথিতে ন্যূনাধিক ৮৪,০০০ শ্লোক আছে। মহাভারতের পুঁথি ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানা লিপিতে পাওয়া গেছে—কাশ্মীরে শারদা লিপিতে, পশ্চিম ভারতে দেবনাগরী লিপিতে, বঙ্গে বাংলা লিপিতে, অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেগু লিপিতে, তামিলনাদে গ্রন্থ লিপিতে, ইত্যাদি। কিন্তু মোটের উপরে দুটি পাঠ বা সংস্করণ হিসাবে সেগুলি ভাগ করা যায়—উত্তর ভারতীয় পাঠ ও দক্ষিণ ভারতীয় পাঠ। পূর্বভারতীয় পাঠ ও পশ্চিমভারতীয় পাঠে বিশেষ পার্থক্য নাই, দুটিই উত্তর-ভারতীয় পাঠের অন্তর্গত। দক্ষিণ-ভারতীয় পাঠে অনেক বিভিন্নতা ও যোজনা আছে। যোজনা উত্তর-ভারতীয় পাঠেও যথেষ্ট আছে—না থাকলে ২৪,০০০ শ্লোক থেকে ৮৪,০০০ শ্লোক হয় কেমন করে? আলোচনার জন্য একটি সংস্করণকে প্রমাণ সংস্করণ বলে ধরে নিতে হয়। কলিকাতায় মহাভারতের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৩৪-৩৯ খৃষ্টাব্দে। বোম্বাই হতে নীলকণ্ঠের টীকা সহ মহাভারত মুদ্রিত হয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, প্রকাশক গণপত কৃষ্ণাজী। পুণার ভাণ্ডারকর গবেষণা কেন্দ্রে সংশোধকমণ্ডলী মহাভারতের মূল পাঠোদ্ধার করতে এই কৃষ্ণাজী প্রকাশিত মহাভারতকে প্রমাণ সংস্করণ ধরেছেন। কৃষ্ণাজী প্রকাশিত সংস্করণের কিছু ত্রুটি সংশোধন পুণা হতে কিঞ্জবডেকর শাস্ত্রী ছয়খণ্ডে ১২৯ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে নীলকণ্ঠটীকা সমেত মহাভারত প্রকাশিত করেন। সেটি সহজপ্রাপ্য হওয়ায় সেটিকে এ আলোচনায় প্রমাণ সংস্করণ ধরা হয়েছে। সেই মহাভারত সংস্করণ এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনূদিত মহাভারতের বিশেষ ভেদ নাই, অধ্যায় সংখ্যা প্রায়ই মেলে, দুই এক ক্ষেত্রে শুধু ভিন্ন দেখা যায়। এই আলোচনায় প্রমাণ সংস্করণ অনুযায়ী অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা দেওয়া হয়েছে, কালীপ্রসন্ন সিংহের বাংলা মহাভারতে তা খুজে নেওয়া কঠিন হবে না।

মহাভারত কাহিনী তার নিজগুণে বহু শতাব্দী ধরে ভারতবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করেছে। পিতার সুখের জন্য ভীষ্মের স্বার্থত্যাগ, যুধিষ্ঠিরের ধর্মনিষ্ঠা কৃষ্ণের যুদ্ধে, ধর্মে ও রাজনীতিতে অবিসংবাদিত নেতৃত্ব, কর্ণ, অর্জুন ও ভীমের বীরত্ব ইত্যাদি ভারতবাসীর কাছে চিরকাল আদরণীয় হয়েছে। মহাভারতের লোকপ্রিয়তার জন্য অনেক কবি তাদের নিজের রচনা মহাভারতে যোজিত করে দিয়েছেন, যাতে সে রচনা মহাভারতের আশ্রয়ে চিরস্থায়িত্ব লাভ করে। কিন্তু বর্তমান মহাভারত কাহিনীতে বহু অনৈসর্গিক কথা আছে, যা এখন শিক্ষিত লোকে বিশ্বাস করতে পারে না। বৈদিক যুগের পরে পৌরাণিক যুগে সম্ভবতঃ লোকের অলৌকিক বা অনৈসর্গিক

কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ ছিল ; যে মনোবৃত্তি নিয়ে ছোট ছেলেমেয়েরা রূপকথা উপভোগ করে, সম্ভাব্যতার বিচার করে না, অশিক্ষিত জনগণ মধ্যে সেই মনোবৃত্তি ছিল। লিপিকারগণ ও কথকগণ সেই মনোবৃত্তির সুযোগ নিয়ে বহু অনৈসর্গিক কথা মহাভারতে যোজিত করেছেন, যথা দেবলোকে গমন, দেবতার সঙ্গে মানুষের সহবাস, ঋষিদের অলৌকিক শক্তি, অভিশাপ দানের অব্যর্থ ফল, ইত্যাদি। আর অতিরঞ্জন আছে, সৈন্যদল সংখ্যানে, দাস-দাসী মণিমুক্তার প্রাচুর্যের কথায়, ব্রাহ্মণ মহিমা কথনে, দানের আতিশয্য বর্ণনায়, ইত্যাদি। তা ছাড়া মহাভারত কাহিনী পাঠে কতকগুলি অসঙ্গতি মনকে পীড়িত করে। পুণার সংশোধক মণ্ডলী অসঙ্গতির অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন, তাঁরা বলেছেন যে ভারত কথা বা মহাভারত এককালে দ্বৈপায়নের মত কোন ঋষিকবি দ্বারা রচিত ও কথিত হয় নাই, পাণ্ডব, ধার্তরাষ্ট্রগণ কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, ঘটনার বহুকাল পরে সেগুলি গ্রথিত হয়েছে, কিন্তু গ্রন্থনকারী অসঙ্গতি দূর করে কাহিনীর সত্যরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই, পরস্পর বিরুদ্ধ কিংবদন্তী থাকলে দুটিকে বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এইসব অনৈসর্গিক কথা, বর্ণনার আতিশয্য এবং অসঙ্গতি বাদ দিয়ে মহাভারত কাহিনী, যোজিত উপাখ্যান ও সন্দর্ভগুলি বাদ দিয়ে মূল ভারত কথা কি ছিল, তাই নির্ণয় করবার স্পৃহা অনেকের হয়। প্রথমে কয়েকটি অসঙ্গতির আলোচনা করা যাক।

২. পাণ্ডবগণের জন্ম-বিবরণ

মহাভারত প্রধানতঃ পাণ্ডবগণের জীবনকাহিনী, কিন্তু পাণ্ডবগণের জন্ম-বিবরণে অসঙ্গতি আছে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে পাণ্ডু অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষ্যে বহু দেশ জয় করে স্ত্রীদ্বয়কে নিয়ে অরণ্যবাসী হলেন, এবং মৃগয়াকালে সঙ্গমরত মৃগ ও মৃগীকে বধ করায় মৃগরূপধারী ঋষির শাপগ্রস্ত হলেন, স্বয়ং পুত্র উৎপাদন করতে পারলেন না, তাঁর স্ত্রীদ্বয় ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয় হতে পুত্রলাভ করেন (১১২-১১৪ শ্লোক), পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে ঋষিগণ কুন্তী ও শিশুপুত্রদের হস্তনাপুরে ধার্তরাষ্ট্রদের নিকট পৌঁছে দেন, বলেন যে এরা পাণ্ডুর পুত্র, বলেই তাঁরা চলে যান। তখন হস্তিনাপুরে কেউ কেউ বলেছিল যে পাণ্ডু তো বহুকাল পূর্বে মৃত হয়েছেন

(চিরমৃত), এরা তাঁর পুত্র কেমন করে হবে ? কেউ কেউ বলেছিল, এরা পাণ্ডুরই পুত্র। তখন দৈববাণী ও পুষ্প বৃষ্টিতে শিশুগণ যে পাণ্ডুরই পুত্র তা প্রমাণ হয় ; ভীষ্ম প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধগণ তাদের পালনের ভার নেন। ঋষিগণ যে বলে গেলেন শিশুরা পাণ্ডুর পুত্র, তারা দেব ঔরসে জাত সেকথা বললেন না, তার থেকে মনে হয় যে ১১২-১১৪ শ্লোক পরে যোজিত হয়েছে, দেবতার ঔরসে জন্মের কথা প্রথম থেকে কাহিনীতে ছিল না। এই আখ্যানের বিস্তৃত বিবরণ আছে ১১৮-১২৭ অধ্যায়ে। ১২৫ অধ্যায়ে আছে যে পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে মাদ্রী তার চিতায় আত্মোৎসর্গ করলেন, ১২৬ অধ্যায়ে আছে যে ঋষিগণ কুন্তী ও শিশুদের হস্তিনাপুরে পৌঁছে দিয়ে তাদের দেবগণের ঔরসে জন্মের কথা শোনালেন, সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ উপস্থিত করে দিয়ে বললেন যে পাণ্ডু সতেরো দিন পূর্বে প্রাণত্যাগ করেছেন ও মাদ্রী পাণ্ডুর চিতায় জীবন বিসর্জন করেছেন। এই বিবরণে পাণ্ডুকে বহুদিন পূর্বে মৃত না বলে সতেরো দিন পূর্বে মৃত বলা হ'ল, এবং ঋষিগণই শিশুদের দেবতার ঔরসে জন্ম সে কথা বলে গেলেন। অতএব শিশুগণ পাণ্ডুর পুত্র কিনা সে বিষয়ে লোকের সন্দেহের অবসর রাখা হল না। এই দুটি অমিল ছাড়া আরো প্রশ্ন ওঠে যে চিতায় দাহ হলে ঋষিগণ পাণ্ডু ও মাদ্রীর দেহ কিভাবে উপস্থিত করেছিলেন ! টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন যে তাঁরা দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি এনে দিয়েছিলেন, সেকালে চিতার থেকে দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি সংগ্রহের প্রথা ছিল। কিন্তু ১২৭ অধ্যায়ে আছে যে বিদুর যখন চিতার উপর পাণ্ডুর দেহ চন্দনলিপ্ত করে সাজিয়ে দিলেন, তখন পাণ্ডুকে জীবিতের মত মনে হল। দগ্ধাবশিষ্ট অস্থিকে চন্দনলিপ্ত করে সাজিয়ে দেওয়া বা তা জীবিতের মত মনে হওয়া সম্ভব নয়। এই যে অসঙ্গতি, এর উল্লেখ ডঃ সুকৃথংকর (মহাভারত সংশোধক মণ্ডলীর প্রথম প্রধান বা অধিকর্তা) তাঁর সংশোধিত আদিপর্বের ভূমিকায় বলেছেন, যে সকল প্রদেশের পুঁথিতেই এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বিবরণ আছে, অতএব সংশোধক মণ্ডলী তা রাখতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য পুরাতন সাধারণ পাঠ উদ্ধার করা ; অসঙ্গতি বা অনৈসর্গিক বিবরণ বাদ দেওয়া, ন্যায় বিজ্ঞান মতে সমালোচনায় করা যেতে পারে (higher criticism), কিন্তু তা করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু অসঙ্গতি এবং অনৈসর্গিকতার দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় যে অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ১১৯-১২২ শ্লোকেই সত্য কাহিনী আছে, দেবগণের ঔরসে পাণ্ডবগণের জন্ম একথা বলে তাদের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে কাহিনীকে ভিন্নরূপ দেওয়া হয়েছে।

১১৮ অধ্যায়ে আছে যে মৃগয়াকালে মৃগরূপধারী কিন্দম ঋষিকে একটি বন্য মৃগীর সঙ্গে সংসর্গ কালে পাণ্ডু বাণ মেরে বধ করেন, মৃগীকেও বধ করেন; কিন্দম মৃত্যুর পূর্বে অভিশাপ দেন যে পাণ্ডুরও সঙ্গমকালে মৃত্যু হবে। যে লোক নিজের রমণেচ্ছা সংযত করতে না পেরে বন্য মৃগীর সঙ্গে সংগম করে, সে বর্তমান কালে রাজদ্বারে দণ্ডনীয়; পুরাকালে দণ্ডনীয় না হলেও তা নিন্দিত ছিল; কিন্দমের উক্তির মধ্যে আছে যে লোকলজ্জা, ভয়ে গহন বনে এসে সে মৃগীর সঙ্গে সংসর্গ করেছিল। যে অসংযমী ঋষি লোকাচার বিরুদ্ধ নিন্দিত কর্ম করে, তার কোন আধ্যাত্মিক বা আভিচারিক শক্তি থাকবার কথা নয়, তার অভিশাপ কেন অব্যর্থ হবে? মহাভারতে ঋষিদের অভিশাপ এবং তা অব্যর্থতার কথা বহুস্থানে আছে; অকারণে বা অল্প দোষে ভয়ানক অভিশাপ দান দেন ঋষিদের স্বভাব ছিল, তা করলে তাদের ধর্মে পতিত হবার কথা, কোন অলৌকিক শক্তি তাদের থাকতে পারে না। তাই কিন্দম ঋষির অভিশাপের কথা সত্য বলে আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

কুন্তী সম্বন্ধে কাহিনী আছে যে রাজা কুন্তিভোজ দুর্বাসা মুনির সেবার ভার তাঁর কুমারী কন্যা কুন্তীর উপর দেন, সেবায় তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা তাকে মন্ত্রবর দেন যে সে ইচ্ছামত মন্ত্রবলে যে কোন দেবতাকে আকর্ষণ করতে পারবে এবং সেই দেবতা সশরীরে এসে পুত্র উৎপাদন করবে। কুমারী অবস্থায় কৌতূহলভরে কুন্তী সূর্যকে মন্ত্রবলে আকর্ষণ করেন এবং সূর্যের ঔরসে কর্ণের জন্ম হয়। কুমারী অবস্থায় জাত পুত্রকে বিসর্জন দিতে হয় (আদিপর্ব, ১১১ অধ্যায়)। পরে যখন পাণ্ডু পুত্রকাম হন কিন্তু কিন্দম ঋষির অভিশাপ স্মরণ করে নিজে পুত্র উৎপাদন করতে সাহস পান না, তখন কুন্তী তাকে তার মন্ত্রবরের কথা জানান (আদিপর্ব ১২২।৩২—৪০) এবং পাণ্ডুর অনুমতিতে ধর্মকে আকর্ষণ করে যুধিষ্ঠিরের জন্মদান করেন ও বায়ুকে আকর্ষণ করে ভীমের জন্মদান করেন। অর্জুনের জন্ম সম্বন্ধে প্রথমে বলা হয়েছে যে পাণ্ডু বীরশ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ করার ইচ্ছায় কুন্তীকে দিয়ে বর্ষব্যাপী ব্রত করালেন, নিজেও কঠোর তপস্যা করলেন, তপস্যায় প্রীত হয়ে ইন্দ্র আবির্ভূত হয়ে পাণ্ডুকে বর দিলেন যে তোমার সকলশত্রুজয়ী পুত্র হবে (আদিপর্ব, ১২৩।২০-৩০)। তার পরে বলা হয়েছে যে বরের কথা জানিয়ে পাণ্ডু কুন্তীকে বললেন, এবার তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে আহ্বান কর, এবং কুন্তী তাই করে অর্জুনকে লাভ করলেন (আদি ১২৩।৩১-৩৫)। এই বিবৃতির দুই অংশের মধ্যে অসংগতি আছে।

কুন্তী যদি মন্ত্রবরের সাহায্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে আহ্বান করে পুত্র লাভ করে থাকেন, তাহলে তার পূর্বে কুন্তীর বর্ষব্যাপী ব্রতপালন এবং পাণ্ডুর কঠোর তপস্যা করা কেন ? সেই তপস্যা ও ব্রতের ফলে পাণ্ডুর ঔরসেই অর্জুনে জন্ম হ'ল, এই তো কাহিনীর স্বাভাবিক পরিণতি। অতএব এই অনুমান সঙ্গত যে অর্জুন পাণ্ডুর ঔরসজাত পুত্র ছিলেন, যুধিষ্ঠির এবং ভীমও তাই ছিলেন; মাদ্রীগর্ভজাত নকুল ও সহদেব অশ্বিনীদ্বয়ের ঔরসে নয়, পাণ্ডুর ঔরসেই জন্মেছিল। মন্ত্রবরবলে সশরীরে দেবতা এসে উপস্থিত হলেন, এই কল্পনা অনৈসর্গিক এবং অগ্রাহ্য। কর্ণের জন্ম সম্বন্ধে মনে হয় যে কবি নবীন সেনের অনুমানই যথার্থ, যে কর্ণ দুর্বাসার ঔরসপুত্র ছিলেন।

অংশাবতরণ অনুপর্বে আছে যে পরাজিত অসুরগণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে অশান্তি সৃষ্টি করছিল তাদের দমন করতে ব্রহ্মার ইচ্ছায় দেবগণের অংশে পৃথিবীতে নানা ক্ষত্রিয় বীরের জন্ম হয়। যথা বিষ্ণুর অংশে কৃষ্ণ, শেষনাগের অংশে বলরাম, দ্বাপরের অংশে শকুনি, কলির অংশে দুর্যোধন, ইত্যাদি। এই কাহিনী অনৈসর্গিকতা হেতু গ্রাহ্য নয়, এবং মহাভারতযুগের বহু শতাব্দী পরে কৃষ্ণকে যখন বিষ্ণুর অবতার বলা হয়, তখনকার কল্পনা; তা মূল ভারত কাহিনীর অংশ নয়। কিন্তু এই অংশাবতরণ কাহিনী মতেও দেখি যে কৃষ্ণ বলরাম, শকুনী ও দুর্যোধন ইত্যাদি অংশাবতরণ হলেও তাদের জন্ম দিতে দেবগণকে সশরীরে আসতে হয় নাই; পাণ্ডবদের বেলায় তা কেন হবে ? বিদুরের জন্ম বলা হল ধর্মের অংশে; যুধিষ্ঠিরেরও তাই, বিদুরের বেলায় ধর্মদেবতা সশরীরে আসেন নাই, যুধিষ্ঠিরের বেলায় তাঁর সশরীরে কেন আসতে হবে ? অংশাবতরণ কথার অনৈসর্গিকতা ছাড়াও এই অসঙ্গতির জন্য অগ্রাহ্য।

মহাভারতে অনেক স্থলে অর্জুনকে ইন্দ্রের পুত্র, পাকশাসনি, বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু অন্য একটি বিরুদ্ধ বিবরণও আছে, যে অর্জুন ও কৃষ্ণ যথাক্রমে নর ও নারায়ণ ঋষি, বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যা করে বহু শক্তি অর্জন করে তাঁরা বিশেষ কার্যের জন্য পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন, তাঁরা অজেয়। খাণ্ডবদাহ অনুপর্বে এই কথা আছে; এই কথা দৈববাণীতে শুনে ইন্দ্রাদি দেবগণ, যাঁরা খাণ্ডবদাহ নিবারণ করতে এসে কৃষ্ণ-অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন, তাঁরা নিবৃত্ত হলেন। অর্জুন ও কৃষ্ণ যে নর ও নারায়ণ ঋষি বিশেষ কার্যের জন্য জন্ম নিয়েছেন, তাঁরা অজেয়, সে কথা পুনঃ উদ্যোগপর্বে ৪৯ অধ্যায়ে এবং দ্রোণ পর্বে ১০১ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে। এই ভাবে পরস্পরবিরুদ্ধ উপাখ্যান নিয়ে অর্জুনের

মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা থেকে অনুমান করা যায় যে এই সব উপাখ্যানই পরের যোজনা; প্রকৃত তথ্য এই যে পাণ্ডবগণ পাণ্ডুরই ঔরসজাত পুত্র।

পাণ্ডু রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে দুই স্ত্রী সহ অরণ্যে মৃগয়াচারী হলেন কেন, তা মহাভারতে বিবৃত হয় নাই। ১১৮-১১৯ অধ্যায় থেকে মনে হতে পারে যে কিন্দম ঋষির শাপে দুঃখিত হয়ে তিনি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। কিন্তু ১।১২২ শ্লোক থেকে মনে হয় যে ঋষির অভিশাপের পূর্বেই তিনি রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে অরণ্যচারী হয়েছিলেন। ১১৪।৬-১১ শ্লোক থেকেও সেই অনুমান হয়। ১১৪।১৫ শ্লোকে আছে যে পাণ্ডু দিগ্বিজয় করে জিত ধনরত্ন ভীষ্ম, সত্যবতী, মাতা অম্বালিকা বা কৌশল্যা, বিদুর প্রভৃতিকে দিয়ে দিলেন, তাঁর জিত অর্থ দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্ব হেতু পাণ্ডু রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, অশ্বরক্ষণ সূত্রে দিগ্বিজয়ের পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ তাঁরই করবার কথা ছিল। ভীষ্ম প্রভৃতির নির্দেশে ধৃতরাষ্ট্র সেই যজ্ঞের যজমান হওয়ায় পাণ্ডু বিদ্রোহ না করে অভিমান ভরে রাজ্য ত্যাগ করে থাকতে পারেন। পুত্রদের জন্মের পরে পাণ্ডুর মৃত্যু হয়। ১।১১৫ শ্লোকে "মাতৃভ্যাং পরিরক্ষিতাঃ", শব্দের টীকায় নীলকণ্ঠ বলেছেন যে পুত্রগণ মাতৃদ্বয় দ্বারা রক্ষিত বলায় তখন যে পাণ্ডু গত হয়েছেন তাই সূচিত হচ্ছে। তাহলে মাদ্রীও পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে পুত্রদের রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন পতির চিতায় জীবন বিসর্জন দেন নাই। পাণ্ডবগণ যখন হস্তিনাপুরে নীত হন, তখন মাদ্রী ছিলেন না, ইতিমধ্যে তিনি স্বাভাবিক কারণে দেহত্যাগ করে থাকতে পারেন। এই অনুমান সত্য হলে ১১৮-১২৭ অধ্যায়ের বিবরণ আরো অগ্রাহ্য মনে হয়। এই অনুমান সত্য না হলেও পাণ্ডবগণের দেব-ঔরসে জন্ম-কথা অসঙ্গতি ও অনৈসর্গিকতা হেতু গ্রহণ করা যায় না।

৩· ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের কথা

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের সম্বন্ধেও অসঙ্গতি এবং বিস্তৃত জন্মবিবরণে অনৈসর্গিকতা আছে। আদিপর্বের ৯৫ অধ্যায়ে বলা হল যে দ্বৈপায়ন ঋষির বরদানের ফলে গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র হয়, তার মধ্যে চার জন প্রধান—দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ও চিত্রসেন (৫৬-৫৭ অনুচ্ছেদ) কিন্তু ৬৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন প্রভৃতি একশত পুত্র এবং বৈশ্যা পরিচারিকার গর্ভে জাত করণ জাতীয় এক পুত্র—যুযুৎসু ছিল, তাদের মধ্যে একাদশ জন মহারথ—যথা দুর্যোধন,

দুঃশাসন, দুঃসহ, দুর্মর্ষণ, বিকর্ণ, চিত্রসেন, বিবিংশতি, জয়, সত্যব্রত, পুরুমিত ও যুযুৎসু (১১৯-১২০ শ্লোক) এই দুটি শ্লোক সংশোধকমণ্ডলী বাদ দিয়েছেন। শান্তি পর্বে ৪৪ অধ্যায়ে দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুর্মর্ষণ ও দুর্মুখ এই চার জন ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের নাম আছে—তাদের গৃহ যুধিষ্ঠির যথাক্রমে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে দিলেন। ১১৭অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের নাম আছে, সেখানে বলা হয়েছে যে তারা সকলেই অতিরথ ছিল (১৬ শ্লোক), উদ্যোগপর্বে রথাতিরথ সংখ্যান অঙ্গপর্বে ভীষ্ম, দুর্যোধন ও তার শত ভ্রাতাকে রথোদার অর্থাৎ উত্তম রথী কিন্তু মহারথ নয়—বলে বর্ণনা করেছেন (১৬২।১৯)। অতএব অতিরথ রূপে বর্ণনা অতিবাদ বলে বাদ দিতে হয়। যুদ্ধ বর্ণনা পাঠে দুর্যোধন ও দুঃশাসন ভিন্ন আর কাকেও উত্তম রথী বলে মনে হয় না।

এক নারীর পক্ষে শত পুত্রের জন্মদান সম্ভব নয়। ৯৫ অধ্যায় দ্বৈপায়নের বরদানের কথা বলা হয়েছে। বিস্তৃত বিবরণ আছে ১১৫ অধ্যায়; সেখানে বলা হয়েছে যে গান্ধারী ব্যাস ঋষিকে পাদ্য অর্ঘ্য আহার্য ইত্যাদি দিয়ে সেবা করায় ব্যাস তুষ্ট হয়ে তাকে শতপুত্রের জননী হও, এই বর দিলেন। গান্ধারী দুই বৎসরকাল গর্ভধারণ করেন, তার মধ্যে সন্তানের জন্ম না হওয়ায় এবং কুন্তীর পুত্র জন্মেছে সংবাদ পেয়ে তিনি স্বীয় উদরে চাপ দিলেন, ফলে গোলাকার কঠিন মাংসপিণ্ড প্রসূত হল। তখন ব্যাস ঋষি উপস্থিত হয়ে বললেন, শীতল জল দিয়ে এই মাংসপিণ্ড সিক্ত কর, তা করা হলে মাংস পিণ্ডটি একশত এক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল ও ব্যাসের নির্দেশে প্রতিটি ক্ষুদ্র মাংসপেশী ঘৃতের কুম্ভে রাখা হল এবং কুম্ভগুলি নিরাপদ স্থানে রক্ষিত হল, প্রতি কুম্ভে কালে একটি করে শিশু উৎপন্ন হ'ল—একশত পুত্র ও একটি কন্যা; পুত্রদের মধ্যে প্রথম জাত যে হল, সেই দুর্যোধন। এইভাবে বিশ্লিষ্ট মাংসপেশী সমূহ ঘৃতপাত্রে রক্ষিত হয়ে কালে শিশুরূপে পরিণত হল, সে আখ্যান গ্রাহ্য নয়। নারীর গর্ভে ছাড়া শিশু পূর্ণাবয়ব লাভ করতে পারে না। ব্যাসের তপস্যার বল থাকতে পারে, কিন্তু তার ফলে তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন না। ৬৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে কলির অংশে দুর্যোধনের জন্ম হয়, এবং পৌলস্ত্যগণ (যক্ষ ও রাক্ষসগণ) তার ভ্রাতৃগণরূপে জন্ম নেয়। সে সব জন্ম একসঙ্গে কেমন করে হবে?

সভাপর্বে ৫৪।১ শ্লোকে দুর্যোধনকে জ্যৈষ্ঠিনেয় বা জ্যেষ্ঠা মহিষী গর্ভজাত বলা হয়েছে। শতপুত্র যদি ধৃতরাষ্ট্রের হয়ে থাকে, তবে তাঁর বহু মহিষী ছিল।

কিন্তু মহাভারতে একমাত্র গান্ধারীর কথাই আছে ধৃতরাষ্ট্রমহিষীরূপে। অতএব শত অর্থে বহু বুঝতে হবে। একটি স্বাস্থ্যবতী নারীর ১৭।১৮টি পুত্র ও একটি কন্যা থাকা অসম্ভব নয়। সম্ভবতঃ ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর ১৭।১৮টি পুত্রই ছিল। দশের বেশী বলে আদরার্থে তাদেরই শত বলা হয়েছে।

পরিসংখ্যানমত শত পুত্র বলে তাদের যুদ্ধে মৃত্যু বর্ণনায় মহাভারতকার এক একসঙ্গে অনেক ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের মৃত্যুর কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। জয়দ্রথ বধের দিন ভীম যখন যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ মত কৌরবব্যূহ বিদীর্ণ করে কর্ণের সম্মুখীন হলেন, তখন ভীমের হস্তে বার বার কর্ণের পরাজয়, এবং কর্ণের সাহায্যে কয়েকজন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রকে প্রেরণ ও ভীমের হস্তে নিমেষে তাদের সকলের মৃত্যু এইভাবে একুশজন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের মৃত্যু, এবং তার পূর্বে ভীমের আক্রমণে বিপর্যস্ত দ্রোণকে সাহায্য করতে এসে এগারজন ধার্তরাষ্ট্রের মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসংখ্যা একশত না বলে ১৭বা ১৮ জন বল্‌লে এইভাবে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের জীবন উৎসর্গকরণ বর্ণনা করতে হ'ত না।

৪. ভীমের বাল্যজীবন বর্ণনায় অসঙ্গতি

হস্তিনাপুরে শিক্ষাকালে ভীম তার অসামান্য দৈহিক বলের সুযোগ নিয়ে মধ্যে মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের উপর উৎপাত করতেন, যথা গাছে উঠলে গাছের কাণ্ড ধরে নাড়া দিয়ে ফেলে দেবার ভয় দিতেন, স্নানের সময় কয়েকজনকে ধরে একসঙ্গে তাদের মাথা জলে ডুবিয়ে ধরে তাদের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হলে ছেড়ে দিতেন, ইত্যাদি। তার প্রতিশোধ নিতে দুর্যোধন একবার ভীমের খাদ্যের সঙ্গে কালকূট বিষ মিশিয়ে দেন, একবার নিদ্রিত পেয়ে কৃষ্ণসর্প দিয়ে দংশন করান, একবার হাত পা বেঁধে নদীতে ফেলে দেন। প্রতিবারই ভীম তাঁর প্রচুর প্রাণশক্তি বলে বেঁচে যান। ৬১ অধ্যায়ে এই স্বাভাবিক বর্ণনা আছে। ১২৮ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে কালকূট বিষ মিশ্রিত খাদ্য গ্রহণ করে অচেতন হয়ে পড়লে ভীমের হাত পা বেঁধে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতৃগণ তাকে জলে ফেলে দেন, ভীম ডুবতে ডুবতে নাগলোকে পৌছে যান, সেখানে নাগের দংশনে শরীরস্থ কালকূট বিষ নষ্ট হওয়ায় ভীম চেতনা লাভ করে অনেক নাগ বধ করেন, নাগরাজ বাসুকি তাঁকে চিনে সমাদর করে রস পান করতে দেন, আট কুণ্ড রস পান

করে ভীম আট দিন পুরো নিদ্রিত থাকেন, জেগে উঠলে বাসুকির আদেশে নাগগণ তাকে গঙ্গার কূলে পৌঁছে দেয়। আট দিন পরে বাড়ী ফিরলে কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি আশ্বস্ত হন, তাঁরা ইতিমধ্যে বিদুরের উপদেশ মত ভীম বাড়ী না ফিরলেও কোন নালিশ বা গোলমাল করেন নাই। এইভাবে ৬১ অধ্যায় বর্ণিত স্বাভাবিক কাহিনীকে অলৌকিক রূপ দিয়ে অসঙ্গতির সৃষ্টি করা হয়েছে।

সংশোধক মণ্ডলী ১২৮ অধ্যায়ের বহু শ্লোক বর্জন ও বহু শ্লোক পরিবর্তন করে ৬১ অধ্যায় কথিত স্বাভাবিক কাহিনী ফিরিয়ে এনেছেন। এই একটি ক্ষেত্রে নানা প্রদেশের পুঁথি মিলিয়ে সঙ্গতি ও অনৈসর্গিকতা দূর করা সম্ভব হয়েছে। এইভাবে আর সব অসঙ্গতি ও অনৈসর্গিকতা দূর করতে পারলে সম্ভাব্যতা বিচার করে অসঙ্গতি ও অনৈসর্গিকতা দূর করবার চেষ্টার প্রয়োজন হত না।

৫. কর্ণ সম্বন্ধে অসঙ্গতি

কর্ণ কুন্তীর কানীন পুত্র; ঋষি দুর্বাসা রাজা কুন্তিভোজের অতিথি হলে কুমারী কন্যাকে তার সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন, দুর্বাসা বিদায় নিয়ে যাবার পরে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। ঋষির অসংযমের কথা ঢাকা দিতে উপাখ্যান সৃষ্টি হয়েছে যে দুর্বাসা যে কোন দেবতাকে সশরীরে আহ্বান করতে কুন্তীকে মন্ত্র বর দিয়েছিলেন; সেই মন্ত্রবলে কুমারী সূর্যদেবতাকে আহ্বান করেন ও তার ঔরসে কর্ণের জন্ম হয়, কিন্তু কবি নবীন সেনের অনুমান যথার্থ, যে কর্ণ দুর্বাসার ঔরস পুত্র। কন্যা অবস্থায় জন্ম হওয়ায় লোকলজ্জাভয়ে কুন্তী পুত্রটিকে জন্মের পরে বিসর্জন দিতে বাধ্য হন, এক পেটিকায় রেখে পুত্রটিকে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, সূত অধিরথ স্নানকালে পেটিকাটি দেখে সেটি উদ্ধার করে জীবন্ত শিশুটিকে দেখতে পান, এবং তিনি ও তাঁর স্ত্রী শ্রীরাধা পুত্রটিকে সযত্নে পালন করেন—তাঁহাদের আর পুত্র ছিল না। অধিরথ পুত্রটির নাম দেন বসুসেন।

কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরামের নিকট শিক্ষা পেয়ে পরমাস্ত্রবিদ বলে খ্যাত হলেন।[১] দ্রোণ যখন হস্তিনাপুরে রাজপুত্রদের অস্ত্রশিক্ষা দেন, তাঁর শিক্ষার উৎকর্ষের খ্যাতি চারদিকে ব্যাপ্ত হওয়ায় বৃষ্ণি-অন্ধক

১ বনপর্ব, ৩০৯।১৮

কুলের ও অন্য রাজ্যের কুমারগণ এসে তার কাছে শিখতে আরম্ভ করলেন, তার মধ্যে রাধেয় কর্ণও এসে দ্রোণকে গুরু বলে বরণ করে নিলেন, একথা আদিপর্বে আছে।[২] কিন্তু পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের শিক্ষা সমাপ্তির পরে যখন রঙ্গস্থল নির্মাণ করে অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন হল অন্য সবার শিক্ষা চাতুর্য দেখাবার পরে দ্রোণ অর্জুনকে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ বলে অস্ত্রের খেলা দেখাতে বললেন, এবং অর্জুন তা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করে দিলেন (১৩৫ অধ্যায়), তখন অকস্মাৎ বাহু আস্ফোটন করে কর্ণ রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলেন, কৃপ দ্রোণকে বিশেষ সম্ভ্রম না দেখিয়ে প্রণাম জানালেন এবং অর্জুনকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি যা দেখিয়েছ, আমি তা সব দেখাতে পারি। সকলে বিস্মিত হয়ে ভাবলো, লোকটি কে?[৩] দ্রোণের অনুমতিতে কর্ণ রঙ্গমধ্যে অর্জুন যা কিছু করেছিলেন, সবই করলেন। তা দেখে দুর্যোধন তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽস্মি মানদ" (ভাগ্যক্রমে তোমাকে পেলাম) —অর্জুনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে দুর্যোধন অত্যন্ত আনন্দিত। তারপর কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে চাইলে কৃপ কর্ণের পরিচয় জানতে চাইলেন, বললেন যে অর্জুন রাজা পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র, রাজপুত্রগণ নীচকুলজাত পুরুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেন না। তখন কর্ণকে লজ্জিত দেখে দুর্যোধন বললেন অর্জুন যদি রাজপুত্র বা রাজা ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ না করে, তাহলে আমি কর্ণকে অঙ্গ রাজ্যের সামন্ত রাজপদে অভিষিক্ত করছি। তারপর সূত অধিরথ রঙ্গস্থলে এলো, কর্ণ তাকে পিতা বলে প্রণাম করলে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আর হল না। কিন্তু এই বৃত্তান্ত থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে কর্ণ দ্রোণের ও কৃপের অপরিচিত ছিলেন। দ্রোণ রঙ্গস্থলে তাকে অস্ত্রের খেলা দেখাতে অনুমতি দিলেও তার পরিচয় জানতেন না। কৃপ তো পরিষ্কার সে কথা প্রকাশ করেছেন। অতএব দ্রোণও কৃপের নিকট কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা হয় নাই, অসঙ্গতি হেতু সেই বৃত্তান্ত বাদ দিতে হবে। পরশুরামের নিকট শিক্ষার কথাও আছে, কিন্তু পরশুরামের পাণ্ডুপুত্র ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের কৈশোরের বা যৌবনের কালে বর্তমান থাকা সম্ভব নয়। তিনি দাশরথি রামের পূর্ববর্তী, দাশরথিরামের তরুণ বয়সে তাঁর সঙ্গে পরশুরামের সাক্ষাৎ হয়; পাণ্ডব কৌরবগণ তার তিন চার শত বৎসর পরে জন্মেছিলেন।

---

২. আদি পর্ব, ১৩২।২২

৩. " " ১৩৬।৭

অতএব পরশুরামের নিকট হতে কি করে কর্ণ শিক্ষা পাবেন। মহাভারত আখ্যানে কালপর্যায় মধ্যে মধ্যে উপেক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু মহাভারতের আখ্যান মতেও দেখা যায় যে পরশুরাম যখন তাঁর সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে বনে যাওয়া মনস্থ করেছেন তখন দ্রোণ গিয়ে তাঁর কাছে ধন প্রার্থনা করলেন, পরশুরাম বললেন—আমার ধন ও জমি জমা সব দান করে দিয়েছি। আমার এই শরীর আর অস্ত্রসমূহ শুধু বাকী আছে। দ্রোণ তাঁর অস্ত্রগুলি চেয়ে নিলেন।[১] এই ঘটনা হয় ভীষ্মের নিকট আশ্রয়লাভের পূর্বে। অতএব কর্ণের পক্ষে ভার্গব পরশুরামের কাছ থেকে অস্ত্রশিক্ষা সম্ভব নয়। ভৃগুবংশীয়, অঙ্গিরস বংশীয় এবং অন্যবংশীয় অস্ত্রশিক্ষক সেকালে অনেক ছিলেন, কর্ণ কার কাছে অস্ত্রশিক্ষা করলেন তা কালে লোকে বিস্মৃত হওয়ায় অসম্ভব গল্পের সৃষ্টি করেছে।

ভার্গব পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা না হয়ে থাকলে তাঁর কাছ থেকে অভিশাপ প্রাপ্তির কথাও বাদ দিতে হয়। অভিশাপ প্রাপ্তির কথা মহাভারতে দুইবার বিবৃত হয়েছে, স্বয়ং কর্ণকর্তৃক কর্ণপর্বে ৪২ অধ্যায়ে এবং নারদ কর্তৃক শান্তিপর্বে ২-৩ অধ্যায়ে। কর্ণের বিবৃতি অনুসারে কর্ণ পরশুরামের নিকট হতে দিব্য অস্ত্র শিক্ষা করতে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে তাঁর আশ্রমে ছিলেন, একদিন যখন গুরু কর্ণের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন, ইন্দ্র অর্জুনের হিতকামনায় ভয়ানক কীটরূপ ধারণ করে কর্ণের উরু ভেদ করে দেন, কর্ণ গুরুর নিদ্রাভঙ্গ-ভয়ে যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন, কিন্তু রক্তের উষ্ণস্পর্শে গুরু জেগে উঠে ব্যাপার দেখে বল্লেন, ব্রাহ্মণ হলে এত যন্ত্রণা সহ্য করে থাকতে পারতো না, তুমি কে সত্যিকরে বল। কর্ণ তখন নিজ পরিচয় দিলেন, সূতপুত্র বলে; শুনে পরশুরাম অভিশাপ দিলেন, মিথ্যা বলে তুমি দিব্য অস্ত্র লাভ করেছ, তোমার মৃত্যু সংকট উপস্থিত হলে এই দিব্য অস্ত্র তোমার স্মরণ হবে না। শান্তিপর্বে নারদ কথিত উপাখ্যান মতে যে ভীষণ দংষ্ট্রাবিশিষ্ট কীট কর্ণের উরুভেদ করে, সে ছিল দংশ নামক মহা অসুর, ভৃগুর ভার্যাকে অপহরণ করায় ভৃগু তাকে শাপ দিয়ে ভীষণ কীটরূপে পরিণত করেন, অসুরের ক্ষমা প্রার্থনায় বলেন যে ভার্গব পরশুরামকে যখন দর্শন করবে তখন শাপ থেকে মুক্তি পাবে; এবং পরশুরাম জেগে উঠলে কীট তাকে দেখে পূর্ববৎ রাক্ষসরূপ ফিরে পেয়ে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে আকাশ পথে চলে গেল। কিন্তু পরশুরাম কর্ণের পরিচয় জেনে তাকে পূর্বকথিত অভিশাপ দিলেন।

---

১ আদিপর্ব ১৩০ অঃ

এক ঘটনার দুই বিবৃতির অসঙ্গতি হেতু ঘটনার সত্যতা অগ্রাহ্য করতে হয়। তাছাড়া প্রতিটি বিবৃতি অনৈসর্গিকতা হেতু অগ্রাহ্য। কর্ণের সূর্যের ঔরসে, অর্জুনের ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম, সেই অনৈসর্গিক কথা বাদ দিলে প্রথম বিবৃতির মূল নষ্ট হয়ে যায়। আদিপর্বে ৫-৬ অধ্যায়ে আছে যে ভৃগুপত্নী পুলোমাকে হরণ করেছিল পুলোমা নামক এক রাক্ষস, তার দাবী ছিল যে সে প্রথমে পুলোমাকে বরণ করে, পরে পুলোমার পিতা ভৃগুর সঙ্গে পুলোমার বিবাহ দেন, কিন্তু হরণ করে নিয়ে যাবার সময় পুলোমার পুত্র চ্যবন গর্ভচ্যুত হয়ে জাত হয়, তার দীপ্ত তেজে হরণকারী রাক্ষস ভস্মীভূত হয়ে যায়। ভৃগু এসে অগ্নিকে অভিশাপ দেন, কারণ অগ্নি পুলোমার কথা সত্য বলে স্বীকার করেছিল, সেখানে রাক্ষস বা অসুরকে ভৃগুর অভিশাপদানের কথা নাই। অতএব এখানেও অসঙ্গতি, অনৈসর্গিকতা তো আছেই। এইভাবে কর্ণের ভৃগুবংশের পরশুরামের অভিশাপ প্রাপ্তির কথা কোন মতেই গ্রাহ্য নয়। তা ছাড়া অর্জুনের সঙ্গে শেষ যুদ্ধকালে কর্ণ যে অস্ত্রের প্রয়োগ বিস্মৃত হয়েছিলেন, তার কোন নিদর্শন কর্ণ-অর্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধের বিবরণে দেখা যায় না। সারথি শল্য যুদ্ধশেষে দুর্যোধনকে বলেন, দুই মহারথীই বহুক্ষণ ধরে অস্ত্রচাতুর্য দেখান, বরং কর্ণই যেন অর্জুনকে বিব্রত করে তুলেছিলেন, দৈবক্রমে অর্জুন জয়লাভ করেন।[1]

সেরূপ এক ব্রাহ্মণের শাপে যুদ্ধকালে কর্ণের রথচক্র প্রোথিত হয়ে যাওয়ার কথাও অগ্রাহ্য মনে হয়। কর্ণপর্বে এই শাপের কথা আছে ৪২.৩৯-৪৮ শ্লোকে, কর্ণ নিজমুখে শল্যকে তা বলেছেন। এবং শান্তিপর্বে নারদ মুখে এই শাপের কথা ২।৯ ২৮ শ্লোকে আছে। এই দুটি বিবরণে কিছু অসঙ্গতি। কর্ণের বিবৃতি মতে তিনি দৈবক্রমে বাণনিক্ষেপ অভ্যাস করা কালে একদ্বিজের হোমধেনুর বৎস বাণাঘাতে মেরে ফেলেছিলেন, দ্বিজকে অজ্ঞানকৃত গোবৎস বধের কথা জানিয়ে তাকে এক সহস্র গোদান করলেন, তবু সে প্রসন্ন না হয়ে শাপ দিল যে মৃত্যুপণ করে যুদ্ধকালে কর্ণের এক রথচক্র ভূপ্রোথিত হয়ে যাবে। নারদের বিবৃতি মতে হোমধেনুর বৎস নয়, একটি হোমধেনু দৈবক্রমে বাণাঘাতে হত হয়েছিল, ব্রাহ্মণ বহু গোদান উপেক্ষা করে চক্র ভূমিগ্রস্ত হবে মৃত্যুপণ যুদ্ধকালে সেই অভিশাপ দিল। নারদ উপাখ্যান মতে সে ঘটনা ঘটে যখন কর্ণ পরশুরামের আশ্রমে মহেন্দ্রপর্বতে (মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যে পূর্বঘাট পর্বতমালার একটিতে) বাস করছিলেন, সে কথা

১ কর্ণ পর্ব, ৯২।১০-১২

কর্ণের নিজ বিবৃতিতে নাই। এই অসঙ্গতি হেতু ঘটনাটি সত্য নয় সাব্যস্ত করা যায়। এইভাবে অনিচ্ছাকৃত গো বা গোবৎস বধের জন্য শাপ বা শাস্তি প্রাপ্য নয়, বিশেষতঃ যখন কর্ণ ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটি নয়, বহু গোধন দিলেন। অতএব ব্রাহ্মণের অভিশাপ ফলবান হবার কথা নয়। কর্ণার্জুন যুদ্ধকালের শেষভাগে কর্ণের রথ ভূপ্রোথিত হবার কথা যুদ্ধবর্ণনার মধ্যে আছে, এবং কর্ণ রথচক্র উঠিয়ে নেবার সময় প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ তাকে বিদ্রূপ করলেন ও অর্জুনকে প্রহার করতে উৎসাহিত করলেন তাও আছে। কিন্তু তখন কর্ণসারথি শল্য কোথায় তার উল্লেখ নাই। রথ চালনাকালে বাধা উপস্থিত হলে তা দূর করা সারথির কার্য, এবং শল্য দক্ষ সারথি ছিলেন বলেই তাকে কর্ণ সেদিন নিজের সারথি করেছিলেন, শল্য সুষ্ঠুভাবে সারথ্য করেছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধশেষে দুর্যোধনের কাছে কর্ণের রথ নিয়ে গিয়ে শল্য যখন যুদ্ধ বিবরণ দেন, তখন রথচক্র প্রোথিত হবার কোন কথা বলেন নাই।

অতএব রথচক্র প্রোথিত হয়ে যাবার কথা পরে কল্পিত তাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধ বিবরণ, বিশেষত কর্ণের যুদ্ধ বিবরণ, বহু পরিবর্তিত হয়েছে। সে পরিবর্তন শুধু ব্রাহ্মণদের মহিমা ও মন্ত্রশক্তি দেখাতে নয়, কিন্তু কর্ণ যে অর্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন, দৈবগতিকে এবং ব্রাহ্মণের অভিশাপে তাঁর মৃত্যু হল এই কথা প্রতিপন্ন করতে কোন কবি বা পুঁথিলেখক আগ্রহী ছিলেন। কর্ণ কুন্তীর পুত্র এবং এক শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের বীর হয়েও তার উপযুক্ত মর্যাদা পান নাই, তা কোন কোন কবিকে ব্যথিত করেছে সন্দেহ নাই। তাই এত যোজনা পরিবর্তন।

এই পরিবর্তন ও যোজনা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর বর্ণনাতেও আছে। লক্ষ্যবেধ করতে প্রয়াস করে যারা নিষ্ফল হলেন, তাদের মধ্যে কর্ণের নাম আছে, আবার আছে যে কর্ণ উঠে ধনুকে সহজেই জ্যা পরিয়ে দিলেন, লক্ষ্যবেধের জন্য উদ্যত বলে কৃষ্ণা বলে উঠলেন, আমি সূতকে বরণ করব না, শুনে কর্ণ নিবৃত্ত হলেন। অর্থাৎ কর্ণ ইচ্ছা করলেই লক্ষ্যবেধ করতে পারতেন, তিনি অর্জুনের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নন, তাই দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। ভাণ্ডারকার গবেষণা কেন্দ্রের মহাভারত সংশোধক মণ্ডলী আদি পর্বের ১৮৭ / ২১ ২৩ শ্লোক বাদ দিয়েছেন। বলেছেন যে এই শ্লোকগুলি অধিকাংশ প্রদেশের পুঁথিতে নাই, এবং দ্রৌপদী বীর্যশুল্কারূপে সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন, যিনি লক্ষ্যবেধ করতে পারেন তাকেই তাঁর বরণ করতে হবে, তাঁর পক্ষে আমি সূতকে বরণ করবো না বলে কর্ণকে নিবৃত্ত করা সম্ভব নয়।

১৮৭ / ১৫ ও ১৮৮ / ১৯ শ্লোকও তাঁরা বাদ দিয়েছেন, তবে ১৮৮ / ৪ শ্লোক দেখেছেন অর্থাৎ কর্ণ লক্ষ্য বেধ করতে পারেন নাই, তাই মূল বিবরণ বলে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। বনপর্বে ঘোষযাত্রা কালে দেখি যে কর্ণ গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন ও তাঁর সেনানীদের হাত থেকে দুর্যোধন ও কুরুস্ত্রীদের রক্ষা করতে পারেন নাই, যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন গিয়ে চিত্রসেনকে পরাজিত করে তাদের উদ্ধার করলেন। উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধ বিবরণে দেখা যায় যে কর্ণ অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন। বন পর্বে ঘোষযাত্রার পরে কর্ণের দিগ্বিজয় কাহিনী আছে, দুর্যোধন রাজসূয় যজ্ঞের পরিবর্তে বৈষ্ণব যজ্ঞ করবার পূর্বে কর্ণ চতুর্দিকের রাজাদের পরাজিত করে যজ্ঞের জন্য কর আদায় করেন তাই বলা হয়েছে। কিন্তু সংশোধকমণ্ডলী কর্ণের দিগ্বিজয় কাহিনী পরে যোজিত সাব্যস্ত করে তা বাদ দিয়েছেন, পর্বসংগ্রহেও তার উল্লেখ নাই। সব কথা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত করা যায় যে কর্ণ প্রায় অর্জুনের সমকক্ষ রথী ও যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু অর্জুনের কিছু শ্রেষ্ঠতা ছিল। কর্ণের কানীন জন্ম হেতু যে স্বীয় যোগ্য অধিকার ও মর্যাদা জীবনে পান নাই, তার জন্য সহানুভূতি হেতু কোন কোন কবি কর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছেন এবং রূপকথা কল্পনা করেছেন।

৬. অর্জুন বনবাস কাহিনী

অর্জুনের বনবাস কাহিনী সম্বন্ধে ভারত সূত্রে ও বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে অসঙ্গতি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মূল কাহিনীর পরিবর্তন হয়েছে। ভারত সূত্রের বিবরণ হ'ল যে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে বাসকালে কোন কারণে তাঁর প্রিয় ভ্রাতা অর্জুনকে এক বৎসর এক মাসের জন্য নির্বাসিত করেছিলেন, অর্জুন বনে ভ্রমণ করতে করতে দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণের অনুজা সুভদ্রাকে লাভ করে ফিরে আসেন।[১]

---

১ প্রমাণ মহাভারতের আদি ৬১।৪০-৪৪ শোধিত সংস্করণে ৫৫।৩১-৩৩, প্রায় সমার্থক, শোধিত পাঠে—

তত্যো নিমিত্তে কস্মিংশ্চিদ্ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
বনং প্রস্থাপয়ামাস ভ্রাতরং বৈ ধনঞ্জয়ম্ ॥
সবৈ সম্বৎসরং পূর্ণং মাসং চৈকং বনে বসন্।
ততোঽগচ্ছদ্ হৃষীকেশং দ্বারকত্যাং কদাচন ॥
লব্ধবাংস্তত্র বীভৎসু র্ভার্যাং রাজীবলোচনাম্।
অনুজাং বাসুদেবস্য সুভদ্রাং ভদ্রভাষিণীম্ ॥"

এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আদিপর্বের ২১২-২২১ অধ্যায়ে আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে নারদের উপদেশে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী সহবাস সম্বন্ধে নিয়ম করেন যে ক্রমান্বয়ে দ্রৌপদী এক এক ভ্রাতার সঙ্গে থাকবেন; এক ভ্রাতার সঙ্গে বাসকালে অন্য কোন ভ্রাতা দ্রৌপদীর কাছে গেলে তাকে দ্বাদশ বৎসর বনবাসে ব্রহ্মচর্য পালন রূপ শাস্তি ভোগ করতে হবে। একদিন দ্রৌপদী যখন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণ এসে জানায় যে তার গোধন হৃত হয়েছে, এবং রাজ্যে গোহরণ নিবারণ করতে না পারার জন্য অর্জুনকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করে এবং তার গোধন উদ্ধার করে দিতে বলে। অর্জুনের অস্ত্র শস্ত্র তখন যুধিষ্ঠিরের গৃহে ছিল; তা আনতে অর্জুনকে যে গৃহে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী একত্র বিশ্রাম করছিলেন, সেখানে যেতে হয়; অস্ত্র নিয়ে তিনি অভিযান করে ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধার করে দেন; ফিরে এসে তিনি নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন বলে যুধিষ্ঠিরের নিষেধ সত্ত্বেও দ্বাদশ বৎসর বনবাস বরণ করলেন। এই কাহিনী নানা কারণে অগ্রাহ্য মনে হয়। পাণ্ডবগণের কাল খৃঃ পূঃ একাদশ দশম শতাব্দী, তখন রাজন্য বা ক্ষত্রিয়গণই প্রধান ছিলেন; রাজ্যে সাধারণ একজন ব্রাহ্মণের গোধন অপহৃত হল, তার জন্য সেই ব্রাহ্মণ এসে রাজ্যে শান্তি রক্ষাকারী রাজভ্রাতাকে তীব্র তিরস্কার করবে, তা সম্ভব মনে হয় না। পরে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের যুগে তা কল্পিত হয়েছে। অর্জুনের উপরে রাজ্য রক্ষার ভার ছিল, তাঁর অস্ত্র-শস্ত্র কেন যুধিষ্ঠিরের বিশ্রাম গৃহে থাকবে? হস্তিনাপুরে দুর্যোধন দুঃশাসনাদি রাজভ্রাতা-গণের পৃথক পৃথক গৃহ ছিল। ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবগণেরও তা থাকা স্বাভাবিক। পৃথক পৃথক অস্ত্রাগার যদি নাও থাকে, অন্ততঃ প্রতি ভ্রাতার গৃহে পৃথক অস্ত্রকক্ষ থাকবে। অতএব অস্ত্র আনতে যুধিষ্ঠিরের বিশ্রামকক্ষে কেন যেতে হবে? তা ছাড়া অস্ত্র শস্ত্র নেবার উদ্দেশ্যে উপস্থিতি জানিয়ে বিশ্রাম গৃহে গেলে নিয়ম ভঙ্গ হয় না, দ্রৌপদীর সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে গেলে নিয়মভঙ্গ হয়। যুধিষ্ঠিরের নিষেধ সত্ত্বেও অর্জুন বনবাস বরণ করলে একথা বলা যায় না, যে যুধিষ্ঠির কোন কারণে তাঁর প্রিয় ভ্রাতা অর্জুনকে নির্বাসিত করেছিলেন। নির্বাসনের কাল সম্বন্ধে অসঙ্গতি বড় বেশী। ভারত সূত্রে "সম্বৎসরং পূর্ণং মাসং চৈকম্" আছে, তাহার সহজ অর্থ পূর্ণ এক বর্ষ ও এক মাস। কালী প্রসন্ন সিংহ সেই অর্থই নিয়েছেন। টিকাকার নীল-কণ্ঠ কষ্টকল্পিত অর্থ করে সামঞ্জস্য করতে চেষ্টা করেছেন, বলেছেন যে "পূর্ণ" শব্দের অর্থ দশ হয়; শ্লোকার্ধের অন্বয় করেছেন "সম্বৎসরং পূর্ণং চৈকং মাসং পূর্ণম্",

অর্থাৎ দশ ও এক বৎসর ও দশ মাস=একাদশ বৎসর দশ মাস। তার পরে সুভদ্রাকে বিবাহ করে সেখানে আরো দুমাস কাটিয়ে দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হ'ল। কিন্তু এই ভাবে অন্বয় করা, পূর্ণং শব্দ বৎসর ও মাস উভয় শব্দের বিশেষণ রূপে গ্রহণ করা, সদর্থ বলে গ্রহণ করা যায় না। সংশোধক মণ্ডলী ভিন্ন ভিন্ন কিংবদন্তিতে অসঙ্গতি আছে, এই কথা বলে দুটি বিবরণই রেখেছেন। কিন্তু ভারতসূত্রের স্বাভাবিক অনৈসর্গিকতা বর্জিত বিবরণই গ্রাহ্য, অর্থাৎ অর্জুন বনবাস কাল ত্রয়োদশ মাস মাত্র ছিল, তাই মানতে হবে।

মহাভারতের দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণে পাণ্ডবগণের জীবনের একটি বর্ষপঞ্জী আছে, সে মতে হস্তিনাপুরে প্রথম আগমন কালে যুধিষ্ঠিরের বয়স ছিল ষোল, ভীমের পনের, অর্জুনের চৌদ্দ, নকুল-সহদেবের তের বৎসর, হস্তিনাপুরে শিক্ষা ও স্থিতিকাল তের বৎসর; বারণাবতে, বনে, একচক্রায় ও দ্রুপদ রাজগৃহে মোট স্থিতিকাল সাত বৎসর; ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যভোগ তেইশ বৎসর, বারো বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস, যুদ্ধের পরে ছত্রিশ বৎসর হস্তিনাপুরে রাজত্বকাল, মহাপ্রস্থানকালে যুধিষ্ঠিরের বয়স ১০৮ বৎসর। এই বর্ষপঞ্জী উত্তর ভারতের বা কাশ্মীরের পুঁথিতে নাই, সংশোধক মণ্ডলী তা গ্রহণ করেন নাই। ভীষ্মপর্বে আছে যে অর্জুন বলছেন, বাল্যকালে আমি ধূলি ধূসরিত দেহে ভীষ্মের কোলে উঠেছি, তাঁকে পিতা বলে ডেকেছি, এখন তাকে কেমন করে বধ করব?[১] অতএব হস্তিনাপুরে যখন প্রথম আসেন, তখন অর্জুন চতুর্দশ বৎসরের তরুণ নন চার বৎসরের শিশু হতে পারেন। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে পাণ্ডুপুত্রগণ যখন হস্তিনাপুরে ঋষিদের সঙ্গে এল, ঋষিরা "এরা পাণ্ডুর পুত্র" এই বলে চলে গেলেন, তখন কেউ কেউ বলেছিল যে পাণ্ডু তো বহুপূর্বে মৃত হয়েছিল, ওরা তার পুত্র কেমন করে হবে? পাণ্ডুপুত্রগণ তখন ১৬-১৩ বৎসর বয়স্ক হলে সে কথা উঠত না, তাদের বয়স ৬-৩ বৎসর ছিল বলেই সে কথা উঠেছিল। হস্তিনাপুরে লালন-পালন, শিক্ষা ও স্থিতিকাল ত্রয়োদশ বর্ষ না বলে একাদশ বর্ষ, এবং ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যকাল ত্রয়োবিংশ বৎসর না বলে পঞ্চবিংশ বর্ষ ধরলে হিসাব মেলে। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যকাল পঞ্চবিংশ বর্ষ ধরতে কোন বাধা নাই, বন জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে

১ ভীষ্মপর্ব ১০৭।৯২।৯৪: "ক্রীড়তা হি ময়া বাল্যে বাসুদেব মহামনাঃ। পাংশুরুষিত গাত্রেণ মহাত্মা পরুষীকৃতঃ। যস্যাহমাতরুহ্যাঙ্কং বাল : কিল গদাগ্রজ। তাতেত্যবোচং পিতরং পিতুঃ পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ॥...স বধ্যং কথং ময়া॥"

রাজধানী স্থাপন করে, নূতন নূতন জনপদ স্থাপনের ভূমি নির্দিষ্ট করে দিয়ে জনপদ গড়ে ওঠার সময় ধরে, শেষে রাজসূয়কালে রাজ্যের সমৃদ্ধি বিবেচনা করে সে পর্যায়ে পৌঁছতে পঁচিশ বৎসর লেগেছিল ধরে নেওয়া অসঙ্গত নয়। ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যকালেই অভিমন্যু ও দ্রৌপদীপুত্রগণের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। তাদের শিক্ষার উন্নতি দেখে অর্জুন সন্তোষ প্রকাশ করেন (আদি ২২১ অ.)। রাজসূয় যজ্ঞের পরে বিদায়ী রাজাদের সম্মানার্থ কিছুদূর পর্যন্ত অনুগমন করা হয়, কে কার অনুগমন করেছিলেন বলতে বলা হয়েছে যে অভিমন্যু ও দ্রৌপদী পুত্রগণ পার্বতীয় মহারথ-দের অনুগমন করেন (সভা. ৪৪ খ)। তখন তারা নিতান্ত শিশু হতে পারে না, অন্ততঃ ষোলসতের বৎসর বয়স্ক হবে।

উদ্যোগপর্বে ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণ-অর্জুনের বীরত্বের কথা বলতে বলেন "ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমাহূয় খাণ্ডবেঽগ্নিমতর্পয়ৎ" (৫২।১০)। অর্থাৎ তেত্রিশ বৎসর হ'ল অর্জুন অরণ্য জ্বালিয়ে খাণ্ডবে অগ্নিকে তৃপ্ত করেছিলেন। খাণ্ডব-দাহ হয় অর্জুন বনবাস শেষ হবার পরে, সুভদ্রাকে বিবাহ করে বনবাস কাল অন্তে অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন, তারপর বলরাম কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা উপহার নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন, কিছুদিন আনন্দ উৎসবের পরে যাদবগণ বলরামের নেতৃত্বে ফিরে গেলেন, কিন্তু কৃষ্ণ সখা অর্জুনের সঙ্গে আরো কিছুদিন রয়ে গেলেন। সেই সময় অর্জুন কৃষ্ণের সাহায্যে খাণ্ডব দাহ করেন। তা যদি পাণ্ডবগণের দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পরে যখন রাজ্যার্ধ প্রত্যর্পণের আলোচনা চলছে তার তেত্রিশ বৎসর পূর্বে হয়ে থাকে, তাহলে অর্জুন বনবাস শেষ হয়েছিল দ্যূতক্রীড়ার বিশ বৎসর পূর্বে, ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য প্রতিষ্ঠার চার পাঁচ বৎসর পরে। অর্থাৎ অর্জুন বনবাস কাল দ্বাদশ বৎসর, তা অলীক কল্পনা, বনবাসকাল এক বৎসর এক মাস, তাই ঠিক কথা।

স্বয়ংবর সভায় অর্জুন যখন লক্ষ্যবেধ করেন, কৃষ্ণা স্মিতমুখে মাল্য হস্তে তাঁর দিকে এগিয়ে এসে তাঁকে মাল্যদান করেন, তাঁর সুন্দর কান্তি দেখে কৃষ্ণার মনে তখনই প্রেম সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। মনে হয় যে একমাত্র অর্জুনের স্ত্রী হতে পারলেই কৃষ্ণার জীবন সুখের হত। যখন ঠিক হল যে তাকে পঞ্চপাণ্ডব ভ্রাতার স্ত্রী হতে হবে, তখন তার মনে কি হল তার কোন উল্লেখ নাই, তিনি নীরবে সে বিধান মেনে নিলেন। নারদের পরামর্শমত পাণ্ডবগণ কৃষ্ণাসহ সহবাসের একটা সময় বা নিয়ম করেছিলেন, তা বিশ্বাস্য নয়; নারদ বদি কেউ থাকেন, তিনি লোকে লোকে হরিনাম করে বেড়ান, পৃথিবীতে যখন তখন মানুষের ব্যাপারে

হস্তক্ষেপ করেন না। তবু এক স্ত্রী বিবাহ করে পঞ্চ ভ্রাতা সহবাসের একটা নিয়ম করে নেবেন, তা স্বাভাবিক, তা লঙ্ঘন করলে এক বৎসর একমাস নির্বাসনরূপ শাস্তি বিহিত ছিল। বিবাহের অল্পকাল পরে ইন্দ্রপ্রস্থে বাসের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে অর্জুন ও কৃষ্ণা সম্ভবতঃ নিয়মভঙ্গ করেছিলেন, তাই অর্জুনকে এক বৎসর একমাস বনে যাবার শাস্তি নিতে হয়। অর্জুন যখন সুভদ্রাকে বিবাহ করে ফিরে এলেন, কৃষ্ণা অভিমানভরে প্রথমে বলেন, তুমি সাত্বতী কন্যার কাছে যাও, নূতন বন্ধন করলে পুরাতন বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। তারপরে আবার সুভদ্রাকে অভ্যর্থনা করে আলিঙ্গন করলেন। তবু দ্রষ্টব্য যে সুভদ্রার গর্ভে পুত্র অভিমন্যুর জন্মের পরে ক্রমে ক্রমে দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসে জ্যেষ্ঠানুক্রমে পুত্র জন্মে।[১] অভিমন্যু ছয় পাণ্ডব পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন ; বনপর্বে কৃষ্ণ বলেছেন যে দ্রৌপদী পুত্রগণ পাঞ্চাল প্রাসাদ থেকে দ্বারকায় সুভদ্রার কাছে চলে গেছেন, সেখানে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে অভিমন্যুও তাদের অস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন।[২] উদ্যোগপর্বে কৃষ্ণা বলেছেন, আমার বীর পুত্রগণ অভিমন্যুকে নেতা করে যুদ্ধ করবে।[৩] তার থেকে অনুমান করা যায় যে অর্জুন যখন নিয়মভঙ্গ অপরাধে নির্বাসিত হলেন, কৃষ্ণাও সেকালে ব্রহ্মচারিণী ভাবে থাকেন, অন্য কোন পাণ্ডব ভ্রাতার সঙ্গে সহবাস করেন নাই। অর্জুনের ঔরসে সুভদ্রার গর্ভে সন্তান জন্মালে তারপরে কৃষ্ণা একে একে জ্যেষ্ঠানুক্রমে পতিদের ঔরসে গর্ভধারণ করেছেন। তাই মহাপ্রস্থানপর্বে দ্রৌপদীর পতন হলে ভীম তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে যুধিষ্ঠির বলেন "পক্ষপাতো মহানস্যাঃ বিশেষতঃ ধনঞ্জয়ে"—ধনঞ্জয়ের প্রতি এর বেশী পক্ষপাত, বেশী টান ছিল, সেই দোষে পড়ে গেল। এই অনুমান যথার্থ হোক বা না হোক, এটা ধ্রুব সত্য যে অর্জুনের বনবাস কাল একবৎসর একমাসই ছিল। দ্বাদশ বৎসর বনবাসের কথা চিত্রাঙ্গদা কাহিনী প্রভৃতি উপাখ্যানে যোজনা করার উদ্দেশ্যে পরে কল্পিত হয়েছে।

---

১ আদি, ২২১।৬৫, ৭৮-৮৬

২ বনপর্ব, ১৮৩।২৯

৩ উদ্যোগপর্ব, ৮২।৩৮

৭. চিত্রাঙ্গদা কাহিনী

মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার কথা মহাভারতে পরে যোজিত হয়েছে সন্দেহ নাই। আদি পর্বে পর্বসংগ্রহধ্যায়ে আছে যে অর্জুনের বনবাসকালে উলূপীর সঙ্গে পথে সঙ্গম, পুণ্যতীর্থভ্রমণ এবং বভ্রুবাহনের জন্ম হল।[১] পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রতি পর্বের বিষয় বর্ণনা আছে, তার মধ্যে পার্থের উলূপীসহ সঙ্গম ও বভ্রুবাহনের জন্মকথা আছে, চিত্রাঙ্গদার নাম নাই। মণিপুর রাজ্যে পার্থের গমনের কথাও নাই। অতএব মনে হয় যে বভ্রুবাহন উলূপীর পুত্র ছিল। আশ্বমেধিক পর্বের বিষয় বর্ণনার মধ্যে চিত্রাঙ্গদাব নাম আছে—এই পর্বে অন্যান্য কথার মধ্যে চিত্রাঙ্গদার পুত্রিকাপুত্র বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুনের প্রাণসংশয় হবার কথা আছে।[২] কিন্তু এই উপাখ্যান পরে যোজিত মনে হয়। অর্জুন বনবাসের বিস্তৃত বিবরণ আছে আদিপর্বে ২১৩-২১৮ অধ্যায়ে। সেখানে পাই যে উলূপীর সঙ্গে বিহারের পরে অর্জুন নানা তীর্থে ভ্রমণ করতে করতে মনিপুর রাজ্যে গেলেন ও মণিপুরের রাজকন্যাকে দেখে আকৃষ্ট হলেন; সেই কন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে জাত পুত্র মণিপুর রাজের পুত্রিকাপুত্র হবে, অর্থাৎঅর্জুনের পুত্রবৎ না হয়ে মণিপুর রাজের পুত্র স্থান নেবে, মনিপুর রাজের উত্তরাধিকারী হবে, সেই শর্ত মেনে নিয়ে অর্জুন চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করলেন, এবং তিন বৎসর তার সঙ্গে মণিপুরে রইলেন; তারপরে তিনি আবার তীর্থভ্রমণে গেলেন; দক্ষিণ সমুদ্র-উপকূলে পাঁচটি তীর্থস্থানে হ্রদ হতে পাঁচটি হাঙ্গররূপী শাপাগ্রস্ত অপ্সরাকে উদ্ধার করলেন, মণিপুরে ফিরে এসে চিত্রাঙ্গদা সহ বিহার করে পুত্র জন্ম দিলেন; পুত্রের জন্ম হলে চিত্রাঙ্গদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নানা তীর্থ হয়ে দ্বারকায় গেলেন, সেখানে তাঁর কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল; কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে কৃষ্ণের বৈমাত্রের ভগ্নী সুভদ্রাকে হরণ করে বিবাহ করলেন। এইভাবে নানা বৃত্তান্ত নিয়ে বারো বৎসর বনবাসের কথা কথিত হয়েছে। কিন্তু বনবাস কাল যদি একবৎসর একমাস মাত্র হয়, তাহলে এত ব্যাপার সম্ভব হয় না; উলূপীর সঙ্গে পথে বিহার করে নানা তীর্থে ঘুরতে ঘুরতে দ্বারকায় উপস্থিত হলেন, সেখানে কৃষ্ণ এসে অর্জুনকে

১। আদি ২।১২২ "পার্থস্য বনবাসেতু উলূপ্যা পথি সঙ্গমঃ।
পুণ্যতীর্থানুযংযানং বভ্রুবাহনজন্ম চ।।"

২। আদি ২।৩৪১-২: "চিত্রাঙ্গদায়াঃ পুত্রেন পুত্রিকায়া ধনঞ্জয়ঃ।
সংগ্রামে বভ্রুবাহেন সংশয়ং চাত্র দর্শিতঃ ॥"

অভ্যর্থনা করলেন, রৈবতকে গিরি প্রদক্ষিণকারিণী কন্যাদের মধ্যে সুভদ্রাকে দেখে অর্জুন মুগ্ধ হলেন, এবং কৃষ্ণের কাছে তার পরিচয় জেনে কৃষ্ণের সম্মতিতে তাকে হরণ করে বিবাহ করলেন, এইমাত্র ত্রয়োদশ মাসের মধ্যে ঘটেছিল অনুমান করতে হবে।

সুবোধ কুমার চক্রবর্তীর "রম্যাণি বীক্ষ্য" শীর্ষক ভ্রমণ কাহিনী স্তবকের মধ্যে কাশ্মীর পর্বের দশম অনুচ্ছেদে আছে যে কাশ্মীরে প্রচলিত এক কাহিনীতে বভ্রুবাহন উলুপীর পুত্র বলে বর্ণিত। ক্ষেমেন্দ্রের "ভারত মঞ্জরী"তে চিত্রাঙ্গদা কাহিনী আছে। অর্থাৎ কাশ্মীরের মহাভারত পুঁথিতে চিত্রাঙ্গদা কাহিনী আছে। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্রের "ভারত মঞ্জরী" রচিত হয়েছে অনুমান ১০৫০ খৃষ্টাব্দে, একাদশ শতাব্দীর কোন পুঁথিই এখন পাওযা যায় না, তার চেয়ে পুরাতন মহাভারত পুঁথি তো অপ্রাপ্য বটেই। একাদশ শতাব্দীর মধ্যে, বোধ হয় তার অনেক পূর্বেই, চিত্রাঙ্গদা কাহিনী মহাভারতে যোজিত হযেছিল, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই মহাভারত মোটামুটি বর্তমানে রূপ পেযেছে, যদিও তার পরেও কিছু কিছু যোজনা হযেছে। অর্জুন বনবাসকাল এক বৎসর একমাস ধরে নিলে এবং পর্বসংগ্রহে আদি পর্বের বিষয় বিবৃতি পড়লে, সন্দেহ থাকে না যে বভ্রুবাহন উলুপীর পুত্র এবং চিত্রাঙ্গদা কাহিনী মহাভারতে পরে যোজিত হযেছে।

৮ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে অভিমন্যুর বযস

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে অভিমন্যু ষোড়শ বর্ষীয় বালক ছিল, এই কথা বহু প্রচলিত হলেও সত্য নয়। অংশাবতরণ অনুপর্বে আছে বটে যে চন্দ্রপুত্র বর্চা অভিমন্যুরূপে জন্মগ্রহণ করে, সে ষোড়শ বর্ষ মাত্র দেবলোক থেকে ভ্রষ্ট থাকবে, এই স্থির হয়।[১] কিন্তু অংশাবতরণের কথা অনৈসর্গিক, তা গ্রাহ্য নয়। অভিমন্যুর জন্ম যে রাজসূয় যজ্ঞকালের অন্ততঃ ১৬।১৭ বৎসর পূর্বে হয়েছিল, সে কথা অর্জুন বনবাস কাল বিচার করতে বলা হয়েছে। অভিমন্যু দ্রৌপদী পুত্রগণ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ছিলেন। সে কথাও প্রমাণসহ বলা হয়েছে। বিরাট পর্বে উত্তরার বিবাহের কথা যখন উঠল, তার যোগ্য বর হিসাবে অর্জুন অভিমন্যুকেই বেছে নিলেন, এবং যুধিষ্ঠির তা সমর্থন করলেন। বনপর্বে আছে যে অর্জুন অস্ত্রশিক্ষালাভ করতে ইন্দ্রলোকে অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার আর্যরাষ্ট্রে গেলে পাণ্ডবগণ তীর্থভ্রমণ করতে

১। আদিঃ ৬৭।১৭-১৮

আরম্ভ করলেন। যখন প্রভাসে গেলেন, তাঁদের সঙ্গে বলরাম, কৃষ্ণ, সাত্যকি প্রভৃতি বৃষ্ণি নেতাগণ সাক্ষাৎ করেন। বলরাম বলেন, ধর্মাচরণ করলেই পার্থিব সমৃদ্ধি লাভ হয়, অধর্মাচরণ করলে অসমৃদ্ধি হয়, সে কথা যে ঠিক নয় তা যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের অবস্থা তুলনা করলেই দেখা যায়; কিন্তু এভাবে ধর্মের পরাজয় হলে পৃথিবীর অকল্যাণ হবে। তা শুনে সাত্যকি বললেন যে যুধিষ্ঠিরের অবস্থা দেখে মুখে দুঃখ প্রকাশ না করে আমাদের কর্তব্য অন্যায়কারী দুর্যোধনাদিকে বধ করা; যুধিষ্ঠির যদি তাঁর প্রতিশ্রুতিমতে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসরকাল অজ্ঞাতবাস পূর্ণ না করে রাজ্য নিয়ে না নেন, তবে আমরা অভিমন্যুকে রাজপদে বসাতে পারি, সে তার উপযুক্ত হয়েছে; তারপর যুধিষ্ঠির তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে ফিরে আসলে অভিমন্যু তাঁকে রাজ্য ছেড়ে দেবে।[১] সে সংকল্প থেকে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ সাত্যকিকে নিবৃত্ত করলেন; কিন্তু এই প্রস্তাব থেকে দেখা যায় যে তখন অভিমন্যু সাবালক ও রাজপদের উপযুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ তার অন্ততঃ ২১ বৎসর বয়স হয়েছে। অর্জুন অস্ত্রশিক্ষায় উৎকর্ষ লাভ করতে যান বনবাসের ত্রয়োদশ মাস পূর্ণ হলে[২] তারপরে যুধিষ্ঠিরাদি প্রায় চার বৎসর তীর্থভ্রমণ করেন।[৩] তীর্থ ভ্রমনের প্রথম দিকেই তাঁরা প্রভাসে গিয়েছিলেন। অনুমান করা যায় যে তখন বনাসের তিন বৎসর কেটেছে। তাহলে বনবাস ও অজ্ঞাতবাসকাল শেষ হলে অভিমন্যুর বয়স ৩১ বৎসর হয়।

দ্রৌপদীর পুত্রগণ অভিমন্যুর কনিষ্ঠ সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের আরম্ভে চতুঃপ্রশ্নের একটি হল যে দ্রৌপদী পুত্রগণের পিতৃগণ জীবিত থাকতেও কেন তারা অবিবাহিত থাকতেই যুদ্ধে মারা গেল। তার উত্তর হল যে রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রাণী শৈব্যার উপর বিশ্বামিত্রের কঠোর আচরণে ব্যথিত হয়ে বিশ্বদেবগণের মধ্যে পাঁচজন বলেছিল যে বক্ষহীন ধার্মিক প্রজাবৎসল রাজার উপর এমন অত্যাচার করে বিশ্বামিত্র অধর্মভাগী হচ্ছেন; তা শুনে বিশ্বামিত্র অভিশাপ দিলেন যে সেই পাঁচজন বিশ্বদেব দেবযোনি থেকে চ্যুত হয়ে মানুষ হয়ে জন্মাবে, বিশ্বদেবগণ ক্ষমাপ্রার্থনা করলে বিশ্বামিত্র বললেন যে বিবাহবন্ধন বদ্ধ হবার পূর্বেই তাদের মৃত্যু হবে ও শাপ মুক্তি হবে, তাদের সংসার চক্রে ভ্রমণ

১। বন ১১৮-১২০ অ.

২। বন' ৩৫ ৩২

৩। বন ১৫৮।৩

করতে হবে না, সেই পঞ্চ বিশ্বদেব দ্রৌপদীর পুত্ররূপে জন্ম নিয়েছিল, তাই তারা বিবাহ না করে যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করে মুক্ত হয়ে গেল। কাহিনীটি শ্রদ্ধেয় নয়, তার মধ্যে ঋষিদের অসীম শক্তি ও দেবলোক মানবলোকের কথার মিশ্রণ আছে, যা মহাভারতের যোজনার মধ্যে ও পুরাণে প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু এই কাহিনী থেকে প্রমাণ হয় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে দ্রৌপদী পুত্রগণের বিবাহের বয়স হয়েছিল, ২৪।২৫ বৎসরের বেশীই হয়েছিল। তাদের জ্যেষ্ঠের বয়স ৩০।৩১ বৎসর হয়েছিল, সেই অনুমান তাতে সমর্থিত হয়।

যুদ্ধপর্বগুলিতে অভিমন্যুকে 'বাল' এবং "অপ্রাপ্ত যৌবন" মধ্যে মধ্যে বলা হয়েছে। কুরুক্ষেত্রে যোদ্ধাদের মধ্যে ভীষ্মের বয়স হয়েছিল ১৫০ বৎসরের কম নয়, দ্রোণ কৃপের ৮৫ বৎসর, অর্জুনের ৬৪ বৎসর, তাদের তুলনায় অভিমন্যুকে "বলে" বলা কিছু অন্যায় নয়। পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের সময় পরিক্ষিতের বয়স ছিল ৩৫ বৎসর; যুধিষ্ঠির সুভদ্রাকে বলে গেলেন, যে তোমার উপর ভার থাকল পরিক্ষিৎ ও বজ্রকে সুপথে চালিত করা, সে দায়িত্ব ছেড়ে তুমি যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর, তাতে তোমার অধর্ম হবে। টিকাকার নীলকণ্ঠ বলেছেন, তখন পরিক্ষিৎ ও বজ্র 'বাল', তাদের সৎপথে চালনা করতে দায়িত্বপূর্ণ নব বা নারীর প্রয়োজন। ৩৫ বৎসর বয়স্ক পরিক্ষিৎকে যদি বাল বলা হয়, তবে ৩০।৩১ বৎসর বয়স্ক অভিমন্যুকে বাল বলা চলে। তবে অপ্রাপ্তযৌবন তিনি তখন ছিলেন না। যুদ্ধ কাহিনীগুলির মধ্যে বহু পরিবর্তন হয়েছে সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

৯. দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ

কৌরবসভায় দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করতে চেষ্টা করে, তখন দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতভাবে উপস্থিত হয়ে দ্রৌপদীর বস্ত্র অন্তহীন করে দিলেন, দুঃশাসন বস্ত্র টেনে স্তূপীকৃত করে শেষ করতে না পেরে ক্লান্ত হযে বসে পড়লো, এই কাহিনী বহু প্রচলিত হলেও তা পরের যোজনা, এবং সংশোধক মণ্ডলী তা বাদ দিয়েছেন, কারণ সে কথা ভারতের অনেক প্রদেশের মহাভারতের পুঁথিতে নাই। কিন্তু ধর্ম বস্ত্র অন্তহীন করে দিয়ে সতীর মান রক্ষা করলেন, সে কথা বাদ দেন নাই; সভা পর্বের ৬৮।৪১-৪৬ শ্লোক বাদ দিযে বাকী অধিকাংশ শ্লোক রেখেছেন। ক্ষেমেন্দ্রের ভারত মঞ্জরীতে কাহিনী সেইভাবে

আছে, এবং সংশোধকগণ কাশ্মীরের মহাভারত পুঁথি সব চেয়ে শুদ্ধ, অর্থাৎ যোজনা তাতে সবচেয়ে কম, তাই ধরে নিয়েছেন।

কিন্তু ধর্ম দ্রৌপদীর পরিধেয় বস্ত্র অন্তহীন করে দিয়ে সতীর মানরক্ষা করলেন, সে কাহিনীও অনৈসর্গিক, অতএব অগ্রাহ্য মনে হয়। এই কাহিনী সত্য হলে মহাভারতের অন্য অনেক অধ্যায়ে তার উল্লেখ পাওয়া যেত। বনপর্বে ১২।৬১-৬৫ শ্লোকে দ্রৌপদী কৃষ্ণের নিকট কুরু সভায় তাঁর অপমানের কথা বলেছেন, সেখানে একথা বলেন নাই যে দুঃশাসন তাঁর বস্ত্র আকর্ষণ করা কালে ক্রমাগত বস্ত্রের আবির্ভাব হতে থাকলো। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ১৫৮ শ্লোকে শেষহীন বস্ত্ররাশির আবির্ভাবের কথা আছে, কিন্তু সেই শ্লোকটি সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন, কারণ সেটি নানা দেশের পুঁথিতে নাই। আদি পর্ব সংশোধন করেছেন সংশোধক মণ্ডলীর প্রথম অধ্যক্ষ ডঃ সুকৃথংকর, তিনি বোধ হয় শেষহীন বস্ত্ররাশির আবির্ভাবের কথা অধিকাংশ প্রামাণ্য পুঁথিতে, অন্ততঃ আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়ে পান নাই।

সভাপর্বের ৬৭ ৭২ অধ্যায় বিচার বুদ্ধি জাগ্রত রেখে পাঠ করলে মনে হয় যে বস্ত্ররাশির আবির্ভাবের কথা মূল কাহিনীর অংশ নয়, পরে যোজিত। প্রতিকামী যখন দুর্যোধনের আদেশে দ্রৌপদীকে সভায় আনতে গেল, তখন দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করে এসে জানাতে বললেন যে যুধিষ্ঠির প্রথমে নিজেকে পণ করেছিলেন না প্রথমে দ্রৌপদীকে পণ করেছিলেন। জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই যে যুধিষ্ঠির যদি প্রথমে নিজেকে পণ রেখে হেরে গিয়ে দাস হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর দ্রৌপদীকে পণ রাখবার অধিকার নাই। প্রতিকামী প্রশ্ন জানালে দুর্যোধন বললেন, দ্রৌপদী সভায় এসে নিজেই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করুন। প্রতিকামী ফিরে গিয়ে দ্রৌপদীকে সে কথা জানালে দ্রৌপদী বললেন, পৃথিবীতে ধর্মপালন সর্বদা শ্রেষ্ঠ, কৌরবগণ যেন অধর্মাচরণ না করেন, তুমি গিয়ে সভাসদগণকে জিজ্ঞাসা কর, ধর্মতঃ আমার কি করা উচিত। প্রতিকামী সভায় এসে সেই প্রশ্ন জানালে সভাসদগণ কোন উত্তর দিতে সাহস করল না। দুর্যোধন পুনরায় প্রতিকামীকে বললেন, দ্রৌপদী সভায় এসে নিজে প্রশ্ন করুন। প্রতিকামী ইতস্ততঃ করলে দুর্যোধন দুঃশাসনকে বললেন, তুমি গিয়ে দ্রৌপদীকে সভায় আন। দুঃশাসনকে দেখে দ্রৌপদী কুরুবৃদ্ধাদের কাছে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করলেন, ইতিমধ্যে দুঃশাসন তাঁকে কেশে ধরে সভায় টেনে নিয়ে গেল। দ্রৌপদী দুঃশাসনকে তিরস্কার করলেন, ভীষ্মাদি কুরুবৃদ্ধদিগকে কুলবধূর অপমান উপেক্ষা করা হেতু গঞ্জনা দিলেন, এবং

যুধিষ্ঠিরাদির প্রতি রোষকষায়িত নেত্রে তাকালেন। ইতিমধ্যে দুঃশাসন তাকে দাসী বলে উপহাস করল, কর্ণ ও শকুনি দুঃশাসনের উক্তি সমর্থন করলো। ভীষ্ম বললেন, দ্রৌপদী ধর্মতঃ জিতা কি অজিতা সেটি অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন, উত্তর দেওয়া কঠিন। টানাটানিতে দ্রৌপদীর উত্তরাঙ্গ হতে বস্ত্র খসে পড়েছিল। তাকে সেই অবস্থায় দেখে ভীম বলে উঠলেন, আমি মনে করি যে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রেখে অধর্ম করেছেন, যে হাত দিয়ে তিনি দ্রৌপদীকে পণ করেছেন. সেই হাত আমি জ্বালিয়ে দেব, সহদেব, আগুন নিয়ে এস। অর্জুন ভীমকে শান্ত করলেন। বিকর্ণ বললেন, আমি মনে করি যে দ্রৌপদী ধর্মত জিতা হন নাই। কর্ণ তাকে তিরস্কার করে বললেন, দুঃশাসন, তুমি পাণ্ডবদের ও দ্রৌপদীর বস্ত্র কেড়ে নাও। পাণ্ডবগণ নিজেদের বস্ত্র ও উত্তরীয় ছেড়ে দিলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরে আকর্ষণ করতে আরম্ভ করলো। সেই সময় ধর্মের প্রভাবে যদি বস্ত্র অন্তহীন হয়ে দ্রৌপদীর মান রক্ষা করে থাকে ও দুঃশাসন বস্ত্র টান্‌তে টান্‌তে শেষ করতে না পেরে বসে পড়ে থাকে, তাহলে সভাসদগণ দ্রৌপদীর জয়ধ্বনি করবে, দুঃশাসনাদিকে নিন্দা করবে, নির্ভয়ে মতামত ব্যক্ত করবে এই আশা করা যায় এবং ব্যাপার জেনে ধৃতরাষ্ট্র তখনই দ্রৌপদীকে বরদান করে পাণ্ডবদের দাসত্ব মুক্ত করবেন তাই স্বাভাবিক হ'ত। কিন্তু যদিও ৬৮।৬৯ শ্লোকে আছে যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখে উপস্থিত রাজগণ দ্রৌপদীর প্রশংসা ও দুঃশাসনের নিন্দা করলেন, কিন্তু তা অত্যন্ত ক্ষীণভাবে বলা, তার স্বাভাবিক পরিণতির উল্লেখ নাই। আছে যে ভীম প্রতিজ্ঞা করলেন যে দুঃশাসনের বক্ষশোণিত পান করবে, এবং বিদুর বললেন যে দ্রৌপদী প্রশ্ন তুলে অনাথার মত ক্রন্দন করছে, তার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া কর্তব্য, সেই সঙ্গে সুধন্বা-বিরোচন উপাখ্যান শোনালেন, যার প্রতিপাদ্য নীতি হল যে নিজের বা পুত্রের জীবনসংশয় হলেও প্রশ্নের সত্য উত্তর দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু সভাসদ্‌গণ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না, কর্ণ দুঃশাসনকে বললেন, দাসী দ্রৌপদীকে সভা হতে নিয়ে যাও, দুঃশাসন আবার দ্রৌপদীকে টান দিল, দ্রৌপদী তা'কে থাম্‌'তে বলে মাটিতে পড়ে আবার প্রশ্ন করলেন, তিনি ধর্মতঃ জিতা কি অজিতা। ভীষ্ম আবার বললেন যে প্রশ্নটিতে ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব জড়িত, সহসা উত্তর দেওয়া যায় না। তারপর দুর্যোধন, ভীম, কর্ণ কিছু কিছু কথা বললেন, দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'ভীম অর্জুন নকুল সহদেব তোমার আদেশের প্রতীক্ষা করছে, তুমি বল দ্রৌপদী

ধর্মতঃ জিতা কি অজিতা। এই বলে তিনি নিজ উরু থেকে কাপড় সরিয়ে দ্রৌপদীর দিকে তাকিয়ে নিজের উরু দেখালেন। ভীম তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করলেন। বিদুর বললেন, এবার কুরুবংশের অমঙ্গলের সূচনা হল। দুর্যোধন আবার বললেন, ভীম অর্জুন নকুল সহদেব এরা বলুক যে যুধিষ্ঠির তাদের প্রভু নহেন, তাহলে দ্রৌপদী মুক্তি পাবে। অর্জুন বললেন, দ্যূতকালে প্রথমে যুধিষ্ঠির আমাদের প্রভু ছিলেন, কিন্তু নিজে জিত হয়ে ইনি আর কার প্রভু থাকতে পারেন। তখন নানা অমঙ্গল চিহ্ন প্রকাশ পেল, বিদুর ও যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে সে কথা জানালে ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বর দিয়ে পাণ্ডবদের দাসত্বমুক্ত করলেন ও রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন।

এই বিবরণের মধ্যে এই অসঙ্গতি আছে যে অলৌকিক ভাবে বস্ত্ররাশির আবির্ভাব হলে তখন সভাসদগণ মৃদুস্বরে দ্রৌপদীর প্রশংসা ও দুঃশাসনের নিন্দা করবেন না, অলৌকিক ব্যাপার দেখে সভা উত্তেজনায় ফেটে পড়বে, দ্রৌপদীর ও ধর্মের জয় এত উচ্চস্বরে ঘোষিত হবে যে তখন দ্রৌপদী জিতা বা অজিতা সে প্রশ্ন অবাস্তব হয়ে যাবে, বিদুর সভাসদ্‌দের নিকট একটি উপাখ্যান বলে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বলবেন না। এবং কর্ণও তখন বলবেন না যে দাসীকে অন্তত্র নিয়ে যাও। দ্রৌপদীও আবার মাটিতে পড়ে বলবেন না, কিনি ধর্মতঃ জিতা বা অজিতা তা সভাসদগণ বলুন। ভীমের দুঃশাসনের বক্ষের শোণিত পানের প্রতিজ্ঞা এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব নয়—অনুদ্যূত পর্বে আছে যে পাণ্ডবগণ শেষ পণে হেরে যখন বনবাসে চলেছেন, তখন দুঃশাসন পাণ্ডবদের গরু গরু বলে নেচে নেচে উপহাস করছিল, তখন ভীম দুঃশাসনের বক্ষশোণিত পানের প্রতিজ্ঞা করেন, সেখানেই সে প্রতিজ্ঞা সমীচীন, একটি প্রতিজ্ঞা দুবার করার কোন কারণ নাই। সুসঙ্গত আখ্যান পাওয়া যায় ৬৮ অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকের পরেই ৬৯ অধ্যায় পাঠ করলে দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র টানতে আরম্ভ করলে দ্রৌপদী বললেন, থাম্ দুর্বৃত্ত ; আমি আগে কুরুবৃদ্ধদের অভিবাদন করে আমার প্রশ্নের উত্তর জেনে নিই। অর্থাৎ ৬৮ / ৪০-৯০ শ্লোক সম্পূর্ণ বাদ হবে তাহলেই ৬৯-৭১ অধ্যায়ের বিবৃতি স্বাভাবিক হয়। দ্রৌপদী কৃষ্ণের কাছে সখিত্বের মর্যাদা পেয়েছিলেন, ধর্মের পথেও চিরকাল চলে ধর্মের প্রসাদ লাভ করেছেন, কিন্তু দ্যূতসভায় তিনি নিজের বুদ্ধিতে, নিজের স্থৈর্যপ্রভাবে—তিনি ধর্মতঃ জিতা কিনা সেই প্রশ্ন তুলে এবং বস্ত্রে টান পড়লে ভূমিশয্যা গ্রহণ করে—নিজেকে বস্ত্র

হরণের অসম্মান থেকে রক্ষা করেছিলেন। বস্ত্ররাশির আবির্ভাবের কথা ঘটনাটিকে লোক রঞ্জক কাহিনীতে পরিণত করতে পরে কল্পিত ও যোজিত হয়েছে।

১০. পাণ্ডবগণের বনবাসের আরম্ভ সম্বন্ধে অসঙ্গতি

অক্ষদ্যূতে যুধিষ্ঠিরের পরাজয়ের ফলে পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু কিভাবে কোন বনে বনবাসের আরম্ভ হ'ল সে বিষয়ে অসঙ্গতি আছে। ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির ২৪/২৫ বৎসর রাজ্যশাসন করেছেন, অক্ষদ্যূতের পণের ফলে ১৩ বৎসর ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যভার দুর্যোধনের হাতে থাকবে। দুর্যোধন দ্রোণকে ইন্দ্রপ্রস্থ শাসনের ভার দিলেন (সভা ৮০/৩৬) অর্থাৎ তাকে ইন্দ্রপ্রস্থের সামন্তরাজ করলেন। দ্বাদশ বৎসর বনবাস আরম্ভ করবার পূর্বে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহ ইন্দ্রপ্রস্থে আসবেন, দ্রোণ বা তাঁর প্রতিনিধিকে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যভার বুঝিয়ে দেবেন, সুভদ্রা, অন্ত রাজ-অন্তঃপুরের নারী, অভিমন্যু, দ্রৌপদীপুত্রগণ ইত্যাদির সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবেন, তার পরে বনবাস আরম্ভ করবেন, তাই মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁরা 'বনবাসায় দীক্ষিত' হয়ে হস্তিনাপুর থেকে বেরিয়েছেন, অতএব তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে নিজেদের প্রাসাদে না গিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ বনে সাময়িক ভাবে আশ্রয় নিয়ে সেখান থেকে প্রাসাদে সংবাদ পাঠাবেন ও বন্ধুরাজ্যে বার্তাবাহী প্রেরণ করে তাদের আসার অনুরোধ করবেন, অনুমান করা চলে। বনপর্বের প্রথম অনুপর্বে আছে যে পাণ্ডবগণ কৃষ্ণা সহ হস্তিনাপুরের প্রধান তোরণ দ্বার দিয়ে নির্গত হয়ে উত্তর দিকে গেলেন, রাত্রে গঙ্গাতীরে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষতলে আশ্রয় নিলেন, তার পর দিন সেখান থেকে কুরুক্ষেত্রে গেলেন, তারপর সরস্বতী, দৃষদ্বতী ও যমুনা নদী পার হয়ে বনের মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিকে বহুদূর গিয়ে সরস্বতী নদীর তীরে মরুপ্রদেশের নিকটস্থ কাম্যক বনে উপস্থিত হয়ে তাঁদের আবাস স্থাপন করলেন (বন ১, ৫ অধ্যায়); কাম্যক বনে বিদুর এসে পাণ্ডবগণ সহ দেখা করেন, আবার ধৃতরাষ্ট্রের আহবানে হস্তিনাপুরে ফিরে যান, তার পরে, কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিশুপাল পুত্র ধৃষ্টকেতু এবং কেকয় রাজ ভ্রাতাগণ সেখানে উপস্থিত হন, যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কথা বলে যুধিষ্ঠির অক্ষদ্যূতের সর্ত সম্যক ভাবে পালন করতে দৃঢ়সংকল্প মেনে কৃষ্ণ সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে যান, ধৃষ্টদ্যুম্ন পঞ্চ দ্রৌপদী পুত্রকে নিয়ে পাঞ্চাল রাজধানীতে ফিরলেন, ধৃষ্টকেতু তার ভগ্নী

নকুলের স্ত্রী করেণুমতীকে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরলেন, এবং কেকয় রাজভ্রাতাগণও অভিবাদন করে চলে গেলেন। সুভদ্রা, অভিমন্যু, দ্রৌপদী পুত্রগণ, করেণুমতী প্রভৃতি দ্যূতক্রীড়া উপলক্ষ্যে হস্তিনাপুরে গিয়েছিলেন তার কোন উল্লেখ নাই; তাদের না যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহলে ইন্দ্রপ্রস্থ হতে বহু দূরে কাম্যক বনে তারা কিভাবে উপস্থিত হলেন? অতএব স্বাব্যস্ত করতে হবে যে পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুর থেকে প্রথমেই কাম্যক বনে গিয়ে আবাস স্থাপন করেন নাই, তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থের কাছে এসে কোন বনে আশ্রয় নিয়ে প্রাসাদে কত্রা ও অন্য কর্মচারীদের সংবাদ দিয়ে আনান ও প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করেন। বনপর্বে ২৩ অধ্যায়ে পাই যে কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বিদায় গ্রহণ করে চলে গেলে পাণ্ডবগণ কৃষ্ণা সহ উত্তম অশ্ববাহিত রথে উঠে পুরোহিত ধৌম্যকে সঙ্গে করে বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন; ২৪ অধ্যায়ে আছে যে কোন্ বন দীর্ঘ বনবাসের উপযুক্ত হবে, অর্জুনকে প্রশ্ন করলে অর্জুন দ্বৈতবনের নাম করলেন, যুধিষ্ঠির অনুমোদন করলে সকলে দ্বৈতবনে গিয়ে সেখানে সুপেয় জলপূর্ণ একটি সরোবরের কূলে তাঁদের পটগৃহ, কুটীর, ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়ে সেখানে বাস আরম্ভ করলেন। সঙ্গে প্রাসাদ হতে বিশজন ভৃত্য ও অনুচর নিজেদের ধনুর্বান ও অন্য নানাবিধ অস্ত্র ও সরঞ্জাম, দ্রৌপদীর ধাত্রী ও দাসীগণ, বস্ত্র ও আভরণ, ও নিজেদের বস্ত্রাদি নিলেন। এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থের উপকণ্ঠ হতে দীর্ঘ বনবাসের জন্য যাত্রা করেন, কাম্যক বন থেকে নয়। উদ্যোগ পর্বে যানসন্ধি অনুপর্বে আছে যে সঞ্জয় উপপ্লব থেকে ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরের উত্তর জানায় যে পাণ্ডবগণের অর্ধরাজ্য দ্যূতের পণ অনুসারে ফিরিয়ে না দিলে পাণ্ডবগণ যুদ্ধ করবে, এবং তাদের পক্ষে পঞ্চাল ও বিরাট ছাড়া কৃষ্ণ, সাত্যকি ইত্যাদি আছে, তখন ধৃতরাষ্ট্র নানা কথা বলে অবশেষে বলেন যে সন্ধি করা কর্তব্য, না হলে কুরুকুল বিনষ্ট হবে; তখন দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন যে যুদ্ধে পরাজয়ের ভয় করবেন না কারণ বনবাসের আরম্ভ কালে কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয়গণ, ধৃষ্টকেতু ইত্যাদি যখন যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করেন, তখন কৃষ্ণ বলেছিলেন যে ধৃতরাষ্ট্রদের উচ্ছেদ করে সমগ্র হস্তিনাপুর রাজ্য যুধিষ্ঠিরের হস্তে তুলে দেবেন, তাদের কথাবার্তা দূতমুখে জেনে দুর্যোধন ভীষ্ম দ্রোণ, কৃপাদিকে বলেছিলেন যে যাদব-পাঞ্চাল ও আরো সব পাণ্ডবগণের মিত্র-রাজ্যের যুক্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে ধার্তরাষ্ট্রগণ ধ্বংস হতে পারে, তার থেকে সন্ধি করাই উচিত হবে কিনা; তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা দুর্যোধনকে আশ্বাস দেন

যে তারা থাকতে কোন ভয় নাই। যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে কৃষ্ণ প্রভৃতির সাক্ষাতের স্থান বলা হয়েছে ইন্দ্রপ্রস্থের অদূরে (উদ্যোগ ৫৫ / ৪), কাম্যক বনে নয়। বন পর্বে ২৩ অধ্যায়ে আরো আছে যে পাণ্ডবগণ যখন দূর বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন ব্রাহ্মণ ও অন্য পৌরগণ এসে বিলাপ করে বলেন, আপনাদের স্থাপিত এই সুন্দর নগর ও দেবসভাগৃহ সম সভাগৃহ ছেড়ে আপনারা কোথায় যান? অর্জুন সকলের হয়ে উত্তর দিলেন, যুধিষ্ঠির বনে বাস করে তপের প্রভাবে শত্রুদের যশ হরণ করবেন, আপনারা বাধা না দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রার্থনা করুন। তখন ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদ ও অন্য প্রজাগণ জয়ধ্বনি করে নিবৃত্ত হল। অর্থাৎ পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থের সন্নিকটে এসে ব্যবস্থা করে নিয়ে পরে দূর বনে বাস আরম্ভ করেন। এবং তাঁরা প্রথমে দ্বৈত বনে গিয়ে নিবাস আরম্ভ করেন, কাম্যক বনে নয়। বনপর্বের প্রথম কয়েকটি অধ্যায় কোন পরবর্তী কালের কবি পরিবর্তন করেছেন কিন্তু সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেন নাই।

১১. পাণ্ডবগণের বনবাস কাহিনীতে আর একটি অসঙ্গতি

অন্যান্য পর্বে যেমন নানা যোজনা হেতু অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়েছে, বনপর্বেও তা হয়েছে। তার মধ্যে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাভারত কাহিনী মতে পাণ্ডবদের ত্রয়োদশ মাস দ্বৈতবনে কাটলে একদিন যখন যুধিষ্ঠির ও ভীম কৌরবপক্ষের বীরদের বীরত্বের কথা বলে তাদের পরাজিত করা যেতে পারবে কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, তখন অকস্মাৎ ব্যাস ঋষি উপস্থিত হয়ে বললেন যে শত্রুবল সম্বন্ধে তোমাদের দুশ্চিন্তা হয়েছে আমি জানি, আমি তোমাকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা শিখিয়ে দিচ্ছি, তুমি এটি শিখে নিয়ে অর্জুনকে শিখিয়ে দাও, তার পরে অর্জুনকে ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট হতে অস্ত্র কৌশল শিখতে ও দিব্য অস্ত্র আয়ত্ত করতে ইন্দ্রলোকে পাঠিয়ে দাও। আর দ্বৈতবন থেকে তোমরা অন্য কোন বনে গিয়ে নিবাস স্থাপন কর, একবনে বেশীকাল না থাকাই ভাল। যুধিষ্ঠির ব্যাসের কাছ থেকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা আয়ত্ব করেছিলেন, তারপরে তাঁর উপদেশ মত দ্বৈতবন ছেড়ে কাম্যক বনে গিয়ে নিবাস আরম্ভ করলেন। কোন্ বনে দ্বাদশ বৎসর কাটানো শ্রেয়ঃ হবে বিবেচনা করে পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে এসে বসতি করেছিলেন, অথচ মহাভারত কাহিনীতে দেখি যে বার বার তাঁরা দ্বৈতবন ছেড়ে

কাম্যক বনে যাচ্ছেন, কাম্যকবনের উপর মহাভারতকারের বা পরবর্তী পুঁথি-লেখক ও কবিগণের বেশী রকম পক্ষপাত দেখা যায়।

যা হোক কাম্যক বনে এসে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা শেখালেন, তার পরে তাঁকে অস্ত্র শিক্ষায় উৎকর্ষ লাভের জন্য ইন্দ্রলোকে পাঠা'না হল। তারপরে আছে যে অর্জুনবিহীন হয়ে পাণ্ডবগণ উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাম্যকবনেই শিকার করে, অধ্যয়ন করে, জপ করে, যজ্ঞ করে পাঁচ বৎসর কাটিয়ে দিলেন।[১] কিন্তু তা যদি সত্য হয়, তবে পাণ্ডবগণের তীর্থযাত্রার বিবরণ বাদ দিতে হয়। ৮০ অধ্যায়ে আছে যে অর্জুন কাম্যক বন হতে চলে গেলে কদিন পরে দ্রৌপদী ভীমকে বললেন, অর্জুনবিহীন এই বনে আর ভাল লাগছে না। ভীম, নকুল, সহদেব দ্রৌপদীর কথার প্রতিধ্বনি করলেন। শুনে যুধিষ্ঠিরও বিমনা হলেন। ইতিমধ্যে লোমশ ঋষি এলেন, তিনি এসে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীকে তীর্থ হতে তীর্থান্তরে নিয়ে অবশেষে হিমালয়ের নানাস্থানে নিয়ে গেলেন। বদরীবিশালে নারায়ণাশ্রমে অবস্থান কালে যুধিষ্ঠির একদিন বললেন, নানা বনে ভ্রমণ করতে করতে আমাদের চার বৎসর কেটে গেছে, পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ হয়েছে, অর্জুন বলে গিয়েছিল যে সে অস্ত্রবিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করে পাঁচ বৎসর পরে ফিরবে।[২] সেখান থেকে বৃষপর্বার আশ্রম হয়ে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী গন্ধমাদন পর্বতে আর্ষ্টিষেণ ঋষির আশ্রমে এসে অর্জুনের আগমন প্রতীক্ষায় কিছুকাল বাস করলেন। সেখানে পাঁচ বৎসর শিক্ষা পূর্ণ করে অর্জুন এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সেখানেই অর্জুনের সঙ্গে গন্ধমাদন ও অলকা শৈলে বিচরণ করে দেখতে দেখতে আরো চার বৎসর কেটে গেল।[৩] বনবাসের দশবর্ষ এইভাবে কেটে গেলে তাঁরা আবার বৃষপর্বার আশ্রম হয়ে বদরীবিশালে ফিরলেন, সেখানে মাসখানেক কাটিয়ে তাঁরা হিমালয়ের পাদমূলে সুবাহু রাজার দেশে এলেন, সেখানে তাঁরা তাঁদের রথ ইন্দ্রসেনাদি পরিজন, ধাত্রী, দাসী প্রভৃতি সুবাহু রাজার আশ্রয়ে রেখে গিয়েছিলেন, তাদের সব নিয়ে তাঁরা বিশাখাযূপ নামক মহারণ্যে একাদশ বর্ষের বাকী সময়

১। বনপর্ব ৫০ / ১২

"তথা তেষাং বসতা কাম্যকে বৈ বিহীনানামর্জুনেনোৎসুকানাম্।
পঞ্চৈব বর্ষানি তথা ব্যতীয়ুরধীয়ানাং জপতাং জুহ্বতাং চ।"

২। বন ১৫৮ / ৩,৭ ৩। বন ১৬৩ / ৫

কাটিয়ে দিলেন, তারপর তাঁরা দ্বাদশ বর্ষ দ্বৈতবনে থাকবেন স্থির করে সেখানে ফিরলেন।[১]

এই যে তীর্থভ্রমণের বিবরণ, এটি সত্য বলে গ্রহণ করলে পরিষ্কার দেখা যায় যে ৫০ অধ্যায়ের কথিত অর্জুন বিহনে পাণ্ডবগণের পঞ্চবর্ষ কাম্যক বনে বাসের কথা গ্রহণ করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে বলেছেন যে বনপর্বের তীর্থযাত্রা পর্বাধ্যায় অপকৃষ্ট রচনা, এবং তা তৃতীয়স্তরান্তর্গত, অর্থাৎ মূল মহাভারত রচনার বহুকাল পরে তা মহাভারতে যোজিত হয়েছে। তীর্থযাত্রা পর্বের অনেক অংশ অপকৃষ্ট ও বর্জনীয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ৮১।২-৮৫ অধ্যায়ে আছে যে নারদ এসে পুলস্ত্য কথিত তীর্থ বিবরণ ও তীর্থমাহাত্ম্য শোনাচ্ছেন, তা সম্পূর্ণ অবান্তর ও বর্জনীয়। ৮৬ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির ধৌম্যের নিকট তীর্থ বৃত্তান্ত শুনতে চাইলেন, ৮৭-৯০ অধ্যায়ে ধৌম্য তা শোনালেন। এই অধ্যায় কয়টিও অবান্তর। ৯১ অধ্যায়ে লোমশ ঋষির আগমন বর্ণিত, ৯২-১৫৬ অধ্যায়ে লোমশ ঋষিসহ পাণ্ডবগণের তীর্থযাত্রা বর্ণিত। তারমধ্যে অনেক অবান্তর ও অপকৃষ্ট উপাখ্যান যোজিত আছে, তা বাদ হবে, কিন্তু লোমশ ঋষিসহ পাণ্ডবগণের তীর্থ ভ্রমণের কথা গ্রাহ্য, তারমধ্যে আছে যে দ্রৌপদী যখন দুর্গম হিমালয় আরোহণের পথে অবসন্ন হয়ে পড়লেন, তখন ভীম তাঁর পুত্র ঘটোৎকচ এবং তার কয়েকজন রাক্ষস অনুচরকে আনালেন, ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে বহন করে দুর্গম পথে উঠে গেল, অন্য রাক্ষসগণও পাণ্ডবদের বহন করল বা উঠতে সাহায্য করল। একথা, ঘটোৎকচের প্রতি তাঁদের ঋণের কথা, যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঘটোৎকচের মৃত্যুর পরে স্মরণ করে দুঃখ করেছেন। অতএব লোমশ ঋষি সহ তীর্থ যাত্রা বিবরণ অবান্তর উপাখ্যানগুলি বাদ দিয়ে সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে, ৫০ অধ্যায় 'কথিত' বিবরণ সত্য নয়, ৫০ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়াই সঙ্গত, তাতে আখ্যানের পক্ষে মূল্যবান কোন কথা নাই।

১২. পঞ্চ ভ্রাতার জন্য পাঁচটি গ্রাম পেলেই যুধিষ্ঠির কি রাজ্যের দাবী ছাড়বার কথা বলেছিলেন ?

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে সন্ধির চেষ্টায় যখন দূত বিনিময় হয়, তখন যুধিষ্ঠির স্বীয়

১। বনপর্ব, ১৭৭ অঃ

অর্দ্ধ রাজ্যের অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যের দাবীতে অটল ছিলেন, না পঞ্চভ্রাতার জন্য পাঁচটি গ্রাম পেলেই রাজ্যের দাবী ছেড়ে দেবার কথা বলেছিলেন, সে বিষয়ে অসঙ্গতি দেখা যায়। প্রথমে দ্রুপদ রাজের পুরোহিত পাণ্ডবগণের দূত হিসাবে যান। তিনি গিয়ে বলেন যে পাণ্ডবগণ অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন, বনবাসে ও অজ্ঞাতবাসে অনেক কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু তাঁরা তাঁদের অর্দ্ধরাজ্য ফেরত পেলেই সন্তুষ্ট থাকবেন, অর্থাৎ তাহলে লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবেন না, রাজ্য ফেরত না দিলে তাঁরা যুদ্ধই করবেন। ধৃতরাষ্ট্র পুরোহিতকে বিশ্রাম নিয়ে ফিরে যেতে বললেন। বলে দিলেন যে তাঁদের দূত গিয়ে তাঁদের উত্তর জানাবে। সঞ্জয় দূত হয়ে এসে বললেন যে যুদ্ধে জ্ঞাতিবধ করা অধর্ম হবে. তার থেকে পাণ্ডবগণ যদি যাদবরাষ্ট্রে বা অন্যত্র ভৈক্ষ্য আচরণ করে, তাও শ্রেয়ঃ হবে—অর্থাৎ পাণ্ডবদের রাজ্যার্দ্ধ ফেরত দিতে কৌরবগণ সম্মত নয়। যুধিষ্ঠির বললেন, দ্যূতের সময় বা চুক্তি অনুসারে তিনি তাঁর রাজ্যার্দ্ধ ফেরত পেতে অধিকারী, ধর্মতঃ যা প্রাপ্য তার জন্য যুদ্ধ করবার প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করাই স্বধর্মপালন হবে, তাতে পাপ কেন হবে? কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কথা সমর্থন করে স্বধর্মপালনের কথা বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন যে নিজের ন্যায্য অধিকার লাভ করতে প্রয়োজন হলে জ্ঞাতিদের সঙ্গে আমরণ যুদ্ধও ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম, তা না করে ভৈক্ষ্য অবলম্বন করলে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্মচ্যুতি হয়, তার থেকে মৃত্যুও ভাল। তখন যুধিষ্ঠির সঞ্জয়কে বললেন, কুরুবৃদ্ধদের আমার প্রণাম ও অন্যদের আমার অভিবাদন জানিয়ে বলবে, আমার কথা এই যে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য আমাকে ফেরত দাও বা যুদ্ধ কর।[১] পরে আবার যুধিষ্ঠির বলছেন, আমরা যেন স্বীয় ভাগ লাভ করি, দুর্যোধনকে পরের দ্রব্যে লোভ হতে নিবর্তিত কর, ব'লে আবার বলছেন—অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অপর একটি গ্রাম পেলেই আমরা সন্ধির পথ অবলম্বন করব।[২] প্রথমে দৃঢ়ভাবে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য ফিরিয়ে না দিলে যুদ্ধ হবে, সে কথা বলে এবং কৃষ্ণের তাতে সমর্থন পেয়ে যুধিষ্ঠির আবার দাবী

১। উদ্যোগপর্ব, ৩০।৪৯ "দদস্ব বা শক্রপুরী মমৈব যুধ্যস্ব বা ভারতমুখ্য বীর।"

২। উদ্যোগের ৩১/১৮[২] ২০[১]: "রাজ্যৈকদেশমপি নঃ প্রযচ্ছ শমমিচ্ছতাম্। অবিস্থলং বৃকস্থলং মাকন্দীং বারণাবতম্। অবসানং ভবত্বত্র কিঞ্চিদেকং চ পঞ্চমম্। ভ্রাতৃণাং দেহি পঞ্চানাং পঞ্চগ্রামান্ সুযোধন॥"

সঙ্কুচিত করে পঞ্চগ্রামের কথা বলবেন, তা সম্ভব মনে হয় না, অতএব ৩১ অধ্যায় সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত, এই অনুমান সঙ্গত।

সঞ্জয় ফিরে গিয়ে কৌরব সভায় উত্তর জানালেন যে পাণ্ডবদিগকে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য ফিরিয়ে না দিলে তারা যুদ্ধ করবে। সঞ্জয়ের কথা শুনে ভীষ্ম ও দ্রোণ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বললেন, কিন্তু দুর্যোধন সে প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না, বললেন যে তাঁর স্থির বিশ্বাস যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের নিকট পাণ্ডবগণ পরাজিত হবে, এবং যুধিষ্ঠির পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন, তাতে মনে হয় তিনি ভয় পেয়েছেন (৫৫।৩০)। কিন্তু সেকথা দুর্যোধন কোথায় পেলেন? সঞ্জয়ের প্রতিবেদনে সে কথার কোন উল্লেখ নাই।

সঞ্জয়ের দৌত্যের পরে কৃষ্ণ বললেন যে তিনি নিজেই দূত হয়ে যাবেন, এবং যুধিষ্ঠিরাদির মত জিজ্ঞাসা করলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্য ফেরত পাবার ইচ্ছাই জানালেন, কিন্তু সেই সঙ্গে বললেন যে তিনি পাঁচখানি গ্রাম পেলেই সন্ধি করতে চেয়েছিলেন, দুর্যোধন তাও দিতে চায় না (৭২।১৪^{১}-১৭^{১})। যুধিষ্ঠীর যদি পঞ্চগ্রামের প্রস্তাব দিয়েও থাকেন, সঞ্জয় চলে যেতেই—হস্তিনাপুর থেকে কোন উত্তর আসবার পূর্বেই—তিনি কি করে জানবেন যে দুর্যোধন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করবে কিনা? অতএব ৭২।১৪^{১}-১৭^{১} শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই। কৃষ্ণের যাত্রারম্ভকালে অর্জুন স্পষ্টভাবে পাণ্ডবদের দাবী জানালেন, আমাদের রাজ্যার্দ্ধ সসম্মানে ফিরে না দিলে আমরা যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রদের শেষ করে দেব (৮৩/৫০-৫৩)। কৃষ্ণ বললেন, তিনি পাণ্ডবদের ন্যায্য প্রাপ্য ছেড়ে না দিয়েই সন্ধির যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। কৌরব সভায় কৃষ্ণের ভাষণেও দেখি যে তিনি স্পষ্টভাবে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য ফেরত দিয়ে সন্ধি করতে বলেন (৯৫।৪২-৪৩, ৫৪^{২}-৫৫^{১})। কুন্তির সহিত সাক্ষাৎকালে কৃষ্ণ কুন্তীকে বলেন, পাণ্ডবেরা দুঃখ ভোগে অভ্যস্ত হয়েছে, তারা এখন ক্ষুদ্র বা মধ্যসুখ চায় না, রাজ্যলাভ চায়, তারা অল্পে তুষ্ট হবে না (৯০।২৫-২৭)[১]। অতএব পাঁচখানি মাত্র গ্রাম পেলেই সন্ধি করা পাণ্ডবদের ইচ্ছা হতে পারে না। সন্দেহ নাই যে যুধিষ্ঠির

১। ত্যক্তগ্রাম্য সুখাঃ পার্থা নিত্যং বীরসুখপ্রিয়াঃ। ন হি স্বল্পেন তুষ্যেয়ুর্মহোৎসাহা মহাবলাঃ॥ অন্তং ধীরা নিষেবন্তে মধ্যং গ্রামসুখপ্রিয়াঃ। উত্তমাংশ্চ পরিক্লেশান্ ভোগাংশ্চাতীব মানুষান্॥ অন্তেষু রেমিরে ধীরা ন তে মধ্যেষু রেমিরে। লভপ্রাপ্তিং সুখামাহুর্দুঃখমন্তরমেতয়োঃ॥

পূর্বাপর স্বীয় রাজ্য ফেরত চেয়েছেন, যুধিষ্ঠিরের অতিত্যাগশীলতা দেখাতে তৃতীয় স্তরের কবি পঞ্চ গ্রামের কথা যোগ করে দিয়েছেন। ৩১, ৫৫, ৭২, ৮২, ১৫০ অধ্যায়গুলি হতে দুটি তিনটি করে শ্লোক বাদ দিলেই এই অসঙ্গতি দূর হয়, ৩১ অধ্যায় সম্পূর্ণই বাদ দেওয়া কর্তব্য, তা ৩০ অধ্যায় কথিত যুধিষ্ঠিরের উক্তির পরে প্রলাপ বাণীর মত মনে হয়।

১৩ঃ দৌত্যশেষে সঞ্জয়ের হস্তিনাপুরে আগমন ও দৌত্যের ফল নিবেদন

উদ্যোগ পর্বের ৩২ অধ্যায়ে পাই যে সঞ্জয় উপপ্লব্যে দিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাব নিবেদন করে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের উত্তর নিয়ে এল, সন্ধ্যার পরে ধৃতরাষ্ট্র প্রাসাদে এসে দ্বারীকে বলল, ধৃতরাষ্ট্র যদি জেগে থাকেন তাঁর কাছে আমার দর্শন প্রার্থনা নিবেদন কর, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ধৃতরাষ্ট্র প্রবেশের অনুমতি দিলেন; সঞ্জয় নিজের নাম বলে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে পাণ্ডবদের কুশলবার্তা জানিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর দুর্বুদ্ধির জন্য, অন্যায় দাবী সমর্থনের জন্য তিরস্কার করে বলেন, আমি বড় ক্লান্ত আছি, পাণ্ডবদের উত্তর কাল নিবেদন করব। ধৃতরাষ্ট্র তাকে বিদায় দিয়ে বিদুরকে ডাকিয়ে নীতি ও ধর্মতত্ত্ব শুনলেন (প্রজাগর পর্ব) এবং ব্রাহ্মণ সনৎসুজাতের নিকট হতে অধ্যাত্ম বিদ্যা শুনলেন। সঞ্জয়ের উক্ত আচরণ অস্বাভাবিক, বিশেষ প্রয়োজন বলে সন্ধ্যার পরে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যে দৌত্য ব্যাপারে গিয়েছিল, তার ফল না জানিয়ে শুধু ধৃতরাষ্ট্রকে অধর্মসমর্থনের জন্য তিরস্কার করে বিদায় নেওয়া সম্ভব নয়। ধৃতরাষ্ট্র তা সহ্য করবেন কেন? যুদ্ধের ধারাবাহিক বর্ণনা শোনাতেও সঞ্জয় অনেক বার ধৃতরাষ্ট্রকে তাঁর অধর্ম সমর্থনের জন্য তিরস্কার করেছে, সর্বক্ষয়ী যুদ্ধের জন্য দাবী করেছে, তাও বেতনভোগী অমাত্যের পক্ষে স্বাভাবিক বা সম্ভব নয়। দৌত্য হতে ফিরে এসে দেখা দিয়ে পাণ্ডবদের উত্তর না জানিয়ে চলে যাওয়া অবিশ্বাস্য। প্রকৃতপক্ষে ৩২ অধ্যায় প্রজাগর পর্ব ও সনৎসুজাত পর্ব এই দুটি ধর্মতত্ত্ব ও উপদেশ মালার ভূমিকা মাত্র। মহাভারতকার জনসাধারণের জন্য, যাদের পক্ষে নিজে ধর্মগ্রন্থ ও বেদাদি অধ্যয়ন সম্ভব নয়, তাদের জন্য মহাভারতে অনেক স্থানে ধর্মতত্ত্ব সন্নিবেশিত করেছেন। তাতে শ্রোতাদের নীতি ও ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা হতে পারে, কিন্তু তাতে মহাভারতের কাহিনী ব্যাহত হয়েছে।

৩২ অধ্যায় যে শুধু এই নীতি ও ধর্মতত্ত্ব প্রসঙ্গ উত্থাপনের জন্য প্রক্ষেপ তা প্রমাণিত হয় ৪৭ অধ্যায়ের বিবরণ থেকে; রাত্রে নীতি ও ধর্মকথা শুনে পরদিন

সকালে ধৃতরাষ্ট্র রাজ সভায় এসে বসলেন, ধার্তরাষ্ট্রদের প্রধান সকলেই সভায় এসে স্ব স্ব স্থান নিল ; তখন দ্বারী নিবেদন করল যে যে রথে সূত (সঞ্জয়) পাণ্ডবগণের কাছে গিয়েছিল, সেই রথটি ফিরে আসছে, সিন্ধুদেশীয় উত্তম অশ্ববাহিত রথ এত শীঘ্র ফিরতে পেরেছে ; রথ প্রাসাদের কাছে এসে থামলে সঞ্জয় রথ হতে লাফিয়ে নেমে রাজসভায় এল, বলল যে পাণ্ডবদের সঙ্গে কথা বলে ফিরে এসেছি ; পরের অধ্যায়ে আছে যে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের উত্তরের সারমর্ম বিবৃত করল। তারপর তা নিয়ে কৌরবসভায় নানা আলোচনা হল। যানসন্ধি পর্বে সঞ্জয়ের কথা ও অন্যদের কথার মধ্যে অনেক অবান্তর কথা, অনেক প্রক্ষেপ আছে। তার আলোচনা করা যাবে মূল কাহিনী ও প্রক্ষেপ নির্বাচন খণ্ডে। এখানে শুধু ৩২ অধ্যায় ও ৪৭ অধ্যায়ের মধ্যে স্পষ্ট অসঙ্গতি দেখানো হল, তার থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে ৩২ অধ্যায় সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত, নীতি কথা ও ধর্মকথার প্রসঙ্গ সূচনা করতে পরবর্তী কোন কবি তা যোগ করেছেন, তবে তা অবুদ্ধি পূর্বক, অসঙ্গতি রেখে করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যায় মহাভারতে যোজনা করতেও পরবর্তী কবি এইরূপ অনিপুন ভাবে, যোজনার স্পষ্ট চিহ্ন রেখে, সে কাজ করেছেন। সে সম্বন্ধে এখানে আর কোন কথা বলা অনাবশ্যক, তা "কৃষ্ণবাসুদেব ও তাঁর প্রকৃত জীবনতত্ত্ব" গ্রন্থে যথেষ্টরূপে আলোচিত হয়েছে।

১৪. দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে সঞ্জয়ের যুদ্ধের ধারাবাহিক বর্ণনা

মহাভারত কাহিনীতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ পাঁচটি দীর্ঘ পর্বে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এই যুদ্ধ বর্ণনা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা যে যুদ্ধের সব ব্যাপার ব্যাসদত্ত দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে বসেই দেখতে ও বুঝতে পারছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর্ণনা করে যাচ্ছে। যুদ্ধ পর্বগুলির অধিকাংশ সেইভাবে লেখা বটে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে এমন কথা আছে যার থেকে দেখা যায় যে সে ধারণা ভ্রান্ত। ভীষ্মপর্বের ১৩ অধ্যায়ে আছে যে যুদ্ধের দশম দিনে সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র হতে অকস্মাৎ এসে ধৃতরাষ্ট্রকে জানালো যে ভরতকুলের পিতামহ ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হয়েছেন।[১] ধৃতরাষ্ট্র দীর্ঘ বিলাপ করলেন এবং বিস্তারিত বিবরণ শুনতে চাইলেন ;

১। ভীষ্মপর্ব ১৩/১[২], ২ "অথ গাবল্গনির্বিদ্বান্ সংযুগাদেত্য ভারত।
ধ্যায়তে ধৃতরাষ্ট্রায় সহসোৎপত্য দুঃখিত।
আচষ্ট নিহতং ভীষ্মং ভরতানাং পিতামহম্ ॥"

তখন সঞ্জয় প্রথম দিনের যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে ধারাবাহিক ভাবে দশদিনের যুদ্ধ বিবরণ বলে গেল, যেন সব চোখের সামনে দেখছে; সেই সঙ্গে ভগবদ্গীতাও আবৃত্তি করে গেল, যেন সব কথা শুনতে পাচ্ছে। দ্রোণপর্বেও দেখা যায় যে প্রথম অধ্যায়েই সঞ্জয়ের হস্তিনাপুরে পুনরাগমনের কথা বলা হয়েছে, সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দ্রোণের সেনাপতিত্বে অভিষেকের কথা ও পাঁচ দিন দ্রোণের সেনাপতিত্বে যুদ্ধের কথা সংক্ষেপে বলে অষ্টম অধ্যায়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে দ্রোণের নিধনের কথা বলল[১], তারপরে আবার দ্রোণসেনাপতিত্বে যুদ্ধের প্রতিদিনের ধারাবাহিক বিবরণ দিল, যেমন ভীষ্ম পর্বে দিয়েছিল। কর্ণ পর্বেও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে কর্ণ নিহত হলে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে গিয়ে সে কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জানিয়ে এলে, ধৃতরাষ্ট্র বিলাপের পরে যুদ্ধের ধারাবাহিক বর্ণনা দিল। শল্য পর্বেও প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে দুর্যোধনের পতনের পরে ও রাত্রে পাণ্ডব-পাঞ্চালশিবিরে হত্যাকাণ্ডের পরে পূর্বাহ্নে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে গিয়ে সে সব কথা জানালো, পরে অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধ বিবরণ, গদাযুদ্ধের বিবরণ ও সৌপ্তিক পর্বের হত্যা বিবরণ বিস্তৃত ভাবে বললো। ইতিমধ্যে যুদ্ধের শেষ দিনে সঞ্জয় সাত্যকির হস্তে বন্দী হয়েছিল যুধিষ্ঠিরের কথায় সাত্যকি তাকে বধ না করে মুক্তি দিলেন। মূলে আছে দ্বৈপায়নের কথায়, কিন্তু দ্বৈপায়নের যখন তখন যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপবিষ্ট থেকে সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে সব দেখছে শুনছে ও বর্ণনা করে যাচ্ছে সে কল্পনা সত্য নয়।

সংশোধিত সংস্করণের ভূমিকায় ডঃ বলভেলকর, যিনি ডঃ সুকথংকরের মৃত্যুর পরে সংশোধক মণ্ডলীর অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন, বলেছেন যে সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, কৌরব শিবিরে মন্ত্রণায়ও অংশ নিয়েছে, কিন্তু প্রতিদিন যুদ্ধ শেষে হস্তিনাপুরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে সেদিনের যুদ্ধের বিবরণ বলে আসতো; দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে সঞ্জয় যা দেখতো তার সবটা সহজে বুঝে নিত ও সেইজন্য সম্যক বিবরণ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হত। তিনি বলেছেন যে দশম দিন যুদ্ধশেষে, পঞ্চদশদিন যুদ্ধশেষে, সপ্তদশদিন যুদ্ধশেষে ও উনবিংশ দিন পূর্বাহ্নে যে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়ে সঞ্জয় যুদ্ধের ফলের কথা বলেছে, তা শুধু কবির বর্ণনা কৌশল। প্রতিদিন

১। দ্রোণপর্ব: ১/৬[২], ৮/৩০: আজগাম বিশুদ্ধাত্মা পুনর্গাবল্গণি স্তদা। এবং কৃপরথ, শূরো হত্বা শতসহস্রশঃ। পাণ্ডবানাং রণে যোধান্‌ পার্ষতেন নিপাতিতঃ ॥

সঞ্জয় হস্তিনাপুরে যেত, তার প্রমাণ স্বরূপ ডঃ বলভেলকর প্রমাণ সংস্করণের দ্রোণ পর্বের ৮৫৫-২০ শ্লোকের উল্লেখ করেছেন,—জয়দ্রথবধ যুদ্ধ বর্ণনার আরম্ভে ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের বিপদ বর্ণনা করতে বলছেন—"আজি আর আনন্দধ্বনি আমার শ্রবণ-গোচর হইতেছে না। জয়দ্রথের ভবনে যে সকল মনোহর শ্রুতিমধুর ধ্বনি হইত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। আমি আমার পুত্রগণের শিবির হইতে সূত ও মগধগণের স্তুতিবাদ এবং নর্তকগণের শব্দ আমার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিতেছে না। কৌরবগণের যে বীরনাদে আমার কর্ণ কুহর নিরন্তর নিনাদিত হইত, আজ তাহারা দীন ভাবাপন্ন হওয়াতে সেই শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। আমি পূর্বে সত্যধৃতি সোমদত্তের নিবেশনে আসীন হইলেই মধুর শব্দ শ্রবণ করিতাম, কিন্তু আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। হে সঞ্জয়, এই সমুদয়ই আমার পরিবেদনের কারণ। হায়, আমি কি পুণ্যহীন। আজি পুত্রগণের নিবেশন নিরুৎসাহ ও আর্তস্বরে নিনাদিত নিরীক্ষণ করিতেছি। বিবিংশতি, দুর্মুখ, চিত্রসেন, বিকর্ণ ও অন্যান্য পুত্রগণের তাদৃশ বীরনাদ আর শ্রুতিগোচর হয় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শিষ্য হইয়া যাঁহার উপাসনা করেন, যে মহাধনুর্দ্ধর আমার পুত্রগণের প্রধান অবলম্বন, যিনি বিতণ্ডা, আলাপ, সংলাপ ও বিবিধ মনোহর গীতবাদ্য দ্বারা দিবারাত্র কালযাপন করিতেন, এবং কৌরব, পাণ্ডব ও সাত্বতগণ সতত যাঁহার উপাসনা করিত, আজি সেই অশ্বত্থামার গৃহে পূর্বের ন্যায় শব্দ হইতেছে না। যে সকল গায়ক ও নর্তক মহাধনুর্দ্ধর অশ্বত্থামাকে নিরন্তর উপাসনা করিত, আজি তাহাদের শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। বিন্দ ও অনুবিন্দের শিবিরে সায়ং সময়ে যে মহাধ্বনি হইত এবং কৈকেয়গণের শিবিরে আনন্দিতস্বভাব সৈন্যগণ নৃত্যকালে যে মহান্ তাল ও গীতধ্বনি করিত, আজি তাহা তিরোহিত হইয়াছে। যে সকল যাদব যজ্ঞ করিতে করিতে শ্রুতিনিধি ভূরিশ্রবার উপাসনা করিতেন, আজি তাহাদিগের শব্দ শ্রুতপথে প্রবিষ্ট হইতেছে না। পূর্বে দ্রোণাচার্যের গৃহে অবিরত মৌর্বীধ্বনি, বেদধ্বনি এবং তোমর, অসি ও রথধ্বনি হইত, আজি তাহা শ্রবণ করিতেছি না। নানা দেশীয় গীত ও বাদিতধ্বনিও আজি অন্তর্হিত হইয়াছে "(দ্রোণ পর্ব, কালী প্রসন্নসিংহের অনুবাদ, ৮৫ অধ্যায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ—১-২০ শ্লোক)। ডঃ বলভলকরের যুক্তি হল যে ধৃতরাষ্ট্রের কথা থেকে বোঝা যায় যে সঞ্জয় দিনশেষে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে

যুদ্ধ বর্ণনা করতে এসেছে, ধৃতরাষ্ট্র কৌরব শিবির থেকে আনন্দধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন না, তাই দুঃসংবাদের ভয় করছেন।

কিন্তু কুরুক্ষেত্র দিল্লী থেকে ৯৫-১০০ মাইল উত্তরে—দিল্লী রেলষ্টেশন থেকে কুরুক্ষেত্র রেল ষ্টেশন ৯৭ মাইল (Murray's Handbook of India, Burma and Ceylon), হস্তিনাপুরের অবস্থান দিল্লী থেকে ৫৬ মাইল উত্তর-পূর্বে গঙ্গার একটি অধুনাত্যক্ত খাতের পারে ছিল বলে অনুমিত হয়েছে (আপ্তে-সংস্কৃত ইংরাজী অভিধান)। অতএব হস্তিনাপুর থেকে যুদ্ধক্ষেত্র অন্যূন ৭০।৭২ মাইল হবে। ধৃতরাষ্ট্র দিব্যদৃষ্টি, দিব্যশ্রুতির বর নেন নাই, তাঁর পক্ষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শিবির হতে হর্ষধ্বনি বা বাদ্যগীতধ্বনি হস্তিনাপুর থেকে শোনা সম্ভব নয়। তাছাড়া জয়দ্রথবধ দিবসে সূর্যাস্তের সঙ্গে অবহার ঘোষিত হয় নাই; দুর্যোধনের তীব্র গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে দ্রোণ ঘোষণা করলেন আজ অবহার হবে না, রাত্রেও একটানা যুদ্ধ চলবে। পরদিন দুপুর পর্যন্ত অবিরাম যুদ্ধ চলেছিল, শুধু মধ্যরাতে অর্জুনের ঘোষণা মত মাত্র দুই দণ্ডের বিশ্রাম হয়েছিল। অতএব যুদ্ধের চতুর্দশ দিবসে সঞ্জয়ের পক্ষে হস্তিনাপুরে সংবাদ দিতে যাওয়া সম্ভব ছিল না! তাই ভ বলভেলকরের যুক্তি গ্রাহ্য নয়।

তাই এই অনুমানই সঙ্গত যে সঞ্জয় প্রতিদিন সন্ধ্যায় এসে যুদ্ধ বর্ণনা করে নাই, ভীষ্মের পতনের পর, দ্রোণের পতনের পরে, কর্ণের পতনের পরে ও যুদ্ধ শেষে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের ফল জানিয়েছিল। সেইভাবে সূচনা করে কবি প্রতিদিনের যুদ্ধের নিজকল্পিত বিবরণ মহাভারতে সন্নিবেশিত করেছেন। ব্যাস ঋষির বরে দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে সঞ্জয় সব দেখতে শুনতে পেল ও সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনা করে গেল তা অলীক কল্পনা।

১৫. পাণ্ডব পক্ষে প্রধান সেনাপতি নির্বাচন

উদ্যোগ পর্বে ১৫১ অধ্যায়ে প্রধান সেনাপতি নির্বাচনের প্রসঙ্গে সহদেব বিরাট রাজের নাম করলেন, নকুল দ্রুপদরাজের নাম করলেন, অর্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নের নাম করলেন এবং ভীম শিখণ্ডীর কথা বললেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের উপর নির্বাচন ভার দিলেন, কৃষ্ণ বললেন যে আপনারা যাদের নাম করলেন, সবলেই উপযুক্ত।

তাছাড়া অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, অভিমন্যু, দ্রৌপদেয়গণ ওরা শত্রুসেনাদের ধ্বংস করবে। কিন্তু তিনি প্রধান সেনাপতি কাকে করা উচিত, তা বললেন না—৪৯[১] শ্লোক সংশোধনমণ্ডলী বাদ দিয়েছেন। কিন্তু ১৫৭ অধ্যায়ে আছে যে পাণ্ডব পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণীর নেতা হলেন, দ্রুপদরাজ, বিরাটরাজ, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু (চেদিরাজ, শিশুপাল পুত্র) শিখণ্ডী ও মগধরাজ সহদেব, সর্ব সেনাপতি হলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন, সকলের উপরে সেনাপতি পতি হলেন অর্জুন, এবং অর্জুনের বুদ্ধিদাতা হলেন কৃষ্ণ। আশ্বমেধিক পর্বে আছে যে কৃষ্ণ যখন তাঁর পিতার নিকট সংক্ষেপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা করেন, তখন বলেন যে কৌরবগণ যখন ভীষ্মের নেতৃত্বে যুদ্ধ করে, পাণ্ডবপক্ষে সেনাপতি ছিলেন শিখণ্ডী, দ্রোণের কৌরব সেনার নেতৃত্বকালে পাণ্ডবপক্ষে সেনাপতি ছিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন, এবং কর্ণের সেনাপতিত্বের সময় পাণ্ডবপক্ষে সেনাপতি ছিলেন অর্জুন (৬০ অ.)। শিখণ্ডী ভীষ্মের নিধনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, যুদ্ধবর্ণনায় কিন্তু তাকে অপরাজিত বলে বর্ণনা করলেও তার বেশী কৃতিত্ব দেখা যায় না। যুদ্ধবর্ণনা কালে বহু পরিবর্তিত হয়েছে সন্দেহ নাই। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের নিধনের জন্য যজ্ঞাগ্নি থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে অনৈসর্গিক কথা গ্রাহ্য নয়, কিন্তু মনে হয় যে দ্রোণ-শিষ্যদের হস্তে দ্রুপদরাজের লাঞ্ছনার পরে দ্রুপদরাজ যজ্ঞ করে বংশের বীরপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণবধের জন্য দীক্ষিত করেছিলেন, যুদ্ধবর্ণনায় ধৃষ্টদ্যুম্নের বীরত্বের পরিচয় যথেষ্ট আছে, এবং যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে তিনি বারবার দ্রোণের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে তৃতীয় বারে তাকে নিধন করতে সমর্থ হন। তবে পাণ্ডব-পক্ষে যুদ্ধের প্রধান উপদেষ্টা ও নির্দেশক ছিলেন কৃষ্ণ, কে কখন প্রধান সেনাপতির পদে ছিলেন সেই প্রশ্ন তাই অনেকটা অবান্তর।

১৬. ভীষ্মের পতন ও মৃত্যু কার অস্ত্রে হয়

ভীষ্মের পতনের ও মৃত্যুর বিবরণ সমূহ মধ্যে এত অসঙ্গতি আছে যে প্রকৃত ঘটনা কি ঘটেছিল সে সম্বন্ধে দুটি ভিন্ন মত সম্ভব; কিন্তু যুদ্ধ বিবরণ মন দিয়ে পাঠ করলে অনুমান করা যায় যে দ্রুপদরাজপুত্র শিখণ্ডীর অস্ত্রাঘাতেই ভীষ্মের মৃত্যু হয়, সে কথা পালটিয়ে অর্জুনের বাণে ভীষ্মের মৃত্যু, এই কাহিনী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে শিখণ্ডী কন্যা হয়ে জন্মে পরে পুরুষ হয়েছে, পূর্বস্ত্রীত্ব হেতু ভীষ্ম তার প্রতি শরবর্ষণ করবেন না, তার সুযোগ নিয়ে শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে তার

পিছন থেকে অর্জুন শরবর্ষণ করে ভীষ্মকে পরাজিত করলেন। কিন্তু এইভাবে কাহিনীর পরিবর্তনে অর্জুন ও শিখণ্ডী দুজনের প্রতিই অবিচার করা হয়েছে।

ভীষ্মের সেনাপতিত্বে যুদ্ধকালে অর্জুন তীব্র যুদ্ধ করে ভীষ্মকে বিপর্যস্ত ও নিহত করতে চান নাই, মৃদু যুদ্ধ করে কৃষ্ণের তিরস্কার সহ্য করেছেন। অর্জুনের মৃদুযুদ্ধ দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ নিজে প্রতোদ হস্তে রথ থেকে নেমে গিয়ে ভীষ্মের দিকে ছুটে গিয়েছেন, এবং অর্জুন অনুনয় করে ও তীব্র যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা করে তাকে ফিরিয়ে এনেছেন, একথা তৃতীয় দিবস ও নবম দিবস যুদ্ধ বিবরণে আছে। নবম দিন যুদ্ধ শেষে পাণ্ডব শিবিরে পরামর্শকালে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেন, অর্জুন যদি পিতামহ ভীষ্মকে মারতে না চায়, তাহলে কাল যুদ্ধে আমাকে বরণ করুন, আমি ভীষ্মকে নিধন করে আপনার জয়ের পথ করে দেব। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না প্রতিজ্ঞা করেছ, তোমাকে প্রতিজ্ঞাচ্যুত করতে চাই না। তারপর আলোচনার পরে স্থির হ'ল যে অর্জুন কৌরবপক্ষের সব রথীদের আটকে শিখণ্ডীকে একা ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধের সুযোগ দেবেন, তাহলে শিখণ্ডী ভীষ্মকে বধ করতে পারবে।[১] তা স্থির করবার পূর্বে অর্জুন বলেছিলেন যে শিশুকালে খেলার সময় যার কোলে উঠে অঙ্গ ধূলি ধূসরিত করেছে, পিতা বলে ডেকেছে, যিনি স্নেহভরে বলেছেন, আমি তোমার পিতা নই, পিতার পিতা, তাকে এখন কেমন করে নির্মম শরপ্রহার করে বধ করব?[২] তাই স্থির হ'ল, শিখণ্ডী ভীষ্ম নিধনে দীক্ষিত, তাকে ভীষ্মের সঙ্গে একক যুদ্ধের সুযোগ দেওয়া হবে। পিতামহ ভীষ্মের প্রতি স্নেহভরে অর্জুন তাকে মর্মান্তিক আঘাত করতে চান না, অথচ শিখণ্ডীর পিছনে লুকিয়ে কাপুরুষের মত ভীষ্মকে মর্মান্তিক আঘাত হানবেন, তা কি করে বিশ্বাস করা যায়? অর্জুনের চরিত্রের সঙ্গে সে আচরণ খাপ খায় না। শিখণ্ডীকে মহাভারতে বহুস্থানে "অপরাজিত" বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ যুদ্ধ বিবরণে দেখি যে অশ্বত্থামা প্রভৃতির কাছে তিনি পরাজিত হচ্ছেন, ও ভীষ্ম তাকে উপেক্ষা করছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধেই ভীষ্ম নিহত হলেন, সেই মূল কাহিনীর উল্লেখ বহুস্থানে আছে। ভীষ্মপর্বে ১৩ অধ্যায়ে আছে যে দশদিন যুদ্ধ চলবার পরে সঞ্জয়

১। ভীষ্মপর্ব ১০৭/১০৫

২। ভীষ্মপর্ব, ১০৭/৯০-৯৫

সহসা হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হয়ে জানালেন যে কুরুকুলের পিতামহ ভীষ্ম শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হয়ে রণক্ষেত্রে পতিত হয়েছেন—একথা তিনবার—৫,৭ ও ১০ শ্লোকে বলা হয়েছে। তারপর ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপে আছে যে যে অতিরথকে জামদগ্ন্য পরশুরাম জয় করতে পারে নাই, সে পাঞ্চালবীর শিখণ্ডীর হস্তে কি করে নিহত হ'ল?[১] দ্রোণপর্বের প্রথম শ্লোকেই আছে যে দেবব্রত ভীষ্ম পাঞ্চাল শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হয়। কর্ণপর্বে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপের মধ্যেও আছে যে অর্জুন দ্বারা রক্ষিত হয়ে শিখণ্ডী ভীষ্মকে নিধন করেছে শুনে আমার চিত্ত ব্যথিত হয়ে আছে।[২] শল্যপর্বেও ধৃতরাষ্ট্র বিলাপে আছে যে মহা প্রতাপশালী ভীষ্ম যে শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলেন, তা যেন শৃগালের হস্তে সিংহের মৃত্যু।[৩] ভীষ্মের শেষযুদ্ধ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে অর্জুন শিখণ্ডীকে এগিয়ে দিয়ে ভীষ্মকে বধ করতে বললেন, শিখণ্ডী যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার বাণ ভীষ্মের বর্ম বিদীর্ণ করে ভীষ্মকে ব্যথা দিতে পারল না, শেষ পর্যন্ত অর্জুনকেই ভীষ্মের তীব্র যুদ্ধে সৈন্যক্ষয় দেখে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'ল, আহত হয়ে পড়ে যেতে যেতে ভীষ্ম বললেন, এই যেসব বাণ আমাকে আমূল বিদ্ধ করছে, এগুলি শিখণ্ডীর বাণ নয়, অর্থাৎ অর্জুনের বাণ।[৪] ভীষ্ম তার যৌবনে ও প্রৌঢাবস্থায় শ্রেষ্ঠ বীর ও অপরাজেয় ছিলেন, কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১৫০/১৬০ বৎসর, সে বয়সেও তিনি পূর্ববৎ অর্জুন ভিন্ন অন্যের অজেয় থাকবেন তা কি করে বলা যায়? জয়দ্রথ বধের দিন অর্জুন, সাত্যকি, ভীম, দ্রোণকে অতিক্রম করে কৌরবব্যূহের মধ্যে অগ্রসর হয়ে গেল, দুর্যোধন এসে অনুযোগ করলে দ্রোণ বললেন, আমার ৮৫ বৎসর বয়স হয়েছে, ওরা আমার থেকে অনেক কম বয়সের, যৌবনের তেজে ক্ষিপ্রতরভাবে যুদ্ধ করে ওরা এগিয়ে যায়, তাদের আমি নিবারণ করতে পারি না। ভীষ্ম সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়, অতিবৃদ্ধ বয়সে মাতৃরক্তের গুণে কর্মক্ষম থাকলেও দশদিনের যুদ্ধে তিনি শ্রান্ত, যুবক শিখণ্ডীর সহ যুদ্ধে একক তিনি পেরে উঠেন নাই। শিখণ্ডীকে পূর্বস্ত্রীত্ব হেতু তিনি আঘাত করেন নাই, শিখণ্ডীর বাণ তার বর্ম বিদারণ করতে

১। ভীষ্ম ১৪/২০ ২১, ৪৯ ৫০

২। কর্ণ ২/১১-১২, ৯/৩৭

৩। শল্য ২/৫৬

৪। ভীষ্ম ১১৭-১১৯ অ

পারে নাই, যুদ্ধ বর্ণ-র মধ্যে এই সব কথা পরে যোজিত সন্দেহ নাই। অম্বা উপাখ্যান মতে অম্বা পরজন্মে ভীষ্মকে বধ করবেন বলা হয়েছে, সেই অম্বা শিখণ্ডী-রূপে জন্ম নিলেন। উপাখ্যানটি সত্য হোক বা না হোক, কাহিনীতে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকবে তাই স্বাভাবিক। সেই উপাখ্যানের কথা বাদ দিলে উপরে লিখিত কারণ মতে শিখণ্ডীর অস্ত্রেই ভীষ্মের পতন ও মৃত্যু হয়েছিল, তাই সিদ্ধান্ত করতে হয়। শরাহত হয়ে ভূমিতে পড়ে অল্পকাল মধ্যেই ভীষ্ম মারা গিয়েছিলেন, দীর্ঘদিন উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় কষ্ট সহ্য করে শরশয্যায় যে থাকা সম্ভব নয়, পরের অনুচ্ছেদে তা আলোচিত হবে।

১৭. ভীষ্মের শরশয্যা ও সেই অবস্থায় রাজধর্ম, আপদধর্ম ও মোক্ষ ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান

ভীষ্মের সমস্ত দেহে এত বাণ আমূল বিদ্ধ হয়েছিল, যে রণ থেকে ভূমিতে পড়ে গেলে তাঁর দেহের কোন অংশ ভূমি স্পর্শ করল না, বহু বাণের উপরেই তাঁর দেহ-ভার স্থিত হয়ে তাঁর বেদনা বৃদ্ধি করল। মহাভারত কাহিনীর বর্তমান রূপ অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে অন্ততঃ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকেই আছে, সম্ভবতঃ তার তিন চার শতাব্দী পূর্ব থেকেই। তার মধ্যে এই কাহিনী আছে যে পিতা শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহ যাতে হতে পারে, সেই জন্য তিনি সিংহাসন দাবী ত্যাগ করলেন এবং চির কুমার থাকবার প্রতিজ্ঞা করলেন, যাতে ভবিষ্যতে তাঁর কোন পুত্র হয়ে সিংহাসন দাবী না করে, এইভাবে নিজের সুখ ও স্বার্থ বিসর্জন দেওয়াতে তাঁর পিতা তাঁকে "ইচ্ছামৃত্যু" বর দিলেন, সেই বরের প্রভাবে সর্বাঙ্গ শরবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে গিয়েও তিনি উত্তরায়ণ কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করলেন; ৫৮ দিন শরশয্যায় থেকে তার মধ্যে প্রায় একমাস করে যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম, আপদধর্ম, মোক্ষধর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিয়ে উত্তরায়ণ আরম্ভ হলে তিনি মৃত্যু ইচ্ছা করে প্রাণ ত্যাগ করলেন।

কেহ বর দিলে বা অভিশাপ দিলে তার ফল অব্যর্থ হবে, এই বিশ্বাস এক-কালে ভারতবাসীর মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাধারণতঃ দেবতাকে তপস্যায় প্রসন্ন করতে পারলে দেবতা এসে বরদান করতেন, ঋষির বরদানের কথাও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়, তাদের অভিশাপ দানের কাহিনীই বেশী। শান্তনু রাজা তো

দেবতা স্থানীয় নন, তপস্যা করে তিনি দেবতুল্য বা ঋষিতুল্য ক্ষমতা লাভ করেছেন তার কোন উল্লেখ নাই। তাঁর কামনা পূরণের জন্য তাঁর পুত্র স্বার্থ ত্যাগ করল, পুত্রের প্রতি প্রসন্ন নিশ্চয় তিনি হয়েছিলেন। কিন্তু ইচ্ছা মৃত্যু রূপ বর দানের শক্তি তাঁর কোথা থেকে আসবে? রাজ্যের একটি অংশ ভাগ করে তিনি দেবব্রতকে দিয়ে দিতে পারতেন, বা সহজে জীবনযাত্রার জন্য তাকে যথেষ্ট বিত্ত দিতে পারতেন। ইচ্ছা মৃত্যুর ক্ষমতা দেওয়া তাঁর সাধ্যের অতীত ছিল, তাঁর দত্ত বরে দেবব্রত ভীষ্ম ইচ্ছা মৃত্যুর শক্তি লাভ করলেন তা গ্রাহ্য নয়। তাছাড়া সেকালে বিশ্বাস ছিল যে সম্মুখ সমরে মৃত্যু হলে স্বর্গলাভ বা উত্তম গতিলাভ হয়, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ যাদের সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু হল, তারা স্বর্গে গেল, এ কথা মহাভারতে আছে। ভীষ্ম কেন সদ্‌গতিলাভের জন্য উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করবেন? আরো কথা এই যে মহাভারতের উপাখ্যান মতে (আদি ৯৯অ) ভীষ্ম শাপভ্রষ্ট বসু ছিলেন; আটজন বসু স্ত্রীগণ সহ অপেব বা বশিষ্ঠের আশ্রমে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন, সেখানে নন্দিনী নামক হোমধেনু দেখে দ্যৌ নামক বসু তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে ধেনুটি অপহরণ করেন, অন্য বসুগণ দ্যৌকে নিবারণ না করে সাহায্য করেন, বশিষ্ঠ আশ্রমে ফিরে হোমধেনুটি না দেখে ব্যাপার বুঝে বসুগণকে অভিশাপ দেন যে তারা দেবযোনি হতে ভ্রষ্ট হয়ে মানুষ হয়ে জন্মাবে। বসুগণ শাপের কথা জেনে বশিষ্ঠের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তাতে বশিষ্ঠ বলেন যে অন্যান্য বসুদের এক এক বৎসর অন্তর জন্ম হয়েই শাপ মুক্তি হবে, কিন্তু প্রধান অপরাধী দ্যৌকেই দীর্ঘকাল মানুষ জন্মে আবদ্ধ থাকতে হবে। ভীষ্ম সেই শাপভ্রষ্ট দ্যৌনামা বসু, দীর্ঘ জীবনের পরে মরলেই তো তিনি আবার বসুযোনি ফিরে যাবেন, তাহলে তাঁর কেন উত্তরায়ণের জন্য প্রতীক্ষা? বশিষ্ঠের অভিশাপে দ্যৌ নামক বসুর ভীষ্মরূপ জন্মের কথা অনৈসর্গিক বলে বাদ দিলেও দীর্ঘকাল শরশয্যায় শয়ান থাকার কথায় এত অসঙ্গতি আছে যে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ভীষ্ম সম্বন্ধে প্রথম আখ্যান এই যে তিনি যুদ্ধের দশম দিনে শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হয়ে ভূমিতে পতিত হন। সে কথা ভীষ্মপর্বের ১৩ অধ্যায়ে তিনবার সঞ্জয় বলেছেন। তাছাড়া অনেকবার ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপে আছে যে ভীষ্মের মত বীর কিনা শিখণ্ডীর হাতে নিহত হল। এই ভাবে যুদ্ধের দশম দিনে মৃত্যুই স্বাভাবিক, সমস্ত দেহ যদি আমূলবিদ্ধ বাণে এমন হয় যে দেহ ভূমি স্পর্শ করে না, তাহলে সে ভাবে আহত বীরের জীবিত থাকা সম্ভব নয়। ভীষ্মের পতনের

আখ্যানের দ্বিতীয় রূপ হল যে তিনি শরশয্যায় উত্তরায়ণ প্রতীক্ষায় ৫৮ দিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর মৃত্যু দিবস আগত জেনে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুর থেকে মাঙ্গলিক দ্রব্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।[1] ভীষ্মের পতনের পরে আট দিন যুদ্ধ চলে; যদি যুদ্ধ শেষ দিনেই সন্ধ্যায় যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে গিয়ে থাকেন—তা অসম্ভব নয়, কারণ যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুর রাজ্য লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন, তাছাড়া পঞ্চপাণ্ডব, সাত্যকি ও কৃষ্ণ যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসের রাত্রিতে তাদের শিবিরে ছিলেন না, অন্যত্র ছিলেন, এবং যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে পাঠিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর রোষশান্তি করতে একথা আছে, বোধহয় তাঁরা সকলেই হস্তিনাপুরে গিয়েছিলেন—এবং সেখানে তখন থেকে রাত্রিবাস করে থাকেন; তাহলে সেখানে পঞ্চাশ রাত্রি কাটলেই ভীষ্মের শরশয্যার ৫৮ রাত্রি কাটে। ভীষ্ম সেদিন যুধিষ্ঠিরকে আসবার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে দুটি একটি কথা বলে এবং কৃষ্ণকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে দুই একটি কথা বলে পরমাত্মাতে মনসংযোগ করে প্রাণত্যাগ করেন। তখন রাজধর্মাদি সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেন নাই। রাজধর্ম, মোক্ষধর্ম ইত্যাদি ভীষ্মের নিকট হতে শুনতে চাইবার যুধিষ্ঠিরের কোন কারণ নাই, তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে বহু বৎসর সুষ্ঠুভাবে রাজত্ব করছিলেন, এবং ধর্মজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর শ্রেষ্ঠতার কথাও বহুবার বলা হয়েছে, বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু শরশয্যা কাহিনীর এই প্রথম রূপও গ্রাহ্য নয়। দ্রোণ পর্বের চতুর্থ দিনের রাত্রি যুদ্ধ সম্বন্ধে পাই যে সেদিন অর্দ্ধ রাত্রি পর্যন্ত অন্ধকার, পরে দীপ জেলে যুদ্ধ হয়, সকলে ক্লান্ত ও নিদ্রাকাতর হলে অর্জুনের প্রস্তাবমত যে যেখানে ছিলেন, যুদ্ধ বিরতি করে দুদণ্ড বিশ্রাম করে বা ঘুমিয়ে নিলেন, শেষরাত্রে চাঁদ উঠলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। সেদিন ছিল কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী, দুর্যোধন বধ হয় অমাবস্যার অপরাহ্নে। ভীষ্মের পতন তাহলে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে, তাঁর মহাপ্রয়াণ হয় উত্তরায়ণ আরম্ভে মাঘমাসের শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে।[2] পৌষের কৃষ্ণাষ্টমী থেকে মাঘের শুক্লাপঞ্চমী ৪২।৪৩ দিন, ৫৮ দিন নয়। টিকাকার নীলকণ্ঠ "অষ্টপঞ্চাশতং" শব্দের অর্থ কষ্টকল্পনা করে ৪২।৪৩ করেছেন:—অষ্টপঞ্চাশতং

১। অনুশাসন পর্ব, ১৬৭/৫: "উষিত্বা শর্বরীঃ শ্রীমান্ পঞ্চাশন্নগরোত্তমে।
সময়ং কৌরবাগ্র্যস্য সস্মার পুরুষর্ষভঃ॥"

২। অনুশাসন ১৬৭/২৮: মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি॥

অষ্ট+পঞ্চ অশতং=৮+৫×৭; কিন্তু তা গ্রহণ করবার কোন কারণ নাই; এই সমাধান গ্রহণ করলে আবার অন্য বিপত্তি হয়, কারণ শান্তিপর্বে ভীষ্মের দীর্ঘকাল ধর্মকথা উপদেশের কাল সমাধান করতে নীলকণ্ঠ বলেছেন যে গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধাদি করতে, যুধিষ্ঠিরের অভিষেক হতে ও কয়েকদিন রাজকার্য করতে ভীষ্মের পতনের পরে ২৮ দিন লেগেছে, তার পরে আরো ৩০ দিন ভীষ্মের জীবন ছিল; ভীষ্মের সঙ্গে পতনের পরে প্রথম দেখা হলে কৃষ্ণ তাকে বলেন "পঞ্চাশতং ষট্‌ চ কুরু প্রবীর শেষং দিনানাং তব জীবিতস্য;[1] সেখানে নীলকণ্ঠ "পঞ্চাশতং ষট্‌ চ" পদসমূহের সহজ অর্থ ৫৬ না নিয়ে বলেছেন "পঞ্চাশতং ষট্‌ চ" মানে পাঁচবার ছয়, অর্থাৎ ত্রিশ; ৫৬ অর্থ নিলে শরশয্যাকাল ৫৮ দিনের অনেক বেশী হয়ে যায়। অর্থাৎ নীলকণ্ঠ শরশয্যাকাল একবার মোট ৫৮ রাত্রি, একবার ৪৩ রাত্রি বলে গোজামিল দিয়েছেন। সংশোধক মণ্ডলী অনুশাসন পর্বের ভূমিকায় এইভাবে সঙ্গতি করতে চেষ্টা করেছেন, যে "ত্রিভাগশেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি" শ্লোকার্দ্ধের অর্থ নয় যে তখন শুক্লপক্ষের তৃতীয়াংশ গত হয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়াংশ গত হয়েছে, সেদিন মাঘের কৃষ্ণা পঞ্চমী, ভীষ্ম ঠিক দেখতে পারছেন না, কিন্তু চাঁদের আলো আছে বুঝতে পারছেন, তা কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিনে যথেষ্ট থাকে; এই সমাধান নিলে ৫৮ দিন হিসাবে গোলমাল হয় না, কিন্তু এই সমাধানও শ্লোকার্দ্ধের অর্থ বিরোধী।

ভীষ্মের পতনের কাহিনীর তৃতীয় রূপ, অর্থাৎ শরশয্যা কাহিনীর দ্বিতীয় রূপই মহাভারতের বর্তমান রূপের বর্ণিত কাহিনী। সেই কাহিনী শান্তিপর্বে বিবৃত হয়েছে। যুদ্ধে মৃত সকল জ্ঞাতি বন্ধুর উদককর্ম করে যুধিষ্ঠিরাদি সকলে একমাস হস্তিনাপুরের বাইরে গঙ্গাতীরে শৌচ পালন করে কাটালেন।[2] তার মধ্যে যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধ, বিশেষতঃ না জেনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে বধের জন্য এবং অভিমন্যু ও দ্রৌপদী পুত্রদের জন্য শোক প্রকাশ করলেন, তাদের মৃত্যুর জন্য নিজেকে পাপভাক্‌ মনে করে রাজ্যভার ছেড়ে বনবাস করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর ভ্রাতাগণ ও দ্রৌপদী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তাতে তিনি শান্তি পেলেন না। অবশেষে ব্যাস ও কৃষ্ণের কথায় রাজ্যভার নিতে

১। শান্তিপর্ব ৫১/১৪

২। শান্তিপর্ব—১/১২

স্বীকার করলেন। শৌচকাল শেষ হলে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন, তাঁর অভিষেক হ'ল। কয়েকদিন রাজকার্য করে একদিন কৃষ্ণের কাছে গিয়ে দেখেন যে কৃষ্ণ ধ্যানস্থ হয়ে আছেন, ধ্যান ভঙ্গ হলে কৃষ্ণ বললেন যে ভীষ্ম শরশয্যায় শায়ী থেকে তাঁকে স্মরণ করে স্তব করছেন। তখন কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভীষ্মের কাছে যান, কৃষ্ণ ভীষ্মের কুশল প্রশ্ন করে বললেন, যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধ হওয়াতে শোকার্ত হয়েছেন, আপনার রাজধর্ম মোক্ষধর্ম ইত্যাদি সম্যক বিদিত আছে, আপনি যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম উপদেশ দিয়ে তার মনে শান্তি দিন। এবং বললেন, আপনার জীবনের "পঞ্চাশতং ষট্ চ" দিন বাকী আছে, তারপরে আপনি শুভলোক প্রাপ্ত হবেন।[1] "পঞ্চাশতং ষট্ চ" পদসমূহের সহজ অর্থ ছাপ্পান্ন যদি নেওয়া যায়, তবে ভীষ্মের শরশয্যাকাল আটান্ন দিনের থেকে অনেক বেশী হয়—প্রায় তিনমাস হয়। তাই হিসাব মেলাতে টিকাকার নীলকণ্ঠ শান্তি পর্বের ১।১-২ শ্লোক উপেক্ষা করে বলেছেন যে ভীষ্মের পতনের পরে যুদ্ধ আটদিন চলেছে, তারপরে দেহ সংকার ও উদকক্রিয়া ও শৌচকাল ষোলদিন, পঞ্চবিংশতিতম দিনে হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ, পরদিন অভিষেক, অষ্টাবিংশ দিন ভীষ্মের নিকট গমন এবং তারপর প্রায় ত্রিশদিন ধরে রাজধর্মাদি উপদেশ শ্রবণ—পঞ্চাশতং ষট্ চ অর্থ ৫×৬=৩০ এই সমাধান অত্যন্ত কষ্ট কল্পিত, তাছাড়া পূর্বেই বলা হয়েছে যে মাঘের শুক্লাপঞ্চমীতে ভীষ্মের জীবন শেষ হলে শরশয্যা-কাল মোট ৪২।৪৩ দিন হয়।

তদ্ভিন্ন আর একটি অসঙ্গতি আছে। কৃষ্ণ যখন ভীষ্মকে রাজধর্মাদির উপদেশ দিতে বললেন, ভীষ্ম বললেন, আমার সমস্ত দেহে যন্ত্রনা, মনও তাই অস্থির, আমি গুছিয়ে কোন উপদেশ দিতে পারবো না। কৃষ্ণ তখন ভীষ্মকে বর দিলেন, তোমার দেহজ যন্ত্রণা, মানসিক গ্লানি সব দূর হয়ে যাক, ক্ষুৎপিপাসা তে যাকে অভিভূত না করুক, সমস্ত জ্ঞান তোমার নিকট প্রতিভ্রাত হোক।[2] সেই বর প্রভাবে সম্পূর্ণ সুস্থদেহময় হয়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে ক্রমে ক্রমে রাজধর্ম কথা, আপদ্ধর্ম কথা ও মোক্ষধর্মকথা শোনালেন। কিন্তু দেখি যে প্রয়াণের দিনে ভীষ্ম বলছেন যে তীক্ষ্ণ বাণের উপর শয়ন করে আটান্ন দিন তাঁর বহুকষ্টে

১। শান্তি:—৫১/১৪

২। শান্তি:—৫২/১৪-২১

কেটেছে, মনে হয়েছে যেন শতবর্ষ তিনি যন্ত্রনা ভোগ করছেন।[১] কিন্তু কৃষ্ণের বরে যদি তাঁর শারীরিক ক্লেশাদি সব দূর হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে কথা ভীষ্ম কেন বল্‌বেন ?

এত সব অসঙ্গতি থাকায় অনুমান করা ছাড়া উপায় নাই যে সমগ্র শরশয্যা কাহিনী পরে কল্পিত ও যোজিত। রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি বলেছেন—"মহাভারতে নানাকালে নানা লোকের হাত পড়েছে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের দিক থেকে তার উপর অবান্তর আঘাতের অন্ত ছিল না, অসাধারণ মজবুত গড়ন বলেই টিকে আছে। এটা স্পষ্টই বোঝা যায়, ভীষ্মের বর্ণিত ধর্ম-নীতি শ্রবণ,—যথাস্থানে আভাসে ইঙ্গিতে, বথা পরিমাণ আলোচনায়, বিরুদ্ধ চরিত্র ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিচয়টি প্রকাশ করলে ভীষ্মের ব্যক্তিরূপ তাতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠবার কথা। কাব্য পড়বার সময় আমরা তাই চাই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কোনো এক কালে আমাদের দেশে চরিত্রনীতি সম্বন্ধে আগ্রহ বিশেষ কারণে অতি প্রবল ছিল। এই জন্যে পাঠকের বিনা আপত্তিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাসকে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম দীর্ঘ একপর্ব জুড়ে নীতিকথায় প্লাবিত করে দিলেন। তাতে ভীষ্মের চরিত্র গেল তলিয়ে প্রভূত সদুপদেশের তলায়।"[২] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথও শান্তিপর্বকে পরের কালের যোজনা বলেছেন। শান্তিপর্বে দেখা যায় যে ভীষ্ম কৃষ্ণকে ভগবানরূপে স্তব করছেন, কৃষ্ণও সে ভগবত্ব আরোপ মেনে নিচ্ছেন। তার থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে যখন কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বা স্বয়ং ভগবান বলা হয়েছিল, শান্তিপর্ব তখনকার যোজনা।

যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধ, ভ্রাতৃবধ, পুত্রবধ দুঃখে অধীর হয়েছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করেছিলেন, ব্যাস ও কৃষ্ণের উপদেশে তাঁর মন শান্ত হল, তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। এই হল শান্তি পর্বের নামের সার্থকতা, ও এখানেই শান্তি পর্ব শেষ।

১। অনুশাসন,—১৬৭/২৭

২। রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪, সাহিত্যের স্বরূপ, ৫১৪ পৃ

১৮. দ্রোণ পর্বে দ্রোণের মৃত্যু বিবরণ ও অশ্বত্থামার বীরত্ব সম্বন্ধে অসঙ্গতি

দ্রোণ পর্বে যুদ্ধের বর্ণনার মধ্যে অনেক পরিবর্তন ও অনেক যোজনা আছে, এবং তজ্জনিত নানা অসঙ্গতি আছে। দ্রোণ বধের জন্য কৃষ্ণ প্ররোচিত যে অপকৌশলের কথা দ্রোণ যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণে আছে, যে অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ রটনা করে দ্রোণকে নিস্তেজ করা হ'ল, যে কথা অনুক্রমণিকাধ্যায়ে, পর্বসংগ্রহে ও দ্রোণ যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণে (দ্রোণপর্ব ৭-৮ অধ্যায়ে) নাই। যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসের পূর্বে অবহার না হওয়ায়, প্রায় সারারাত্রি ধরে যুদ্ধ চলায়, সকলেই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। দ্রোণের প্রায় সমবয়সী দ্রুপদরাজ ও বিরাটরাজ সেই ক্লান্তির ফলে বিশেষ যুদ্ধ চালাতে না পেরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দ্রোণও যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, সে কথা আশ্বমেধিক পর্বে ৬০।১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে। তা কৃষ্ণের উক্তি বলে অগ্রাহ্য করবার কারণ নাই, কারণ তাই স্বাভাবিক। জয়দ্রথ বধের দিনে দ্রোণ জয়দ্রথকে রক্ষা করতে পারবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা না পেরে দুর্যোধনের অনুযোগ সহ্য করতে না পেরে তিনি অবহারের নিয়ম লঙ্ঘন করে সারারাত যুদ্ধ চালাবার আদেশ দিলেন, তাতে নিজেকেও যে বিপন্ন করছেন, তা বুঝতে পারেন নাই। দ্রোণ পর্বের ৯৪ অধ্যায় আছে যে অর্জুন অনেক বিশিষ্ট কৌরব বীর বধ করে জয়দ্রথের দিকে ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন দুর্যোধন এসে দ্রোণকে বলেন যে, আপনি বলেছিলেন যে অর্জুন আপনাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না, কিন্তু আপনি তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে জয়দ্রথ বধের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। দ্রোণ বললেন, আমার পঁচাশি বৎসর বয়স হয়েছে, অর্জুনের মত ক্ষিপ্রকারী যোদ্ধা ব্যূহদ্বারে অল্প ফাঁক করে এগিয়ে গেল, তাকে নিবারণ করা আমার সম্ভব হয় না। পরে সাত্যকি যখন দ্রোণকে পার হয়ে যান, দ্রোণ তার পশ্চাদ্ধাবন করে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে ফিরতে বাধ্য হন। ভীম দ্রোণকে পার হয়ে যাবার সময় বললেন, আমি অর্জুনের মত দয়ালু নই, আমি শত্রু, বলে দ্রোণের সারথি ও অশ্ব নিধন করে রথ উল্টিয়ে দিয়ে যান, দ্রোণ কোনমতে আত্মরক্ষা করেন।

রাত্রি যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরও একবার দ্রোণকে বিপর্যস্ত বিসংজ্ঞ করেছিলেন,[১] তারপর অর্জুনের রথ থেকে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দ্রোণকে বাদ দিয়ে দুর্যোধনকে আক্রমণ করতে বলেন। তার পরদিন যুদ্ধক্লান্ত দ্রোণকে তার থেকে অনেক কম বয়স্ক ধৃষ্টদ্যুম্ন মৃত্যুভয় ত্যাগ করে বার বার আক্রমণ করে তৃতীয় বার তাঁকে নিধন করতে পারলেন, তাতে আশ্চর্য কিছু নাই। বরং কৃষ্ণের মুখে যে কথা বসানো হয়েছে, যে অর্জুন তো দ্রোণকে মারবে না, দ্রোণ এখন এত বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন যে তার পুত্রের মৃত্যু হয়েছে রটনা করে তার বীর্য হ্রাস না করলে তাকে পরাজিত করা যাবে না,[২] সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়; ক্লান্ত দ্রোণ সেরূপ বিক্রমের সঙ্গে পঞ্চদশ দিবস যুদ্ধ করতে পারেন না। এই অপকৌশলের কথা শুধু কৃষ্ণের চরিত্রে কালিমা লেপনের চেষ্টায় করা হয়েছে; কৃষ্ণ প্রচারিত পঞ্চরাত্র বা সাত্বত ধর্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের আক্রোশ ছিল।

দ্রোণের বীরত্ব যেমন বেশী করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে, তেমন কোন পরবর্তীকালের কবি অশ্বত্থামার বীরত্বও বাড়িয়ে দেখাতে চেষ্টা করছেন। অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ২০২ শ্লোকে দ্রোণের পতনের পরে অশ্বত্থামা ও নকুলের সমযুদ্ধের কথা আছে।[৩] কিন্তু দ্রোণ পর্বের বর্তমান রূপে নকুল ও অশ্বত্থামার সমযুদ্ধ দ্রোণের মৃত্যুর পরে বা পূর্বে কোথাযও বর্ণিত হয় নাই। তার পরিবর্তে আছে যে নারায়ণাস্ত্রে বিফল হলে অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধ হয়ে এমন তীব্র যুদ্ধ আরম্ভ করলেন যে তার সম্মুখীন হয়ে ক্রমান্বয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ভীম পরাজিত হলেন, পরে অর্জুনকে অশ্বত্থামাকে পরাজিত করতে তীব্র যুদ্ধ করতে হ'ল। (২০০-২০১ অধ্যায়।) এরূপ যুদ্ধের কথা অনুক্রমণিকাধ্যায়ে বা পর্বসংগ্রহে নাই। অতএব সন্দেহ নাই যে নকুলসহ সমযুদ্ধ বিবরণ বাদ দিয়ে সেই স্থানে ২০০-২০১ অধ্যায় বসানো হয়েছে।

১৯ ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ ও বলরাম

উদ্যোগপর্বে পাই যে কৌরব ও পাণ্ডব শিবির স্থাপিত হয়েছে, সেনাপতি নির্বাচন ও প্রতি অক্ষৌহিণী সেনার নায়ক নির্বাচন হয়ে গেছে, সেই সময়ে

১। দ্রোণ পর্ব, ১৬২/৩৬-৪৬

২। দ্রোণ পর্ব, ১৯০/৭-১২

৩। যদাশ্রৌষং দ্রোণিনা দ্বৈরথস্থং মাদ্রীপুত্রং নকুলং লোকমধ্যে।
সমং যুদ্ধং মণ্ডলেভ্যশ্চরন্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

বলরাম পাণ্ডব-শিবিরে এসে উপস্থিত হলেন, এসে বললেন যে পাণ্ডব ও কৌরবদের সঙ্গে বৃষ্ণিকুলের তুল্য সম্পর্ক, কৃষ্ণকে বলরাম বলেছিলেন যে তুমি অর্জুনকে সাহায্য করছ, দুর্যোধনকেও সাহায্য দাও, তা কৃষ্ণ শুনলো না; কৃষ্ণের বিরুদ্ধে তিনি যেতে পারেন না, কৃষ্ণের সাহায্যে পাণ্ডবদের জয় নিশ্চিত, তিনি উপস্থিত থেকে কৌরবদের বিনাশ দেখ্‌তে চান না, অতএব তিনি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হচ্ছেন। এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন।

বলরাম কৌরবদের বিনাশ দেখতে চান না বলে চলে গেলেন, তারপর মহাভারতে বর্ণিত[1] ঘটনাবলী অনুসরণ করে দেখলে মনে হয় যে ভীম-দুর্যোধনের গদা যুদ্ধকালে বলরামের উপস্থিতি সম্ভব নয়। উদ্যোগ পর্বে ১৬০-১৬৪ অধ্যায়ে উলূক দৌত্যকথা বর্ণিত আছে, তার মধ্যে সার কথা এই যে আগামী কাল থেকে যুদ্ধ আরম্ভ হবে। ১৫৮ অধ্যায়ে রুক্মী প্রত্যাখ্যানের কথা আছে, রুক্মী সসৈন্য উপস্থিত হয়ে এসে একে দুই পক্ষকেই সাহায্য দিতে চাইলেন কিন্তু তাঁর বীরত্বের দম্ভ দেখে হোক বা অন্য কোন কারণে হোক কোন পক্ষই তার সাহায্য গ্রহণ করল না—রুক্মীর আগমন কাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "এতস্মিন্নেব কালে" অর্থাৎ বলরাম এসে যখন চলে গেলেন। ১৫৯ অধ্যায়ে আছে, সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন যুদ্ধের কথা একমনা হয়ে শুনুন, অর্থাৎ যুদ্ধ আসন্ন। আমাদের নির্ণয় মতে অবশ্য সঞ্জয় হস্তিনাপুরে বসে থেকে যুদ্ধের বর্ণনা ধৃতরাষ্ট্রকে শোনান নাই। তবে মহাভারতের অধিকাংশ অধ্যায়ে সেই ভাবে কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধ পৌষ মাসে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে আরম্ভ হয়েছে, সে সম্বন্ধে টিকাকার নীলকণ্ঠ ভীষ্মপর্বের ১৭ অধ্যায়ের টিকায় ভারত-সাবিত্রী থেকে[2] উদ্ধৃত করেছেন—"হেমন্তে প্রথমে মাসি শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশীম্। প্রবৃত্তং ভারতীং যুদ্ধং নক্ষত্রে যমদৈবতে। হেমন্তের প্রথম মাস মার্গশীর্ষ বা অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে যুদ্ধারম্ভ—যমদৈবত নক্ষত্রে। যমদৈবত নক্ষত্র হল ভরণী, কিন্তু মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ১৭ অধ্যায়ে আছে যে যুদ্ধারম্ভদিনে চন্দ্র মঘা নক্ষত্র ছিল (১৭/২)। গদাপর্বে পাই যে বলরাম এসে বলেছেন যে আমি বিয়াল্লিশ দিন তীর্থভ্রমণ করে এসেছি, পুষ্যা নক্ষত্রে যাত্রা আরম্ভ করে শ্রবনা নক্ষত্রে ফিরেছি (শল্য পর্ব ৩৪/৬)। পুষ্যা ৮নং নক্ষত্র, মঘা ১০নং, শ্রবনা ২২নং। মঘা নক্ষত্রে যদি যুদ্ধারম্ভ হয়ে থাকে, তবে পুষ্যা নক্ষত্রে অর্থাৎ

১। উদ্যোগপর্ব, ১৫৭ অধ্যায়।

২। ভারত মঞ্জরী কাশ্মীর-কবি কৃত সংস্কৃত কবিতায় মহাভারতের সারমর্ম, "ভারতসাবিত্রী" দক্ষিণ ভারতে কৃত সারমর্ম।

যুদ্ধারম্ভের দুইদিন পূর্বে বলরাম তীর্থ যাত্রা আরম্ভ করেছেন, তা ধরলে উদ্যোগ পর্বের পূর্ব-উদ্ধৃত কথাগুলির সঙ্গে সে বিবরণ মিলে যায়, কিন্তু তা হলে ৪২ দিন তীর্থযাত্রা শেষ করে বলরাম গদাযুদ্ধের দিনে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হতে পারেন না, তাঁর যাত্রা যুদ্ধ শেষের বাইশদিন পরে শেষ হয়। টিকাকার নীলকণ্ঠ সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা করেছেন এই বলে যে বলরামের পাণ্ডবশিবিরে আগমন যুদ্ধ আরম্ভের দুইদিন মাত্র পূর্বে নয়, শিবির সংস্থাপনের প্রথম দিকে, এবং যুদ্ধারম্ভ হয়েছিল মঘানক্ষত্রে নয়, মঘানক্ষত্রের অধিপতি পিতৃগণ, যুদ্ধে মৃত বীরগণের উত্তমদেহ প্রদানার্থ চন্দ্র সেদিন পিতৃলোক সন্নিহিত ছিল। অর্থাৎ সেদিন মৃগশিরা নক্ষত্র, যার অধিপতি চন্দ্র। মৃগশিরা নক্ষত্র থেকে যুদ্ধ আরম্ভ হলে—অভিজিৎ নক্ষত্র বাদ দিয়ে অষ্টাদশ দিবসে শ্রবণা নক্ষত্র হয়; বলরাম তীর্থ যাত্রা আরম্ভ করেন কার্ত্তিকের পুষ্যা নক্ষত্রে, তাহলে হিসাব মিলে যায়। কিন্তু এই সমাধান কষ্টকল্পিত। উদ্যোগ পর্বের ১৫৭-১৬৫ অধ্যায় পাঠে মনে হয় যে বলরাম যুদ্ধারম্ভের মাত্র দুদিন পূর্বেই এসেছিলেন, বহু পূর্বে নয়, এবং "মঘা বিষয়গং সোমস্তদ্দিনং প্রত্যপদ্যত" (ভীষ্ম ১৭/২) শ্লোকার্দ্ধের যে অর্থ নীলকণ্ঠ করেছেন, তাও কষ্ট-কল্পিত মনে হয়। তাছাড়া বলরাম বলে গেলেন যে তিনি উপস্থিত থেকে কৌরবদের বিনাশ দেখতে চান না, তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য দুর্যোধনের বিনাশ দেখতে কেন অকস্মাৎ উপস্থিত হবেন? গদা পর্বে, অর্থাৎ শল্য পর্বের দ্বিতীয় ভাগে অধ্যায় বিন্যাস বিবেচনা করে দেখলেও বলরামের অকস্মাৎ আগমন কথা পরে যোজিত বলে মনে হয়। ৩৩ অধ্যায়ে আছে যে ভীম ও দুর্যোধন গদা হস্তে পরস্পরের প্রতি তর্জন করছেন, তার পরে গদাযুদ্ধ বর্ণনায় ছেদ পড়িল; ৩৪ অধ্যায়ে বলরাম উপস্থিত হয়ে এসে বললেন যে ৪২ দিন সরস্বতীর নানা তীর্থ দর্শন করে তিনি এসেছেন; ৩৫ হতে ৫৪ অধ্যায়, অর্থাৎ দীর্ঘ বিংশ অধ্যায় সেই তীর্থ সমূহের বর্ণনা ও সংশ্লিষ্ট উপাখ্যান; ৫৫ অধ্যায়ে পুনঃ গদাযুদ্ধ কাহিনী আরম্ভ, ৫৬ অধ্যায়ে গদাহস্তে ভীম ও দুর্যোধনের বাগ্‌ যুদ্ধ—সেটি বহুলাংশে ৩৩ অধ্যায়ের প্রতিধ্বনি—বস্তুতঃ ৩৩।৩১-৫৮ শ্লোক এবং ৫৬।১৪-৪৬ শ্লোক প্রায় এক, মধ্যে মধ্যে সামান্য বাক্য ভেদ মাত্র আছে। ৫৭-৫৮ অধ্যায় গদাযুদ্ধের বিশদ বিবরণ। ৩৩ অধ্যায়ের পরে ৫৭-৫৮ অধ্যায় পড়লেই স্বাভাবিক হয়, মধ্যের তেইশটি অধ্যায় অবান্তর এবং পরে যোজিত সন্দেহ নাই। ভীম যদি অন্যায়ভাবে গদা প্রহারে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করে থাকেন, বলরাম উপস্থিত থাকলে তাঁর তৎক্ষণাৎ

প্রতিবাদ করা আশা করা যায়। কিন্তু ৫৮ অধ্যায়ে উরুভঙ্গের কথা বলে ৫৯ অধ্যায়ে আছে যে ভীম ভূপতিত দুর্যোধনের শিরে পদাঘাত করলেন, যুধিষ্ঠির ভীমকে নিবৃত্ত হতে বললেন, তার পর দুর্যোধনের অবস্থার জন্য ও তার দুর্বুদ্ধি হেতু ধ্বংসলীলার কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তার পরের অধ্যায়ে-৬০ অধ্যায়ে—আছে যে পতিত শত্রুর মস্তকে পদাঘাত ও নাভির নীচে গদাঘাত করার জন্য বলরাম ক্রোধ প্রকাশ করে হল হস্তে ভীমের দিকে ধাবিত হলেন. কৃষ্ণ তাঁকে নিবারণ করে ভীমের সমর্থনে যা বললেন বলরাম সে কথাকে ধর্মের অপলাপ আখ্যা দিয়ে চলে গেলেন। এই ষষ্টিতম অধ্যায় বাদ দিলেও আখ্যানে কোন ছেদ পড়ে না। এই অধ্যায়ও পরে যোজিত মনে হয়।

গদাযুদ্ধের নিয়ম ছিল যে প্রতিপক্ষের নাভির নীচে কেহ গদাঘাত করতে পারবে না। ভীমের প্রতিজ্ঞা ছিল যে তিনি দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন। ভীম নিয়ম-বহির্ভূত আঘাত করেন এবং তা কৃষ্ণের প্ররোচনায়, তা দেখাতে ৩৩।২-১৭ শ্লোকে এবং ৫৮।১-১১ শ্লোকে কৃষ্ণের উক্তি দেওয়া হয়েছে—অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন যে ভীম অধিক বলবান, কিন্তু দুর্যোধন অধিক কৃতী বা কৌশলী, ন্যায় যুদ্ধে ভীম জয়ী হতে পারবে না, উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা ও কৃষ্ণ ভীমকে স্মরণ করিয়ে দিলেন (৩৩/২৮)। পুনঃ যুদ্ধশেষে দেখা যায় যে কৃষ্ণ বলছেন যে দুর্যোধন ও কৌরব পক্ষের অন্য বীরদের পাণ্ডবগণ ন্যায়যুদ্ধে পরাজিত করতে পারতেন না; তিনি পাণ্ডবগণের হিতার্থী হয়ে কূটনীতির উপদেশ দিয়ে তাদের জয়ী করেছেন (৬১ অধ্যায়)। এই সমস্তই দ্বিতীয় স্তরের কবির কল্পনা; এই কবি কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলেও দেখাতে চেয়েছেন যে কৃষ্ণ কূটনীতিক, এবং ঈশ্বরই ধর্মের ও অধর্মের প্রেরয়িতা। শান্তিপর্বে ব্যাসের উক্তি দিয়েছেন যে ঈশ্বরের নিয়োগানুসারেই লোকে সাধু বা অসাধু কর্ম করে (৩২/১৩)। কিন্তু তা কৃষ্ণের মতবাদ নয়। কৃষ্ণ ধর্মপথে চলবার উপদেশই সর্বত্র দিয়েছেন। যেখানে কৃষ্ণ সেখানে ধর্ম, সেকথা বার বার বলে[1] কৃষ্ণকে অধর্মের প্রেরয়িতা বলা পরিহাস মনে হয়।

শল্যপর্বে ১২ অধ্যায়ে ভীম ও শল্যের গদাযুদ্ধ বর্ণনা করতে বলা হয়েছে যে ভীমের গদা প্রহারের সম্মুখীন হতে পারে এমন শল্য ও বলরাম ছাড়া কেহ নাই, শল্যেরও গদাপ্রহার সহ্য করতে সমর্থ বীর ভীম ও বলরাম ছাড়া কেহ নাই।

১। ভীষ্মপর্ব, ২১/১১-১২,১৪,৩৪; অনুশাসন, ১৬৭/৪০-৪১, শল্য ৬২/৩১-৩২

অর্থাৎ এখানে দুর্যোধনকে বলরাম, ভীম ও শল্যের সঙ্গে গদাযুদ্ধে তুলনীয় বলা হয় না। উদ্যোগ পর্বে ৫১ অধ্যায়ে আছে যে ভীমের গদাযুদ্ধে বিক্রম স্মরণ করে ধৃতরাষ্ট্র উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, তিনি দুর্যোধনের গদাযুদ্ধে বিক্রমের কথা বলেন নাই। উদ্যোগ পর্বে ১৬৯ অধ্যায়ে আছে যে ভীষ্ম উভয়পক্ষের বীরগণের কথা বলতে ভীমকে নাগাযুতবলী ও গদাযুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলেছেন. দুর্যোধনকে উত্তমরথী ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহারে কুশলী বলেছেন. শ্রেষ্ঠ বলেন নাই। গদাযুদ্ধের পূর্বপর্যন্ত যুদ্ধ বিবরণে পাই যে ভীম প্রতিদিন গদাহস্তে হস্তী, অশ্ব, রথ চূর্ণিত করছেন, দুর্যোধন সম্বন্ধে একবার মাত্র কথিত হয়েছে যে তিনি গদা হস্তে যুধামন্যু-উত্তমৌজার রথ চূর্ণিত করেছিলেন। অতএব কৃষ্ণ কেন বলবেন যে ন্যায়যুদ্ধে ভীম দুর্যোধনকে পরাজিত করতে পারবেন না? কেনই বা অন্যায় যুদ্ধ প্ররোচনা দিবেন? বস্তুতঃ শল্যপর্বের ৩৩/২-১৭, ৫৮/১-১১, ৩৩/২০ ইত্যাদি সকল শ্লোক পরের যোজনা, এবং ৬১ অধ্যায় যে পরের যোজনা, তার মধ্যে সব বাজে কথা, তাতে সন্দেহ নাই। উত্তর গোগ্রহের যুদ্ধে অর্জুনের বীরত্ব স্মরণ করে, ভীমের সাত্যকির ধৃষ্টদ্যুম্নর অভিমন্যুর ঘটোৎকচের বীরত্বের কথা মনে করলে কেহই বলতে পারে না যে পাণ্ডবগণ কূটনীতি আশ্রয় না করলে জয়লাভ করতে পারতেন না। যুদ্ধ বিবরণগুলি পর্যালোচনাতেও দেখা গেছে যে তার মধ্যে কূটনীতি আশ্রয়ের কথা সামঞ্জস্যহীন ও পরে যোজিত।

উরুভঙ্গের বিবরণ শল্যপর্বে ৫৮/৪২-৪৭ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে—ভীমকে গদা উদ্যত করে ছুটে আসতে দেখে দুর্যোধন লাফ দিয়ে উঠে আঘাত ব্যর্থ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আঘাত তাঁর উরুদ্বয়ের উপর পড়ে উরু ভেঙ্গে গেল। তার থেকে বলা যায় যে ইচ্ছাকৃত নিয়ম বিরুদ্ধ আঘাত ভীম করেন নাই, ঘটনাচক্রে তাঁর আঘাত দুর্যোধনের উরুর উপর পড়েছিল। তা যদি নাও হয়, ভীম যদি ইচ্ছা করেই দুর্যোধনের উরুর উপর আঘাত করে থাকেন, তার জন্য ভীমই দায়ী, কৃষ্ণকে সেই অন্যায় আঘাতের প্রেরক বলবার কোন কারণ নাই। পরের কালের কোন কবি গদাযুদ্ধে অভিজ্ঞ বলরামকে গদাযুদ্ধ স্থলে উপস্থিত করে তার মুখে একথা বসিয়েছেন যে ভীম নাভির নীচে আঘাত করে অধর্ম করেছেন, এবং ভীমের আচরণ সমর্থন করে কৃষ্ণের উক্তিও অধর্মাশ্রিত। কিন্তু বলরামের ভীম দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ কালে উপস্থিতি সম্ভব নয়, অতএব তাঁর মুখে যে মন্তব্য বসান হয়েছে, তার উপর কোন মূল্য দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয় খণ্ড

ভাণ্ডারকর গবেষণা কেন্দ্র হতে প্রকাশিত সংশোধিত মহাভারত

১ সংশোধিত মহাভারতের কল্পনা ও রূপদান

প্রথমখণ্ডের সূচনায় ভারতের নানাস্থানে প্রাপ্ত নানা প্রকার লিখিত মহাভারতের পুঁথির পাঠ বিভিন্নতার কথা বলা হয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক ম্যাক্‌ডনেল তাঁর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লিখেছিলেন যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ টিকাসহ বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ প্রভৃতি বহু বৈদিক ও সংস্কৃত গ্রন্থের মূল পাঠ যথাসম্ভব উদ্ধার করে প্রকাশ করেছেন; কিন্তু যদিও মহাভারতের সম্পূর্ণ পুঁথি লণ্ডন, অক্সফোর্ড, প্যারিস, বার্লিন প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থশালায় আছে এবং ভারতবর্ষে বহু সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ মহাভারতের পুঁথি আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখনও মহাভারতের মূলপাঠ যথাসম্ভব উদ্ধার করে প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন নাই; মহাভারতের বিশালতা ও পুঁথিসমূহে বিভিন্ন পাঠ থাকায় কাজটি বহু সময় ও শ্রম সাধ্য হতে বাধ্য, এবং সে কাজ বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে একযোগে করতে হবে। ইউরোপে পর পর দুইটি মহাযুদ্ধ ঘটায় এবং তার ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় আসায় সেখানে সংস্কৃত চর্চা অনেকটা ব্যাহত হয়। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে বিদ্বজ্জন বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে বেদ, পুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি সমীক্ষণ করে যথাসম্ভব শুদ্ধ পাঠ যুক্ত সংস্করণ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এই ব্যাপারে পুনা শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেছে। পুনার ভাণ্ডারকর গবেষণা কেন্দ্রের পণ্ডিতগণ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হতে মহাভারতের নানা দেশীয় পুঁথি সমীক্ষণ করে প্রাচীনতম শুদ্ধ সর্ব ভারতীয় পাঠ উদ্ধার করার কল্পনা করেন। তাঁরা মহাভারত সংশোধকমণ্ডলী নামে একটি সমিতি গঠন করেন, ডঃ বিষ্ণু সুকথংকর সেই সমিতির প্রথম অধ্যক্ষ রূপে কাজ আরম্ভ করেন। প্রথমে তাঁরা ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হতে নানা লিপিতে লেখা মহাভারতের সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পুঁথি সংগ্রহ করেন; যেখানে মূল পুঁথি অন্যত্র প্রেরণে অসম্মতি হয়, সেখানে তাঁরা আলোক চিত্র সাহায্যে পুঁথির নকল প্রস্তুত করে নেন, ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে লেখা পুঁথি প্রয়োজন মত দেবনাগরি লিপিতে

পুনর্লিখিত হয়। লণ্ডন, অক্সফোর্ড, প্যারিস, বার্লিন প্রভৃতি গ্রন্থশালার মহাভারত পুঁথির আলোকচিত্র নকল প্রস্তুত করে নেন। যবদ্বীপ, বালি প্রভৃতি দ্বীপমালায় ভারতীয়গণ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী বা তার পূর্ব থেকে উপনিবেশ স্থাপন করেন, সঙ্গে মহাভারত নিয়ে যান। যবদ্বীপে তখনকার কবিভাষায় লিখিত মহাভারতের আটটি পর্বের অনুবাদ পাওয়া গেছে—আদি, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, আশ্রমবাসিক, মৌসল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ, সেগুলিতে মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে। সংশোধনমণ্ডলী সেটিকেও কাজে লাগিয়েছেন।

সংশোধক মণ্ডলীর প্রথমে ধারণা ছিল যে ইয়োরোপের, বিশেষতঃ জার্মানির সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সহায়তা পাবেন। কিন্তু যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় তা সম্ভব হয় নাই। কেবল একজন আমেরিকান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তা সংশোধক মণ্ডলী পান—ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ফ্রাঙ্কলিন এজারটন (Prof. Franklin Edgerton)। তিনি সংশোধক মণ্ডলীর নিয়ম অনুসরণ করে সভাপর্বের শুদ্ধ প্রাচীন পাঠ সঙ্কলন করেন। বাকী সমস্ত পর্বের সমীক্ষণ ও সংকলন ভারতের পণ্ডিতরাই করেছেন।

মহাভারতে নানা লিপিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে লিখিত পুঁথিসমূহের মধ্যে পাঠভেদ থাকলেও উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয়, এই দুটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা চলে। কলিকাতায় মহাভারতের মূল পর্বসমূহ হরিবংশ সহ প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮৩৪-৩৯ খৃষ্টাব্দে, এবং বোম্বাইয়ে মল্লিনাথের টিকাসহ কিন্তু হরিবংশ বাদ দিয়ে প্রথম মুদ্রণ হয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় পাঠ অনুসারে মহাভারত তেলেগু লিপিতে প্রথম মুদ্রিত হয় ১৯৫৫-৬৯ খৃষ্টাব্দে। সংশোধক মণ্ডলী মুদ্রিত সংস্করণগুলি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তাঁরা হস্ত লিখিত পুঁথিকে বেশী প্রামাণ্য দিয়েছেন। উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিসমূহের মধ্যে বহু অধ্যায় বিন্যাস, আখ্যান ও শ্লোকে পার্থক্য আছে। উত্তর ভারতীয় পুঁথিতেও বহু যোজনা আছে। তবে দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিতে যোজনা অনেক বেশী। ডঃ সুকথংকরের অধ্যক্ষতায় বিভিন্ন পাঠ তুলনা করে কোন্ পাঠ গৃহীত হবে সে সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম করা হয়। যেখানে উত্তর ভারতীয় পাঠ ও দক্ষিন ভারতীয় পাঠ মেলে, তা গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তর ভারতীয় পুঁথি সমূহের মধ্যে ডঃ সুকথংকর কাশ্মীরের পুঁথি

সবচেয়ে প্রামাণ্য মনে করেছেন, কারণ কাশ্মীরী পুঁথির পাঠ খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে কি ছিল, তার নির্দেশ পাওয়া যায় কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র রচিত মহাভারতের সংস্কৃত কবিতায় লিখিত সারমর্ম "ভারতমঞ্জরী" থেকে। যে শ্লোক বা অধ্যায় বা উপাখ্যান উত্তর ভারতীয় পুঁথিতে আছে, কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিতে নাই, বা যা দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিতে আছে, কিন্তু উত্তর ভারতীয় পুঁথিতে নাই, তা সংশোধক মণ্ডলী বর্জন করেছেন। বর্জিত অংশগুলি পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে। উত্তর ভারতীয় পুঁথিসমূহের মধ্যে আবার যা পশ্চিম ভারতীয় পুঁথিতেই আছে, পূর্ব ভারতীয় বা কাশ্মীর পুঁথিতে নাই, তাও বর্জন করা হয়েছে, যথা ব্রহ্মার উপদেশমত গণেশকে আহ্বান করে তাকে দিয়ে শ্রুতিলেখন করাবার উপাখ্যান। যা পূর্বভারতীয় বাংলা পুঁথিতে আছে, কিন্তু পশ্চিম ভারতীয় বা কাশ্মীর পুঁথিতে নাই, যথা বিরাট পর্বে ও ভীষ্মপর্বে দুর্গাস্তব, তাও বাদ দেওয়া হয়েছে। মহাভারত কাহিনীতে মধ্যে মধ্যে অসঙ্গতি আছে, একই ঘটনা দুবার ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যেখানে উভয় বিবৃতি উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় দুই বিভাগের প্রামাণ্য পুঁথিতে আছে, সংশোধক মণ্ডলী তা রেখেছেন, বলেছেন যে তাঁদের উদ্দেশ্য প্রাচীনতম সর্বভারতীয় পাঠ নির্ণয়; অসঙ্গতি সংশোধন নয়; অসঙ্গতির উৎপত্তি হয়েছে এই কারণে যে একই ঘটনার দুই প্রকার বর্ণনা জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীতে ছিল, পুঁথি যখন লেখা হয়, পুঁথি লেখক সমন্বয় করবার চেষ্টা করেন নাই, উভয় বর্ণনাই লিপিবদ্ধ করেছেন। অথবা বহুকাল পূর্বে কোন কবি বা সূত্র (কথক) একটি নূতন রকম বিবৃতি কল্পনা করে যোগ করে দিয়েছেন। এখন যেসব পুঁথি পাওয়া যায়, তার কোনটি ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেকার নয়, সেগুলি সমীক্ষণ করে অসঙ্গতি দূর করা যায় না।

কিছু কিছু উপাখ্যান বা শ্লোক বর্জন ভিন্ন সংশোধক মণ্ডলী প্রতিটি শ্লোকের শুদ্ধপাঠ স্থির করতে চেষ্টা করেছেন। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এবং তাতে অনেক ব্যাকরণগত অশুদ্ধি বা ভাবের অস্পষ্টতা দূর করা সম্ভব হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে।

(১) প্রমাণ মহাভারতের আদি পর্বের ২৪২.৫ শ্লোক—যুধিষ্ঠিরের রাজত্বে বেদপাঠ, যজ্ঞ ও প্রজার সুখ বর্ণনা—"অধ্যেতারং পরং বেদান্ প্রযোক্তারং মহাধ্বরে।
রক্ষিতারং শুভাল্লোকান্ লেভিরে তং জনাধিপম্॥"

এই শ্লোকের সহজ অর্থ করা যায় না, টিকাকার 'বেদান্' শব্দে 'বেদানান্' বোঝায় বলেছেন যদিও তাতে বিভক্তি ব্যত্যয় হয়, এবং অনুবাদকারকে 'শুভান্ লোকান্' শব্দের অর্থ "শিষ্ট প্রজাদের" (রক্ষক) বলতে হয়েছে। কিন্তু সংশোধক মণ্ডলী সংকলিত শ্লোকটির অর্থ স্পষ্ট ও ব্যাকরণ অশুদ্ধিহীন, যথা—

"অধ্যেতারং পরং বেদাঃ প্রযোক্তারং মহাধ্বরাঃ।
রক্ষিতারং শুভং বর্ণা লেভিরে তং জনাধিপম্ ॥"

(২) অর্জুনের লক্ষ্যভেদ সম্বন্ধে আদিপর্বে প্রমাণ মহাভারতে ১৮৮।১৮ শ্লোক—

"প্রণম্য শিরসা দেবমীশানং বরদং প্রভুম্।
কৃষ্ণং চ মনসা কৃত্বা জগৃহে চার্জুনো ধনুঃ।"

মহাভারত যুগে শিবপূজা প্রচলিত হয় নাই, সেটি বৈদিক দেবতার যুগ, এবং লক্ষবেধ কালে পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণের পরিচয় হয় নাই। অতএব শ্লোকটি অশুদ্ধ পাঠ যুক্ত, সংশোধক মণ্ডলীর পাঠ হল—"স তদ্ধনুং পরিক্রম্য প্রদক্ষিণমথাকরোৎ। প্রণম্য শিরসা হৃষ্টো জগৃহে চ পরন্তপঃ॥" অর্থাৎ ধনুকটিকে, লক্ষ্যবেধের যন্ত্রটিকে, আদর জানানো হয়েছে, তা স্বাভাবিক।

(৩) প্রমাণ মহাভারতে পর্বসংগ্রহে দ্যূতক্রীড়াকালের ঘটনা সম্বন্ধে ২।১৩৮-১৩৯ শ্লোক দ্বয়—

"যত্র দ্যূতার্ণবে মগ্নান্ দ্রৌপদীং নৌরিবার্ণবাৎ।
ধৃতরাষ্ট্রে' মহাপ্রজ্ঞেঃ স্নুষাং পরম দুঃখিতাং।
তারয়ামাস তাংস্তীর্ণাঞ্জ্ঞাত্বা দুর্যোধনো নৃপঃ।
পুনরেব ততো দ্যূতে সমাহ্বয়ত পাণ্ডবান্ ॥"

কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদ—"দ্যূতার্ণবে মগ্না দুঃখিতা দ্রৌপদীর ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক উদ্ধার, দ্রৌপদীকে বিপদ হইতে উত্তীর্ণা দেখিয়া দুর্যোধনের পুনর্বার পাণ্ডবদিগের সহিত দ্যূতারম্ভ।" সংশোধিত সংস্করণে শুদ্ধপাঠ "যত্র দ্যূতার্ণবে মগ্নান্ দ্রৌপদী নৌরিবার্ণবাৎ। তারয়াগাস তাংস্তীর্ণান্ জ্ঞাত্বা দুর্যোধনো নৃপঃ। পুনরেব ততো দ্যূতে সমাহ্বয়ত পাণ্ডবান্।" (২।১৩৮ শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তি বাদ, প্রথম পংক্তিতে "দ্রৌপদীং" স্থলে "দ্রৌপদী" পাঠ); অর্থাৎ দ্যূতক্রীড়ায় বিপন্ন পাণ্ডবদিগকে সমুদ্রে মগ্ন লোককে যেমন নৌকা উদ্ধার করে, দ্রৌপদী সেইভাবে বিপদ উত্তীর্ণ করলেন, তাদের (পাণ্ডবদিগকে) বিপদ উত্তীর্ণ দেখে দুর্যোধন রাজা পুনঃ তাদের দ্যূতক্রীড়া করতে আহ্বান করলেন। এই জন্য

পাঠের সমর্থন আছে সভাপর্বে ৭২।৩ শ্লোকে—"অপ্লবেঽম্ভসি মগ্নানামপ্রতিষ্ঠে নিমজ্জতাম্। পাঞ্চালী পাণ্ডুপুত্রানাং নৌরিব পারগাভবৎ॥" দ্রৌপদীকে ধৃতরাষ্ট্রের বরদানের পরে কর্ণের এটি কথা—"পাণ্ডবগণ দুস্তর প্লাবনে নিমগ্ন হইতেছিলেন, পাঞ্চালী তরণী হইয়া তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিলেন" (কা স. ৭০ অধ্যায়।)

এইভাবে বহু শ্লোকের শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করাতে সংশোধিত সংস্করণ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছে। সংশোধিত সংস্করণের প্রথম খণ্ড সমগ্র আদিপর্বে, ডঃ সুকৃথংকর কর্তৃক সংকলিত হয়ে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ মহাভারত ২২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়েছে, শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে। ডঃ সুকথংকর সংশোধক মণ্ডলীর কার্যারম্ভকাল থেকে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অধ্যক্ষতা করেন। তারপরে ডঃ শ্রীপদকৃষ্ণ বংভেলকর অধ্যক্ষপদে বৃত হন। তিনি শেষের কয়েকটি পর্বের সংশোধিত সংস্করণ সংকলন করেন। শেষ খণ্ড প্রকাশের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপরে আর বিশেষ কাজ হয় নাই। হরিবংশের সংশোধিত পাঠ নির্ণয় করা হয় নাই।

এবার প্রতি পর্বে সংশোধক মণ্ডলী কি বর্জন বা পরিবর্তন করেছেন, সংক্ষেপে তার আলোচনা করা প্রয়োজন।

২. সংশোধিত রূপ—আদিপর্ব

সংগৃহীত পুঁথি সমূহ সমীক্ষণ করে আদিপর্বের সংশোধিত রূপ সংকলন করেছেন ডঃ সুকৃথংকর। প্রমাণ মহাভারতে আদিপর্বে ২৩৪ অধ্যায় ৮৩৭৩ শ্লোক আছে। সংশোধিত আদিপর্বে ২২৫ অধ্যায় ৭১৯৭ শ্লোক আছে। অর্থাৎ ১১৭৬ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বাদের মধ্যে পড়েছে (১) প্রথম অধ্যায়ের ৫৫[২]-৯৩ শ্লোক, অর্থাৎ ব্রহ্মার ব্যাসের নিকট আগমন, ব্রহ্মার উপদেশে ব্যাসের গণেশকে স্মরণ ও গণেশ কর্তৃক ব্যাসকথিত মহাভারতের প্রতিলিখন; হরিদাস দেবশর্মাও এই শ্লোকগুলি তাঁর সম্পাদিত মহাভারত থেকে বাদ দিয়েছেন, কারণ বাংলা প্রামাণ্য মহাভারত পুঁথিসমূহে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ নাই, এটি পশ্চিম ভারতে গণেশ উপাসক সম্প্রদায়ের কোন কবির রচনা। সংশোধক মণ্ডলীর মতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস বা কোন অন্য এক কবি সমগ্র মহাভারত বা

মূল ভারত কথা ঘটনার প্রায় সমকালে রচনা করেন নাই, পাণ্ডবগণ, ধার্তরাষ্ট্রগণ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, সেগুলি ঘটনার কয়েক শতাব্দী পরে, হয়তো গৌতম বুদ্ধের জন্মের পরে কোন কবি সংগ্রহ করে ভারতকথা সংকলন করেন, কালে তার উপর বহু যোজনা হয়েছে। (২) আস্তীক অনুপর্ব হতে ২২ অধ্যায় (কদ্রু-বিনতার সমুদ্র অতিক্রমণ) ও ২৪ অধ্যায় (গরুড ভ্রাতা অরুনের সূর্য-সারথিরূপে নিয়োগ) সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে; আস্তীক অনুপর্বে আস্তীকের জন্মকথা বলতে বহু পৌরাণিক কথা যোজিত হয়েছে; সংশোধক মণ্ডলী সে সব বাদ না দিয়ে সংক্ষেপ করেছেন। (৩) ১১৬ অধ্যায়, যাতে ধৃতরাষ্ট্র কন্যা দুঃশলার জন্ম কথা পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে, দুঃশলার জন্মকথা ১১৫ অধ্যায়েই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের জন্ম কথার সঙ্গে বলা হয়েছে। (৪) ১২৮ অধ্যায়ের ৩৪-৪৯ ও ৬০-৭২ শ্লোক, এবং ১২৯ অধ্যায়ের ১-৩৪ শ্লোক বাদ হয়েছে। এই দুটি অধ্যায়ে শিক্ষাকালে দুর্যোধনাদি ভীমের প্রতি বিদ্বেষ হেতু তাকে তিনবার মেরে ফেলতে চেষ্টা করেছিল, যে কথা ভারত সূত্রে অর্থাৎ ৬১ অধ্যায়ে আছে, তাকে রূপকথায় পরিণত করা হয়েছিল, সংশোধক মণ্ডলী নানা দেশীয় পুঁথি সমীক্ষণ করে এই দুটি অধ্যায়ের উপরি উক্ত শ্লোক সমূহ বাদ দিয়ে ও অবশিষ্ট শ্লোক কিছু কিছু পরিবর্তিত করে মূল আখ্যান ফিরিয়ে এনেছেন। এই বিষয় প্রথম খণ্ডের ৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। (৫) ১৩৭। ১,৬-৬২ শ্লোক বাদ হয়েছে। দ্রোণ পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রদের শিক্ষা শেষ হলে তাদের নিকট হতে গুরুদক্ষিণারূপে চাইলেন যে তারা দ্রুপদরাজ্য জয় করে দ্রুপদ-রাজকে বন্দী করে তাঁর কাছে এনে দেবে। প্রমাণ মহাভারতে আছে যে পাণ্ডবগণ প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রদের চেষ্টা করতে বললেন, তারা পরাজিত হলে পাণ্ডবগণ আক্রমণ করে পঞ্চালসেনাদের পরাজিত করে দ্রুপদ রাজকে বন্দী করে এনে দিলেন। এই আখ্যান বাদ দিয়ে সংশোধিত সংস্করণে বলা হয়েছে যে পাণ্ডবগণ ও ধার্তরাষ্ট্রগণ একযোগে আক্রমণ চালিয়ে পাঞ্চাল সেনা পরাজিত করে দ্রুপদরাজকে বন্দী করে এনে দিলেন। ১৩৮ অধ্যায়ে ৭৭টি শ্লোক ছিল, সংশোধিত রূপে ১৮ শ্লোকে গুরুদক্ষিণার কাহিনী শেষ করা হয়েছে। (৬) ১৩৯ অধ্যায়, যাতে যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষেকের কথা আছে, সেটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। সংশোধক মণ্ডলী বলেছেন যে এই অধ্যায়টি পরের কালের যোজনা, কাশ্মীর পুঁথি ও বহু প্রামাণ্য পুঁথিতে নাই। বারনাবতে পাণ্ডবদের নির্বাসন দেবার পূর্বে যুধিষ্ঠিরকে

যুবরাজরূপে স্থাপন করার কথার মধ্যে অসঙ্গতি আছে, ১৪১-১৪৩ অধ্যায়ে দুর্যোধন পিতার নিকটে এসে যখন পাণ্ডবদের নির্বাসন ও অগ্নিদাহে বধ করার মন্ত্রণা দিচ্ছেন তখন বলছেন যে পৌরজন যুধিষ্ঠিরকে এখন রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য সে কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছে, যুধিষ্ঠিরকে যে যুবরাজ করা হয়ে গেছে সে কথা দুর্যোধন বা ধৃতরাষ্ট্র কেহই বলেন নাই। বরং ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মন্ত্রণা শুনে বলেছেন যে তিনিও পাণ্ডবদের নির্বাসন দিয়ে দুর্যোধনের পথ নিষ্কণ্টক করার কথা ভেবেছেন। অতএব যদিও ডঃ সুকথংকর অসঙ্গতি দূর করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর সংকলন করেন নাই, এই অধ্যায়টি বাদ দেওয়াতে একটি অসঙ্গতিও দূর হয়েছে। (৭) ১৪০ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। এই অধ্যায়ে আছে যে কণিক নামক তাঁর এক মন্ত্রীকে, ডেকে আপদ ধর্ম, রাজার বিপদ উপস্থিত হলে যে কূটনীতি অবলম্বন করা যায়, তাই শুনছেন। সংশোধক মণ্ডলীর মতে এটিও আধুনিক কালের, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীর পরের যোজনা। কণিক নীতি শান্তিপর্বে আপদ ধর্ম বিবৃতির মধ্যে ১৪০ অধ্যায়ে আছে, সেখান থেকে সামান্য পরিবর্তন করে কোন কবি বা পুঁথিলেখক আদিপর্বে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তা বাদ দিয়ে হয়েছে, সেই সঙ্গে ১৪১।১-১৯ এবং ১৪২।১-৪ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ তাতে কণিকের উপদেশের উল্লেখ আছে। (৮) ১৮৭-১৮৮ অধ্যায় স্বয়ম্বর পর্ব। ১৮৭ অধ্যায় হতে ১৫ শ্লোকের শেষার্দ্ধ, ১৬, ১৭, ১৯ শ্লোকের শেষার্দ্ধ এবং ২২-২৮ শ্লোক ডঃ সুকথংকর বাদ দিয়েছেন। ২২-৫৮ শ্লোকে আছে যে অন্য রাজগণ যখন ধনুকে জ্যারোপণ করতেই পারলেন না, তখন কর্ণ উঠে সহজেই জ্যারোপণ করলেন, তিনি লক্ষ্যবেধ করতে উদ্যত হলে দ্রৌপদী বলে উঠলেন, আমি সূতকে বরণ করব না, তা শুনে কর্ণ ধনুকটি জ্যামুক্ত করে ফেলে বসে পড়লেন। এই আখ্যান বহু প্রচলিত, রমেশ চন্দ্র দত্ত তাঁর ইংরেজী কবিতায় লেখা মহাভারতের সংক্ষিপ্তসারেও সে আখ্যান বর্ণনা করেছেন, তা স্বীকার করেও ডঃ সুকথংকর বলেছেন যে এই কাহিনী কাশ্মীরের পুঁথিতে, ভারত মঞ্জরীতে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের অনেক পুঁথিতে নাই; অতএব এই আখ্যান বর্জনীয়; এবং দ্রৌপদী লক্ষ্যবেধকারী ব্রাহ্মণ বেশীর সঙ্গে তার কুটিরে চলে গেলেন, লক্ষ্য বেধকারীকে স্মিতমুখে আনন্দিত মনে মাল্য দিয়ে বরণ করার পরেও পঞ্চ ভ্রাতার সঙ্গে বিবাহে কোন আপত্তি তুললেন না, যদিও তাঁর পিতা ও ভ্রাতা আপত্তি করেছিলেন; তার থেকে অনুমান করা চলে যে দ্রৌপদী

জানতেন যে তিনি বীর্যশুল্কা, যে বীর্যের পরীক্ষায় জয়ী হবে, তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে, তাঁর নিজের কোন স্বাধীন মত নাই, কর্ণ স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রিত রাজগণের মধ্যে ছিলেন, সে ক্ষেত্রে দ্রৌপদী কর্ণকে সূত বলে প্রত্যাখ্যান করবেন তা সম্ভবপর নয়। লক্ষ্যবেধকারী ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনকে দেখে দ্রৌপদীর কুমারী মনে যে প্রেম সঞ্চারিত হয়েছিল, পঞ্চভ্রাতার স্ত্রী হয়েও সেই প্রেম সম্পূর্ণ তিনি ভুলতে পারেন নাই, তাই অবশেষে অর্জুনের প্রতি অধিক প্রেমের জন্য তাঁর পতন হ'ল। ১৮৮।১৮ শ্লোক, যাতে অর্জুনের লক্ষ্যবেধের জন্য ধনু গ্রহণ বর্ণিত হয়েছেন, সেই শ্লোকের সংশোধনের কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। (৯) খাণ্ডবদাহ পর্বে ২২৩।১২-৮৩ এবং ২২৪।১-১৩[১] শ্লোক, অর্থাৎ ব্রাহ্মণবেশী অগ্নিদেবের শ্বেতকি রাজার কৃত যজ্ঞে ক্রমাগত হবি ভক্ষণের ফলে অরুচি হওয়ার কথা, বাদ দেওয়া হয়েছে, তা কাশ্মীর পুঁথিতে নাই, কিন্তু অগ্নিদেবের ব্রাহ্মণ বেশে এসে অর্জুন ও কৃষ্ণের নিকট খাণ্ডববন দাহের প্রার্থনার কথা রাখা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্তন আর বিশেষ কিছু এই পর্বে না থাকলেও সমীক্ষণের ফলে সংশোধিত পর্বের রূপ সম্বন্ধে আরো কিছু বলা প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়, অর্থাৎ অনুক্রমনিকাধ্যায়ে, মহাভারতের সারমর্মে ১৫০টি শ্লোকে আছে, এই কথা বলা হয়েছে (১।১০৫[২]-১০৬[৩])।[১] প্রমাণ মহাভারতে অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ২৭৫টি শ্লোক আছে, সংশোধিক সংস্করণ ৫৫টি বাদ দিয়ে ২২০ শ্লোক করা হয়েছে। তার মধ্যে ১৫০ শ্লোকে ভারতকথার সারমর্ম পাওয়া যায় না। প্রমাণ মহাভারতের ৯৪-১০১[১], ১০২-১০৫[১], ১১০-১৩২, ১৩৪-১৫২ ১৫৭, ১৫৯-১৬৩, ১৬৬-১৬৮, ১৭০-১৭৪, ১৭৬-১৮২, ১৮৪-২১৭ শ্লোকে সারমর্ম এক রকম ভাবে বর্ণিত বলা চলে, তাতে মোট ১০৫ শ্লোক হয়। যা হোক, ধৃতরাষ্ট্র মুখে বসানো বিলাপরূপে উপজাতি ছন্দে যে সারমর্ম তার মধ্যে সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন ১৫৩-৬ (জতুগৃহ হতে পাণ্ডবগণের মুক্তি, কৃষ্ণাপ্রাপ্তি, জরাসন্ধ বধ, দিগ্বিজয়), ১৫৮ (দ্রৌপদী নিগ্রহকালে বস্ত্ররাশির আবির্ভাব), ১৬৪ (অর্জুন কর্তৃক কালকেয় ও পৌলোমাদের বধ), ১৬৫ (অসুর বধ করে অর্জুনের প্রত্যাগমন), ১৬৯ (অজ্ঞাতবাস কালে পাণ্ডবগণের সন্ধান লাভে

১। ততো হধ্যর্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবান্ ঋষিঃ। অনুক্রমনিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্বণাম্॥

অসামর্থ্য), ১০৫ (কৃষ্ণের সন্ধিস্থাপন চেষ্টার নিষ্ফলতা), ১৮৩ (ভীষ্ম কর্তৃক স্বীয় বধের উপায় কথন) এই কটি শ্লোক বোধ হয় তাঁরা এখানে অনাবশ্যক মনে করেছেন, মহাভারত কাহিনীর সংশোধিত রূপে এই বৃত্তান্তগুলি বাদ দেওয়া হয় নাই। ২ অধ্যায়, অর্থাৎ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে প্রমাণ সংস্করণের ৩৯৬ শ্লোক কমিয়ে ২৪৩ করা হয়েছে, অর্থাৎ ১৫৩টি বাদ দেওয়া হয়েছে। সেগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক, মোটের উপর বলা যায় যে প্রতি পর্বের বিবর বর্ণনা যা ছিল, তার থেকে আরো সংক্ষিপ্ত রূপে বলা হয়েছে। কোন কোন বিষয়ের কথা পর্বসংগ্রহ থেকে বাদ দিলেও সংশোধিত সংস্করণে বৃত্তান্তটি বাদ দেওয়া হয় নাই, ডঃ সুকথংকরের মতে পর্বসংগ্রহে উল্লেখ আছে কিনা, বৃত্তান্তটির মৌলিকতা বিচারে তার বিশেষ মূল্য নাই। অন্যান্য অধ্যায়গুলিতে মধ্যে মধ্যে শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে, কোন কোন অধ্যায়ের আবার সমস্ত শ্লোকই গৃহীত হয়েছে, তবে শ্লোকের ভাষা শুদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে। ৬১ অধ্যায়ের নাম ভারতসূত্র, সেটিতে মহাভারত কাহিনী সংক্ষেপে অনৈসর্গিকতা বাদ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। প্রমাণ সংস্করণে সে অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোক ছিল, সংশোধিত সংস্করণে ৪৩ শ্লোক—প্রমাণ সংস্করণের ৯নং শ্লোক বাদ হয়েছে, এবং ১৮-৩০নং শ্লোকের স্থলে পাঁচটি নূতন শ্লোক বসানো হয়েছে, যা ১৮-৩০ শ্লোকের সারমর্ম বলা যায়। এই ভারতসূত্র অধ্যায়ের বিবরণ থেকে কি কি উপাখ্যান পরে যোজিত হয়েছে তা কিছুটা অনুমান করা যায়।

অংশাবতরণের কথা অনৈসর্গিক হলেও সংশোধকমণ্ডলী তা বাদ দেন নাই, তবে সংক্ষেপ করেছেন; যথা ৬২ অধ্যায়ে ৫৩টি শ্লোক স্থলে ৩০টি শ্লোক করেছেন, ৬৩ অধ্যায়ে শ্লোক সংখ্যা ১২৭ থেকে ১০৬ করেছেন, ৬৭ অধ্যায়ে ১৬৪ শ্লোক স্থলে ১০২ শ্লোক নিয়েছেন। তবে তাতে প্রচলিত কাহিনীর কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, অনাবশ্যক বর্ণনা ও পুনরুক্তি বাদ হয়েছে। যথা ৬৭ অধ্যায়ের ১২৯-১৪৭ শ্লোকে কথিত কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত বাদ হয়েছে, কারণ সেই বৃত্তান্ত আবার ১১৯ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে; ৬৭/৯২-১১০ শ্লোকে কথিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ তা আবার ১১৭ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে। এরূপ উদাহরণ আরো দেওয়া যায়।

অন্যান্য অধ্যায় সংশোধনের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। মধ্যে মধ্যে অধ্যায় ও শ্লোক বিন্যাসের পরিবর্তন করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রমাণ সংস্করণের একটি

অধ্যায়কে ভাগ করে দুটি অধ্যায় করা হয়েছে, বা প্রমাণ সংস্করণের দুটি অধ্যায় যুক্ত করে একটি করা হয়েছে, তবে তাতে আখ্যানের পরিবর্তন হয় নাই।

৩. সভাপর্ব

সভাপর্বের সংগৃহীত পুঁথিসকল সমীক্ষণ করে সংশোধিত পাঠ প্রস্তুত করেছেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রাঙ্কলিন এজার্টন (Franklin Edgerton)। তিনি ডঃ সুকথংকরের কৃত পুঁথির পাঠ সংশোধন নিয়মাবলী মেনে নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি অসঙ্গতির উল্লেখ করেছেন, যথা ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক দ্যূতক্রীড়ার আয়োজনের আদেশ দান সম্বন্ধে দুইবার দুইভাবে বর্ণনা আছে: একবার আছে যে বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ না করেই ধৃতরাষ্ট্র দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন করে যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করতে আদেশ দিলেন (৪৯ অধ্যায়), আর একবার আছে যে বিদুরের মত শুনেও দুর্যোধনের কথায় তা অগ্রাহ্য করে সেই আদেশ দিলেন (৫০-৫৬ অধ্যায়); কিন্তু প্রামাণ্য পুঁথিসমূহে দুটি বিবরণই থাকায় তিনি কোনটি বাদ দিতে পারেন নাই। অন্যান্য সম্পাদকের মত নানাদেশীয় পুঁথি সমীক্ষণ করে ডঃ এজার্টনও প্রমাণ সংস্করণের শ্লোক ও অধ্যায় বিন্যাসের কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। প্রমাণ সংস্করণে সভাপর্বে ৮১ অধ্যায়, ২৭২২ শ্লোক; সংশোধিত সংস্করণে ৭২ অধ্যায়, ২৩৯০ শ্লোক আছে, অর্থাৎ ৩৩২টি শ্লোক বর্জিত হয়েছে। প্রমাণ সংস্করণের ৪৬-অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে, তাতে ছিল রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্তির পরে ব্যাস সশিষ্য যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন যে পরবর্তী ত্রয়োদশ বৎসর অমঙ্গল পূর্ণ হবে। মহাভারতে বহুস্থলে ব্যাসের অকস্মাৎ আগমন করে কিছু কথা বলে আবার চলে যাবার কথা বলা হয়েছে, এবং প্রায় সর্বত্রই তা অবাস্তব ও বর্জনীয় মনে হয়, সংশোধক মণ্ডলীও প্রায়ই তা বাদ দিয়েছেন। রাজসূয় যজ্ঞের পরে অবশ্য তাঁর উপস্থিতি আকস্মিক নয়, রাজসূয় যজ্ঞকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আর কোন অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হয় নাই, সংশোধিত সংস্করণে অধ্যায় সংখ্যা আরো কম হবার কারণ এই যে প্রমাণ সংস্করণের ১১ ও ১২ অধ্যায়, ১৮ ও ১৯ অধ্যায়, ২৫ ও ২৬ অধ্যায়, ৫৪ ও ৫৫ অধ্যায়, ৫৯ ও ৬০ অধ্যায়, ৬৯ ও ৭০ অধ্যায়, এবং ৭৪ ও ৭৫ অধ্যায়দ্বয় যুক্ত করে এক একটি অধ্যায়ে পরিণত করা হয়েছে। অনেক অধ্যায় হতে কিছু কিছু শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাদ হ'ল প্রমাণ সংস্করণের ৬৮/৪১-৪৬ শ্লোক, তাতে আছে যে পরিধেয় বস্ত্র আকর্ষণ করলে দ্রৌপদী

কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন, কৃষ্ণ অদৃশ্যভাবে এসে বস্ত্র অন্তহীন করে দিলেন। কিন্তু ধর্মের প্রভাবে বস্ত্র অন্তহীন হল, দুঃশাসন টেনে টেনে শেষ করতে না পেরে বসে পড়ল, সে অংশ বাদ হয় নাই। ডঃ এজার্টনের মতে ধর্মের প্রভাবে সতী নারীর মানরক্ষা হল, তাই মহাভারতের মূল কল্পনা ছিল, ভারতমঞ্জরীতেও কাহিনী সেইভাবে বলা হয়েছে। ধর্মের প্রভাবে অন্তহীন বস্ত্রের আবির্ভাব বাস্তব সংসারে সম্ভব কিনা, সেদিক থেকে সম্পাদক মণ্ডলী বিচার করেন নাই; অসঙ্গতি বা অনৈসর্গিকতা দূর করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, তাঁদের উদ্দেশ্য প্রাচীনতম সাধারণ পাঠ নির্ণয়। অন্য শ্লোক বর্জনের মধ্যে উল্লেখ করা যায় ১০ অধ্যায় (কুবেরের সভাবর্ণন) থেকে ২১-৩৯ শ্লোক, ১১ অধ্যায় (ব্রহ্মার সভাবর্ণন) থেকে এগারটি শ্লোক, ৩১ অধ্যায় (সহদেবের দিগ্বিজয় বর্ণন) থেকে ২৩টি শ্লোক, ৩৭ অধ্যায় (শিশুপালের ভাষণ) থেকে ১০-১৯ শ্লোক এবং ৭৯ অধ্যায় (পাণ্ডবগণের বনগমন কালে কুন্তীর বিলাপ) হতে ১২টি শ্লোক।

ডঃ এজার্টনও প্রয়োজন মত শ্লোকের পাঠ সংশোধন করেছেন। তবে তাঁর দুটি পাঠ সংশোধন গ্রাহ্য মনে হয় না—যথা প্রমাণ সংস্করণের ৩১/৭২ শ্লোকের প্রথম পংক্তি 'আটবীং চ পুরীং রম্যাং যবনানাং পুরং তথা' স্থলে তিনি 'আটবীংচ পুরীং রোমাং যবনানাং পুরং তথা' পাঠ নিয়ে বলেছেন যে এই শ্লোকে রোমনগরীর উল্লেখ আছে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে রোমনগরী স্থাপিত হয় নাই। এবং প্রমাণ সংস্করণে ৬৭/১৮-২০ শ্লোকে আছে, যে দ্রৌপদী প্রতিকামীকে দ্বিতীয়বার ফেরত পাঠালে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে আর একজন দূত মুখে বলে পাঠালেন, তুমি যেমন অবস্থায় আছ, সভায় এসে শ্বশুরের সম্মুখে দাঁড়াও, তোমার অবস্থা দেখলে সভাসদগণ দুর্যোধনকে নিন্দা করবে। সম্পাদক ১৯ শ্লোকের পদ "শ্বশুরস্যাগ্রতো ভব" স্থলে "শ্বশুরস্যাগ্রতোঽভবৎ" করে বলেছেন যে কয়েকটি প্রামাণ্য পুঁথিতে এই পাঠ আছে, তা যদিও মূল কাহিনীর সঙ্গে মেলে না, তবু তা একটি পৃথক কিংবদন্তীর পরিচায়ক, এবং তা বাদ দেওয়া চলে না। কিন্তু মনে হয় না যে পুঁথিকারগণ এমন জাজ্বল্যমান অসঙ্গতি রাখবেন, এখানে "অভবৎ" পাঠ নকলের প্রমাদ ধরতে হবে; তার থেকে বরং প্রমাণ সংস্করণের পাঠ শ্রেয়ঃ, যুধিষ্ঠির আসতে বলে পাঠালেন, কিন্তু দ্রৌপদী সে ডাকে এলেন না। এলেন না তা প্রমাণ হয় ৬৭ ২৮ শ্লোক থেকে, দুর্যোধন প্রতিকামীকে আবার আদেশ দিলেন, দ্রৌপদীকে সভায় এসে তাঁর প্রশ্ন করতে বল; প্রতিকামীর দ্বিধাভাব দেখে দুঃশাসনকে আদেশ

দিলেন, তুমি নিজে গিয়ে দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে এস, দুঃশাসন দ্রৌপদীকে চুল ধরে সভায় টেনে নিয়ে এল। নানা পুঁথিতে নানা পাঠ থাকায় ৬৭/১৮-২০ শ্লোক তিনটি বর্জন করাই সঙ্গত, ৬৭/২১-২২ শ্লোকদ্বয় সংশোধক মণ্ডলীই বাদ দিয়েছেন। ৬৭/১৭ শ্লোকের পরে ৬৭/২৩ শ্লোক পাঠ করলেই সদর্থ হয়।

৪. বন পর্ব

বনপর্বের সংশোধিত পাঠ সংকলন করেছেন ডঃ সুকথংকর। বনপর্ব মহাভারতে দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব, প্রমাণ সংস্করণে বনপর্বে ৩১৫ অধ্যায়, ১১৮৫৯ শ্লোক আছে। সংশোধিত সংস্করণে ২৯৯ অধ্যায়, ১০৩৫৫ শ্লোক আছে, অর্থাৎ মোট ১৫০৪ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে। আদিপর্ব সংশোধন কালে যেমন, বনপর্ব সংশোধনকালে তেমন, ডঃ সুকথংকর কাশ্মীরের শারদা লিপিতে লেখা পুঁথিকে বেশী প্রামাণ্য ধরেছেন, এবং ভারতমঞ্জরীর সারসর্গের উপর দশম একাদশ শতাব্দীর পরে যোজনা নির্ণয়ে অনেকটা নির্ভর করেছেন। নানা দেশের পুঁথি তুলনা করে তিনি তিনটি উপাখ্যান আধুনিক কালের (অর্থাৎ দশম একাদশ শতাব্দীর পরের) যোজনা বলে বর্জন করেছেন—(১) অর্জুনের প্রতি উর্বশীর অভিসার ও অভিশাপ দান (৪৫-৪৬ অধ্যায় ১৭৯ শ্লোক), (২) কর্ণের দিগ্বিজয় কাহিনী (২৫৩।১৯ হতে ২৫৪ অধ্যায়ের শেষ=৪৭ শ্লোক), (৩) দুর্বাসার পাণ্ডবগণের নিকট সশিষ্য আতিথ্য গ্রহণার্থ আগমন এবং দ্রৌপদীর কৃষ্ণস্মরণে বিপদ হতে উদ্ধার (২৬২-২৬৩ অধ্যায়=৭৭ শ্লোক)। তদ্ভিন্ন আরো নয়টি অধ্যায় উত্তর ভারতের পুঁথিকারদের যোজনা বলে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন, সেগুলি হল: (১) ১৪২ অধ্যায় (৬৩ শ্লোক, তীর্থ যাত্রাকালে পাণ্ডবগণের মন্দর পর্বতে গমন এবং লোমশ ঋষির নিকট বিষ্ণুর বরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধার কাহিনী শ্রবণ), (২) ১৫৬ অধ্যায় (২১ শ্লোক—সৌগন্ধিক হ্রদ হতে পাণ্ডবগণের নরনারায়ণাশ্রমে আগমন), (৩-৮) ১৯৩-১৯৮ অধ্যায় (১১৯ অনুচ্ছেদ ও শ্লোক, মার্কণ্ডেয় সমাস্যায় মণ্ডুকরাজ কন্যার কথার পরে ছয়টি গদ্য পদ্যে মিশ্রিত সন্দর্ভ; ১৯৩—দীর্ঘজীবী বক ও ইন্দ্রের কথা; ১৯৪—সুহোত্র ও শিবি রাজদ্বয়ের মধ্যে পথ ছেড়ে দেওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব, নারদের কথায় সমাধান; ১৯৫—যযাতির প্রীত মনে গোসহস্র দান, ১৯৬—ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণকে কষাঘাত করার পরে বৃষদর্ভ রাজার তাকে সহস্র অশ্বের মূল্য দান; ১৯৭—শিবি-কপোত-

প্রশ্নে কথা ; ১৯৮—অষ্টক, প্রতর্দন, বসুমনা ও শিবি এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে নারদ কর্তৃক শিবিকে শ্রেষ্ঠ কথন ও কারণ প্রদর্শন) ; (৯) ২৩২ অধ্যায় (২১ শ্লোক কার্তিকেয়ের নানা নাম কথন)। আরো একটি অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হয়েছে—২০০ অধ্যায় (১২৯ শ্লোক দান মাহাত্ম্য)। এই অধ্যায় বাদ দিবার কারণ বিবৃত নাই, মনে হয় যে মার্কণ্ডেয় ঋষি কথিত নানা সন্দর্ভের মধ্যে দান মাহাত্ম্যের বর্ণন অসমীচীন ; দান মাহাত্ম্যের কথা শান্তিপর্বে ও অনুশাসন পর্বে বহুবার কীর্তিত হয়েছে।

এতদ্ভিন্ন সম্পাদক নানা পুঁথির পাঠ সমীক্ষণ করে পাঠ সংশোধন করেছেন, কিছু অধ্যায় ও শ্লোকের পুনর্বিন্যাস করেছেন ; কোন কোন অধ্যায় থেকে বহু শ্লোক, কোন কোন অধ্যায় থেকে অল্প কয়েকটি শ্লোক বাদ দিয়েছেন, কোন কোন অধ্যায় হতে কোন শ্লোক বাদ হয় নাই। বেশী শ্লোক বাদ হয়েছে প্রমাণ সংস্করণের ৩ অধ্যায় থেকে (যুধিষ্ঠিরের সূর্যস্তব ও স্থালী প্রাপ্তি), ৮৬ শ্লোকের অধ্যায়টিকে ভাগ করে এক অধ্যায়ে ৩৩ ও আর এক অধ্যায়ে ১০ শ্লোক নেওয়া হয়েছে, মোট ৪৩ শ্লোক বাদ হয়েছে ; ৩৯ অধ্যায় (অর্জুন ও কিরাতরূপী শিবের যুদ্ধ) থেকে ৮৪ শ্লোকের মধ্যে ২৩ শ্লোক বাদ ; ৬৫ অধ্যায় (দময়ন্তীর পিতৃগৃহাভিমুখে গমন কালে পথসঙ্গী বণিকদের উপর হস্তীযূথের আক্রমণ বর্ণন) হতে ৭৬ শ্লোক মধ্যে ৩৩ শ্লোক বাদ, ৯৯ অধ্যায় (দাশরথি রামের হস্তে পরশুরামের তেজোহানি ও বধূসর নদীতে স্নান করে পুনঃ তেজ লাভ) হতে ৭১ শ্লোক মধ্যে ৪৪ শ্লোক বাদ ; ২৭২ অধ্যায় (জয়দ্রথ বিমোক্ষণ) হতে ৮১ শ্লোক মধ্যে ৫১টি বাদ, এবং ৩১৩ অধ্যায় (যুধিষ্ঠির ও যক্ষরূপী ধর্মের কথা) হতে ১৩৩ শ্লোক মধ্যে ৫৯ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য অধ্যায় হতে শ্লোক বাদ দেওয়ার সংখ্যা দেওয়া অনাবশ্যক।

সমগ্র পর্বটিকে প্রমাণ সংস্করণে ২২টি অনুপর্বে ভাগ করা হয়েছে। বররুচি কৃত অনুপর্ব সংখ্যা ১৬টি (আদিপর্বে ২।৩৯৬ শ্লোকের নীলকণ্ঠীয় টিকা দ্রষ্টব্য)। ডঃ সুকথংকরও তাঁর সংশোধিত সংস্করণে পর্বটিকে ১৬ অনুপর্বে ভাগ করেছেন যথা আরণ্যক, কির্মীর বধ, কৈরাত, ইন্দ্রলোকাভিগমন, তীর্থযাত্রা, জটাসুর বধ, যক্ষযুদ্ধ, আজগর, মার্কণ্ডেয় সমাস্যা, দ্রৌপদী-সত্যভামা সংবাদ, ঘোষযাত্রা, মৃগস্বপ্ন, ব্রীহিদ্রৌণিক, দ্রৌপদীহরণ, কুণ্ডলাহরণ, আরণেয়। অর্জুনাভিগমন অনুপর্ব কৈরাত অনুপর্বের মধ্যে নেওয়া হয়েছে, নলোপাখ্যান ইন্দ্রলোকাভিগমন অনুপর্বের মধ্যে পড়েছে, নিবাতকবচ যুদ্ধ অনুপর্ব যক্ষযুদ্ধ অনুপর্বের মধ্যে জয়দ্রথ-

বিমোক্ষণ অনুপর্ব 'দ্রৌপদী হরণ অনুপর্বের মধ্যে, এবং রামোপাখ্যান ও পতিব্রতা মাহাত্ম্য-সাবিত্রী উপাখ্যান-অনুপর্বদ্বয়ও দ্রৌপদীহরণ অনুপর্বের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বোধহয় বররুচির সময়-খৃষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দী হতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী মধ্যে—বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একজন ছিলেন—নলদময়ন্তী কথা, নিবাতকবচ যুদ্ধ কথা, রামোপাখ্যান ও সাবিত্রী উপাখ্যান মহাভারত কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। থাকলে সেগুলিকে পৃথক অনুপর্বরূপে গণনা না করবার কারণ নাই। কিন্তু সংশোধক মণ্ডলী এই উপাখ্যান সমূহের কোনটিকেই বাদ দেন নাই।

৫ঃ বিরাট পর্ব

বিরাট পর্বের নানা পুঁথি মিলিয়ে পাঠ সংকলন করেছেন ডঃ রঘুবীর, সনাতন ধর্ম কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। প্রমাণ সংস্করণে ৭২ অধ্যায়, ২৩২৭ শ্লোক, সংশোধিত সংস্করণে ৬৭ অধ্যায়, ১৮৩৪ শ্লোক হয়েছে, অর্থাৎ মোট ৪৯৩ শ্লোক বাদ পড়েছে। এই পর্বে উল্লেখযোগ্য বর্জন হ'ল যুধিষ্ঠির কৃত দুর্গাস্তব, প্রমাণ সংস্করণের ৬ অধ্যায়। এই দুর্গাস্তব পূর্বভারতের পুঁথিতে ও পশ্চিম ভারতের কোন কোন পুঁথিতে পাওয়া যায়, কাশ্মীরের পুঁথি বা দক্ষিণ ভারতের পুঁথিতে এটি নাই। অতএব সংশোধকমণ্ডলী এটিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের যোজনা বিচার করে বাদ দিয়েছেন। আর কোন সমগ্র অধ্যায় বাদ দেওয়া হয় নাই, তবে কয়েকটি অধ্যায়ে বহু শ্লোক পরের কালের যোজনা বিচারে বাদ দেওয়া হয়েছে, এবং অধ্যায় বিন্যাস পরিবর্তিত করে ও কোন কোন অধ্যায় অন্য অধ্যায়-সহ যুক্ত করে অধ্যায় সংখ্যা আরো চারটি কম হয়েছে। দুর্গাস্তব ভিন্ন উল্লেখযোগ্য শ্লোক বর্জন আছে প্রমাণ সংস্করণের ১৩ অধ্যায় (ভীম ও জীমূতের মল্লযুদ্ধ বর্ণন) হতে ৪৯ শ্লোকের মধ্যে ১৭ টি, ১৪ অধ্যায় (দ্রৌপদীর নিকট কীচকের কুপ্রস্তাব) হতে ৫২ শ্লোকের মধ্যে ৩৯টি ; ১৯ অধ্যায় (ভীমের নিকট দ্রৌপদীর দুঃখ নিবেদন) হতে ৪৭ শ্লোকের মধ্যে ১৯টি ; ২১ অধ্যায় (ভীমের দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দান) হতে ৫১ শ্লোকের মধ্যে ১৭টি, ২২ অধ্যায় (কীচকবধ) হতে ৯৪ শ্লোক মধ্যে ২৭টি, ৩৩-৩৪ অধ্যায় (দক্ষিণ গোগ্রহ যুদ্ধে ভীমের বীরত্ব—সংশোধিত সংস্করণে একটি অধ্যায়ে পরিণত) হতে মোট ৮৮ শ্লোক মধ্যে ৩০টি ; ৪৬ অধ্যায় (উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনের উত্তরকে উৎসাহ দান) হতে ৩৩ শ্লোক মধ্যে ১৩টি, ৫৫ অধ্যায় (অর্জুন-কৃপযুদ্ধ) হতে ৬০ শ্লোক

মধ্যে ৬৭টি; ৫৭ অধ্যায় (কৃপের পরাজয়) হতে ৪৩ শ্লোক মধ্যে ১৫টি, এবং ৬১ অধ্যায় (অর্জুন দুঃশাসনাদির যুদ্ধ) হতে ৪৬ শ্লোক মধ্যে ১৮টি। অন্যান্য অধ্যায় হতেও কিছু কিছু শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে; তবে এইসব বাদ হ'ল বর্ণনা বাহুল্যের বাদ, তাতে আখ্যানের কোন পরিবর্তন হয় নাই।

৬. উদ্যোগ পর্ব

উদ্যোগ পর্বের নানা পুঁথির পাঠ বিচার করে সংশোধিত সংস্করণ সংকলন করেছেন ডঃ সুশীল কুমার দে, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন, দেশ বিভাগের পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। প্রমাণ সংস্করণে এই পর্বে ১৯৩ অধ্যায়, ৬৬১৪ শ্লোক আছে। সংশোধিত সংস্করণে করা হয়েছে ১৯৭ অধ্যায় ও ৬০৬৯ শ্লোক, মোট ৫৪৫টি শ্লোক বাদ হয়েছে। অধিকাংশ শ্লোক বর্জন করা হয়েছে প্রজাগর ও সনৎসুজাত অনুপর্ব এবং উলুকদূত অনুপর্ব থেকে। প্রজাগর ও সনৎসুজাত অনুপর্ব প্রমাণ সংস্করণের ৩৩ ৪৬ অধ্যায়, তার থেকে ৪৫ অধ্যায় পুনরুক্তি হেতু এবং অন্য প্রামাণ্য পুঁথিতে না থাকায় বর্জন করা হয়েছে, এবং এই দুই অনুপর্বের মোট ৭৯৩ শ্লোকের মধ্যে ১৩১টি বাদ হয়েছে। উলুক পর্বে প্রমাণ সংস্করণে ১৬০-১৬৪ এই পাঁচ অধ্যায়ে ৩০০ শ্লোক, তার মধ্যে ১৮১টি বাদ দেওয়া হয়েছে। বাকী সব অনুপর্ব হতে বেশী বাদ হয় নাই। ডঃ সুশীল দে বলেছেন যে ভারত মঞ্জরীতে উদ্যোগ পর্বের বিবরণ এত সংক্ষিপ্ত যে তার উপর নির্ভর করে কোন উপাখ্যান আধুনিক কালে যোজিত তা সাব্যস্ত করা যায় না। অনেক অধ্যায় ও শ্লোকের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে, অনেক অধ্যায়, বিশেষত অম্বা উপাখ্যান অনুপর্বে, দুই অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এই কারণে একটি অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া সত্ত্বেও সংশোধিত সংস্করণে এক অধ্যায় বেড়েছে।

প্রজাগর ও সনৎসুজাত অনুপর্ব ভগবদ্গীতার মত মহাভারতে সন্নিবেশিত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা, তা মূল কাহিনীর অংশ নয়। মহাভারতের মূলকাহিনী উদ্যোগ পর্বের সেনোদ্যোগ, সঞ্জয়যান, যানসন্ধি, ভগবদ্যান, সৈন্য নির্যাণ, রথাতিরথ সংখ্যান ও অম্বা উপাখ্যান অনুপর্বে, এইগুলিতে বহু অসঙ্গতি ও যোজনার লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও সংশোধক বিশেষ বাদ দেন নাই। ৫৫২১ শ্লোকের মধ্যে মাত্র ২৩৩টি বাদ দেওয়া হয়েছে।

৭ ভীষ্ম পর্ব

ভীষ্মপর্বের সংশোধিত সংস্করণ সংকলন করেছেন ডঃ শ্রীপদ কৃষ্ণ বলভেলকর। ইনি ডঃ সুকথংকরের মৃত্যুর পরে সংশোধক সমিতির অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। অনেকগুলি পর্ব তিনি সংশোধন করেছেন। মহাভারতের প্রমাণ সংস্করণে ভীষ্মপর্বে ১২২ অধ্যায়, ৫৮৬৯ শ্লোক আছে। সংশোধিত সংস্করণে ১১৭ অধ্যায় ও ৫৪০৬ শ্লোক আছে, অর্থাৎ মোট ৪৬৩ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে, উল্লেখ-যোগ্য বাদ হল প্রমাণ সংস্করণের ২৩ অধ্যায়ের দুর্গাস্তোত্র, তা শুধু পূর্ব ভারতের পুঁথিতে এবং পশ্চিম ভারতের কোন কোন পুঁথিতে আছে, কাশ্মীরের বা দক্ষিণ ভারতের পুথিতে নাই। তাই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রথম দিনের যুদ্ধ বিবরণের মধ্যে শ্বেতের ভীষ্মসহ যুদ্ধ ও মৃত্যু বিবরণ—৪৭।৪৩-৮৭ শ্লোক ও ৪৮ অধ্যায় সম্পূর্ণ—মোট ১২৯ শ্লোক পরে যোজিত বলে বাদ দেওয়া হয়েছে; সে শ্লোকগুলি সম্বন্ধে প্রমাণ সংস্করণের সম্পাদক ডঃ কিঞ্জবডেকরও মন্তব্য করেছিলেন যে তা স্পষ্টতই প্রাক্ষিপ্ত।

অবশিষ্ট অধ্যায়গুলির হতে মধ্যে মধ্যে দুটি তিনটি করে শ্লোক বাদ, মধ্যে মধ্যে অধ্যায় ও শ্লোকের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে, তবে উল্লেখযোগ্য আর কোন বাদ নাই। ভূমিকায় ডঃ বলভেলকর মন্তব্য করেছেন যে প্রমাণ সংস্করণের ১৪ অধ্যায়ে দীর্ঘ ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ, ৬৫।২৭ হতে ৬৮।২০ শ্লোকে বিবৃত বিশ্বোপাখ্যান ও বাসুদেবের মহিমাকীর্তন, এবং যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে কৃষ্ণের ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মের অভিমুখে আক্রমণার্থ গমন ও নবম দিবসে কৃষ্ণের ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মের অভিমুখে ধাবন, এর মধ্যে একটি বিবৃতি, তিনি প্রক্ষিপ্ত মনে করেন, কিন্তু বহু প্রামাণ্য পুথিতে সেগুলি সব থাকায় তিনি তা বাদ দিতে পারেন নাই। তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কর্তৃক সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দানের কথা সত্য বলে গ্রহণ করেছেন, এবং ভূমিকায় বলেছেন যে সঞ্জয় যুদ্ধে ও কৌরব শিবিরে পরামর্শ সভায় থাকতেন, আবার দিনশেষে হস্তিনাপুরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সব বর্ণনা করতেন, দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে যা দেখতেন তার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে নিতেন। এই মত সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে, এখানে আর কিছু বলবার প্রয়োজন নাই।

৮· দ্রোণ পর্ব

দ্রোণ পর্বের সংশোধনের ভার নেন ডঃ সুশীল কুমার দে, তিনি যাদবপুর থেকেই আবশ্যক পুঁথি বা পুঁথিসমূহের আলোক চিত্র নকল আনিয়ে তাঁর সমীক্ষণ কার্য শেষ করে সংশোধিত সংস্করণ প্রস্তুত করেন। মহাভারতের প্রধান সংস্করণে এই পর্বে ২০২ অধ্যায় ও ৯৬৪৪ শ্লোক আছে; সংশোধিত সংস্করণে ১৭৩ অধ্যায় ও ৮১১২ শ্লোক হয়েছে অর্থাৎ ১০৩২ শ্লোক বর্জন করা হয়েছে। সংশোধক মণ্ডলীর মতানুসারে প্রমাণ সংস্করণের ৫২-৭১ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। ৫২-৭১ অধ্যায়ে অভিমন্যুর মৃত্যুর পরে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এসে শোকার্ত যুধিষ্ঠিরকে মৃত্যুর উৎপত্তি কথা ও মৃত্যু প্রজাপতি সংবাদ, পরে পুত্র সুবর্ণষ্ঠীবীর মৃত্যুতে শোকার্ত সৃঞ্জয়রাজকে নারদ এসে যে ষোলজন রাজার কথা শুনিয়েছিলেন, ষোড়শ রাজক পর্ব, তাই শোনালেন। শান্তি পর্বে আছে যে কৃষ্ণ নারদ কথিত ষোড়শরাজ কথা যুধিষ্ঠিরকে শুনিয়ে দিলেন (শান্তি-২৯ অধ্যায়), এবং সৃঞ্জয়-স্বর্ণষ্ঠীবী কথাও শুনিয়েছিলেন (শান্তি ৩০-৩২ অধ্যায়)। দ্রষ্টব্য যে সৃঞ্জয় পুত্রের নাম শান্তিপর্বে স্বর্ণষ্ঠীবী, দ্রোণ পর্বে সুবর্ণষ্ঠীবী; এবং ষোড়শরাজ কথার মধ্যে শান্তিপর্বে যেখানে সূর্যবংশীয় সগর রাজের কথা আছে, তার স্থলে দ্রোণ পর্বে পরশুরামের কথা আছে—কিন্তু পরশুরাম রাজা ছিলেন না, ষোড়শ রাজ কথায় তার নাম অবান্তর—ভৃগুবংশের লেখক কর্তৃক ভৃগুবংশের মহিমা বাড়াবার চেষ্টার নিদর্শন। সংশোধক মণ্ডলী একমত হয়ে শান্তি পর্বের বিবরণই মূল বলেছেন, দ্রোণপর্বের বিবরণ কিছু পরিবর্তিত ও পরে যোজিত বলেছেন, তাই এই কুড়িটি অধ্যায় বাদ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা হয় নাই।

আর উল্লেখযোগ্য বর্জন আছে জয়দ্রথ বধ অধ্যায়ে, প্রমাণ সংস্করণের ১৪৬ অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ের ১৪৪ শ্লোক মধ্যে ৯৮টি বাদ দিয়ে ৪৬টি রাখা হয়েছে; কৃষ্ণ যে ঐশ্বরিক শক্তি প্রয়োগ করে সূর্যকে ঢেকে দিলেন, অন্ধকার হয়ে আসায় জয়দ্রথ কিছু অসতর্ক হলে অর্জুন জয়দ্রথ বধ করলেন, আবার কৃষ্ণ মায়ায় সূর্যের আবরণ দূর হয়ে রৌদ্র উদ্ভাসিত দিন দেখা গেল—এই অনৈসর্গিক কাহিনী পরের কালের যোজনা বিচারে বাদ হয়েছে, কাশ্মীরের পুঁথিতে ও অনেক প্রামাণ্য পুঁথিতে সেই উপাখ্যান নাই। কিন্তু কৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন জয়দ্রথের শির বাণে বাণে চালিত করে জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ের

উপর ফেললেন, বৃদ্ধক্ষত্র উঠে দাঁড়ালে জয়দ্রথের শির ভূমিতে পড়ার সঙ্গে বৃদ্ধক্ষত্রের শিরও বিদীর্ণ হয়ে গেল, সে উপাখ্যান অবিশ্বাস্য হলেও বাদ পড়ে নাই।

দ্রোণ পর্বে আরো কয়েকটি অধ্যায় সংক্ষেপিত করা হয়েছে, যথা প্রমাণ সংস্করণের ৫৩ অধ্যায় (দ্বাদশ দিবস যুদ্ধে অশ্বধ্বজাদিবর্ণন) হতে ৯৮ শ্লোক মধ্যে ২৫টি বাদ, ১৩৯ অধ্যায় (ভীম কর্ণ যুদ্ধ বিবৃতি) হতে ১২৪ শ্লোক মধ্যে ৩০টি বাদ, ১৪৩ অধ্যায় (ভূরিশ্রবা বধ) হতে ৭২ শ্লোকের মধ্যে ৩৫টি বাদ, ১৪৮ অধ্যায় (যুদ্ধভূমির অবস্থা বর্ণন) হতে ৪৮ শ্লোক মধ্যে ১৬টি বাদ, ১৪৯ অধ্যায় (জয়দ্রথ বধ শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের আনন্দ প্রকাশ) হতে ৬২ শ্লোকের মধ্যে ২৯টি বাদ, ১৫২ অধ্যায় (দুর্যোধনের প্রতি কর্ণের সান্ত্বনা বাক্য) হতে ৩৬ শ্লোক মধ্যে ১০টি বাদ, ১৫৬ অধ্যায় (ঘটোৎকচ বধ অনুপর্বে সঙ্কুল যুদ্ধ বর্ণন) হতে ১৯০ শ্লোক মধ্যে ৫৫টি বাদ, ১৫৯ অধ্যায় (সঙ্কুল যুদ্ধ মধ্যে অর্জুন হস্তে কর্ণের পরাজয়) হতে ১০০ শ্লোকের মধ্যে ১৯টি বাদ, ১৯২ অধ্যায় (দ্রোণ বধ বিবৃতি) হতে ৮৪ শ্লোক মধ্যে ১২টি বাদ—১৯২ ও ১৯৩ অধ্যায়দ্বয় সংশোধিত সংস্করণে মিলিয়ে একটি অধ্যায় করা হয়েছে; ২০০ অধ্যায় (নারায়ণাস্ত্র প্রশমনের পরে অশ্বত্থামার তীব্র যুদ্ধ বর্ণন) হতে ১৩২ শ্লোকের মধ্যে ৬২টি বাদ হয়েছে; শেষ বা ২০২ অধ্যায় ১৫৮টি শ্লোকের মধ্যে ৫৭টি বাদ। অন্যান্য অধ্যায়ে অল্প কিছু শ্লোক বাদ হয়েছে বা সব শ্লোকই গৃহীত হয়েছে, অধ্যায় ও শ্লোকের পুনর্বিন্যাস অন্যান্য পর্বের মত এই পর্বেও করা হয়েছে। এই সমস্ত শ্লোক বর্জন সত্ত্বেও জয়দ্রথ বধ অধ্যায় ছাড়া আর কোথাও আখ্যানের কোন পরিবর্তন হয় নাই। নারায়ণাস্ত্র মোক্ষণের কথা দুবার আছে—১৯৫ ও ১৯৯ অধ্যায়ে; তার প্রথমটি যোজনা মনে হয়, কিন্তু সম্পাদক সেটিকে বাদ দেন নাই। শেষ অধ্যায়টিও অবান্তর, ২০০ অধ্যায়ে কথিত অবহার ঘোষণার পরে পুনরায় যুদ্ধ বিবরণ অসঙ্গতির পরিচায়ক, এবং শিব মহিমা বর্ণনা পরের কালের যোজনা সন্দেহ নাই, তবে অনেক পুঁথিতে থাকায় সম্পাদক সে বর্ণনা রেখেছেন। ডঃ সুকথংকরের মৃত্যুর পরে ভারত মঞ্জরীতে কোন উপাখ্যান বাদ হওয়ার উপর সম্পাদকগণ বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই। ডঃ বৈদ্যকে এই বিষয়ে ব্যতিক্রম বলা যায়।

৯. কর্ণ পর্ব

কর্ণ পর্ব সংশোধন করেছেন শ্রীপরশুরাম লক্ষ্মণ বৈদ্য, পুনা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। ইনি ডঃ বলভেলকরের মৃত্যুর পরে সংশোধক মণ্ডলীর অধ্যক্ষপদে

বৃত হয়েছিলেন। ডঃ সুকথংকরের মত না হলেও ইনি ভারত মঞ্জরীর সারমর্মে কোন আখ্যান আছে, কোন আখ্যান নাই, সে কথা বিবেচনা করে শ্লোক রক্ষণ ও বর্জন করেছেন, শ্লোক বর্জন সম্বন্ধে তেমন দ্বিধা করেন নাই। প্রমাণ মহাভারতে এই পর্বে ৯৬ অধ্যায, ৫০১৪ শ্লোক আছে, সংশোধিত সংস্করণে ৬৯ অধ্যায়, ৩৮৭১ শ্লোক আছে, অর্থাৎ মোট ১১৪৩ শ্লোক বাদ হযেছে, বর্জিত শ্লোকের অনুপাত এই পর্বের সংশোধিত সংস্করণে সব পর্বের মধ্যে অধিকতম। অধ্যাপক বৈদ্য বলেছেন যে এক অধ্যাযে কথিত শ্লোক আবার অন্য অধ্যায়ে বলা, একই ঘটনা সম্বন্ধে একাধিক বার বিবৃতি এবং শ্লোক সংস্থানে ক্রমাবদ্ধতার হানিকরণ কর্ণ পর্বে বড বেশী আছে। সে দোষগুলি অন্য পর্বেও আছে, তবে অধ্যাপক বৈদ্যের মত অন্য সংশোধকগণ সেদিকে ততটা লক্ষ্য করেন নাই। অধ্যায় ও শ্লোকের পুনর্বিন্যাস, প্রমাণ সংস্করণে দুই বা ততোধিক অধ্যায়কে যুক্ত করে একটি অধ্যায় করা, বা প্রমাণ সংস্করণের একটি অধ্যায়কে ভাগ করে দুই বা ততোধিক অধ্যায় করা এই পর্বেও যথেষ্ট আছে।

প্রমাণ সংস্করণের ৭।১ ৩ শ্লোক বাদ দেওয়া হযেছে, কারণ সেই শ্লোকগুলি পুনঃ ৯।৯৩-৯৫ রূপে আছে, প্রভেদ খুব কম। প্রমাণ সংস্করণের ৮, ৯ অধ্যায়ে উক্ত দীর্ঘ ধৃতরাষ্ট্র বিলাপকে একটি অধ্যায় ভুক্ত করে ১৮টি শ্লোক বাদ হয়েছে, মোট ১২৮ শ্লোকের মধ্যে ১১০ শ্লোক রাখা হযেছে।

কর্ণাভিষেক ও প্রথম দিনের যুদ্ধ বর্ণন প্রমাণ সংস্করণে ১১-৩০ অধ্যায়ে বর্ণিত, সেগুলি থেকে বেশী শ্লোক বাদ হয নাই, তবে তার মধ্যে অধ্যাযের পুনর্বিন্যাস আছে। শল্যকে কর্ণের সারথী নিযোগ এবং কর্ণ ও শল্যের বাদানুবাদ প্রমাণ সংস্করণের ৩১-৪৬ অধ্যায়ে বর্ণিত। ৩১ অধ্যায়ের ৭৩ শ্লোক মধ্যে ১২ শ্লোক ও ৩২ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোক হতেও ১২ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে। ৩৩-৩৪ অধ্যায়ে ত্রিপুর ধ্বংস উপাখ্যান বিবৃত, যে ব্যাপারে ব্রহ্মা শিবের সারথি হতে স্বীকার করেছিলেন, এই দুটি অধ্যায যুক্ত করে মোট ২২৬ শ্লোকের মধ্যে ৬৫ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রমাণ সংস্করণের ৩৫ অধ্যায়ে ত্রিপুর উপাখ্যান বলে দুর্যোধন শল্যকে কর্ণের সারথি হতে অনুরোধ করছেন এবং শল্য সারথি হতে সম্মত হচ্ছেন, কিন্তু ৩২ অধ্যায়েই শল্যের সম্মতিদানের কথা আছে, প্রায় এক ভাষায। তাই মনে হয় যে ত্রিপুর উপাখ্যান (৩৩-৩৪ অধ্যায়) এবং ৩৫ অধ্যায় পরের কালের যোজনা। ভারতমঞ্জরীতে ত্রিপুর উপাখ্যান

থাকায় সংশোধক তা বাদ দেন নাই। ৩৫ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোক থেকে ৩৭ শ্লোক বাদ দিয়ে মাত্র ১১টি রেখেছেন। ৩৬-৪৬ অধ্যায়ে কর্ণ ও শল্যের বাদানুবাদ, তার কোন অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয় নাই তবে অনেক সংক্ষেপ করা হযেছে, এই অধ্যায় সমূহের মোট ৫২৩ শ্লোক হতে ৭২ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে।

৪৭-৬৪ অধ্যায়ে সপ্তদশ দিবসের যুদ্ধের প্রথমাংশ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলিতে বহু অসঙ্গতি ও পরিবর্তনের চিহ্ন আছে। সম্পাদক নানা পুঁথি সমীক্ষণ করে বহু শ্লোক বাদ দিয়ে সংশোধিত পাঠ ঠিক করেছেন; ৪৯ অধ্যায়ে ৯২ শ্লোকের মধ্যে ২২ শ্লোক, ৫১ অধ্যায়ে ৮১ শ্লোকের মধ্যে ২১ শ্লোক, ৫৬ অধ্যায়ে ১৪৭ শ্লোক হতে ৪৭ শ্লোক বাদ হয়েছে। ১৭ শ্লোক যুক্ত ৫৭ অধ্যায় (অশ্বত্থামার ধৃষ্টদ্যুম্ন বধ প্রতিজ্ঞা) সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে। ৫৮ অধ্যায় (পাণ্ডব-পাঞ্চাল সেনার ভাঙ্গন দেখে অর্জুনের সেদিকে গমন) হতে ৫২ শ্লোক মধ্যে ৪৩ শ্লোক বাদ হযেছে, কারণ ৫৮।৯-৩৩ শ্লোক কৃষ্ণ কর্তৃক যুদ্ধভূমি বর্ণন ১৯।২৭-৫৪ শ্লোকের পুনরুক্তি, এবং ৫৮।৩৪-৪১ শ্লোক সংশোধিত সংস্করণের ১৪ অধ্যায়ে (প্রমাণ সংস্করণের ১৯ অধ্যায়েব শোধিত পাঠে) স্থান পেয়েছে, ৫৮।১-৮, ৪২, ৪৩ শ্লোক বাদ হয়েছে। ৫৯, ৬০, ৬১ অধ্যায় (সঙ্কুল যুদ্ধ বিবরণ) থেকে যথাক্রমে ৬৭ শ্লোক মধ্যে ১০টি, ৯২ শ্লোক মধ্যে ১৪টি ও ৭৪ শ্লোকমধ্যে ১৯টি বাদ দেওয়া হয়েছে। ৬২, ৬৩ অধ্যায় (কর্ণের যুদ্ধ বিবরণ, ৩৪ + ৩৭ শ্লোক) সম্পূর্ণ পরের যোজনা বিবেচনায় বাদ দেওয়া হয়েছে। ৬৪, ৬৫ অধ্যায় (সঙ্কুল যুদ্ধ বিবরণ) একত্র যুক্ত করে মোট ৯৩ শ্লোক থেকে ২০টি বাদ দেওয়া হযেছে।

৬৬ ৭৪ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের মনান্তর এবং কৃষ্ণ কর্তৃক সত্যধর্ম ও লোকপালনীয় ধর্মের উপদেশ দিযে তাদের শান্ত করা বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়গুলি হতে কিছু কিছু শ্লোক বাদ দেওযা হয়েছে, তবে তাতে মূল কাহিনীও কৃষ্ণের উপদেশ মালার কোন হানি হয় নাই।

৭৫-৯৬ অধ্যাযে সপ্তদশ দিবসের অপরাহ্নের যুদ্ধে ভীমের হস্তে দুঃশাসনের বধ ও বুকের রক্তপানের কথা, এবং কর্ণ অর্জুনের যুদ্ধ বিবরণ আছে। তার মধ্যে সম্পাদক তিনটি অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন: ৮৬ অধ্যায় (২৩ শ্লোক, বৃষসেন বধের পরে কৃষ্ণ-অর্জুনের কথা), ৯৩ অধ্যায় (৬০ শ্লোক—কর্ণের পতনের পরে কৌরব সেনার পলায়ন কথা), এবং ৯৫ অধ্যায় (১৮ শ্লোক-অবহার ঘোষণা)। এগুলি পুনরুক্তি,

অন্যান্য অধ্যায়েই সেকথা আছে। বাকী অধ্যায়গুলির পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে, এবং অনেক শ্লোক প্রতি অধ্যায় হতে বর্জন করা হয়েছে—যথা প্রমাণ সংস্করণের ৭৬ অধ্যায়ের ৪০ শ্লোক মধ্যে ১১টি, ৭৯ অধ্যায়ের ৯৫ শ্লোক মধ্যে ২৬টি, ৮৩ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকের মধ্যে ৩৫টি, ৮৪-৮৫ অধ্যায়ের মোট ৮১ শ্লোক হতে ১০টি, ৮৭ অধ্যায়ের ১১৭ শ্লোক মধ্যে ৩৪টি, ৮৯ অধ্যায়ের ৯৭ শ্লোক হতে ৪২টি, ৯০ অধ্যায়ের ১১৬ শ্লোকের মধ্যে ৫০টি, ৯১ অধ্যায়ে ৬৭ শ্লোকের মধ্যে ৩০টি, ৯৬ অধ্যায়ের ৬৫ শ্লোক হতে ২২টি, এবং অন্যান্য অধ্যায় হতে দুটি চারটি করে। তবে কর্ণ অর্জুনের যুদ্ধ বিবরণ সংক্ষেপিত হলেও পরিবর্তিত হয় নাই; কর্ণের রথচক্র ভূমিগ্রস্ত হওয়ার কথা এবং কর্ণের অবসর প্রদানের অনুরোধের উত্তরে কৃষ্ণের কঠোর উক্তি বর্জিত হয় নাই—সেগুলি অধিকাংশ প্রামাণ্য পুঁথিতে আছে, এবং ভারত-মঞ্জরীতে আছে, তাই সম্পাদক নিজের স্বাধীন বিচার করবার অবকাশ পান নাই, ডঃ সুকথংকর কর্তৃক স্থিরীকৃত নীতি অনুসরণ করেছেন।

১০. শল্য পর্ব

শল্য পর্বের পুঁথি সমীক্ষণ করে সংশোধিত সংস্করণ প্রস্তুত করেছেন শ্রীরামচন্দ্র নারায়ণ দণ্ডেকর, পুনার সংস্কৃত কলেজের একজন অধ্যাপক। প্রমাণ সংস্করণের ৬৫ অধ্যায়, ৩৬৩৮ শ্লোক স্থলে সংশোধিত সংস্করণে আছে ৬৪ অধ্যায়, ৩২৯৮ শ্লোক; অর্থাৎ মোট ৩৪০ শ্লোক মাত্র বাদ হয়েছে। সংশোধক বলেছেন যে ভারত মঞ্জরীতে যে শল্যপর্বের সারমর্ম আছে, তাতে কয়েকটি বিশিষ্ট কথা নাই, যথা প্রমাণ সংস্করণের ৪, ৫ অধ্যায়ে কথিত কৃপ কর্তৃক দুর্যোধনের প্রতি সন্ধিস্থাপনের উপদেশ ও দুর্যোধন কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান; ৩২ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকে দুর্যোধন কর্তৃক পাণ্ডবদের এক এক জন করে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলা, এবং ৬১-৬২ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের উক্তি যে পাঁচজনের মধ্যে যার সঙ্গে দুর্যোধন যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করে, তাকে বধ করতে পারলেই দুর্যোধনের রাজ্য থাকবে; এবং সেকথা বলার জন্য কৃষ্ণের ভর্ৎসনা (৩৩/১-৭), কার্ত্তিকের জন্ম ও দেব সেনাপতিত্বে বরণের কথা এবং তারক বধ, মহিষবধ ইত্যাদি বর্ণনা (৪৪-৪৬ অধ্যায়), এবং গদা যুদ্ধকালে কৃষ্ণের ইঙ্গিতে অর্জুনের বাম ঊরুতে চপেটাঘাত করে ইঙ্গিত দান (৫৮/.-২১)। কিন্তু অধ্যাপক দণ্ডেকর এই সর্গগুলি সংশোধিত সংস্করণ হতে বাদ দেন নাই,

তিনি বলেছেন যে তাতে মহাবীর বৃত্তান্ত বর্ণন এত সংক্ষিপ্ত যে তাতে বিবৃত হয় নাই বলেই যে আখ্যানটি পরের কালের যোজনা, তা বলা যায় না। এখানে তিনি ডা. সুকথংকরের পথে চলেন নাই. ডঃ সুকথংকর ভারতবর্ষীয় বিবিধ ও শারদা লিপিতে লেখা কাশ্মীরের পুঁথির উপর বেশী নির্ভর করেছেন।

অধ্যাপক দণ্ডেকর প্রমাণ সংস্করণের ৩/৩-৬১ শ্লোক, অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায় প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন, কারণ এই অধ্যায় কর্ণপর্বের ৯০ অধ্যায়ের পুনরুক্তি, এবং প্রামাণ্য পুঁথিসমূহের অধিকাংশ পুঁথিতে এই শ্লোকগুলি নাই। ৩/১-২ শ্লোক চতুর্থ অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করে একটি অধ্যায় করা হয়েছে। তাই অধ্যায় সংখ্যা ৬৫ থেকে ৬১ হয়েছে। আর কোন অধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য বর্জন বা কোন অধ্যায়ের পুনর্বিন্যাস নাই। দুটি অধ্যায়, প্রমাণ সংস্করণ ২১ ও ৫৮, হতে ১০টি করে শ্লোক বাদ হয়েছে, অন্য অধ্যায়গুলি হতে দুই একটি শ্লোক বাদ হয়েছে বা মোটেই বাদ হয় নাই।

১১. সৌপ্তিক পর্ব ও স্ত্রীপর্ব

সৌপ্তিক পর্ব সম্পাদন করেছেন বম্বে উইলসন্ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীহরি দামোদর ভেলাংকর। তিনি প্রমাণ সংস্করণের ১৮ অধ্যায় রেখেছেন, কিন্তু শ্লোকসংখ্যা কিছু কমিয়ে ৮০৩ থেকে ৭৭২ করেছেন। কিছু উল্লেখযোগ্য বাদ নাই।

স্ত্রীপর্ব সম্পাদন করেছেন পুনা ফার্গুসন কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীবাসুদেব গোপাল পারাঞ্জপে। তিনি প্রথম অন্তপর্বের নাম "জল প্রদানিক" স্থলে "বিশোক" নাম দিয়েছেন, কারণ বিশোক নামই প্রামাণ্য পুঁথিসমূহে আছে; প্রথম অন্তপর্বে মৃতদের উদ্দেশে জলপ্রদানের কথা নাই, তা আছে তৃতীয় অন্তপর্বে। প্রমাণ সংস্করণের ৯/২-২৩ শ্লোক বর্জন করা হয়েছে, কারণ তা ২ অধ্যায়ের পুনরুক্তি ও অধিকাংশ পুঁথিতে নাই। ৯/১ শ্লোক ও ১০ অধ্যায় মিলিয়ে শোধিত সংস্করণে একটি অধ্যায় করা হয়েছে, কিন্তু ১৫ অধ্যায়কে দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। তাই সংশোধিত সংস্করণে ও প্রমাণ সংস্করণে ২৭ অধ্যায় সংখ্যার পরিবর্তন হয় নাই; মোট শ্লোক সংখ্যা ৮২৫ স্থলে ৭৩০ করা হয়েছে; ৯নং অধ্যায় ছাড়া অন্যান্য অধ্যায় হতে দু-চারটি করে অবান্তর শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে।

১২. শান্তিপর্ব

শান্তিপর্ব মহাভারতের বৃহত্তম পর্ব। প্রমাণ সংস্করণে এই পর্বে ৩৬৫ অধ্যায় ও ১৩৭৩২ শ্লোক আছে। এই পর্বের নানা পুঁথি বিচার করে সংশোধিত সংস্করণ প্রস্তুত করেছেন ডঃ শ্রীপদ কৃষ্ণ বলভেলকর। সংশোধিত সংস্করণে ৩৫৩ অধ্যায় ও ১২৮৬৮ শ্লোক আছে, অর্থাৎ শ্লোক সংখ্যা ৮৬৪ কমান হয়েছে। সম্পাদক বলেছেন যে শান্তি পর্বের সম্পূর্ণ পুঁথি অপেক্ষা খণ্ড খণ্ড পুঁথি বেশি পাওয়া যায়—প্রথম খণ্ডে যুধিষ্ঠিরের বিষাদ অপনোদন ও রাজ্যাভিষেক (প্রমাণ সংস্করণের ১-৫৮ অধ্যায়)। দ্বিতীয় খণ্ড রাজধর্ম (৫৯-১৩০ অধ্যায়), তৃতীয় খণ্ড আপদ্‌ধর্ম (১৩১-১৭৩ অধ্যায়), এবং চতুর্থ খণ্ড মোক্ষধর্ম (১৭৪-৩৬৫ অধ্যায়)। প্রথম খণ্ডে সম্পাদক ২৭ অধ্যায় (অর্জুনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের বনবাস সংকল্প সমর্থনে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রশংসা—৩১ শ্লোক) সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন; এই অধ্যায়ের শ্লোকগুলি ১২, ১৯ ও ২১ অধ্যায়ে কথিত যুক্তির পুনরুক্তি, এবং বহু পুঁথিতে অধ্যায়টি নাই। এই অধ্যায় বাদ দিয়েও প্রমাণ সংস্করণের ৩৩ অধ্যায় দুই অধ্যায়ে বিভক্ত করে প্রথম খণ্ডের অধ্যায় সংখ্যা ৫৮ই রাখা হয়েছে। ৪৭ অধ্যায় (ভীষ্ম কর্তৃক শরশয্যায় শায়িত অবস্থায় কৃষ্ণের স্তব, কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে থেকে শুনছেন) হতে ১০১ শ্লোক মধ্যে ৩২ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে, সম্পাদকের অনুমান যে ভীষ্মস্তবরাজ নামে পরিচিত এই অধ্যায়ে গ্রথিত স্তবে মূলে ৩২টি শ্লোক ছিল, উৎসাহী কবি বা সূতগণ তার সঙ্গে আরো ১৪টি যোগ করে স্তবে ৪৬টি শ্লোক করেছেন, (৩৮-৮৩ শ্লোক), পরের যোজনা হ'ল ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৫১, ৬১-৬৫, ৭২-৭৫ ও ৮১ নং শ্লোক। স্তবের আগে পরে আরো ১৮টি শ্লোক পরের যোজনা। ৪৯ অধ্যায় (কৃষ্ণ কথিত পরশুরাম চরিত) হতে ৯০ শ্লোক মধ্যে ১০টি বাদ হয়েছে, কিন্তু এই অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া উচিত ছিল মনে হয়; যুধিষ্ঠিরাদির পরশুরামের কথা আরো অনেকবার শুনেছেন, যথা বনপর্বে ১১৫-১১৭ অধ্যায় ও দ্রোণ পর্বে ৭০ অধ্যায়ে। প্রথম খণ্ডে আর কোন অধ্যায় হতে উল্লেখযোগ্য শ্লোকসংখ্যা বর্জিত হয় নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডে রাজধর্মানুশাসন প্রমাণ সংস্করণের ৫৯-১৩০ অধ্যায়। এই অধ্যায়গুলি হতে বিশেষ কিছু শ্লোক বাদ হয় নাই, তবে অধ্যায় বিভাগ পরিবর্তন করে অধ্যায় সংখ্যা দুটি কমানো হয়েছে। পাঠশুদ্ধি বহু শ্লোকে করা হয়েছে,

যথা ১২১।৫০ শ্লোক, তার শেষপদ "যঃ স্বধর্মেণ তিষ্ঠতি" স্থলে যঃ স্বধর্মে ন তিষ্ঠতি"—তাতে মানে পরিষ্কার হয়েছে।

তৃতীয় খণ্ড আপদ্ ধর্মানুশাসন প্রমাণ সংস্করণের ১৩১-১৭৩ অধ্যায়; অধ্যায়-বিভাগ পরিবর্তন করে অধ্যায় সংখ্যা ৪টি কমানো হয়েছে, অনেক অধ্যায় থেকে দুটি চারটি করে শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে উল্লেখযোগ্য শ্লোকবর্জনের কোন উদাহরণ নাই।

চতুর্থ খণ্ড মোক্ষধর্মানুশাসন, প্রমাণ সংস্করণে ১৭৪-৩৬৫ অধ্যায়। এই খণ্ডে পরের কালের যোজনা অনেক আছে। সম্পাদক এর মধ্যে চারটি অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন—২৭৭ অধ্যায় (৪৯ শ্লোক পিতা পুত্র সংবাদ—পিতার কথিত চতুরাশ্রমের দোষ দেখিয়ে পুত্রের ত্যাগ ও সন্ন্যাসের প্রশংসা) এটি ১৭৫ অধ্যায়ের প্রায় অবিকল পুনরাবৃত্তি, ২৮৪ অধ্যায় (২০৮ শ্লোক দক্ষযজ্ঞ বিবরণ ও দক্ষ কর্তৃক শিবকে বহুনামে আরাধনা করে তুষ্ট করণ)—দক্ষযজ্ঞের বিবরণ ২৮৩ অধ্যায়ে একবার দেওয়া হয়েছে, এবং শিবের অষ্টোত্তর সহস্র নামে ভজন করা হচ্ছে বলে ছয়শত নামের কয়েকটি মাত্র বেশী নাম আছে, পরে অনুশাসন পর্বে ১৭ অধ্যায়ে শিবের অষ্টোত্তর সহস্র নাম বলা হয়েছে; ১০৪ অধ্যায় (৪৬ শ্লোকে পঞ্চভূতাত্মক দেহ, জীবাত্মা ইত্যাদির কথা)—অধ্যায়টি ১৯৪, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯ অধ্যায়ে কথিত তত্ত্বসমূহের পুনরাবৃত্তি; এবং ৩২২ অধ্যায় (২০ শ্লোকে কর্মফলের অলঙ্ঘ্যতা, উপবাস, তপস্যা, প্রভৃতির ফল) এটি ১৮২ অধ্যায়ের অবিকল পুনরুক্তি। পুনরুক্তি হেতু বা উপরিলিখিত অন্যান্য কারণ বশতঃ অবশ্য সম্পাদক বাদ দেন নাই, এই অধ্যায়গুলি অনেক প্রামাণ্য পুঁথিতে না থাকায় সম্পাদক বাদ দিয়েছেন। সম্পাদক প্রমাণ সংস্করণের ১৭৭, ১৭৮ অধ্যায় যুক্ত করে একটি অধ্যায় করেছেন, তাতে ১৭৮ অধ্যায়ের শেষ ৬ শ্লোক বাদ, ২৩১ ও ২৩২ অধ্যায় যুক্ত করে একটি অধ্যায় করেছেন; ২৯৩-২৯৪ অধ্যায় দুয় যুক্ত করে একটি অধ্যায় করেছেন, আবার প্রমাণ সংস্করণের ৩৪২ অধ্যায় বিভক্ত করে সংশোধিত সংস্করণে দুইটি অধ্যায় করেছেন। এই ভাবে এই খণ্ডের অধ্যায়সংখ্যা প্রমাণ সংস্করণের অধ্যায় সংখ্যা থেকে মোট ৬টি কম হয়েছে। প্রমাণ সংস্করণের ৩৩৯ অধ্যায় থেকে ১৭টি শ্লোক এবং ৩৪৩ অধ্যায় থেকে ১১টি শ্লোক বাদ হয়েছে। আরো কয়েকটি অধ্যায় হতে দুটি তিনটি শ্লোক বাদ হয়েছে, অনেক অধ্যায় হতে কিছু বাদ হয় নাই।

আখ্যান বা তত্ত্বকথার কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। সম্পাদকের কৃত পাঠশুদ্ধির মধ্যে এই খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের, প্রমাণ সংস্করণের ১৭৪।২ শ্লোকের প্রথম পংক্তি—"সর্বত্র বিহিতো ধর্মঃ সত্যপ্রেত্য তপঃ ফলম্" স্থলে "সর্বত্র বিহিতো ধর্মঃ স্বর্গ্যঃ সত্যং পরং তপঃ।"—এটি উল্লেখযোগ্য, অর্থ হল যে সর্ব আশ্রমেই ধর্ম অর্থাৎ ধর্মপালন বা কর্তব্যপালনের ফল স্বর্গ প্রাপ্তি, এবং সত্য পালন পরম তপস্যা। ১৭৪।৩ শ্লোকের প্রথম পাদে "বিষযে" স্থলে "বিনযে" শুদ্ধ পাঠ, বিনয় শব্দের অর্থ আশ্রমবিহিত কর্তব্যকর্ম। এই অধ্যায়ের ৪-৫ শ্লোকের উল্লেখ করে সম্পাদক বলেছেন যে একথা সত্য নয় যে মোক্ষধর্মানুশাসনে মোক্ষের জন্য কেবল একান্ত বৈরাগ্য যুক্ত সন্ন্যাসের বিধান দেওয়া হয়েছে, শুক সম্প্রদায় কর্তৃক উপদিষ্ট কর্মসন্ন্যাস, জনক সম্প্রদায় কর্তৃক উপদিষ্ট কর্মযোগ এবং নারদ সম্প্রদায় উপদিষ্ট ভক্তিযোগ, এই তিন পথে মোক্ষলাভের কথা আছে। ভক্তিযোগের বিষয় "নারায়ণীয়" নামক অংশে বিবৃত হয়েছে, এর দুটি ভাগ আছে; ৩৩৪-৩৩৯ অধ্যায় ভীষ্ম কথিত, এবং ৩৪০-৩৪৮ অধ্যায় সৌতি কথিত। প্রথমভাগে আছে যে নারদ বদরিকাশ্রমে নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয়কে তপস্যা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কার তপস্যা করছেন; নারায়ণ ঋষি সর্বভূতের অন্তরাত্মা সনাতন পুরুষের কথা বললেন, নারায়ণের উপদেশ মত নারদ শ্বেতদ্বীপে গিয়ে পরমপুরুষের ভক্তগণকে প্রথমে দেখলেন ও ভক্তিভরে আরাধনা করে পরম পুরুষেরও সাক্ষাৎ পেলেন এবং তাঁর নিকট পঞ্চরাত্র ধর্মের কথা, চতুর্ব্যূহ তত্ত্ব, ইত্যাদি শুনলেন। ভারত মঞ্জরীতে শুধু নারদের শ্বেতদ্বীপে গমনের কথা ও বিষ্ণুর স্তব করে পরমপুরুষকে দেখতে পেলেন এই কথাই আছে, পঞ্চরাত্র ধর্মের কথা ও চতুর্ব্যূহ তত্ত্ব নাই। নারায়ণীয়ের দ্বিতীয় অংশে সৌতির কথিত পঞ্চরাত্র ধর্মের পরিবর্তিক বৈদিক ধর্মাশ্রিত রূপের বর্ণনা ও কিছু অবান্তর উপাখ্যান আছে। সম্পাদক নিজেই বলেছেন যে ৩৪০-৩৪৮ অধ্যায় পরের কালের যোজনা তাতে সন্দেহ নাই, ভারত মঞ্জরীতে সে অংশের কোন উল্লেখ নাই। তবু সম্পাদক অধ্যায়গুলি হতে দুচারটি করে শ্লোক বাদ দিয়ে সংশোধিত সংস্করণে রেখেছেন।

প্রমাণ সংস্করণের ৩৬ অধ্যায়ে (শান্তি পর্বের ১ম খণ্ডে) বিবৃত ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার সম্বন্ধে ও সম্পাদক তা শান্তি পর্বে অবান্তর ও আধুনিক কালের যোজনা এই মন্তব্য করেও অধ্যায়টিকে রেখেছেন। ৩৪-৩৫ অধ্যায়ে বর্ণিত নানা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বিধিও শান্তি পর্বে অবান্তর, সম্পাদক যে বিষয়ে কোন মন্তব্য না করে সে দুটিকে অন্যান্য মৌলিক অধ্যায়ের মত সংশোধন করে সংশোধিত সংস্করণে স্থান দিয়েছেন।

১৩. অনুশাসন পর্ব

অনুশাসন পর্বের সংশোধিত সংস্করণ সংকলন করেছেন ডঃ রামচন্দ্র নারায়ণ দণ্ডেকর, পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক। প্রমাণ সংস্করণে এই পর্বে ১৬৮ অধ্যায়, ৭৭০৩ শ্লোক আছে, সংশোধিত সংস্করণে ১৫৪ অধ্যায়, ৬৫৩৬ শ্লোক আছে, অর্থাৎ ১১৬৫ শ্লোক বাদ পড়েছে। ডঃ দণ্ডেকর বলেছেন যে বর্তমানকালে প্রাপ্তব্য অধিকাংশ পুঁথিতে অনুশাসন পর্বকে একটি পৃথক পর্বরূপে গণনা করা হয়েছে, কিন্তু কোন কোন পুঁথিতে অনুশাসন পর্ব শান্তিপর্বের অন্তর্গত একটি অনুপর্ব রূপে গণিত হয়েছে। অষ্টাদশ পর্ব পূর্ণ হয়েছে শল্যপর্ব হতে গদা পর্ব পৃথক করে নিয়ে। যবদ্বীপে মহাভারতের আটটি মাত্র পর্ব এপর্যন্ত পাওয়া গেছে, তার মধ্যে শান্তিপর্ব বা অনুশাসন পর্ব নাই। তবে সেখানে আদি পর্বের পর্বসংগ্রহ অধ্যায়ে অনুশাসন পর্বের নাম নাই, এবং শান্তিপর্বের অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩৩ ও ১৪,৫২৫ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশোধিত সংস্করণে পর্বসংগ্রহে শান্তিপর্বের অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যা যথাক্রমে ৩৩৭ ও ১৪,৫২৫। তার থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে—যখন মহাভারত কাহিনী ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনকারীদের দ্বারা যবদ্বীপে নীত হয়, তখন অনুশাসন পর্ব নামক পৃথকপর্ব মহাভারতে ছিল না। আল-বেরুনি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গজ্‌নির মাহমুদের সৈন্যদলের সঙ্গে ভারতবর্ষে এসে সংস্কৃত শিখে ভারতের সম্বন্ধে এক বা একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন, তিনি মহাভারতের কথা বলতে পর্বসমূহের নাম করেছেন, তার মধ্যে অনুশাসন পর্বের নাম করেন নাই। বর্তমানে শান্তিপর্বে মোটামুটি ১৪,০০০ শ্লোক এবং অনুশাসনপর্বে ৮০০০ শ্লোক আছে, এই আট হাজার শ্লোক বোধহয় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পরে, অন্ততঃ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে, মহাভারতে যোজিত হয়েছে।

অধ্যাপক দণ্ডেকর বলেছেন যে অনুশাসন পর্ব পুঁথি লেখকগণের নূতন উপাখ্যান ও সন্দর্ভ যোজনার শেষ আশ্রয় ছিল, যুধিষ্ঠিরের মুখে যে সব প্রশ্ন বসিয়ে নূতন উপাখ্যান যোজিত হয়েছে, তার অনেক প্রশ্ন দেখে মনে হয় যে যুধিষ্ঠির নিতান্ত অর্বাচীন পুরুষ ছিলেন, অথচ মহাভারতের প্রধান পর্বগুলিতে যুধিষ্ঠিরের বিচক্ষণতা ও ধর্মজ্ঞতা জাজ্বল্যমান, অনেক প্রশ্নের সঙ্গে আবার উত্তর এবং তার সমর্থক উপাখ্যানের সঙ্গতি নাই, অর্থাৎ যোজনাকারী নিতান্ত তৃতীয় স্তরের কবি ছিলেন। এই পর্বটির অধিকাংশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য, গোজাতির মূল্য ও দান মহিমা অত্যন্ত আতি-

প্রসঙ্গের সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। শিবের অষ্টোত্তর সহস্র নাম আছে ১৭ অধ্যায়ে, শিবের মহিমা ১৪-১৮ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। আবার বিষ্ণুর অষ্টোত্তর সহস্র নাম আছে ১৪৯ অধ্যায়ে, তা ছাড়া ১৩৯ অধ্যায়ে ও আরো কয়েকটি অধ্যায়ে তাঁর মহিমা কীর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ শিবের উপাসক, বিষ্ণুর উপাসক এই দুই সম্প্রদায়েরই কবিগণ অনুশাসন পর্বে যোজনা করেছেন।

যাহোক, অধিকাংশ অধুনা প্রাপ্তব্য পুঁথির উপর নির্ভর করে, এবং ডঃ সুকথংকরের নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করে সম্পাদক অনুশাসন পর্ব সম্পূর্ণ বাদ না দিয়ে পর্বটির সংশোধিত পাঠ সংকলন করেছেন। সম্পাদক বলেছেন যে উত্তরভারতীয় পুঁথি ও দক্ষিণভারতীয় পুঁথি তুলনা করে দেখা গেছে যে সর্বভারতসাধারণ অধ্যায় ও শ্লোকসমূহের উপরে উত্তর ভারতীয় পুঁথিসমূহে ১৩টি দীর্ঘ সন্দর্ভ যোজিত হয়েছে, সেগুলিতে মোট ২০০৮ পংক্তি, এবং দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিসমূহে ১৫টি দীর্ঘ সন্দর্ভ যোজিত হয়েছে, সেগুলির পংক্তি সংখ্যা মোট ৩২৬১। তা ছাড়া প্রমাণ সংস্করণের[১] ১৩১-১৪৬ অধ্যায়ের (শোধিত সংস্করণের ১২৬-১৩৪ অধ্যায়ের) ১০২৬ পংক্তি স্থলে মোটামুটি সেই উপাখ্যান ও সন্দর্ভ দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিসমূহে ৪৭০৬ পংক্তিযুক্ত শ্লোক ও অধ্যায় আছে।

সংশোধিত সংস্করণে প্রমাণ সংস্করণের ২০টি অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে: ৩২ (শিবিকপোতশ্যেন উপাখ্যান, তা বনপর্বে ১৩১ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে, ১৯৭ অধ্যায়ে পুনঃ কথিত হয়েছিল—সে অধ্যায় সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন); ১০৯ (দ্বাদশ মাসে দ্বাদশবার উপবাস সহ বিষ্ণু পূজা বিধান), ১১০ (অঙ্গ-লাবণ্য লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নক্ষত্রে চান্দ্রব্রত), ১২৫ ১২৬ (শ্রেয়ার্থী দরিদ্র ব্যক্তির দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রীতিকর অনুষ্ঠান) ১২৭-১৩৪ (বিভিন্নকালে বিভিন্ন দানের ও আচারের ফলবর্ণন), ১৩২-৬ (কোন কোন জাতির অন্ন গ্রহীতব্য), ১৩৭-১৩৮ (দানের মহিমা কথন ও দান পাত্র নির্ণয় প্রসঙ্গ), ১৪৭-১৪৮ (শিব

১। সংশোধক মণ্ডলী গণপতি কৃষ্ণাজী কর্তৃক নীলকণ্ঠের টিকা সহ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মহাভারতকে vulgate অর্থাৎ প্রমাণ সংস্করণ করেছেন। পুনা হতে কিঞ্জবডেকর কর্তৃক ১৯২৯ ৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত নীলকণ্ঠ টিকাযুক্ত মহাভারত কৃষ্ণাজীর সংস্করণ মোটামুটি অনুসরণ করায় এবং সহজলভ্য হওয়ায় এই গ্রন্থে সেটিকেই প্রমাণ সংস্করণ ধরা হয়েছে।

কথিত বাসুদেব মাহাত্ম্য), এবং ১৫০ (সাবিত্রী মন্ত্রাদি জপের ফল)। তা ছাড়া সম্পাদক ১৪নং অধ্যায় হতে ১৭৯ শ্লোক বাদ দিয়ে সেটিকে যথাক্রমে ১৯৯ ও ৫১ শ্লোক যুক্ত দুটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন; ১৪ অধ্যায় ছিল ৪২৯ শ্লোকযুক্ত মহাভারতে বৃহত্তম অধ্যায়। তার বিষয় হল উপমন্যু ঋষির নিকট শিবমন্ত্রের দীক্ষা নিয়ে কৃষ্ণের পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে শিবের আরাধন। আর কোন উল্লেখযোগ্য বর্জন নাই, কোন কোন অধ্যায় হতে অল্প কয়েকটি শ্লোক বাদ হয়েছে, কোন কোন অধ্যায়ে কোন শ্লোক বাদ হয় নাই। অধ্যায় বিভাগের সামান্য পরিবর্তন আছে। বর্জিত অধ্যায় ও শ্লোক অন্যান্য পর্বের সংস্করণের মত পাদটিকায় বা পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে।

১৪. আশ্বমেধিক পর্ব

আশ্বমেধিক পর্ব সম্পাদন করেছেন ডঃ রঘুনাথ দামোদর কার্মারকর, পুনার পরশুরাম কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ। তিনি অনুগীতা এবং উত্তঙ্ক কৃষ্ণসংবাদের মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এবং সুবর্ণ-নকুল কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতা ও মৌলিকতা সম্বন্ধেও বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ডঃ সুকথংকর প্রণীত নীতি অনুসারে এইসব সন্দর্ভ ও উপাখ্যান বহু প্রামাণ্য পুঁথিতে থাকাতে সেগুলি বর্জন করেন নাই। প্রমাণ সংস্করণে ৯২ অধ্যায়, ২৮৪৫ শ্লোক। সংশোধিত সংস্করণে কয়েকটি অধ্যায় ভাগ করায় ৯৬ অধ্যায় হয়েছে, শ্লোক সংখ্যা ২৭৫৫, অর্থাৎ ৯০ শ্লোক বাদ হয়েছে। অধিকাংশ অধ্যায় হতে অল্প কয়েকটি শ্লোক বাদ হয়েছে, উল্লেখযোগ্য বাদ কোন অধ্যায় থেকে করা হয় নাই। অনেক অধ্যায়ে কোন শ্লোকই বাদ হয় নাই।

দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথিসমূহে এই পর্বে ন্যূনাতিক ১৭০০ শ্লোক অধিক আছে—যুধিষ্ঠির অনুরোধ করায় কৃষ্ণ সবিস্তারে বৈষ্ণব বা ভাগবত ধর্মের নানা অঙ্গের বর্ণনা দিলেন। কিন্তু এই বর্ণনা কৃষ্ণ প্রচারিত চতুর্ব্যূহাত্মক পঞ্চরাত্র ধর্মের বিবরণ নয়, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে কৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে যে রূপ নিয়েছিল, যা অহির্বুধ্ন্য-সংহিতা প্রভৃতি আগমে বর্ণিত হয়েছে, তারই বিবরণ আছে। এই দক্ষিণ ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিবরণ আশ্বমেধিক পর্বের সংশোধিত সংস্করণের পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে।

১৫. আশ্রমবাসিক পর্ব

আশ্রমবাসিক পর্ব সম্পাদন করেছেন ডঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণ বলভেল্‌কর। প্রমাণ সংস্করণে এই পর্বে ৩৯ অধ্যায়, ১০৮৮ শ্লোক আছে। সংশোধিত সংস্করণে প্রমাণ সংস্করণের কয়েকটি অধ্যায় ভাগ করায় অধ্যায় সংখ্যা হয়েছে ৪৭, শ্লোকসংখ্যা মোট ১০৬২, অর্থাৎ মাত্র ২৬ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছে। ক্ষেমেন্দ্রের ভারত মঞ্জরীতে যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রের বন-গমন কালে রাজধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দান (প্রমাণ সংস্করণ, ৫-৭ অধ্যায়), ধৃতরাষ্ট্রের প্রজামণ্ডলীর প্রতি ভাষণ এবং তাঁর বা দুর্যোধনের কৃত অপরাধ মনে না রাখবার অনুরোধ ও প্রজামণ্ডলীর মুখপাত্রের উত্তর (৫-১০ অধ্যায়), কুন্তীর কর্ণ জন্মকথা বলে কর্ণকে দেখাবার জন্য ব্যাসের নিকট অনুরোধ (৩০ অধ্যায়), এবং জনমেজয় কর্তৃক তাঁর পিতাকে দেখাবার প্রার্থনা ও ব্যাস কর্তৃক সে প্রার্থনা পূরণ (৩৫ অধ্যায়)—এই বিষয়গুলির কোন উল্লেখ নাই। সম্পাদক বলেছেন যে সেগুলি প্রক্ষিপ্ত মনে করবার কারণ আছে, কিন্তু ডঃ সুকথংকর প্রবর্তিত নীতি অনুসরণ করে সম্পাদক সে সব কিছু বাদ দেন নাই।

সম্পাদক আরো বলেছেন যে পুত্রদর্শন পর্বের শেষে (৩৩ অধ্যায়ের শেষভাগে) শ্রুতি মাহাত্ম্য হতে এই পর্বের আধুনিক কালের যোজনার কথা প্রমাণ হয় ও তদ্ভিন্ন ভারত মঞ্জরীতে এই বৃত্তান্ত সম্বন্ধে শুধু আছে যে ব্যাস কুরুস্ত্রীদের স্বর্গ নদীজলে পরলোকগত রাজগণকে ও কৌরবগণকে দেখালেন,[1] সাধ্বী স্ত্রীগণ বিমানে তাদের অনুগমন করলেন। অতএব পুত্রদর্শন পর্ব বর্তমানে যে রূপ নিয়েছে—যে গঙ্গানদী থেকে মৃত বীরগণ সশরীরে উঠে এলেন, স্ত্রী-আত্মীয়-বন্ধুদের সহ রাত্রিবাস করে প্রভাতে গঙ্গানদীতে নেমে আবার মিলিয়ে গেলেন, ব্যাসের কথায় পতিলোকগামী স্ত্রীগণ নদীজলে অবগাহন করে প্রাণত্যাগ করেন—তা একাদশ শতাব্দীর পরে মহাভারতে যোজিত হয়েছে। কিন্তু বিরূপ মন্তব্য করা সত্ত্বেও সম্পাদক সব বৃত্তান্ত সংশোধিত মহাভারতে স্থান দিয়েছেন।

১। পরলোকগতান্ সর্বান্ ভূপালান্ সহ কৌরবৈঃ।
অদর্শয়ৎ কুরুস্ত্রীণাং ব্যাসঃ স্বর্গনদীজলে॥
সাধ্ব্যোঽপি তান্ অনুযযুঃ বিমানৈঃ ত্যক্তবিগ্রহাঃ।—ভারত-মঞ্জরী, ৭০৭ পৃঃ

১৬. মৌসল পর্ব

মৌসল পর্ব সম্পাদন করেছেন ডঃ বলভেল্‌কর। এই পর্বে প্রমাণ সংস্করণে ৮ অধ্যায়, ২৮০ শ্লোক, সম্পাদক প্রথম অধ্যায় বিভাগ করে দুটি অধ্যায় করেছেন ; তাই সংশোধিত সংস্করণে ৯ অধ্যায়। উল্লেখযোগ্য কোন শ্লোক বর্জন করা হয় নাই, পুঁথি মিলিয়ে মোট সাতটি মাত্র শ্লোক পরের যোজনা হিসাবে বাদ দিয়েছেন, অতএব সংশোধিত সংস্করণে শ্লোক সংখ্যা ২৭৩। অর্জুন দ্বারকা হতে ইন্দ্রপ্রস্থ যেতে পঞ্চ নদ হয়ে কেন গেলেন, পঞ্চনদ যদি পাঞ্জাব হয়, তা দ্বারকা যেতে সোজা পথে ইন্দ্রপ্রস্থে যেতে পড়ে না, সৌরাষ্ট্র হতে বর্তমান কালের রাজস্থান (সেকালে যেখানে মৎস্য, অবন্তি ইত্যাদি রাজ্য ছিল) পার হয়ে সহজে ইন্দ্রপ্রস্থে যাওয়া যায়। তিনি অনুমান করেছেন যে সৌরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বে একটি প্রদেশ পঞ্চনদ নামে প্রাচীনকালে খ্যাত ছিল, সেখানে সরস্বতী, দৃষদ্বতী, অরণা (সরস্বতীর শাখানদী), ব্যাস নদী ও লুনি নদী, এই পাঁচটি নদী কচ্ছ উপসাগরে গিয়ে পড়ত, সেই অঞ্চল আভীর অধ্যুষিত ছিল, সেখানেই আভীরগণ নারী হরণ করে। সেই অনুমান সপক্ষে সম্পাদক বনপর্বের তীর্থ যাত্রা পর্বের একাংশের উল্লেখ করেছেন (প্রমাণ সংস্করণের ৩।৮৩।১৪৫-১৫২)। সেই অনুমান সত্য কি না তা স্থির করা সম্ভব নয়।

১৭. মহাপ্রস্থানিক পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব

এই পর্বদ্বয়ও ডঃ শ্রীপদ কৃষ্ণ বলভেল্‌কর সংশোধন করেছেন। মহাপ্রস্থানিক পর্বে প্রমাণ সংস্করণে ৩টি অধ্যায়, ১১০ শ্লোক। সংশোধিত সংস্করণে ৩টি অধ্যায়, ১০৬ শ্লোক, চারটি মাত্র শ্লোক সম্পাদক বাদ দিয়েছেন।

স্বর্গারোহণ পর্বে প্রমাণ সংস্করণে ৫ অধ্যায়, ২১৫ শ্লোক ; সংশোধিত সংস্করণেও ৫ অধ্যায়, তবে শ্লোকসংখ্যা কিছু কমিয়ে ১৯৪ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায় হতেই বেশ কয়েকটি শ্লোক বাদ হয়েছে, যথা প্রমাণ সংস্করণের ৪১, ৪৪ ৪৯, ৫৪-৫৫ ইত্যাদি, সেগুলিতে শ্রুতিফলের মাহাত্ম্য বেশী বাড়িয়ে বলা হয়েছিল, এবং দ্বৈপায়ন ঋষি প্রণীত মহাভারতে প্রথমে ষাট লক্ষ শ্লোক ছিল, তার মধ্যে ৩০ লক্ষ দেবলোকে, ১৫ লক্ষ পিতৃলোকে, ১৪ লক্ষ যক্ষ লোকে ও একলক্ষ মানুষলোকে প্রচলিত রইল, এই সব অবাস্তর কথা ছিল। আদি পর্বেও সে কথা ছিল ; সেখানেও সংশোধকগণ তা বাদ দিয়েছেন।

তৃতীয় খণ্ড

মহাভারতে মূল ভারত সংহিতা, যোজনা ও প্রক্ষিপ্ত নির্বাচন

১. সংশোধিত সংস্করণের পরেও এই নির্বাচন কেন

ভাণ্ডারকর গবেষণা কেন্দ্র গঠিত সংশোধকমণ্ডলী মহাভারতের বহু পুঁথি সংগ্রহ করে সেগুলি সমীক্ষণ করে প্রাচীনতম সর্বভারতীয় পাঠ সংকলন করেছেন এবং গৃহীত শ্লোক সমূহের শুদ্ধপাঠ যথাসম্ভব নির্ণয় করেছেন। তাঁদের গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলে ভারতবর্ষের এই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আখ্যানগ্রন্থ নানাদিকে উৎকর্ষ লাভ করে পাঠকদের নিকট উপস্থিত হয়েছে। সংশোধিত পাঠে মহাভারতের কিছু অসঙ্গতি ও কিছু অনৈসর্গিকতা দূর হয়েছে। কিন্তু সংশোধকগণ তাঁদের উদ্দেশ্য স্থির করে নিয়েছিলেন যতটা সম্ভব প্রাচীন সাধারণ পাঠ উদ্ধার করা, অসঙ্গতি দূর করা তাঁদের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল না, ডঃ সুকথংকর প্রভৃতি মহাভারতের কয়েকটি ঘটনার দুই পরস্পর বিরুদ্ধ বিবৃতি আছে তা স্বীকার করেও বলেছেন যে দুটি বিবৃতিই অধিকাংশ প্রামাণ্য পুথিতে আছে, অতএব তাঁরা দুটি বিবৃতিই রাখছেন, বিচার করে একটি সঙ্গতিপূর্ণ আখ্যান স্থির করা তাঁদের লক্ষ্যের বহির্ভূত। অনৈসর্গিকতার উল্লেখই তাঁরা করেন নাই; শুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করতে কিছু অনৈসর্গিকতা আপনা হতে দূর হয়েছে।

অতএব মূল ভারতকথা কি ছিল, তার সন্ধান করতে হলে অসঙ্গতি ও অনৈসর্গিকতা দূর করতে হবে। এ সম্বন্ধে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রণীত "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থে যা বলেছিলেন, তা এখনও প্রযোজ্য। ভারতসংহিতা যখন সংকলিত হয়, তখন তাতে ২৪০০০ শ্লোক ছিল, এবং অনুক্রমনিকাধ্যায়ে তার দেড়শত শ্লোকে সারমর্ম ছিল। বর্তমান কালে প্রমাণ মহাভারতে ৮৩, ৬৬১ শ্লোক আছে, কালে বহু উপাখ্যান ও সন্দর্ভ যোজিত হওয়ায় তা হয়েছে। পুঁথিকারগণ বহু যোজনা করছিলেন দেখে কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত পর্বসংগ্রহ

নামক অধ্যায় প্রণয়ন করেন; আদি ভারতকথা বৈশম্পায়ন কথিত, পর্বসংগ্রহ উগ্রশ্রবা কর্তৃক নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষির নিকট কথিত। বঙ্কিমচন্দ্র পর্বসংগ্রহ সম্বন্ধে লিখেছিলেন—"মহাভারতে যে যে বিষয় বর্ণিত বা বিবৃত আছে, ঐ পর্বসংগ্রহে তাহার গণনা করা হইয়াছে। এখনকার গ্রন্থের সূচিপত্র বা table of contents সদৃশ। অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের গণনাভুক্ত হইয়াছে। এখন যদি দেখা যায় যে কোন একটা গুরুতর বিষয় ঐ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ভুক্ত নহে, তবে অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে যে উহা প্রক্ষিপ্ত। একটা উদাহরণ দিতেছি। আশ্বমেধিক পর্বে অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা পর্বাধ্যায় পাওয়া যায়। এই দুইটি ক্ষুদ্র বিষয় নয়, ইহাতে ছত্রিশ অধ্যায় গিয়াছে। কিন্তু পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে উহার কিছু উল্লেখ নাই, সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা সমস্তই প্রক্ষিপ্ত।"[১] ডঃ সুকথংকর পর্বসংগ্রহ অধ্যায়ের বিবৃতিতে এতটা মূল্য দেন নাই, তিনি বলেছেন যে পর্বসংগ্রহে উল্লেখ নাই বলেই যে একটি উপাখ্যান বা সন্দর্ভ আধুনিককালে প্রক্ষিপ্ত তা বলা যায় না, মহাভারত খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে যবদ্বীপে ভারতীয় উপনিবেশকারীদের সঙ্গে যায়, যবদ্বীপে প্রাপ্ত আদিপর্বেও পর্বসংগ্রহ অধ্যায়টি আছে। সে অধ্যায়টিতেও কালে নূতন শ্লোক যোগ হয়েছে, যথা যবদ্বীপের পর্বসংগ্রহে অনুশাসন পর্বের কথা নাই, কিন্তু এখন প্রমাণ সংস্করণে অনুশাসন পর্বের বিষয়সমূহ সাতটি শ্লোকে বর্ণিত পাওয়া যায়। সংশোধিত সংস্করণের সম্পাদক অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেও অধিকাংশ পুঁথিতে আছে, তাই বাদ দেন নাই। মহাভারতের পুঁথি যেগুলি পাওয়া গেছে, কোনটি তিন শতাব্দীর অধিক পুরাতন নয়, অর্থাৎ ষোড়শ সপ্তদশ অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর পুঁথির উপরই সংশোধকগণের নির্ভর করতে হয়েছে। অতএব মূল ভারতকথায় কি ছিল বা ছিল না, তার বিচারের জন্য অধুনা পর্বসংগ্রহে কোন বিষয় উল্লেখ আছে বা নাই, তাতে অবশ্যই যথেষ্ট মূল্য দিতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র আরো বলেছেন যে যদি দেখি যে কোন ঘটনা দুইবার বা ততোধিক বার বিবৃত হয়েছে, অথচ দুটি বিবরণ ভিন্ন প্রকার বা পরস্পর বিরোধী, তবে তার মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত। সংশোধকগণ বলেছেন যে দুটি ভিন্ন কিংবদন্তী সংগৃহীত হওয়ায় দুটিই

১। বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, ৪২৫ পৃঃ

লিপিবদ্ধ হয়েছে, প্রাপ্ত পুঁথিসমূহে উভয় বিবরণ থাকলে কোনটি বাদ দেওয়া যায় না, সে কথা সংশোধকগণ যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছেন, তার পক্ষে প্রযোজ্য, কিন্তু ঘটনার সত্য বিবরণ সন্ধান করার ব্যাপারে যেটি সম্ভব বা স্বাভাবিক, সেই বিবরণ গ্রহণ করে অন্যটি বর্জন করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথিত আর একটি নির্দেশ যে যাহা অতিপ্রাকৃত বা অনৈসর্গিক, তা গ্রহণ যোগ্য নয়। মহাভারতে অনৈসর্গিক বা অতিপ্রাকৃত কথা অনেক আছে। দেবতার ঔরসে নারীর গর্ভে জন্মের কথা, ঋষির অভিশাপে শুধু সাধারণ মানুষের নয়, দেবতারও অশেষ দুর্ভোগ, এই সব কথায় হয়তো এককালে লোকের বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এখন শিক্ষিত লোকে সে কাহিনী অগ্রাহ্য মনে করে। নানা রকম দৈবশক্তি সম্পন্ন অস্ত্রের কথা, আকাশ পথে বিমানে গতির কথা মহাভারতে অনেক আছে, কিন্তু তিন সহস্র বৎসর পূর্বে সে সবের বাস্তব জগতে অস্তিত্ব ছিল না, বহুকালের কল্পনা ক্রমে মানুষের সাধনায় ও জ্ঞানের ফলে বাস্তব রূপ বর্তমানকালে নিয়েছে। সুতরাং বিমান, ব্রহ্মাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, পাশুপতাস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ অনেক বিবৃতিতে থাকলেও তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না।

এই খণ্ডের নামে যোজনা ও প্রক্ষিপ্ত এই দুটি পদ ব্যবহার করা হয়েছে। যোজনা শব্দে বোঝানো হয়েছে সেই সব উপাখ্যান যা ভারতকথার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত নয়, যা সহজেই ভারত কথা থেকে পৃথক করে নেওয়া যায়, যথা নল-দময়ন্তী উপাখ্যান, যুধিষ্ঠির দ্যূতে পরাজিত হয়ে দুঃখভোগ করছেন, তাই এক ঋষি তাকে শোনালেন যে আর একজন রাজা তার চেয়ে বেশী দুঃখভোগ করেছিলেন। এই উপাখ্যান বাদ দিলে ভারত কাহিনীর কোন হানি হয় না, অপরপক্ষে মনে হয় যে মহাভারতে যুক্ত হয়েছিল বলে নল-দময়ন্তীর মত সুন্দর উপাখ্যান সহস্র সহস্র বৎসর ধরে আমরা উপভোগ করতে পেরেছি, মহাভারতে যুক্ত না হয়ে কত কাব্য কত নাটক যে চিরতরে বিস্মৃতি গর্ভে চলে গেছে, তার ইয়ত্তা নাই। প্রক্ষিপ্ত শব্দ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি এমন বিবরণ যা ভারত কাহিনীর সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত, যেমন দেবগণের ঔরসে পাণ্ডবদের জন্মকথা, অষ্ঠিলা বা শক্ত মাংসপিণ্ড হতে দুর্যোধনাদির জন্মলাভ, অগ্নিবেদী হতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণার আবির্ভাব; কিন্তু যা অতিপ্রাকৃত বা অনৈসর্গিক বলে গ্রাহ্য নয়। যে উপাখ্যান যোজনা, তা সহজেই বাদ দিয়ে পরিশিষ্টভুক্ত করা চলে, কিন্তু যা প্রক্ষিপ্ত তার স্থলে স্বাভাবিক কোন বিবরণ বসানো প্রয়োজন,

না হলে কাহিনীতে অপূর্ণতা থাকবে। প্রতি পর্বে কোন বিবরণ যোজনা বা প্রক্ষিপ্ত, কোনটি মূল ভারত কথার অঙ্গ, সেই সমস্যার এবার বিচার করতে হবে।

২. মূল ভারত সংহিতা নির্ণয় : আদিপর্ব আরম্ভ

মহাভারত পাঠ করলে দেখা যায় যে তাতে তিনটি আরম্ভ আছে; তার থেকে অনুমান করা যায় যে ক্রমবর্দ্ধমান এই গ্রন্থের তিনবার সংকলন হয়েছে। প্রথম আরম্ভ প্রথম অধ্যায় হতে, যাকে অনুক্রমণিকা পর্ব বলা হয়, নৈমিষারণ্যে শৌনকের দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সত্রে লোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবা বা সৌতি উপস্থিত হলে ঋষিরা তাঁকে ঘিরে বসেন, এবং তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্র থেকে আসছেন জেনে তাঁকে ভারত ইতিহাস, যা সেই সত্রে কথিত হয়েছিল, তাই আবৃত্তি করে শোনাতে অনুরোধ করেন। সৌতি ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ভারত-কথার সারমর্ম বল্‌লেন। দ্বিতীয় অধ্যায় পর্ব সংগ্রহ, প্রতি পর্বের বিষয়সূচির মত। তৃতীয় অধ্যায়ে কিছু অবান্তর কথা আছে, আপোদ ধৌম্যের আশ্রমের তিন শিষ্যের আশ্রম জীবনের কথা এবং উত্তঙ্ক কর্তৃক গুরুর পত্নীর জন্য পৌষ্য রাজার রাণীর নিকট হতে স্বর্ণকুণ্ডল আহরণের কথাও আছে। দ্বিতীয় আরম্ভ চতুর্থ অধ্যায়ে, সেখানে আবার আছে যে শৌনকের দ্বাদশবর্ষব্যাপী সত্রে সৌতি উপস্থিত হলে ঋষিগণ তাঁকে জনমেজয়ের সত্রে শ্রুতকথা শোনাতে অনুরোধ করলেন, সৌতি প্রশ্ন করলেন—কি-কথা আপনারা শুনতে চান, তাতে শৌনক উত্তর দিলেন, প্রথমে ভৃগুবংশের কথা বলুন। সৌতি ভৃগুবংশের কথা বল্‌তে আরম্ভ করলেন,—ভৃগুর পুত্র চ্যবন, তার পুত্র প্রমতি, প্রমতির পুত্র রুরু, রুরু প্রমদ্বরা নামে একটি সুন্দরী কন্যা বিবাহ করে, বিবাহের পরেই প্রমদ্বরা সর্পদংশনে মৃত হয়, রুরুর শোক দেখে এক দেবদূতের মাধ্যমে রুরুর অবশিষ্ট আয়ুর অর্দ্ধভাগ প্রমদ্বরাকে দিয়ে যমরাজ প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত করেন, রুরু সর্পদের উপর জাতক্রোধ হযে ডুণ্ডুভ নামক একটি সর্পকে বধ করতে গেলে সে মুনিরূপ ধারণ করে সর্পসত্রে জনমেজয় রাজা কর্তৃক সর্পনিধন ও আস্তীক-ঋষির অনুরোধে জনমেজয়ের সর্প বধ হতে বিরতির কথা শুনতে বলে। তারপরে আস্তীক পর্ব, যার মধ্যে আস্তীকের জন্ম কথা, কদ্রু ও বিনতার সপত্নী দ্বেষের কথা, গরুড, অরুণ ও সর্পকুলের জন্ম কথা, পরীক্ষিতের তক্ষক দংশনে মৃত্যু ও জনমেজয়ের সর্পসত্রের কথা আছে। তৃতীয় আরম্ভ ৫৯ অধ্যায়ে, সেখানে শৌনক বলছেন, ভৃগুবংশের বিবরণ ও অন্য কথা যা সব শোনালেন, তা ভাল লাগল, এবার সর্পসত্রে

যজ্ঞের বিরতি সময়ে যে ভারত কথা বলা হয়েছিল, তাই বলুন। এখান থেকেই প্রকৃত ভারত কথা আরম্ভ, ভারত কথা জনমেজয়ের যজ্ঞে বৈশম্পায়ন বলেছিলেন, ৬১ অধ্যায় ভারত সূত্র হতে বৈশম্পায়নের কথা আরম্ভ, অবশ্য সৌতির মুখে পুনরুক্তি হিসাবে। ৫৯ ৬০ অধ্যায় ভারত কথার ভূমিকা বলা যায়। মহাভারতে আদি পর্বের ১/৫২ শ্লোকে আর একভাবে মহাভারতের তিনটি আরম্ভের কথা আছে— "মন্বাদি ভারতং কেচিদাস্তীকাদি তথাপরে। তথোপরিচরাদ্যন্যে বিপ্রাঃ সম্যগধীয়তে॥"— অর্থাৎ কেহ কেহ মনুর কথা হতে ভারত কথা পড়তে আরম্ভ করেন (আদি পর্বের ৭৫ অধ্যায়ে বৈবস্বত মনুর কথা আছে, আদি ১/৪২-৪৩ শ্লোকেও আছে, টিকাকার 'মন্বাদি' শব্দের প্রথম অধ্যায় হতে, এই অর্থ করেছেন) কেহ কেহ আস্তীকের কথা হতে আরম্ভ করেন— ১৩ অধ্যায় হতে, কেহ কেহ উপরিচর কথা হতে আরম্ভ করেন —৬৩ অধ্যায় হতে। উপরিচর বসুর কথা হতেই ভারত-কথার প্রকৃত আরম্ভ বলা যায়—উপরিচর বসুর কন্যা কালী বা সত্যবতী, সত্যবতী-পরাশরের পুত্র কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস, তার ঔরস পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু, ৫৯-৬১ অধ্যায় তার ভূমিকারূপে গ্রহণ করা যায়।

অতএব প্রথম অধ্যায়—অনুক্রমণিকা ও দ্বিতীয় অধ্যায়—পর্বসংগ্রহ, সূচিপত্ররূপে থাকবে, প্রথম অধ্যায়ে ভারতকথার সারমর্মের এক অংশ কোন কবি ত্রিষ্টুভ্ বা উপ-জাতি ছন্দে রচনা করেছেন, (১৫০-২১৭ শ্লোক) কিন্তু তার পরে যে সঞ্জয় কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দানের কথা আছে ও অধ্যায়টির গুণগান ও শ্রুতিফল আছে সেঅংশ —অর্থাৎ ২১৮-২৭৫ শ্লোক বাদ হবে, কারণ এখানে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ মাধ্যমে ভারত-কথার সারমর্ম বলা হচ্ছে, ধৃতরাষ্ট্রের শোকের কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। প্রথম, দ্বিতীয় অধ্যায়ের সংশোধিত রূপ (প্রথম অধ্যায়ের ২১৮-২৭৫ বাদ দিয়ে) গৃহীত হবে।

তৃতীয় অধ্যায় পৌষ্য অনুপর্ব মহাভারতে অবান্তর; তবে তিন সহস্র বৎসর পূর্বে আশ্রমিক জীবন কিরূপ ছিল, তার বর্ণনা হিসাবে অধ্যায়টির মূল্য আছে; যোজনা হিসাবে পরিশিষ্টে স্থান পাবে। ৪-১২ অধ্যায় ভৃগুবংশের কথা, ভারত কথায় অবান্তর; ১৩-৫৮ অধ্যায় আস্তীক পর্ব, তাও সৌতি কথিত, বৈশম্পায়ন কথিত ভারতকথার অংশ নয়। সেগুলিও যোজনা হিসাবে বাদ হবে। ৫৯ অধ্যায়ও বাদ হবে, কারণ প্রথম অধ্যায় গৃহীত হয়েছে, তাতে ১৭-২১ শ্লোকে ভারতকথা বলতে ঋষিগণ সৌতিকে অনুরোধ করেছেন, তারপরে আবার ৫৯ অধ্যায়ে উক্ত অনুরোধ অনাবশ্যক। ৬০ অধ্যায় ভারতকথার ভূমিকারূপে থাকবে,

তবে ৩^{১} শ্লোক অনৈসর্গিক—তা বাদ হবে। ৬১ অধ্যায় ভারতসূত্র সংশোধক-মণ্ডলীর কৃত পাঠ মত গৃহীত হবে। এটি ভারত কথার অলঙ্কারহীন, অনৈসর্গিকতা দোষমুক্ত সারমর্ম, এটি মূল ভারত আখ্যান নির্ণয়ে বহু মূল্যবান। ৬২ অধ্যায়ে মহাভারতের ও মহাভারতকার ব্যাসের প্রশংসা আছে, তিন বৎসরে ব্যাস মহাভারত রচনা করলেন বলা হয়েছে। সংশোধকমণ্ডলীর মতে সেভাবে মহাভারত রচিত হয় নাই, কিছুকাল পরে নানা জনশ্রুতি সংগ্রহ করে ভারতকথা রচিত হয়েছিল; অতএব ৬২ অধ্যায় বাদ হবে। ৬৩ অধ্যায়ে রাজা উপরিচরের কথা, কিন্তু তাঁর কন্যা সত্যবতীর জন্ম কথাকে অতিপ্রাকৃতরূপ দেওয়া হয়েছে; বলা হয়েছে মৃগয়ার্থ যমুনা তীরে গিয়ে স্ত্রীকে স্মরণ করে রাজার কামের উদ্রেক হ'ল, শুক্রপাত হল; সেই শুক্র একটি বৃক্ষপত্রে ধরে একটি শুক পক্ষীকে দিলেন রাণী গিরিকার কাছে পৌঁছে দিতে, কিন্তু শুকের মুখ থেকে জলে পড়ে যাওয়ায় সেই শুক্র মৎস্যরূপী একটি অপ্সরা পান করল, সে সময়ে পুত্র কন্যা প্রসব করে শাপমুক্ত হ'ল, রাজা পুত্রটিকে নিয়ে গেলেন, তার নাম দিলেন মৎস্য, কন্যাটিকে পালনের জন্য দাস রাজার কাছে দিলেন, তার নামই কালী বা সত্যবতী। এই কাহিনীর অনৈসর্গিক অংশ স্থলে বলা যায় উপরিচর রাজার কামোদ্রেক হলে যমুনাকূলে দাসরাজবংশের এক যুবতী কন্যাকে আমন্ত্রণ করে তার সঙ্গে বিহার করলেন, তার গর্ভে যমজ পুত্র-কন্যা হলে পুত্রটিকে নিয়ে গেলেন ও কন্যাটিকে দাস রাজার কাছে পালনের জন্য দিলেন। দাস রাজা ছিলেন যমুনা নদীর খেয়া ঘাটের অধিকারী ও মৎস্যজবীদের নেতা। কথিত কথা পরিবর্তন এইভাবে করা যায়—১,২^{১}, ২৮^{২}-৩৩^{১}, ৩৯^{১}-৪৬ শ্লোক গ্রাহ্য, তার পরে ৪৭-৬০ শ্লোক বাদ দিয়ে বসবে "অদ্রিকাং ইতি বিখ্যাতাং স্বশ্রোণীং যমুনাচরীম্। স্যমন্তরত চাপ্যেনাং ব্যাহরচ্চ তয়া সহ।" তারপরে ৬১^{১} পংক্তি নিয়ে দ্বিতীয় পংক্তি স্থলে "সুষাব সাচ মিথুনং স্ত্রীং পুমাংসং সুদর্শনৌ॥" পরে ৬৩, ৬৭-৮৬, গ্রাহ্য বাকী সব শ্লোক বাদ। এইভাবে অতিপ্রাকৃত কথা বাদ দিয়ে স্বাভাবিক কথা সর্বত্রই করা যায়—কিন্তু শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ রচনা না করেই এরপর থেকে স্বাভাবিক বিবৃতির কথা বলা হবে। ৬৩/৮৭ ১১৭ শ্লোক বাদ হবে, তাতে বংশ বিবৃতির মধ্যে অংশাবতরণের অনৈসর্গিক কথা আছে।

আদিপর্বের ৬৪ অধ্যায়ে আছে যে দৈত্যদানবগণ স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিলে ভারপীড়িতা পৃথিবীদেবী ব্রহ্মার কাছে গিয়ে ভারাবতরণ প্রার্থনা করলেন; ব্রহ্মা দেবগণকে অংশাবতরণের জন্য আদেশ দিলেন, যাতে দেবগণের অংশে জন্ম নিয়ে

শক্তিশালী রাজন্যগণ দৈত্যদানব যারা দুর্ধর্ষ পুরুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মেছেন তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে; এবং বিষ্ণুকেও অংশে অবতরণ করতে সম্মত করলেন; বিষ্ণুর অংশে কৃষ্ণের জন্ম। এই কাহিনী অনৈসর্গিক; কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতাররূপে কল্পনা করা হয়েছে সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে, বেস্‌নগরে বাসুদেবের উদ্দেশ্যে গরুড়ধ্বজ খৃ. পূ: দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপিত হয়; ব্রহ্মসূত্রে অবতারবাদের কোন কথা নাই, অর্থাৎ খৃঃ পূ. পঞ্চম শতকে অবতারবাদ কল্পিত হয় নাই। সমগ্র অংশাবতরণ অনুপর্ব খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের যোজনা হিসাবে বাদ হবে, অনৈসর্গিকতার জন্য। ৬৫ ৬৬ অধ্যায়ে দক্ষকন্যাগণ হতে দেবতা, দানব, মানুষ ও অন্য সব প্রাণীর জন্মকথা, সেটি পুরাণকারদের কল্পনা, ভারত-কথায় অবান্তর, পরের কালের যোজনা হিসাবে বাদ হবে। ৬৬ অধ্যায় শেষে শ্রুতিফল আছে; কোন অধ্যায় বা উপাখ্যানের শেষে শ্রুতিফল থাকলে সেটিকে পরের কালের যোজনা অনুমান করা যায়, সে কথা আশ্রমবাসিক পর্বে পুত্রদর্শন অনুপর্ব শেষে শ্রুতিফল সম্বন্ধে ডঃ বল্‌ভেলকর বলেছেন; সে অনুমান সর্বত্র প্রযোজ্য। মহাভারতকার প্রতি পর্বশেষে তার শ্রুতিফল দিয়েছেন, কিন্তু পর্বমধ্যে কোন অধ্যায় বা উপাখ্যান শেষে শ্রুতিফল থাকলে তা মূল ভারত-কথার অংশ নয়, পরে যোজিত, সেই অনুমান সঙ্গত। অতএব ৬৫-৬৬ অধ্যায় পরের কালের যোজনা। ৬৭ অধ্যায়ে ভারতে নানা রাজন্যের দেব অংশে জন্মের কথা আছে, তার কিছু কিছু শ্লোক সংশোধক-মণ্ডলী বাদ দিয়েছেন, কিন্তু অংশাবতরণের-কথা অনৈসর্গিক, তাই সম্পূর্ণ ৬৭ অধ্যায় বাদ হবে। ৬৮/১ শ্লোক বাদ হবে, তাতে অংশাবতরণ কথার উল্লেখ আছে। ৬৮/২ শ্লোক জনমেজয় কুরুবংশের কথা জানতে চাইলেন, বৈশম্পায়ন রাজা ভরতের কথা থেকে আরম্ভ করলেন; ৬৮/২ শ্লোক থেকে ৭৪ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কথা এবং তাদের পুত্র ভরতের রাজ্যলাভের কথা, তা মোটের উপর গ্রাহ্য, ভারত কথার অন্তর্ভুক্ত, তবে ইন্দ্র কর্তৃক বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্য অপ্সরা মেনকাকে প্রেরণ ইত্যাদি-কথা অনৈসর্গিক, তাই ৭১/২০ হতে ৭২/৯ এবং ৭২/১০[২]-১০[১] শ্লোক বাদ হবে, তা হলে স্বাভাবিক হয়, অর্থাৎ দুষ্মন্তের নিকট শকুন্তলা বলছে যে কণ্বমুনি হিমালয়ের পাদদেশে মালিনী নদীর তীরে বনে শকুন্ত বা পক্ষীগণ রক্ষিত অবস্থায় তাকে পেয়ে নিয়ে গিয়ে পালন করেছেন, সে কণ্বমুনিকেই পিতা বলে

-জানে। বিশ্বামিত্রের তপস্যাকালে কোন সুন্দরী নারীর সঙ্গে বিহারের ফলে শকুন্তলার জন্ম হয়ে থাকলেও সেকথা শকুন্তলার মুখে অশোভন হয়।

৭৫ অধ্যায়ে আছে প্রাচেতস দক্ষ হতে বৈবস্বত মনুর জন্মকথা, তারপর ইলার গর্ভজাত পুরুরবা হতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি, যযাতির পুরুকে রাজ্য দান কাহিনী কিছু পৌরাণিক হলেও কথার সম্পূর্ণতার জন্য গ্রাহ্য মনে হয়, তবে যযাতি তাঁর নষ্ট যৌবন পুত্র পুরু হতে লাভ করলেন, সহস্র বৎসর পরে আবার পুরুকে যৌবন ফিরিয়ে দিলেন, তা গ্রাহ্য নয়, অতএব ৭৫।৩৭-৪৬ শ্লোক বাদ হবে। ৭৬ অধ্যায় হতে ৮৬ অধ্যায় পর্যন্ত যযাতি দেবযানী শর্মিষ্ঠার বিস্তৃত কাহিনী, তার মধ্যে কচ-দেবযানী কথাও আছে। এই বিষয়ের কথা পর্বসংগ্রহে নাই। ৮৭ অধ্যায় হতে ৯৩ অধ্যায় যযাতির স্বর্গ হতে পুণ্যক্ষয়ে পতনের কথা এবং দৌহিত্রদের নিকট হতে পুণ্য লাভ করে আবার স্বর্গে যাবার কথা আছে। এই বিষয়ের কথাও পর্বসংগ্রহে নাই, এবং এই বিবরণ সম্পূর্ণ অনৈসর্গিক। অতএব ৭৬-৯৩ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ৯৪ অধ্যায়ে জনমেজয় পুরুর পরের রাজাদের কথা জিজ্ঞাসা করছেন, তা ৭৫ অধ্যায়ে কথিত পুরুর রাজ্যলাভ কথার পরে স্বাভাবিক। অতএব ৯৪ অধ্যায়, পুরু হতে শান্তনু পর্যন্ত রাজবংশের বিবরণ গ্রাহ্য, যদিও শেষ দিকে কিছু অসঙ্গতি আছে মনে হয়। ৯৫ অধ্যায়ে গদ্যে দক্ষ হতে জাত চন্দ্রবংশের পূর্ণতর বিবৃতি, রাজা জনমেজয় পর্যন্ত, কিন্তু অধ্যায় শেষে শ্রুতিফল থাকায় এই অধ্যায় পরের কালে যোজিত ধরে বাদ দিতে হবে, যদিও ভারত-মঞ্জরীতে ৯৫ অধ্যায় বর্ণিত বিবরণ গৃহীত হয়েছে।

৩. আদি পর্ব : শান্তনুর কথা হতে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র ও পাণ্ডু পুত্রগণের শিক্ষা

শান্তনুর রাজ্যকাল থেকে ভারতকথার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আরম্ভ বলা যায়; তাঁর পূর্বতন চন্দ্রবংশের রাজগণের ইতিহাস বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হয়েছে কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী আছে, যেমন যযাতি দেবযানী শর্মিষ্ঠার কথা, তার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। শান্তনুর বৃত্তান্ত আরম্ভেও রূপকথা আছে, ভীষ্মের জন্ম সম্বন্ধেও; যথা ৯৬ অধ্যায়ে আছে যে ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা মহাভিষ পুণ্যকর্ম করে স্বর্গলাভ করেছিলেন, তিনি একদিন ব্রহ্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে

যান, তখন গঙ্গাদেবীও যান. দমকা হাওয়ায় গঙ্গাদেবীর বসন উড়ে গেলে আর সকলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন, কিন্তু মহাভিষ গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকেন, তা দেখে ব্রহ্মা অভিশাপ দিলেন, তুমি আবার মানুষ জন্ম লাভ করে গঙ্গাদেবীকে পাবে, তার অপ্রিয় আচরণে তোমার যখন ক্রোধ হবে, তখন তুমি শাপমুক্ত হবে। গঙ্গাদেবীও মহাভিষের কথা চিন্তা করতে করতে সেখান থেকে গেলেন। মহাভিষ স্থির করলেন যে তিনি প্রতীপ রাজার পুত্র হয়ে জন্মাবেন। গঙ্গাদেবী পথে যেতে বিবর্ণকান্তি বসুগণকে দেখ্‌লেন, কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল যে বশিষ্ঠমুনি প্রচ্ছন্ন স্থানে বসে সন্ধ্যারত ছিলেন, তাকে দেখ্‌তে না পেয়ে তার প্রতি সম্মান না দেখিয়ে আমরা তাকে অতিক্রম করে যাই, তাতে বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন, তোমরা যোনিতে জন্ম নেবে; আমরা মানুষের গর্ভে প্রবেশ করতে চাই না, তুমি মানুষী হয়ে মর্ত্য লোকে যাও, তোমার গর্ভে আমরা জন্ম নেব, তুমি জাত হলেই আমাদের জলে ফেলে দেবে, যাতে আমাদের শাপমোচন শীঘ্র হয়, প্রতীপ রাজার পুত্র হবে লোকবিশ্রুত শান্তনু, তার ঔরসে আমাদের জন্ম দিও। গঙ্গা বললেন, তাই করব, তবে একটি পুত্র রেখে যাব। বসুগণ তাতে সম্মতি দিল। ৯৭ অধ্যায়ে আছে যে গঙ্গাদেবী একদিন নারীরূপে মূর্ত হয়ে প্রতীপ রাজার দক্ষিণ উরুতে বস্‌লেন, তাকে প্রতীপ বললেন, দক্ষিণ উরুতে কন্যা বা পুত্রবধূর স্থান, তুমি আমার পুত্রের নিকট এসে তাকে বরণ কোরো। শান্তনু রাজ্যে অভিষিক্ত হলে গঙ্গাদেবী আবার সুন্দরীরূপে উপস্থিত হলেন, শান্তনু তাকে বিবাহ করতে চাইলেন। ৯৮ অধ্যায়ে আছে যে গঙ্গা একটি সর্ত করে নিলেন যে তিনি যা করেন, তাতে রাজা বাধা দিতে পারবেন না, বাধা দিলে বা মন্দ বললে গঙ্গাদেবী চলে যাবেন। রাজার ঔরসে সাতটি পুত্রের জন্ম হলে গঙ্গা প্রতিটিকে জলে ফেলে দিলেন. অষ্টম পুত্রের জন্ম হলে রাজা বললেন, তুমি পুত্রদের মেরে ফেলে মহাপাপ করছ, এটিকে মারতে পারব না। গঙ্গা তখন নিজের পরিচয় দিলেন, বসুদের শাপের কথা ও তাদের সঙ্গে তাঁর যে কথা হয়েছিল তা বললেন, শেষ পুত্রটিকে জলে না ফেলে বললেন, সর্তমত আমার এখন মুক্তি, বলে অন্তর্ধান করলেন। ৯৯ অধ্যায়ে বসুগণের প্রতি বশিষ্ঠের অভিশাপের বিস্তৃত বিবরণ আছে, তা ৯৬ অধ্যায়ে বসুগণ কথিত বিবরণ হতে ভিন্ন। সে বিবরণ হল যে অষ্টবসু সস্ত্রীক বশিষ্ঠের আশ্রমে বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানে নন্দিনী নামক হোমধেনু দেখে তার দুগ্ধের

গুণ শুনে দ্যৌ নামক বসুর স্ত্রী হোমধেনুটি নিয়ে যেতে বলে, স্ত্রীর কথায় দ্যৌ বশিষ্ঠের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গাভীটিকে নিয়ে যায়, অন্য বসুগণ বাধা না দিয়ে সাহায্যই করে, বশিষ্ঠ আশ্রমে ফিরে হোমধেনুটি না দেখে সন্ধান করেন, জানতে পারেন যে বসুগণ তাকে নিয়ে গেছে। জেনে ক্রুদ্ধ হয়ে বশিষ্ঠ শাপ দিলেন যে বসুগণ মানুষ হয়ে জন্মাবে। শাপের কথা বসুগণ জানতে পেরে বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, কিন্তু বশিষ্ঠ বলেন, আমার কথার অন্যথা হবে না, ত'ব শুধু দ্যৌকে দীর্ঘকাল মানুষ লোকে থাকতে হবে, আর সকলে মানুষ লোকে এক বৎসর মধ্যেই পাপমুক্তি পাবে।

এই দুই অভিশাপ কাহিনীর অমিল থেকে এদের অসত্যতা প্রমাণ হয়, ৯৬ অধ্যায়ে কথিত মহাভিষের ব্রহ্মার নিকট গমনের কথা ও অভিশপ্ত হবার কথাও অনৈসর্গিকতা হেতু বর্জনীয়। তা ছাড়া রাজা শান্তনু গঙ্গার আচরণে যখন ক্রোধ ও অসন্তোষ প্রকাশ করলেন, তখন তো তার শাপমুক্তি হ'ল না, তারপর বহু বৎসর তাকে মর্ত্যলোকে থাকতে হয়েছে। তাতেও দেখা যায় যে ৯৬ অধ্যায় লিখিত কথা সত্য নয়। একটি একটি করে সাতটি পুত্রকে তাঁর স্ত্রী জলে ভাসিয়ে দিলেন, শান্তনু অষ্টম পুত্রের জন্ম পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ করলেন না তা অস্বাভাবিক। প্রকৃত কাহিনী মনে হয় যে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যখন আর্যগণ ভারতে এসে বসতি স্থাপন করছিলেন, তখন এক এক গোষ্ঠির লোক এক এক স্থানে সাময়িক বসতি স্থাপন করতো, সেই স্থান উপযুক্ত মনে না হলে কয়েক বৎসর পরে অন্যত্র বসতি যোগ্য স্থানের সন্ধানে যেত। এক গোষ্ঠির লোক কুরুরাজ্যে এসে প্রতীপ রাজার সময় বসতি স্থাপন করেছিল, শান্তনু সেই গোষ্ঠির একটি সুন্দরী নারীকে বিবাহ করেন, একটি পুত্রের জন্ম হলে সেই নারীর পিতৃগোষ্ঠির লোক অন্য বসতি সন্ধানে কুরুরাজ্য ছেড়ে চলে যায়, শান্তনুর স্ত্রীও ছেলেটিকে ফেলে পিতৃগোষ্ঠির লোকের সঙ্গে চলে যায়। এরূপ ঘটনা আমেরিকার পশ্চিমভাগে যখন ইয়োরোপীয় জনগণ বসতি স্থাপন করে, তখন ঘটেছে।[১] সেই গোষ্ঠির লোক সম্ভবতঃ ককেশীয় একটি প্রদেশ, জর্জিয়া বা আজের বাইজান থেকে এসেছিল; সেখানে লোক দীর্ঘজীবী হ'ত, এখনও আজের

১। The Townsman, by Pearl Buck: এই গ্রন্থে এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। গ্রন্থটি উপন্যাস বটে, কিন্তু তখন পশ্চিম আমেরিকায় যেভাবে বসতি স্থাপন হয়েছে, তার সামাজিক চিত্র।

বাইজান প্রভৃতি স্থানে ১৬০/১৭০ বয়স্ক কর্মক্ষম লোকের কথা শোনা যায়। ভীষ্ম তাই ১৫০/১৬০ বৎসর বেঁচেছিলেন। অতএব শুধু ৯৬ অধ্যায় নয়, ৯৭/১-২৪ শ্লোক বাদ হবে, ৯৭/২৫-৩২ গ্রাহ্য, ৯৮/১[১], ২-৬[১] গ্রাহ্য, তার পরে সাতটি পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা ও অষ্টম পুত্রের জন্ম হলে রাজার ভর্ৎসনার কথা বাদ হবে, কয়েকটি শ্লোক বসবে এই কাহিনী বলে সে একটি পুত্রের জন্মের পর সেই স্ত্রী ছেলেটি দিয়ে পিতৃগোষ্ঠির সঙ্গে চলে গেল—"স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি পুত্রং পাহি মহাব্রতম্।" (২৩[২])—অর্থাৎ আমি যাচ্ছি, পুত্রটি তুমি পালন কর, এই কথা বলে। ৯৯ অধ্যায় ৪৬ শ্লোক আছে যে গঙ্গাদেবী পুত্রকে নিয়ে গেলেন, তা ৯৮/২৩[২] শ্লোকের বিরোধী, অতএব বাদ হবে এবং ১০০ অধ্যায়ে গঙ্গাদেবী কর্তৃক পুত্রের শিক্ষার কথা বাদ হবে। ১০০/১-২২, ৪২[২] – ১০৩, গ্রাহ্য, তার মধ্যে শান্তনুর সত্যবতীকে বিবাহ এবং ভীষ্মের রাজ্যের দাবী ত্যাগ ও অবিবাহিত থাকবার প্রতিজ্ঞার কথা আছে, ১০১–১০৩ অধ্যায় গ্রাহ্য, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের কথা বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পরে ভীষ্মকে বিবাহ করতে অনুরোধ করার কথা তাতে আছে। ১০৪ অধ্যায়ে পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধনের কথা ও ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিধবা ক্ষত্রিয়াদের গর্ভ উৎপাদনের কথা, বৃহস্পতির দুর্ব্যবহার ও দীর্ঘতমার কথা আছে; তা অবান্তর, বাদ হবে, ১০৩ অধ্যায়ের পর ১০৫ অধ্যায় স্বাভাবিক, ভীষ্ম নিয়োগের কথা বললে সত্যবতী নিয়োগের জন্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে স্মরণ করলেন; ১০৬ অধ্যায় গ্রাহ্য, নিয়োগ দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম হল, কিন্তু ১০৬/১৯ শ্লোক এবং ১০৭-১০৮ অধ্যায়, অণিমাণ্ডব্যের উপাখ্যান, অবান্তর হিসাবে বাদ হবে। ১০৯-১১৪ অধ্যায় গ্রাহ্য – সংশোধিত পাঠ গ্রহণ করতে হবে, সংশোধনে কিছু কিছু শ্লোক বাদ পড়েছে, এই অধ্যায়সমূহে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুরের বিবাহের কথা ও পাণ্ডুর রাজ্যলাভ ও দিগ্বিজয়ের কথা আছে, দিগ্বিজয়ে আহৃত ধন ভীষ্মকে সত্যবতীকে মাতা কৌসল্যা বা অম্বালিকাকে দিয়ে পাণ্ডু স্ত্রীদ্বয় নিয়ে বনে গিয়ে মৃগয়া করে বনেই নিবাস আরম্ভ করলেন। ১১৫-১২৭ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দর অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃত জন্ম কথা, পাণ্ডুর প্রতি কিন্দম মুনির অভিশাপ ও পাণ্ডু পুত্রগণের দেবতার ঔরসে জন্মের কথা আছে। এই বিষয় প্রথমখণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়গুলি বাদ হবে, সত্য আখ্যান মনে হয় যে ধৃতরাষ্ট্রের ১৭/১৮টি পুত্র ও একটি কন্যা হল গান্ধারী গর্ভে, যুযুৎসুর জন্ম হল ধৃতরাষ্ট্রের পরিচারিকার গর্ভে, এবং বনে পাণ্ডুর

ঔরসে পাণ্ডু পুত্রদের জন্মের পরে পাণ্ডুর মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পর কুন্তী ও পাণ্ডুর পঞ্চ-পুত্রকে ঋষিগণ হস্তিনাপুরে দিয়ে যান। ১২৮-১৩৮ শ্লোকে পাণ্ডুর শ্রাদ্ধ. পাণ্ডু পুত্র ও ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের শিক্ষা ও গুরুদক্ষিণা হিসাবে দ্রুপদ রাজা জয়—আখ্যানভাগ সংশোধিত পাঠ মত মোটামুটি গ্রাহ্য, তবে কিছু প্রক্ষিপ্ত হিসাবে বাদ যোগ্য বা পরিবর্তন যোগ্য আছে। ১৩০/২ শ্লোকে কৃপের পিতা শরদ্বান্ গৌতমের জন্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"জাতঃ সহশরৈঃ—কা.ম.তে অনুবাদ আছে "শরের সহিত জন্মিয়াছিলেন"—শর বা বাণ সহ কোন শিশুর জন্ম হয় না, টিকাকার নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করেছেন—শরৈঃ সহ জাতঃ শরা এব বা অস্য বন্ধুবৎ প্রিয়াঃ—অর্থাৎ ধনুকের বাণই তার বন্ধুবৎ প্রিয় ছিল—তার সমর্থন ৩ শ্লোক আছে—তার বেদাধ্যয়নে তেমন মন ছিল না, ধনুর্বেদ শিক্ষায়ই মন ছিল। এই ব্যাখ্যা নিলে অনৈসর্গিকতা আসে না।[১] এই অধ্যায়ের ৫-১৪[১] শ্লোকে আছে যে তার ধনুর্বেদ নিয়ে তপস্যা দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে জানপদী নামক দেবকন্যাকে তার কাছে পাঠালেন তাকে দেখেই শরদ্বানের কাম উদ্রেক হল ও রেতঃস্খলন হল, শরস্তম্বে অর্থাৎ কুশতৃণগুচ্ছে রেতঃ পড়ে দুভাগ হল, তার থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মাল। এই কাহিনী অনৈসর্গিক. নারী গর্ভে ছাড়া শিশুর জন্ম হয় না, সেকথা মহাভারতেই অন্যত্র আছে—"স্ত্রীণামপিকা শক্তিঃ স্রষ্টুং রায়ামৃতে প্রজাম্।" (আদি ৭৪/৫২ – শকুন্তলার উক্তি)—অতএব প্রকৃত তথ্য এই যে কোন জনপদ কন্যার সঙ্গে সংগমে শরদ্বানের যমজ পুত্রকন্যা হয়েছিল, মাতা তাদের তৃণক্ষেত্রে ফেলে গিয়েছিল। তারপর ১৪[১] থেকে গ্রাহ্য, শান্তনু রাজা মৃগয়া করতে এসে শিশুদ্বয়কে দেখলেন ও কৃপা করে তাদের নিয়ে পালন করলেন, তাদের নাম কৃপ ও কৃপী হল, শরদ্বান গৌতম তাদের কথা জেনে তাদের নিয়ে গেলেন। দ্রোণের জন্ম সম্বন্ধেও অনুরূপ কাহিনী অনৈসর্গিক বলে সংস্কৃত করে নিতে হবে—১৩০/৩৬[২]-৩৭[১] শ্লোকে আছে ভরদ্বাজ ঋষি হবির্ধানে (যজ্ঞীয় শকটে) যাচ্ছিলেন, নদীতীরে অসংবৃতবসনা ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখে তাঁর কামোদ্রেক হওয়ায় রেতঃ পাত হল, রেতঃ কলসে রাখলেন, সেই কলসেই দ্রোণের জন্ম. দ্রোণ শব্দের অর্থ কলস। এখানেও বলতে হবে যে ভরদ্বাজের সঙ্গে অবৈধ সংসর্গ ফলে কোন সুন্দরীর গর্ভ সঞ্চার হয়, পুত্র জাত হলে তাকে কলসে করে ভরদ্বাজের আশ্রমে রেখে যায়। অধ্যায় শেষে আছে যে দ্রোণ পরশুরামের কাছ

১। তুলনীয় ইংরাজী প্রবচন "born with a silver spoon in the mouth."

থেকে কিছু দিব্যাস্ত্র লাভ করেন—মহাভারতের যুগে পরশুরাম কি সত্যই বেঁচে ছিলেন? তিনি দাশরথী রামের থেকে বেশী বয়সী ছিলেন, রামের তিন চার শত বৎসর পরে তিনি কেমন করে অস্ত্রদান করবেন? অতএব দ্রোণের অস্ত্রলাভ পরশুরামের নিকট থেকে নয়, পরবর্তী কোন ভার্গব অস্ত্রবিৎ থেকে হতে পারে। ১৩২/৩৬-৬০ অধ্যায়ে কথিত একলব্যের অঙ্গুষ্ঠ কেটে গুরুদক্ষিণাদানের কাহিনী সম্বন্ধে সন্দেহ আসে, ব্রাহ্মণ গুরু যদি নিষাদ রাজপুত্রকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, সেই নিষাদ রাজপুত্র কেন তাকে গুরু বলে ভক্তি করবে, কেনই বা দূর নিষাদ রাজ্যে (কলিঙ্গে বা কলিঙ্গের নিকটে) না ফিরে হস্তিনাপুরের নিকটস্থ বনে দ্রোণের মূর্তি বানিয়ে অস্ত্রাভ্যাস করবে? সেকালে মূর্তি প্রস্তুত হত কিনা তাও সন্দেহ। পুরাণে ও মহাভারতের মধ্যে একলব্যকে অসাধারণ বীর বলা হয়েছে, কৃষ্ণের হস্তে তীব্র যুদ্ধে সে অনেক বৎসর পরে নিহত হয়। কর্তিত অঙ্গুষ্ঠ হলে কি সে প্রথম মানের ধনুর্বিদ হতে পারত? কাহিনীটিতে দ্রোণ ও অর্জুনের ক্রূরতার প্রকাশ, কিন্তু তা সত্য বলে গ্রহণ করবার কারণ নাই।

৪. আদি পর্ব—জতুগৃহ দাহ হতে খাণ্ডবদাহ ও ময়দর্শন

১৪১-১৫১ অধ্যায়, জতুগৃহ দাহ পর্ব, সংশোধিত সংস্করণের পাঠ মত গ্রাহ্য। ১৫২-১৫৩ অধ্যায় হিড়িম্ব বধ পর্ব। তার মধ্যে ১৫৬/৫-১৯ শ্লোকে ব্যাসের আগমন ও কুন্তী এবং পাণ্ডবদের মিষ্টকথা বলে একচক্রায় এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে স্থাপন করার কথা আছে। এখানে ব্যাসের আগমনের কোন সার্থকতা নাই, পাণ্ডবগণ পূর্বেই স্থির করেছিলেন যে অরণ্য পার হয়ে নিকটস্থ গ্রামে বা নগরে আশ্রয় নেবেন (১৫৪/৩৫-৩৬)। অতএব ১৫৬/৫-১৯ শ্লোক বাদ দিয়ে তার স্থলে একটি শ্লোক থাকবে, যে পাণ্ডবগণ কুন্তী সহ একচক্রা নগরে এসে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিলেন। অনুপর্বের বাকী অংশ সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য।

১৫৭-১৬৪ অধ্যায়—বক বধ অনুপর্ব—সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য।

১৬৫-১৮৬ অধ্যায় চৈত্ররথ পর্ব, তার মধ্যে সংশোধিত পাঠের মধ্যেও কিছু বর্জনীয় আছে। ধৃষ্টদ্যুম্নের যজ্ঞীয় অগ্নি থেকে আবির্ভাবের কথা অনৈসর্গিক, দ্রোণ শিষ্যদের নিকট পরাজিত হয়ে অর্দ্ধরাজ্য দিতে বাধ্য হয়ে দ্রুপদরাজ দ্রোণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে যজ্ঞ করে তাঁর কুলের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ-

তরুণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে দত্তক পুত্র হিসাবে নিয়ে দ্রোণ বধের জন্য দীক্ষিত করেছিলেন মনে হয়, সে কথাই যজ্ঞের অগ্নি হতে আবির্ভাবরূপে বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণার যৌবনপ্রাপ্তা পরমাসুন্দরী কন্যারূপে বেদি হতে আবির্ভাবের কথাও গ্রাহ্য নয়। বনপর্বে ৩২।৬০-৬২ শ্লোকে আছে যে কৃষ্ণা বালিকা বয়সে পিতার কোলে বসে ব্রাহ্মণ গুরু ভাইদের যে শাস্ত্রপাঠ করাতেন তা শুনতেন। অতএব কৃষ্ণার প্রথম আবির্ভাব যৌবনপ্রাপ্তা রূপে নয়। ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণ বধে দীক্ষিত দত্তকপুত্র করবার সময় তার সহোদরা ভগ্নী কৃষ্ণাকেও দ্রুপদরাজ কন্যারূপে গ্রহণ করেছিলেন, এইভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। হয়তো যজ্ঞকালে অগ্নিকুণ্ড হতে ঘন ধূম উৎপন্ন করে সেই ধূমের মধ্য দিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কৃষ্ণাকে উপস্থিত করে প্রচার করা হয় যে তারা যজ্ঞকুণ্ড থেকে উঠেছে। অতএব ১৬৫।৮-১২ শ্লোক বাদ হবে; ১৬৬ অধ্যায় বাদ হবে, তাতে দ্রোণের জন্মকথা, দ্রুপদরাজের নিকট পূর্বসখা হিসাবে সাহায্য চাইতে গিয়ে অপমান, এবং পাণ্ডব ধার্তরাষ্ট্র শিষ্যদের নিয়ে দ্রুপদরাজকে জয় ও তার অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণের কথা আছে। তা পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। ১৬৭ অধ্যায়ে দ্রুপদ রাজের যাজক অনুসন্ধান ও দ্রোণ বধের জন্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুত্ররূপে লাভ ও বেদি মধ্য হতে উত্থিতা সুন্দরী কৃষ্ণাকে লাভের কথা আছে। এই অধ্যায়ের শ্লোকগুলি পরিবর্তিত করে প্রকৃত বিবরণ দিতে হবে। ১৬৮ অধ্যায়, পাণ্ডবগণের দ্রুপদরাজের নগরে আগমন কথা, গ্রাহ্য। ১৬৯ অধ্যায় ব্যাসের আগমন ও পঞ্চপতির সূচনা—এক কন্যা শংকরের আরাধনা করে পাঁচবার উত্তম পতি প্রার্থনা করায় তার পাঁচটি পতি হবে, সেই কন্যা দ্রুপদের কুলে জন্ম নিয়েছে (১৪ শ্লোক)—তার থেকে বেদিমধ্য হতে আবির্ভাবের কথা যে কল্পিত, তা বোঝা যায়, কিন্তু অধ্যায়টি বাদ হবে, এক কন্যার পঞ্চপতির সঙ্গে বিবাহ মহাভারত যুগে অপ্রচলিত ছিল, সেইরূপ বিবাহের কারণ কবি দিতে চেষ্টা করেছেন—দুইভাবে—এক ১৬৯ অধ্যায়, আর এক ১৯৭ অধ্যায়ে—সেখানেও ব্যাস পঞ্চ ইন্দ্র উপাখ্যান বলে পঞ্চপতিত্ব সমর্থন করেছেন। দুটিই বাদ হবে, যুধিষ্ঠিরের সিদ্ধান্ত মতে অর্জুনের সম্মতিতে এই পঞ্চপতিত্ব হয়েছিল। চিত্ররথ পর্বে ১৬৯ অধ্যায়ের পরে ১৭০ অধ্যায় সংশোধিতরূপে গ্রাহ্য। ১৭১-১৮২ অধ্যায়—সংবরণ তপতী উপাখ্যান, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্বকথা, কল্মাষপাদ রাজার কাহিনী—এইসব যোজনা হিসাবে বাদ হবে। ১৮৩ অধ্যায় কথিত চিত্ররথ নির্দিষ্ট ধৌম্য পুরোহিতের নিয়োগ কথা গ্রাহ্য।

১৮৪-১৯২ অধ্যায় স্বয়ম্বর অনুপর্ব। সংশোধিত পাঠ মোটের উপর গ্রাহ্য, তবে কিছু বাদ হবে—যথা ১৮৪।১৭২ (কৃষ্ণাকে যজ্ঞসেন অর্থাৎ দ্রুপদরাজার দুহিতা বলে আবার বেদীমধ্য হতে উত্থিতা বলা হয়েছে; ১৮৪।৯ শ্লোক (ধৃষ্টদ্যুম্নের যজ্ঞাগ্নি হতে আবির্ভাবের কথা), ১৯৬।১৭ শ্লোক থেকে প্রাতৃন্নির নাম বাদ হবে, তার জন্ম দ্রৌপদী স্বয়ংবরের পরে। ১৮৯/১২-২৪ শ্লোক বাদ হবে, ভীম একটি বৃক্ষ উৎপাটন করে তা ব্যবহার করেন নাই, তাই বৃক্ষ উৎপাটনের কথা অবান্তর।

১৯৩-১৯৯ অধ্যায়ে বৈবাহিক অনুপর্ব। তন্মধ্যে ১৯৩ অধ্যায়, পঞ্চইন্দ্র কথা বলে পঞ্চপতিত্বের ব্যাখ্যা বা সমর্থন, বাদ হবে। ১৯৬।১৯২-২০১, ২২-২৩ শ্লোকও বাদ হবে, তা ১৯৭ অধ্যায়ের সূচনা।

২০০-২১২ অধ্যায় বিদুরাগমন ও পাণ্ডবগণের অর্দ্ধরাজ্য লাভ বর্ণিত, তার মধ্যে নারদাগমন ও সুন্দ-উপসুন্দ কথা বাদ হবে, নারদের আগমন অনৈসর্গিক, কাহিনীও অতিপ্রাকৃত। তবে একস্ত্রী সঙ্গে বিহার সম্বন্ধে কোন সময় বা নিয়ম করা স্বাভাবিক, পাণ্ডবগণ তা নিজেরাই করেছেন, যে এক ভ্রাতার সঙ্গে কৃষ্ণা আসীন থাকলে অন্য কোন ভ্রাতা সেখানে কৃষ্ণার সঙ্গের জন্য গেলে ত্রয়োদশ মাস—দ্বাদশ বৎসর নব—নির্বাসনে থাকতে হবে। ২১১।২৮২-৩০ শ্লোক সেই ভাবে বদলে নিতে হবে।

২১৩-২১৮ অধ্যায়ে অর্জুন বনবাস পর্ব; এ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। ২১৩ অধ্যায় যেইভাবে বহু পরিবর্তিত হবে; ২১৪ অধ্যায়ের সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য। ২১৫-২১৭ অধ্যায়—চিত্রাঙ্গদা কথা বাদ হবে, ২১৮ অধ্যায় গ্রাহ্য।

২১৯-২২১ অধ্যায়ে সুভদ্রা হরণ ও ইন্দ্রপ্রস্থে যৌতুক প্রেরণের বর্ণনা। ২২১।১০-১৫ শ্লোক দ্বাদশ বর্ষের স্থলে "পূর্ণং সম্বৎসরং মাসং চৈকং" হবে। বাকী গ্রাহ্য।

২২২-২২৭ অধ্যায়ে খাণ্ডবদাহ বর্ণিত। সংশোধক মণ্ডলী শ্বেতকি রাজার যজ্ঞ এবং বারো বৎসর ক্রমাগত ঘৃতধারা অগ্নিতে পতন—অগ্নির ভক্ষণ হেতু অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্যের কাহিনী—অর্থাৎ ২২৩।১২-৮৩, ২২৪।১-১৩১ শ্লোক বাদ দিয়েছেন। কিন্তু অগ্নির ব্রাহ্মণ বেশে কৃষ্ণ অর্জুনের সম্মুখে আবির্ভাব, খাণ্ডব বন দাহের অনুরোধ, এবং অর্জুনকে দিব্য রথ, গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূনীর, এবং কৃষ্ণকে বজ্রনাভ চক্র দিলেন, সে সব কথাও বাদ হবে। প্রকৃত

বৃত্তান্ত এই যে জনপদ স্থাপনের জন্য কৃষ্ণ ও অর্জুন পরামর্শ করে বিস্তৃত খাণ্ডব বন পুড়িয়ে ফেলতে সিদ্ধান্ত নেন, যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে দক্ষ শিল্পীদের দিয়ে উত্তম রথ, ধনুক, বজ্রনাভ চক্র ইত্যাদি প্রস্তুত করান, এবং তারপরে বনে অগ্নিসংযোগ করেন। সেইভাবে পরিবর্তিত শ্লোক বসাতে হবে।

২২৮ ২৩৪ অধ্যায়ে ময় দর্শন—দানবশিল্পী ময়কে প্রাণদান, তারপরে শার্ঙ্গক ও মন্দপাল উপাখ্যান। ২২৮ অধ্যায় সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। মন্দপাল ও শার্ঙ্গক উপাখ্যান অবান্তর যোজনা—২২৯-২৩৪।৪ বাদ হবে। শেষ ১৫ শ্লোক থাকবে।

৫. সভাপর্ব

১-৩ অধ্যায়ে শিল্পী ময়দানব কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের জন্য সভাগৃহ নির্মাণ কথা শোধিত পাঠ মত সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। ৪ অধ্যায় সভাপ্রবেশ, উপস্থিত বিশিষ্ট পুরুষদের মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধনাদি, বলরাম, কৃষ্ণের নাম নাই, তাতে মনে হয় যে সভাপ্রবেশ উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণ করা হয় নাই, যারা ইন্দ্রপ্রস্থে আপনা থেকে এসেছিল, তারাই উপস্থিত ছিল, অতএব বহু ঋষির নাম ও রাজার নাম, ১০-৩৩[১] শ্লোক, বাদ হবে, ৫[১] শ্লোকও বাদ হবে—প্রতি ব্রাহ্মণকে এক সহস্র গাভী দেওয়া হল, তা দানলোভী কোন ব্রাহ্মণ লিপিকারের কল্পনা। বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ৫ অধ্যায়ে নারদকথিত রাজধর্ম অনুশাসন, নারদের আগমন অনৈসর্গিক এবং তাঁর দেওয়া রাজধর্ম সম্বন্ধে উপদেশের কথা পর্বসংগ্রহে নাই, এই অধ্যায় বাদ হবে। ৬-১২ অধ্যায়ে নারদ কর্তৃক ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের প্রভৃতি লোকপালদের সভার বর্ণনা—তার কথা পর্বসংগ্রহে আছে বটে, তবে সেগুলি অতিপ্রাকৃত হিসাবে বর্জনীয়। ১৩-১৯ অধ্যায় রাজসূয়ারম্ভ অনুপর্ব, অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞের কল্পনা ও তার জন্য প্রস্তুতি; ১৩।১-৩ শ্লোক বাদ হবে, তাতে লোকপাল সভাবর্ণনের উল্লেখ আছে। বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ১৪-১৬ অধ্যায়ের সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য। ১৭ অধ্যায় চণ্ডকৌশিক ঋষির দেওয়া আম খেয়ে বৃহদ্রথ রাজার দুই রাণীর গর্ভসঞ্চার হ'ল, যথাকালে রাণীরা দুজনেই একটি শিশুর অর্দ্ধভাগ প্রসব করল, শিশুখণ্ড দুটিকে বাইরে ফেলে দেওয়া হ'ল, তখন জরা নামক রাক্ষসী দেখে দুটি খণ্ড জোড়া দিতেই একটি জীবিত শিশু হয়ে গেল, শিশুর কান্না শুনে রাজা দুই রাণীসহ

এসে শিশুটি গ্রহণ করলেন ও জরাকে প্রশংসা করলেন; শিশুর নাম হল জরাসন্ধ। কাহিনীটি অতিপ্রাকৃত, তাই গ্রাহ্য নয়। রামায়ণে একটি ফল ভাগ করে তিন রাণীর ভক্ষণ করার কথা আছে, কিন্তু তাদের তো শিশুর খণ্ড মাত্র প্রসব করার কথা নাই, তারা পূর্ণাঙ্গ পুত্র—এক রাণী পূর্ণাঙ্গ যমজ পুত্র প্রসব করেছে। সুতরাং কাহিনীটি এইভাবে পরিবর্তিত হতে পারে যে দুই রাণীই মৃতকল্প শিশু প্রসব করল, তার একটি জরা নামক ধাত্রীর সেবা কৌশলে বেঁচে উঠল। অতএব ১৭।১-৩৪ গ্রাহ্য, ৩৫-৪১ শ্লোক পরিবর্তিত হয়ে দুটি মৃতকল্প শিশু প্রসবের কথা এবং একটির জরা নামক ধাত্রীর নিপুণ সেবা কৌশলে বেঁচে ওঠার কথা হবে। ৮-১৯ অধ্যায় সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য।

২০-২৪ অধ্যায়ে জরাসন্ধবধ বর্ণিত হয়েছে। সংশোধিত সংস্করণে তার অল্প কয়েকটি শ্লোক বাদ হয়েছে, তার উপর ২২।৩৩-৩৬ শ্লোক বাদ হবে—তাতে আছে যে মধুবংশীয়দের দ্বারা জরাসন্ধ অবধ্য জেনে কৃষ্ণ নিজে তাকে বধ করতে চাইলেন না। কিন্তু ২৩।২ শ্লোকে আছে যে কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলছেন, আমাদের তিনজনের মধ্যে কার সঙ্গে আপনি মল্লযুদ্ধ করতে চান, বেছে নিন। ২৪।১৩-৩০ শ্লোক ও ২৪।৩৪ শ্লোক বাদ হবে, তাতে অযথা কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বা সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলা হয়েছে, তা অনেক পরের কালের যোজনা। বাকী অংশ সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য।

২৫-৩২ অধ্যায়ে ভীম-অর্জুন নকুল-সহদেবের দিগ্বিজয় বর্ণিত। ৩১ অধ্যায়ে সহদেবের দক্ষিণ দিকের রাজ্য জয় ও করসংগ্রহ বর্ণিত, তার মধ্যে একটি অলৌকিক উপাখ্যান আছে যে মাহীষ্মতীর নীলরাজার সুন্দরী কন্যাকে অগ্নিদেব কামনা করে ব্রাহ্মণরূপে এসে বিবাহ করেন, এবং রাজার জামাতা হয়ে অগ্নিদেব যুদ্ধে অগ্নিকাণ্ড ঘটান, সহদেবের স্তবে প্রশমিত হন। কিন্তু ৪১-৪৯ শ্লোক কথিত অগ্নিস্তবের পরে ৫০ শ্লোকে সেই স্তবের পাঠের ফলশ্রুতি আছে, অতএব ৪১-৫০ শ্লোক পরে যোজিত অনুমান করা যায়; ব্রাহ্মণ ঋত্বিককেই অগ্নিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ধরে নিলে অলৌকিকতা চলে যায়। সংশোধক ৪৩-৫০ শ্লোক বাদ দিয়েছেন, ৪১ ৪২ শ্লোকও বাদ হবে, ২৫ শ্লোক বাদ হবে, কারণ ৪০ শ্লোকে তার বিপরীত কথা আছে এবং সেটাই গ্রাহ্য। অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত পাঠক্রমমত গ্রাহ্য, তবে সংশোধক ৭২ শ্লোক "আটবীং চ পুরীং রম্যাং" স্থলে "আটবীং চ পুরীং রোমাং" পাঠ নিয়ে বলেছেন যে এখানে রোম

নগরীর উল্লেখ আছে ; কিন্তু যে মত গ্রাহ্য মনে হয় না। বাকী অধ্যায় সমূহ সংশোধিতরূপে গ্রাহ্য।

৩৩-৩৫ অধ্যায়ে রাজসূয় যজ্ঞের আরম্ভ বর্ণিত হয়েছে ; তার মধ্যে ৩৫।১০ শ্লোকে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের চরণ ক্ষালনে অর্থাৎ পাদ্যজল দেবার কার্যে নিযুক্ত হলেন, তা কৃষ্ণের উপযুক্ত কার্য নয়। ৪৫।৩৯ শ্লোকে আছে যে রাজসূয় যজ্ঞ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ রক্ষা করলেন। বড় যজ্ঞে অনেক সময় বাধা বিপর্যয় উপস্থিত হ'ত, অনার্যদল বা বিরোধীদল আক্রমণ করত, তাই সব বড় যজ্ঞেই রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হত, কৃষ্ণ যজ্ঞরক্ষা কার্যের নেতা নিযুক্ত হয়েছিলেন। অতএব ৩৫।১০ শ্লোক বাদ হবে, সেখানে যজ্ঞ রক্ষার কথা বলার প্রয়োজন নাই, কারণ তা পরে বর্ণিত হয়েছে। বাকী সব শ্লোক গ্রাহ্য বলা যায়।

৩৬ ৩৭ অধ্যায়ে অর্ঘ্যাভিহরণের বর্ণনা। ৩৬।১০, ২১ শ্লোক অনৈসর্গিকতা হেতু বাদ হবে, নারদ এসে অংশাবতরণের কথা চিন্তা করলেন, নারায়ণ কৃষ্ণরূপে এসেছেন ইত্যাদি তার মনে হল—নারদের আগমনকথাও গ্রাহ্য নয়, অংশাবতরণের কথার রেশও গ্রাহ্য নয়। ৩৮ অধ্যায়ে ভীষ্ম কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান সমর্থন করে শিশুপালকে কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা বোঝাতে কয়েকটি শ্লোকে কৃষ্ণের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করছেন, যথা ৯, ১০^{২}-১১^{১}, ১৫^{২}, ১৭^{১}, ১৮^{১}, ২৩-২৯ শ্লোক এইগুলি বাদ হবে, কারণ কৃষ্ণের জীবনকালে তিনি ঈশ্বর বা অবতার রূপে স্বীকৃত হন নাই। যেখানে কৃষ্ণ ভগবানরূপে কথা বলছেন বলে আছে, যথা ভগবদ্গীতায়, তা অনেক পরের কালের যোজনা। ৩৯/৬-৯ শ্লোকও অনৈসর্গিকতার কারণে বাদ হবে।

৪০-৪৫ অধ্যায়ে শিশুপাল বধ বর্ণিত। তার মধ্যেও অনৈসর্গিকতা বা ঈশ্বরত্ব আরোপ হেতু কিছু কিছু বাদ হবে, যথা ৪১।১৭ (ভীষ্ম কৃষ্ণকে জগৎকর্তা বলেছেন, শিশুপাল তার উত্তর দিচ্ছে) ৪১।২৯-৪০ (বৃদ্ধ হংসের উপাখ্যান—উপাখ্যান হিসাবে বর্জনীয়), ৪২।৬ (কৃষ্ণকে জগতের কর্তা বলায় শিশুপালের উপহাস), ৪৩ অধ্যায় সম্পূর্ণ (শিশুপালের চতুর্বাহু, ত্রিনেত্র রূপে জন্ম, কৃষ্ণের স্পর্শে অতিরিক্ত বাহু ও চক্ষুর লোপ ইত্যাদি কাহিনী), ৪৪।১, (ভীষ্মের কৃষ্ণকে জগৎ কর্তা বলে বর্ণনা)। ৪৪ অধ্যায়ের অনেক শ্লোক সংশোধকমণ্ডলী বাদ দিয়েছেন, ৪৫।২১^{২}-২৫^{১} শ্লোকও বাদ দিয়েছেন—তা হল

এই যে কৃষ্ণ চক্র স্মরণ করলেন, চক্র কৃষ্ণের হস্তে এসে গেল, তাই দিয়ে কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করলেন। উদ্যোগপর্বে ২২।২৫-৩১ শ্লোকে আছে যে কৃষ্ণ তৎকালীন যুদ্ধ কৌশলেই জয়ী হয়ে শিশুপালকে বধ করেছিলেন. চক্র স্মরণ করার কথা পরের কালের যোজনা।

৪৬ অধ্যায় (ব্যাসের লোকক্ষয়কর যুদ্ধের সম্বন্ধে ভবিষ্যবাণী) সংশোধকমণ্ডলী বাদ দিয়েছেন। ৪৭-৭৩ অধ্যায়ে দ্যূতপর্ব বর্ণিত। ৪৭-৪৯ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধি দেখে ক্ষুব্ধ দুর্যোধনের সঙ্গে শকুনির পরামর্শ, এবং যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য আহ্বানে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমোদন ও আজ্ঞাদান বর্ণিত হয়েছে, তা গ্রহণ করা যায়, কেবল ৪৯ ৬০ শ্লোক বাদ হবে, কারণ বিদুর ভীষ্মের সঙ্গে পরামর্শ করবেন ভাবলেন বলা হয়েছে, কিন্তু ভীষ্মের সঙ্গে পরামর্শের কথা নাই। ৫০-৫৭ অধ্যায়ে দুর্যোধন শকুনির পরামর্শ ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদনের কথা, ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিধা প্রকাশ করে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য আহ্বানের আজ্ঞা দান, পুনঃ বিস্তৃততর-ভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা বাদ হবে। ৬৭।১৮-২২ শ্লোক এবং ৬৮।৪১-৪৭ শ্লোক বাদ হবে, এই শ্লোকগুলি সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। ৬৯ অধ্যায়ের প্রথমে নীলকণ্ঠ টিকার উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধ—'তাবৎ প্রতীক্ষ ভ্রাতস্ত্র দুঃশাসন নরাধম' বসবে।

৭৪ ৮৯ অধ্যায়ে অনুদ্যূত পর্ব বর্ণিত। ৭৭।৪৬ শ্লোক বাদ হবে, কারণ ভবিষ্যতে যুদ্ধে যা ঘটেছিল, অনুদ্যূতের পরেই প্রতিজ্ঞা করা বা বলা সম্ভব নয়। ৭।১৪-১৬ শ্লোকও বাদ হবে, যেকমার্ণি নুরাণ কথা এখানে অবান্তর। ৮০ ৩২-৩৫ শ্লোক, নারদের আগমন ও তার কথা, অনৈসর্গিক হিসাবে বাদ হবে। অনুপর্বের অবশিষ্ট অধ্যায় ও শ্লোক সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্য।

৬ আরণ্যক বা বনপর্ব ঃ অরণ্য অনুপর্ব হ'তে তীর্থযাত্রা অনুপর্ব

প্রমাণ সংস্করণে বনপর্ব বাইশ অনুপর্বে বিভক্ত, সংশোধিত সংস্করণে ষোলটি অনুপর্ব আছে। আলোচনা প্রমাণ সংস্করণের পর্বানুসারে করাই সুবিধা।

প্রথম দশ অধ্যায় নিয়ে আরণ্য অনুপর্ব; প্রথম অধ্যায়ে আছে যে হস্তিনাপুরের প্রধান পুরদ্বার দিয়ে পাণ্ডবগণ তাদের অনুগত নির্গত হয়ে উত্তর দিকে

চললেন, ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চৌদ্দ বা পনর জন অনুচর স্ত্রীদের নিয়ে রথে অনুগমন করল, প্রজাগণ বিলাপ করতে করতে পাণ্ডবদের সাথে চলল, যুধিষ্ঠির তাদের মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে স্বগৃহে ফেরালেন ; তাঁরা তারপর রথে উঠে চললেন, সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরে একটি বৃহৎ বটের তলে রাত্রির জন্য আশ্রয় নিলেন। ৪৩২ ৪৫ শ্লোক বাদ হবে, তাতে বলা হয়েছে কিছু সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ, কিছু ব্রাহ্মণ সঙ্গে স্ত্রী না নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, কিন্তু ৩৩ শ্লোকে আছে "ব্রাহ্মণপ্রমুখাঃ প্রজাঃ"—ব্রাহ্মণ সহ প্রজাগণ—যুধিষ্ঠিরের কথায় ফিরে গেল ; আবার অস্ত্রীক ও সস্ত্রীক ব্রাহ্মণদের আগমন কথা কেন ? এই ব্রাহ্মণদের ভরণপোষণ করতে যুধিষ্ঠিরের সূর্য উপাসনা করে দিব্য স্থালীলাভের কথা আছে, যাতে প্রস্তুত খাদ্য রাত্রে দ্রৌপদীর ভোজন পর্যন্ত ফুরাবে না—সে অনৈসর্গিক কথা বাদ হবে—যুধিষ্ঠীরের অনিচ্ছায় বহু ব্রাহ্মণ পোষণের কথা শুধু ব্রাহ্মণ মহিমা বাড়াবার চেষ্টায়। ২ অধ্যায়ে আছে যে প্রভাতে যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের বলছেন, আপনারা ফিরে যান, আমরা এখন বিত্তহীন, এত লোক কি করে পোষণ করি ? তার উত্তরে শৌনক নামে এক ব্রাহ্মণের দীর্ঘ বক্তৃতা আছে—অর্থেই অনর্থ, যুধিষ্ঠির কেন নিজের অভাবের জন্য দুঃখিত ? যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের ভরণপোষণের ত্রুটির ভয়ে বিত্তাভাবের কথা বলেছেন, তাঁকে শৌনকের প্রকৃত উপদেশ সম্পূর্ণ অবান্তর। শুধু শৌনকের কথা নয়, সমগ্র ২ অধ্যায় বাদ হবে। ৩ অধ্যায়ে ধৌম্যের উপদেশে যুধিষ্ঠিরের সূর্যস্তব ও দিব্যস্থালী লাভ তা সংশোধকগণ কিছু সংক্ষেপ করেছেন, সবটাই বাদ হবে। ৩,৮৩ অধ্যায়টির শেষ শ্লোকে—পাণ্ডবগণের কাম্যক বনে গমনের কথা আছে, কিন্তু কাম্যক বনের অবস্থান সম্বন্ধে যে বর্ণনা ১-৩ শ্লোকে আছে,—সরস্বতীকূলে মরু প্রদেশের নিকট, তা ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে দূর মনে হয়। পাণ্ডবগণ বনবাসের ব্যবস্থা সব ঠিক করে নিতে ইন্দ্রপ্রস্থ হয়ে গেছেন ধরে নেওয়া যায়, সেখান থেকে পুত্রদের ব্যবস্থা, অস্ত্র ও বস্ত্র, অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ, ইত্যাদি প্রয়োজন ছিল। তা প্রথম খণ্ডের ১০ অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। পাণ্ডবগণ "বনবাসায় দীক্ষিতাঃ" (সভা ৭৭,১) হয়ে হস্তিনাপুর থেকে গেছেন, তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে নিজেদের প্রাসাদে না যেতে পারেন, কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থের উপকণ্ঠে বনে সাময়িক অবস্থান করে সব ব্যবস্থা করে, সেইখানেই কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইত্যাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ পেয়ে অভিমন্যু ও সুভদ্রাকে কৃষ্ণের সঙ্গে দিবে, দ্রৌপদীপুত্রগণকে ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে দিয়ে তাঁরা অস্ত্র, বসন, দ্রৌপদীর ধাত্রী ও দাসীগণ ও অন্যান্য

সরঞ্জাম নিয়ে রথে করে স্থায়ীভাবে বনবাস আরম্ভ করতে যাত্রা করলেন (বন. ২৩।১-৫), তাঁরা আলোচনা করে ঠিক করলেন যে দ্বৈতবনে যাবেন. এবং সেখানে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে নিলেন। অতএব যদিও ৪ ও ৬ অধ্যায় গ্রাহ্য, তার মধ্যে যেখানে কাম্যক বনের উল্লেখ আছে, তার স্থলে 'ইন্দ্রপ্রস্থের উপকণ্ঠে মহাবনে" বুঝতে হবে, সেইভাবে কিছু পরিবর্তন করে নিতে হবে। ৭-১০ অধ্যায় বিদুরের প্রত্যাগমনে দুর্যোধনের সন্তাপ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণের বনে পাণ্ডবগণেকে আক্রমণ ও বধ করবার সংকল্প, ব্যাস ঋষির আগমন ও নিষেধ, সুরভির উপাখ্যান ও মৈত্রেয় ঋষির উপদেশ ও দুর্যোধন প্রতি উরুভঙ্গের অভিশাপ, গ্রাহ্য মনে হয় না। পর্বসংগ্রহে এই বিষয়গুলির উল্লেখ ছিল ২/১৪৭-১৪৯ শ্লোকে, সেগুলি সংশোধক মণ্ডলী বাদ দিয়েছেন, কিন্তু ৭-১০ অধ্যায় বাদ দেন নাই। ড সুকথংকর মন্তব্য করেছেন যে ক্ষুদ্র বিষয় পর্বসংগ্রহে উল্লেখ না থাকলেও অধিকাংশ পুঁথিতে থাকলে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ৭-১০ অধ্যায় বাদ দেওয়াই সঙ্গত। ভীষ্ম, দ্রোণ পক্ষে না থাকলে দুর্যোধন কর্ণ প্রভৃতি পাণ্ডবগণকে পরাজিত করবার আশা করতে পারেন না।

দ্বিতীয় অনুপর্ব কির্মীর বধ একটি মাত্র অধ্যায়ে, একাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে। কির্মীর বধের কথা যদিও পর্বসংগ্রহের সংশোধিত পাঠেও আছে তবু সেটি গ্রাহ্য মনে হয় না। ভীম বাহু যুদ্ধে অনেক মল্ল, রাক্ষস, অসুর বধ করেছেন; আদিপর্বে হিড়িম্ব ও বক বধ, বিরাট পর্বে জীমূত নামক মল্ল ও কীচক বধ; সেসব ঘটনা বৈশম্পায়ন বর্ণনা করেছেন স্বচক্ষুতে দেখা ঘটনারূপে, কারো বর্ণনা উদ্ধৃত করে নয়। কির্মীর বধ সেরূপ বৈশম্পায়নের স্বয়ংদৃষ্ট ঘটনার মত বর্ণিত নয়, তা বিদুরের কথা উদ্ধৃত করে বর্ণনা, এবং বিদুরও সেই ঘটনা নিজে দেখেছেন তা বলেন নাই। বলেছেন যে যখন ধৃতরাষ্ট্র রাগ করে তাকে চলে যেতে বললেন, তিনি বনে পাণ্ডবদের নিকট গেলেন, তখন তাদের কাছ থেকে কির্মীর বধ বৃত্তান্ত শুনেছেন। পাণ্ডবগণের সঙ্গে বিদুরের বনে সাক্ষাৎ হলে যে কথা হয়েছিল, তা ৫-৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, তার মধ্যে কির্মীর বধের কথা কেউ বললেন বা বিদুর তা জানলেন, সে কথা নাই। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের ডাকে তার কাছে ফিরে গেলেন, তখনও বিদুর ভীমের সেইভাবে বীর্য প্রকাশের কথা বলেন নাই। ১০ অধ্যায়ে মৈত্রেয় ঋষি দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করতে উপদেশ দিতে পাণ্ডবদের বীর্যের কথা বলেন, তার মধ্যে ভীম কর্তৃক কির্মীর রাক্ষস বধের উল্লেখ করেন। ধৃতরাষ্ট্র কির্মীর বধের বিস্তৃত

বিবরণ শুনতে চাইলে দুর্যোধনের উপেক্ষা হেতু ক্রুদ্ধ ঋষি বললেন, আমি যাই, আর কিছু বলব না, বিস্তৃত বিবরণ বিদুরের কাছে শুনতে পাবেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে প্রশ্ন করায় কির্মীর বধ কথা বিদুর বিস্তৃতভাবে বললেন। ভারতকথায় পাণ্ডবদের জীবন বৃত্তান্ত সরলভাবে বলা হয়েছে, এইভাবে ঘুরিয়ে কোন বৃত্তান্ত বলা হয় নাই। কির্মীর বধ বৃত্তান্ত প্রসঙ্গক্রমে শোনা কথার পুনরুক্তি রূপে বলা হয়েছে। অগ্রাহ্য করবার একটি কারণ এই। দ্বিতীয় কারণ যে কির্মীর বধ বৃত্তান্ত ও কীচক বধ বৃত্তান্তে কিছু কিছু শ্লোকের মিল আছে, সন্দেহ হয় যে পরের কালের কোন কবি কীচক বধ বৃত্তান্ত কিছু পাল্টে কির্মীর বধ বৃত্তান্ত রচনা করেছেন। পরে কির্মীর বধের উল্লেখ যেখানে আছে, যথা দ্রোণ পর্বের ১৮০/৩৩ শ্লোকে—কৃষ্ণ বলছেন যে পাণ্ডবগণের হিতার্থে হিড়িম্ব কির্মীর বক প্রভৃতি রাক্ষসকে বধ করেছেন, তা স্পষ্টই প্রক্ষিপ্ত।

তৃতীয় অনুপর্ব অর্জুনাভিগমন ১২-৩৭ অধ্যায়ে বিবৃত। এই অনুপর্বের তিনটি ভাগ আছে—১২-২২ অধ্যায়ে কৃষ্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সহ সাক্ষাৎ বিবরণ ও শাল্ববধ কাহিনী, ২৩-৩৫ অধ্যায়ে দ্বৈতবনে গমন ও সেখানে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠির-ভীমের বিতর্ক, ৩৬-৩৭ অধ্যায়ে ব্যাসের আগমন ও প্রতিস্মৃতি বিদ্যাদান, এবং অন্য বনে থেকে ও অর্জুনকে ইন্দ্রলোকে অস্ত্র শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিতে উপদেশ দান ও অর্জুনের যাত্রারম্ভ। ১২ অধ্যায়ে পাণ্ডবগণসহ কৃষ্ণ প্রভৃতি বৃষ্ণিগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইত্যাদির সাক্ষাতের কথা—সাক্ষাৎ হ'ল মহাবনে, কাম্যকের নাম এখানে নাই—সাক্ষাৎ হয়েছিল ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ বনে। এই অধ্যায় অতিপ্রাকৃত কথা আছে, কৃষ্ণ দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণের আচরণের কথা বলে বললেন, তারা সদ্য বধযোগ্য—তাঁকে এত ক্রুদ্ধ দেখাল যে অর্জুন তাকে শান্ত করতে বিষ্ণুর অবতার বলে তাঁর নানা কীর্তির উল্লেখ করলেন। তা গ্রাহ্য নয়—দ্রৌপদীর দীর্ঘ বিলাপে পাণ্ডবগণের ইতিহাস ও নিজের দুঃখের কথা বলাও সময়োচিত নয়। কৃষ্ণের দুষ্কৃতকারীদের সদ্য বধ করবার প্রস্তাবের উত্তরে যুধিষ্ঠিরের কথা থাকা স্বাভাবিক, যেমন তিনি দ্বারকায় সাত্যকির প্রস্তাবের উত্তরে বলেছিলেন (১২২।২৭-২৯)—যে তিনি তাঁর ধর্মপালন করবেন, অক্ষদ্যূতে যে সর্ত বা সময় হয়েছে, তা পালন করবেন, পরে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতে হবে। যুধিষ্ঠির যে সেভাবে কথা বলেছিলেন তা পাই ৫১ অধ্যায়ে—সঞ্জয় কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলোচনার কথা—নিবেদনে ;

কৃষ্ণ সহ যাদববীরদের নিয়ে রাজ্য উদ্ধারের প্রস্তাবে যুধিষ্ঠির বলেন যে ত্রয়োদশ-বর্ষ বনে বাসের প্রতিশ্রুতি পালনের পরে তোমার প্রস্তাব সাদরে বরণ করে নেব। (৫১।৩১^{২}-৩৪^{১})। অতএব ১২/১-৮, ৯^{২}-১০^{১} গ্রাহ্য, ১০^{২}-৪৮^{১} বাদ হবে, ১০^{১} এর পরে বসবে ৫১.৩১^{২}-৩৫ শ্লোক, তারপরে ৪৮^{২}-৪৯, ৬১-৬৮, ১২০-১২৩, ১২৮-১৩০^{১} গ্রাহ্য, বাকী বাদ হবে। ১৩-১৪ অধ্যায়ে কৃষ্ণের আগমনে বিলম্বের কারণ ও শাল্ব বধের কথা গ্রাহ্য। ১৫-২২।৪৩, শাল্ব বধের বিস্তৃত বিবরণ, তার মধ্যে অনেক অনৈসর্গিক কথা আছে, তা বাদ হবে। ২২ ৪৪-৫৪ গ্রাহ্য, সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে নিয়ে কৃষ্ণ চলে গেলেন, দ্রৌপদেয়দের নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন গেলেন, ইত্যাদি তাতে আছে।

২৩ অধ্যায়ে পাণ্ডবগণের রথে অস্ত্রশস্ত্র, নানা সরঞ্জাম ও বস্ত্র, দ্রৌপদীর বস্ত্র ও দাসী ইত্যাদি নিয়ে বনের উদ্দেশ্যে যাত্রারম্ভঃ ইন্দ্রপ্রস্থবাসীদের বিলাপ ও পাণ্ডবপক্ষে অর্জুন কর্তৃক সান্ত্বনা, ২৪ অধ্যায় ও ২৫/১-৩ শ্লোক পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সেখানে গিয়ে বাস আরম্ভ গ্রাহ্য। ২১।৪ ১৯ শ্লোকে মার্কণ্ডেয় ঋষির উপদেশ, ২৬ অধ্যায়ে বকদাল্ভ্য ঋষির উপদেশ,—অবান্তর হিসাবে বাদ হবে। ২৭-৩৫ অধ্যায়ে দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির ও ভীমের দ্যূত ও বনবাস সম্বন্ধে আলোচনা, তা স্বাভাবিক ও গ্রাহ্য। ৩৫।৩২ শ্লোকে পাই যে বনবাসের ত্রয়োদশ মাস শেষ হয়েছে। ৩৬ অধ্যায়ে আছে যে ব্যাস এসে অন্য বনে যাওয়ার উপদেশ দিলেন, এবং ভীষ্ম দ্রোণ-কর্ণাদি বীরদের পরাজয় করতে অর্জুনের আরো অস্ত্রশিক্ষার জন্য দেবগণের উদ্দেশ্যে তপস্যা করা ও দেবলোকে গমন করা কর্তব্য, সেই কথা বলে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা শিখিয়ে সেই বিদ্যা অর্জুনকে যাত্রার পূর্বে শিখিয়ে দিতে বললেন। ইন্দ্রলোকে—ইলাবৃত বর্ষে, অর্থাৎ তিব্বতের পশ্চিমে অবস্থিত মধ্য এশিয়া—সমরখন্দ, বোখারা ইত্যাদি এখন যেখানে আছে, সেখানে আর্যগণের বসতি হয়েছিল, আর্যদের একাংশ সেখান থেকে ভারতবর্ষে আসেন। প্রতিস্মৃতি বিদ্যা বোধহয় সেখানে চলিত ভাষা—ভারতবর্ষে আর্যদের ভাষা কিছু পরিবর্তিত হয়েছিল। তাই ইলাবৃত-বর্ষে অস্ত্রশিক্ষার জন্য গেলে সেখানকার ভাষা শিখে নেওয়া প্রয়োজন। ব্যাস নানাস্থানে ঘুরতেন, ইলাবৃত বর্ষের ভাষা তাঁর জানা ছিল, এবং যুধিষ্ঠির ভাষাশিক্ষা দ্রুত করতে পারতেন, তিনি ম্লেচ্ছ ভাষা জানতেন—যা অন্যান্য পাণ্ডবগণের জানা ছিল না। তাই ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে সেই ভাষা শিখিয়ে চলে গেলেন। ব্যাসের-

কথায় পাণ্ডবগণ দ্বৈতবন হতে কাম্যক বনে গেলেন, যুধিষ্ঠির প্রতিস্মৃতি বিদ্যা কিছু দিনে আয়ত্ত করে অর্জুনকে শেখালেন। ৩৬ অধ্যায় গ্রাহ্য। ৩৭ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞায় অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থ যাত্রা করলেন, ১-৪১ শ্লোক গ্রাহ্য। ৪২-৫৯ শ্লোক বাদ হবে, তাতে আছে যে ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে দেখা দিয়ে বললেন যে তপস্যা করে প্রথমে শিবের দর্শন লাভ করবার চেষ্টা কর, পরে ইন্দ্রলোকে গিয়ে অস্ত্রশিক্ষা শেষ কর। মহাভারত যুগে—খৃঃ পূঃ একাদশ দশম শতাব্দীতে শিবের পূজা আর্যদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল মনে হয় না, কিরাত ইত্যাদি অনার্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

চতুর্থ অনুপর্ব কৈরাত ৩৮-৪১ অধ্যায় চারটি নিয়ে। অর্জুন শিবের আরাধনা বা শিবের জন্য তপস্যা করছিলেন, তখন বরাহের প্রতি বাণ নিক্ষেপ নিয়ে অর্জুন এক কিরাত সর্দারের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পরাজয় স্বীকার করে তাকে তুষ্ট করলেন, সেই কিরাত সর্দারই শিব—তাঁর কাছ থেকে অর্জুন পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন বলা হয়েছে। কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বা অন্য কোন সময়ে পাশুপত অস্ত্র অর্জুন ব্যবহার করেন নাই। পাশুপত অস্ত্র লাভের কথা বাদ দেওয়া যায়। ভারবির কিরাতার্জুনীয় কাব্যে সেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, ভারবি সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতকের কবি, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী বা তার পূর্বে মহাভারত বর্তমান রূপ পেয়েছে। সম্ভব মনে হয় যে অর্জুন ইলাবৃত দেশে যেতে প্রথমে হিমালয় পর্বতের দিকে যান, গন্ধমাদন পর্বত পার হয়ে যান, হিমালয়ের পথে যেতে অর্জুনের সঙ্গে একটি বরাহ শিকার নিয়ে এক কিরাত দলের সংঘর্ষ হয়, কিরাতগণ ধনুর্বিদ্যায় পটু ছিল, বাণযুদ্ধে কিরাতপতির কাছে অর্জুন পরাজয় স্বীকার করলেন; তাতে খুশী হয়ে কিরাতপতি উৎকৃষ্ট ধনুর্বিদ্যা অর্জুনকে শিখিয়ে দেন। ৩৮-৪০ অধ্যায় সেইভাবে কিছু পরিবর্তিত করে নিতে হবে। ৪১ অধ্যায় বাদ হবে, কারণ ইন্দ্রলোক গিয়ে অস্ত্রশিক্ষা লাভের পূর্বেই ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ এসে অর্জুনকে দিব্য অস্ত্র দিলে তাঁর ইন্দ্রলোকে যাবার প্রয়োজন থাকে না।

৪২-৫১ অধ্যায়ে ইন্দ্রলোকাভিগমন নামক পঞ্চম অনুপর্ব। ৪২ অধ্যায়ে আছে যে ইন্দ্র তার সারথিকে ডেকে দিব্য বিমান নিয়ে গিয়ে অর্জুনকে ইন্দ্রলোকে আনতে বললেন। সারথি মাতলি তাই করল। বিমানের কথা অনৈসর্গিক হিসাবে বাদ হবে, তবে ভারত থেকে ইলাবৃতবর্ষে, এবং ইলাবৃত থেকে ভারতবর্ষে যাতায়াতের পথ ছিল, বণিকদল দ্রব্যসম্ভার নিয়ে যাতায়াত করত। অর্জুন একটি ইলাবৃত-

বর্ষগামী বণিকদলের সঙ্গে গিয়েছিলেন অনুমান করা যায়। ৪৩ অধ্যায়ে ইন্দ্রপুরীর সৌন্দর্য ও অর্জুনের ইন্দ্র কর্তৃক অভ্যর্থনা বর্ণিত। আতিশয্য থাকলেও গ্রাহ্য। ৪৪ অধ্যায় আছে যে অর্জুন পাঁচ বৎসর ধরে অস্ত্রশিক্ষা নিলেন, নৃত্যগীত শিক্ষাও নিলেন, তা গ্রাহ্য। ৪৫-৪৬ অধ্যায়, উর্বশীর অভিসার ও অভিশাপ, সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন। ৪৭ অধ্যায়ে আছে যে লোমশ ঋষি নানা দেশে ঘু'তে ঘুরতে ইন্দ্রলোকে ইন্দ্রকে দর্শন করতে গেলেন, অর্জুনকে ইন্দ্রসহ সিংহাসনে আসীন দেখে বিস্মিত হলেন; ইন্দ্র তাকে বল্লেন, অর্জুন আমার পুত্র, তা ছাড়া অর্জুন ও কৃষ্ণ নর ও নারায়ণ ঋষি, বিশেষ কার্যের জন্য পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন; অর্জুন এখানে শিক্ষা-লাভ করে দক্ষিণা হিসাবে নিবাতকবচ দৈত্যদের বধ করে যাবে, তুমি যুধিষ্ঠিরাদিকে নানা তীর্থে নিয়ে যাও। যেহেতু ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুনের জন্ম কথা অনৈসর্গিক, নর-নারায়ণ ঋষির কথাও ঐতিহাসিক মনে হয় না, সেই কারণে এই অধ্যায় গ্রাহ্য নয়। ৪৮-৪৯ অধ্যায়ে আছে যে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষার্থ ইন্দ্রলোকে গমনের কথা শুনে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। এই অধ্যায়দ্বয়ের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে মনে হয় না, বাদ দেওয়া যায়। ৫০ অধ্যায়ে বনবাস কালে পাণ্ডব ভ্রাতাগণ মৃগয়া করে মাংস খেতেন, এবং তাঁদের পাঁচ বৎসরকাল কাম্যকে কেটে গেল, এই কথা আছে; তা বাদ হবে, কারণ অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থ গেলে পাঁচ বৎসর কাম্যক বনে কাটালে যুধিষ্ঠিরাদির তীর্থযাত্রার কথা বাদ দিতে হয়। এই সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডে ১১ অনুচ্ছেদে আলোচনা হয়েছে। ৫১ অধ্যায়ও বাদ হবে, তার থেকে কিছু শ্লোক ১২ অধ্যায়ে নেওয়া হয়েছে, তাছাড়া কৃষ্ণ যে ভাবী যুদ্ধে অর্জুনের সারথ্য অঙ্গীকার করেছেন (১৯ শ্লোক) সেকথা তখন হতে পারে না।

ষষ্ঠ অনুপর্ব নলোপাখ্যান ৫২-৭৯ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে। ভারতকথা মূলে উপাখ্যান বর্জিত ছিল, সুন্দর উপাখ্যান হলেও এটিকে বাদ দিতে হবে। নলোপাখ্যানের সূচনায় প্রথম শ্লোক—অস্ত্রহেতু পার্থ ইন্দ্রলোকে গেলে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ কি করেছিলেন।[১] তীর্থযাত্রা অনুপর্বের প্রথম শ্লোকও তার সমার্থক—

১। অস্ত্রহেতোর্গতে পার্থে শক্রলোকং মহাত্মনি। যুধিষ্ঠির প্রভৃতয়ঃ কিমকুর্বত পাণ্ডবাঃ ।। বন-৫২/১

প্রপিতামহ অর্জুন যখন কাম্যক বন থেকে চলে গেলেন, তখন অর্জুনবিহীন পাণ্ডবগণ কি করলেন।[১] তার থেকেও ধারণা হয় যে সমগ্র নলোপাখ্যান পরে যোজিত।

সপ্তম অনুপর্ব তীর্থযাত্রা পর্ব, এটি দীর্ঘ অনুপর্ব ৮০-১৫৬ অধ্যায়ে বিবৃত, এবং তিন ভাগে ভাগ করা যায়, ৮০ অধ্যায়ে তীর্থযাত্রার সূচনা হিসাবে গ্রাহ্য, তারপরে ৮১-৮৫ অধ্যায়ে নারদের তীর্থবর্ণন, নারদ আবার ভীষ্ম একদা পুলস্ত্য ঋষির কাছে যে তীর্থ বর্ণনা শুনেছিলেন, তার পুনরুক্তি করছেন। নারদের আগমন অনৈসর্গিক বলে নারদের বর্ণনা বাদ হবে। ৮৬-৯০ অধ্যায়ে পুরোহিত ধৌম্য কর্তৃক ভারতের তীর্থ বর্ণন। তাও বাদ হবে, কারণ পাণ্ডবগণ লোমশ ঋষির সঙ্গে বহু তীর্থে গিয়ে হিমালয়ের গন্ধমাদন পর্বতে অর্জুনের আগমন প্রতীক্ষা থেকে সেখানে অর্জুনের সাক্ষাৎ পেলেন (১৬৪ অধ্যায়), সেই কথা গ্রাহ্য, এবং তা হলে ধৌম্যের নিকট হতে তীর্থ বর্ণনা শোনা অবান্তর। লোমশ সহ তীর্থযাত্রা ৯১-১৫৬ অধ্যায়ে বিবৃত। গ্রাহ্য ৮০ অধ্যায়ের পরে ৮১।১ শ্লোক। ৯১-৯২ অধ্যায়ে কথিত লোমশের বিবৃতি, যে তিনি ইন্দ্রলোকে গিয়ে অর্জুন ও ইন্দ্রকে দেখে এলেন, তাঁরা লোমশকে বলেছেন যুধিষ্ঠিরাদিকে তীর্থে তীর্থে নিয়ে যেতে, তা বাদ হবে, ৪৭ অধ্যায় যেমন হয়েছে। পাণ্ডবগণ যখন কাম্যক বন হতে চলে যাবার কথা বলছিলেন, তখন বহু তীর্থ ভ্রমণ অভিজ্ঞ লোমশ ঋষি এলেন, তিনি পাণ্ডবদের অন্যত্র যাবার ইচ্ছা জেনে তীর্থযাত্রায় তাদের পথ প্রদর্শক হলেন, সেইভাবে স্বাভাবিক কাহিনী হয়। তাহলে ৮১।১ শ্লোকের পরে হবে যে সেই সময় যুধিষ্ঠির যখন ভ্রাতাদের কথা শুনে বিমনা হয়েছেন, তখন লোমশ ঋষি উপস্থিত হলেন, যথাযোগ্য পাদ্য অর্ঘ তাঁকে দেওয়া হলে, তিনি যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে বিমনা কেন দেখাচ্ছে, উত্তরে যুধিষ্ঠির বললেন—ধৌম্যকে যেমন ভাবে বলার কথা আছে (৮৬ অধ্যায়), যে অর্জুনকে অস্ত্রশিক্ষার জন্য পাঠিয়ে তাকে ছেড়ে কাম্যবনে থাকতে আর ভাল লাগছে না (৮৬।২, ১৭), লোমশ ঋষি বহু তীর্থ নদী পর্বত দেখেছেন, তিনি বলতে পারেন কাম্যক থেকে কোথায় গেলে নানা সুন্দর দৃশ্য দেখা যাবে, কোথায় গিয়ে অর্জুনের জন্য প্রতীক্ষা করা ভাল হবে (৮৩।১৮-২১)। তার উত্তরে লোমশের কথা—

১। ভগবন্ কাম্যকাৎ পার্থে গতে মে প্রপিতামহে।
পাণ্ডবাঃ কিমকুর্বংস্তে তমৃতে স্যসাচিনম্॥ বন-৯৩/১

৯২।৯, ১০, ১৬ (তাতে "ধৌম্যস্ত" স্থলে "ভ্রাতৄণাং" পড়তে হবে), ১৭-২৭ শ্লোক গ্রাহ্য, বাকী বাদ। ৯৩ অধ্যায়ে ১-১২[১], ১৫-১৮[১], ২৬-২৯ শ্লোক গ্রাহ্য, ব্যাস আর দুজন ঋষিকে নিয়ে অকস্মাৎ উপস্থিত হয়ে তাদের তীর্থযাত্রা অনুমোদন করলেন, তা বাদ হবে। ৯৪ অধ্যায় বাদ হবে, তার মধ্যে লোমশ চতুর্যুগ ব্যাপী জীবন দাবী করে কথা বলছেন, ভারত কথায় তা অবান্তর। ৯৫।১-১২ শ্লোক গ্রাহ্য, ১৩[২], ১৪[২] শ্লোক ও গ্রাহ্য:—তার থেকে পাই যে পাণ্ডবগণ (কাম্যক বন থেকে পূর্বদিকে যাত্রা আরম্ভ করে) নৈমিষারণ্যে এলেন, গোমতী নদীতে স্নান করলেন, কন্যা তীর্থাদিতে, কালকোটি পর্বতে, বিষপ্রস্থ পর্বতে বাস করে বাহুদা নদীতে অবগাহন করলেন; সেখান থেকে প্রয়াগে এসে স্নান করে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে দান ও তর্পন করলেন; সেখান থেকে যাত্রা করে তাঁরা গয়শির পর্বত, মহানদী ও ব্রহ্মসর নামক পুণ্য সরোবর দেখলেন, সরোবরের তীরে চারমাস বাস করে তাঁরা চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করলেন। ৯৫ অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ বাদ, তাতে গয় রাজর্ষির বহুদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের বর্ণনা আছে। ৯৬।১ গ্রাহ্য—পাণ্ডবগণ ব্রহ্মসর থেকে দুর্জয়া অর্থাৎ বাতাপি ইল্বলের মণিমতী পুরীস্থিত অগস্ত্য আশ্রমে এলেন। ৯৬।২ ৯৯।৩০ বাদ হবে, তার মধ্যে অগস্ত্যের ও লোপামুদ্রার কথা, বিত্তের জন্য অগস্ত্যের ইল্বল নামক অসুররাজের নিকট গমন, ইল্বল বাতাপির কথা, বাতাপিকে জীর্ণ করে অগস্ত্যের ইল্বলকে শাসন ও তার কাছ থেকে বিত্তলাভ, ইত্যাদি উপাখ্যান আছে। ৯৯।৩১ ৩৭ গ্রাহ্য, তাতে পাই যে পাণ্ডবগণ দুর্জয়া পুরী থেকে উত্তরে গিয়ে গঙ্গাদ্বারের কাছে গঙ্গা বা ভাগীরথী দেখলেন ও সেখানে স্নান করলেন; ৯৯.৩৮ ৭১ শ্লোকে দাশরথি রামের নিকট পরশুরাম হৃততেজ হয়ে বধূসর নদীতে স্নান করে তেজ ফিরে পেলেন, সেই কাহিনী সংশোধকগণই বাদ দিয়েছেন। ১০০-১০৯ অধ্যায়ে নানা উপাখ্যান আছে—বজ্র নির্মাণ, বৃত্রবধ, সমুদ্রজলে দানবদের আশ্রয় গ্রহণ, দানবদের দমন করবার উপায় বিষ্ণুর কাছ থেকে জেনে দেবগণের অগস্ত্যকে সমুদ্রপান করতে অনুরোধ, অগস্ত্য কর্তৃক বিন্ধ্যপর্বতের উর্দ্ধস্ফীতি রোধ ও সমুদ্রপান, দেবগণ কর্তৃক সমুদ্রগর্ভে দানবধ্বংস, সগর-অংশুমান কপিলের কথা, ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা পৃথিবীতে আনয়ন ও সগরপুত্রদের উদ্ধার ইত্যাদি পুরাণ কাহিনী, ভারত কাহিনীতে তা সম্পূর্ণ অবান্তর, তা সব বাদ হবে। ১১০।১-৩, ১৯-২০, ২২ ২৪[১], ২৫[২], ২৬ শ্লোক গ্রাহ্য, তাতে পাই যে পাণ্ডবগণ গঙ্গাদ্বার থেকে যাত্রা করে গঙ্গার দুটি উপনদী, নন্দা ও অপরনন্দা দেখলেন, এবং নন্দা

নদীতে স্নান করেন, আরো অগ্রসর হয়ে কৌশিকী নদীর পারে বিশ্বামিত্রের ও ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম দেখলেন; বাকী শ্লোক অবান্তর হিসাবে বাদ হবে, ১১০/২৫ হতে ১১৩/২৪ ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান বাদ; ১১৩/২৫ গ্রাহ্য, তাতে পাই যে পাণ্ডবগণ কৌশিকী নদীতীর্থে স্নান করলেন। ১১৪/১-৩, ১৩, ৩০ শ্লোক গ্রাহ্য, তাতে পাই যে কৌশিকী তীর্থ হতে ক্রমে ক্রমে পাণ্ডবগণ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে উপস্থিত হলেন, সেখানে অবগাহন স্নান সেরে তাঁরা কলিঙ্গ দেশের দিকে চললেন, বৈতরণী নদীতে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পন করলেন, তারপর যুধিষ্ঠির একাই স্বস্ত্যয়ন করে সমুদ্রে স্নান করে নিলেন; অধ্যায়ের বাকী শ্লোক অনৈসর্গিক বা অবান্তর কথায় পূর্ণ। ১১৪/৩০ শ্লোকে পাণ্ডবগণের মহেন্দ্র পর্বতে এক রাত্রি বাস করার কথা আছে, সেটি গ্রাহ্য, কিন্তু তার পরে ১১৫-১১৭/১৭[১] বাদ হবে, তাতে আছে পরশুরামের হস্তে কার্তবীর্যের নিধন ও ক্ষত্রিয় নিধন। ১১৭।১৭[২] গ্রাহ্য, তাতে পাই যে মহেন্দ্রপর্বতে একরাত্রি বাস করে পাণ্ডবগণ দক্ষিণ মুখে চললেন। ১১৮।১-৪, ৮-২৩ গ্রাহ্য, সেখানে আছে পাণ্ডবগণ বহু তীর্থ দর্শন প্রশস্তা নদীতে পিতৃতর্পণ ও স্নান করলেন, পরে গোদাবরী সাগর সঙ্গমে স্নান করে দ্রাবিড় দেশে পৌছালেন, সেখানে অগস্ত্যতীর্থ, নারীতীর্থাদি দেখে আরো দক্ষিণে সমুদ্রতীর ধরে এগিয়ে গেলেন, বহু তীর্থ পার হয়ে পুণ্য শূর্পারক তীর্থে এলেন, সেখানে সমুদ্রের একটি বাহু পার হয়ে বহু যজ্ঞবেদী শোভিত অরণ্যময় এক দ্বীপে ঘুরে এলেন, তারপর সমুদ্রতীর দিয়ে উত্তর দিকে গিয়ে প্রভাসতীর্থে পৌছে কয়েকদিন তপস্যা করলেন, তাদের আগমন বার্তা পেয়ে বলরাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি ইত্যাদি বৃষ্ণি বীরগণ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ১১৮।৫-৭ শ্লোকে অর্জুনের কীর্তির নিদর্শনের কথা আছে, কিন্তু সেই কীর্তির আখ্যান বাদ দেওয়াতে তার উল্লেখ বাদ হবে। ১১৯-১২০ অধ্যায়ে পাণ্ডবগণ সহ বৃষ্ণিবীরদের আলোচনার কথা আছে, সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। ১২০ অধ্যায় শেষে আছে যে যুধিষ্ঠিরাদি দ্বারকা থেকে বিদর্ভ রাজ্য স্থিত পয়োষ্ণী নদীতীর্থে উপস্থিত হলেন। ১২১।১-২২ গ্রাহ্য, লোমশ বলছেন যে পয়োষ্ণীর তীর্থে কত রাজা যজ্ঞ করেছেন; পয়োষ্ণীতে স্নান করে পাণ্ডবগণ লোমশের সঙ্গে বৈদূর্য পর্বত দেখলেন, সেখান থেকে নর্মদা নদীর তীরে নেমে শুনলেন যে সেখানে শর্যাতি রাজার যজ্ঞ হয়েছিল এবং শর্যাতির কন্যা সুকন্যার সহিত চ্যবন ঋষির বিবাহ হয়। ১২১।২৩-২৪ বাদ হবে, তা হল চ্যবন-সুকন্যা উপাখ্যানের ভূমিকা;

ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে রক্ষীগণ বাধা দিল, ভীম বহু যক্ষ ও রাক্ষস রক্ষী বধ করলেন, মণিমান্ নামক এক কুবের সেনাপতিও নিহত হল। শব্দ শুনে যুধিষ্ঠিরাদি এলেন, ভীমের কৃত কর্ম দেখে বললেন, তুমি দু:সাহস করেছ, আমার প্রিয় চাইলে এমন কার্য আর করবে না। তারপরে কুবের এলেন, তার কাছে যুধিষ্ঠিরাদি প্রণত হলেন, কুবের যুধিষ্ঠিরাদির পরিচয় পেয়ে ভীমের অপরাধ ক্ষমা করলেন। অনেকটা একরকম কাহিনী দুবার বলা হয়েছে, দুবারই যুধিষ্ঠিরের অনুযোগ আছে "পুনরেবং ন কর্তব্যং মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্।" যক্ষ যুদ্ধ পর্বের কথা পর্ব সংগ্রহে আছে, তীর্থযাত্রা কাহিনীর শেষভাগে কোন পরের কালের কবি সৌগন্ধিক পদ্ম কাহিনী রচনা করে যোগ করে দিয়েছেন, তার মধ্যে হনুমান্ সহ সাক্ষাৎ ইত্যাদি অনৈসর্গিক কথা এনেছেন। অতএব যক্ষযুদ্ধ পর্ব মূল ধরে সৌগন্ধিক পদ্ম কাহিনী—১৪৬-১৫৬ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ১৫৬ অধ্যায় সঙ্গে তীর্থযাত্রা অনুপর্ব শেষ, যদিও লোমশ ঋষি আরো কিছুকাল পাণ্ডবগণের সঙ্গে থাকলেন।

৭. বনপর্ব—জটাসুর বধ হতে আবণেয অনুপর্ব

অষ্টম অনুপর্ব জটাসুর বধ একটি মাত্র অধ্যায়ে (১৫৭) বিবৃত। সংশোধিত পাঠ মতে গ্রাহ্য।

নবম অনুপর্ব যক্ষযুদ্ধ ১৫৮-১৬৪ অধ্যায়ে বিবৃত। তার মধ্যে ১৬৩ অধ্যায়, ধৌম্য কর্তৃক লোকপালদের আবাস ও মেরু প্রদর্শন, বাদ হবে। বাকী ছয়টি অধ্যায় গ্রাহ্য।

দশম অনুপর্ব নিবাত কবচ যুদ্ধ—১৬৫-১৭৫ অধ্যায়ে বিবৃত। সংশোধকগণ পুরাতন অনুপর্ব বিভাগ অনুসরণ করে এটিকে যক্ষযুদ্ধ অনুপর্বের মধ্যে ১৬৪ অধ্যায় থেকে ১৭ ২০ শ্লোক বাদ দিয়ে সেটিকে ১৬৫ অধ্যায় সহ যুক্ত করেছেন। কিন্তু ১৬৫ অধ্যায়ে অর্জুনের মাতলি চালিত বিমানে আগমন বর্ণিত হয়েছে, সেকালে বিমানের অর্থাৎ আকাশযানের অস্তিত্ব সম্ভব না হওয়ায় তা গ্রাহ্য নয়, অর্জুন সার্থবাহ বা বণিকদের সঙ্গে গর্দভ বা অশ্বতর বা চমরী মৃগের পিঠে গিয়েছিলেন এসেছিলেন, সেই অনুমানই যুক্তিযুক্ত। ১৬৬ অধ্যায়ে অর্জুন আগমনের পরদিন বিমানে ইন্দ্রের আগমন কথা আছে, বলা হয়েছে যে ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে অর্জুন একাগ্রমনে শিক্ষা করে বহু অস্ত্র ও অস্ত্রচালনা কৌশল আয়ত্ত করেছে, তার ফলে তুমি পৃথিবী শাসন করতে পারবে, এবার তোমরা কাম্যক বনে ফিরে যাও।

মধ্য এশিয়ার ইলাবৃতবর্ষের আর্য অধিপতি ইন্দ্র নামে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর বিমানে আগমন কথা গ্রাহ্য নয়, ১৬৬ অধ্যায় শেষে পাঠ মহিমা উক্ত হয়েছে, তাও অধ্যায়টির পরের কালের যোজনা সূচিত করে। তাছাড়া পাণ্ডবগণ আরো চার বৎসর গন্ধমাদনেই রইলেন। ১৬৫-১৬৬ অধ্যায় বাদ হবে, এবং ১৬৪ অধ্যায়ের ১৭-২০ শ্লোক মধ্যে ১৭,২০ শ্লোক থাকবে, তাতে অনৈসর্গিকতা বাদ দিবে অর্জুনের পাঁচ বৎসর ধরে নানা অস্ত্রকৌশল শিখে গন্ধমাদন পর্বতে আগমনের কথা আছে। ১৬৭/১ শ্লোকের প্রথম পাদ "যথাগতংগতে শক্রে" স্থলে "তথা শক্রলোকাদেত্য" বসতে পারে, বাকী গ্রাহ্য, ২-৭¹, ১০-২৬, ৩০-৩৩, ৩৯-৪০ গ্রাহ্য, তারপরে আছে যে কিরাত নেতা শিবের রূপধারণ করলেন ও বর দিলেন, তার পরিবর্তে কিরাত-রাজই প্রসন্ন হয়ে উৎকৃষ্টতর ধনুর্বিদ্যার কৌশল শেখালেন, এইভাবে বাকীটা পরিবর্তিত হবে। ১৬৮ অধ্যায়ের প্রথম ভাগে লোকপালগণের আগমন ও অস্ত্র-দানের কথা আছে, তা বাদ হবে, মাতলি চালিত ইন্দ্র বিমানে ইন্দ্রলোকে গমনের কথা বাদ দিয়ে সার্থবাহ দলের সঙ্গে গমনের কথা বসাতে হবে। গ্রাহ্য ১৬৮/৫৪²—৮৬, ১৬৯/১-২২, ১৭০, ১৭২ অধ্যায়, ১৭১ অধ্যায় বাদ, শুধু বর্ণনা বাহুল্য। ১৭২ অধ্যায় গ্রাহ্য, ১৭৩ অধ্যায় বাদ—তাতে নিবাত কবচ-পুর ধ্বংস শেষ করে কালকঞ্জ ও পৌলোমজ দানবদের পুর আক্রমণের ও জয়ের কথা আছে, পাশুপত অস্ত্রের ব্যবহারকথাও আছে। ইন্দ্র গুরুদক্ষিণা হিসাবে শুধু নিবাত-কবচদের উচ্ছেদ চেয়েছিলেন, অতএব ১৭৩ অধ্যায় বাদ হবে। আখ্যানপূরণের জন্য ১৭৩/৬৭-৬৮¹ মিলিয়ে "দেবরাজস্য ভবনং কৃতকর্মাহমাগমম্"—তার পরে ৬৮², ৬৯¹, ৭০-৭৫ শ্লোক গ্রাহ্য। ১৭৪/১-১১, ১৫-১৭ গ্রাহ্য, ১৭৫/১ ৮ গ্রাহ্য, ৯-২৫ স্থলে হবে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখে অর্জুনের স্মরণ হল যে অ প্রয়োজনে দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ নিষেধ, তিনি সব দিব্য অস্ত্র সংবরণ করলেন এবং পৃথিবী স্থির হ'ল, তারপর পাণ্ডবগণ কৃষ্ণা সহ সুখে বাস করলেন। নারদের ও অন্য দেবগণের এখানে আগমনের কথা বাদ হবে।

একাদশ অনুপর্ব আজগর ১৭৬—১৮১ অধ্যায়ে বিবৃত। ১৭৬ অধ্যায় গ্রাহ্য, তাতে আছে যে অর্জুন ফিরে আসবার পরে পাণ্ডবগণ সুখে আরো চার বৎসর গন্ধমাদন পর্বতে বাস করলেন, তাতে বনবাসের দশ বৎসর পূর্ণ হল; তারপরে তাঁরা গন্ধমাদন থেকে ফিরে চললেন, লোমশ ঋষি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ১৭৭ অধ্যায় গ্রাহ্য, ভাতে আছে যে পাণ্ডবগণ পর্বত থেকে নেমে

এসে সুবাহু রাজার নিকট গচ্ছিত রথ ও অনুচরবর্গ নিয়ে বিশাখযূপ নামক একটি বনে এক বৎসর কাটালেন, সেখানে ভীম একদিন একটি অজগরের কবলে পড়েছিলেন, যুধিষ্ঠির গিয়ে তাঁকে অজগরের কবলমুক্ত করেন। তারপর দ্বাদশবর্ষ তাঁরা দ্বৈতবনে কাটাবেন স্থির করে সেখানে গেলেন। ১৭৮-১৮১ অধ্যায়ে ভীমের অজগরকবলে পড়ার কথা ও উদ্ধারের কথাকে অনৈসর্গিক রূপ দিয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে, অজগরটি শাপভ্রষ্ট নহুষ, যুধিষ্ঠির তার প্রশ্নগুলির উত্তর দিলে ভীমের মোচন ও নহুষের শাপমুক্তি হল, এইভাবে কাহিনীর রূপ দেওয়া হয়েছে। পরের কালের যোজনা হিসাবে ১৭৮-১৮১ অধ্যায় বাদ হবে।

দ্বাদশ অনুপর্ব মার্কণ্ডেয় সমাস্যা, তীর্থযাত্রা পর্বের মত একটি বিস্তৃত অনুপর্ব, ১৮২-২৩২ অধ্যায়ে বিবৃত। মার্কণ্ডেয় সমাস্যা একখানি পুরাণের মত, সমাস্যা—অর্থাৎ পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণ এক সঙ্গে বসে মার্কণ্ডেয়র কথা শুনছেন। কথাগুলির মধ্যে নারায়ণ রূপী মৎস্য ও মনুর কাহিনী, ধুন্ধুমার কাহিনী, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম কথা ও যুদ্ধে কার্ত্তিকেয় কর্তৃক তারকাসুর ও মহিষাসুর বধ বৃত্তান্ত, ধর্ম ব্যাধের ধর্মউপদেশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য, কিছু অর্বাচীন কাহিনীও আছে; সংশোধক মণ্ডলী এই অনুপর্ব হতে ছাটটি অধ্যায়—১৯৬-১৯৮, ২০০ ও ২৩২ অধ্যায়—সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। কিন্তু সমগ্র অনুপর্বটিই পরে যোজিত মনে হয়। ১৮২ অধ্যায়ে দ্বৈতবনে বর্ষাবর্ণন এবং পাণ্ডবগণের বর্ষা শেষে দ্বৈতবন ছেড়ে কাম্যক বনে যাওয়ার কথা আছে। ১৮৩ অধ্যায়ে আছে যে পাণ্ডবগণ কাম্যকবনে এসেছেন জেনে কৃষ্ণ সত্যভামাকে নিয়ে সেখানে এলেন, অভিমন্যু ও দ্রৌপদী পুত্রগণের কথা বললেন—দ্রৌপদী পুত্রগণ পাঞ্চাল রাজধানী থেকে অভিমন্যুর সঙ্গে দ্বারকায় থাকতে গিয়েছিল—তখন বহু সহস্র বর্ষজীবী মার্কণ্ডেয় মুনি সেখানে এলেন, তাঁকে যথারীতি অভ্যর্থনার পরে কৃষ্ণ তাঁকে পুরাণ কথা শোনাতে বললেন এবং মার্কণ্ডেয় কয়েকদিন ধরে সাতমাশের পরে বসে কাহিনী শোনালেন। কিন্তু পূর্বে ১৭৭ অধ্যায়ে আছে যে পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বর্ষ দ্বৈত বনে কাটাবেন ঠিক করে সেখানে গেলেন। তাহলে বর্ষা শেষ হতে আবার কাম্যক বনে কেন যাবেন? ঘোষযাত্রা অনুপর্ব ২৩৬ অধ্যায় হতে, তার প্রথম শ্লোক হল যে দ্বৈতবনে পুণ্য সরোবর তীরে বাস স্থাপন করে পাণ্ডবগণ কি করলেন? অর্থাৎ ঘোষযাত্রার সময় পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে ছিলেন। তাঁরা যে কাম্যক বন থেকে ফিরে দ্বৈতবনে গেলেন, সেকথা মার্কণ্ডেয় সমাস্যা পর্ব শেষে বা দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদ শেষে বলা হয় নাই। ঘটনাসমূহ কাল

পর্বার অনুসারে বলা হয়েছে, কৃষ্ণ ও মার্কণ্ডের ঋষির কাম্যক বনে আগমনের পূর্বেই যে ঘোষযাত্রার ঘটনা ঘটেছিল, তা বলা যায় না। অতএব বর্ষাশেষে পাণ্ডবগণের কাম্যক বনে আগমনের কথা, এবং সেখানে কৃষ্ণের ও মার্কণ্ডের ঋষির আগমন কথা পরে কল্পিত; ১৭৭ অধ্যায়ের পরেই ২৩৬ অধ্যায় বসবে, মধ্যে যেসব অধ্যায় আছে, শুধু মার্কণ্ডের সমাস্যা নয়, কিন্তু দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদও পরের কালের যোজনা হিসাবে বাদ হবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "কৃষ্ণ চরিত্র" গ্রন্থে বলেছেন যে এই দুটি অনুপর্ব যোজিত; দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদকে স্পষ্টতঃই প্রক্ষিপ্ত বলেছেন, মার্কণ্ডের সমাস্যা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করছেন যে সেটি প্রক্ষিপ্ত। তিনি স্যমন্তক মণির কথা এবং সত্রাজিত কর্তৃক সত্যভামাকে কৃষ্ণের হস্তে অর্পন করার কথাও বিশ্বাস করেন নাই। এই কথাগুলি বিশ্বাসযোগ্য মনে করলেও মার্কণ্ডের সমাস্যা অনুপর্ব এবং দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদ অনুপর্ব সম্বন্ধে মহাভারত কাহিনী আলোচনা করে দেখলে সেদুটি পরে যোজিত অনুমান ছাড়া উপায় নাই। যেরূপ আত্যন্তিক পতিসেবার কথা দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদে আছে, তা দ্রৌপদীর কথা বলে মনে হয় না, এই অনুপর্ব ভারত কথার অঙ্গ বলে ধরা যায় না। অতএব শুধু মার্কণ্ডেয় সমাস্যা নয়, ২৩৩-২৩৫ অধ্যায়ে বিবৃত ত্রয়োদশ অনুপর্ব, দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদও বাদ হবে।

চতুর্দশ অনুপর্ব ঘোষযাত্রা ২৩৬-২৫৭ অধ্যায়ে বিবৃত। ধার্তরাষ্ট্রগণ ঐশ্বর্যের আড়ম্বর করে দ্বৈতবনের সরোবরের কাছে তাদের পটমণ্ডপ করে সেখানে গোধন গণনা উপলক্ষ করে গিয়ে পাণ্ডবগণের মনে ঈর্ষা ও ক্লেশের উদ্রেক করবেন, সেই উদ্দেশ্যে স্ত্রীগণসহ গিয়ে সরোবরে স্নানের অধিকার নিয় গন্ধর্বদের সঙ্গে কলহ ও যুদ্ধ বাধালেন, চিত্রসেনের নেতৃত্বে গন্ধর্বসৈন্য কৌরব সৈন্যদের পরাজিত করে দুর্যোধন ও তার ভ্রাতা ও স্ত্রীগণকে বেঁধে নিয়ে চললেন, কর্ণ যথাসাধ্য যুদ্ধ করে তাদের ঠেকাতে পারলেন না। সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে ভীম ও অর্জুন তীব্র যুদ্ধে গন্ধর্বদের পরাজিত করে দুর্যোধন ও তার ভ্রাতা ও স্ত্রীগণকে উদ্ধার করে আনলেন। এটি মূল ভারত কথার অংশ এবং গ্রাহ্য। তবে দুর্যোধনের প্রায়োপবেশনের সংকল্প জেনে দানবগণ অভিচার ক্রিয়া করে কৃত্যা উৎপন্ন করে তাকে দিয়ে দুর্যোধনকে পাতালে নিয়ে যাওয়া ও সান্ত্বনা দিয়ে জীবন রক্ষা করতে প্রচোদিত করার কথা অনৈসর্গিক হিসাবে বাদ হবে—বাদ ২৫১/২১[২] হতে ২৫২/৩১ শ্লোক। এই অনুপর্বেই দুর্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞ ক্রিয়ার বর্ণনা ও কর্ণের যজ্ঞের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থ দিগ্বিজয়ের কথা আছে, কর্ণের দিগ্বিজয় কথা সংশোধক মণ্ডলী

বাদ দিয়েছেন—অর্থাৎ ২৫৩/১৭ হতে ২৫৪ অধ্যায় সমগ্র বাদ দিয়েছেন, কিন্তু বৈষ্ণব যজ্ঞের কথা রেখেছেন। বৈষ্ণব যজ্ঞের কথা পর্ব সংগ্রহ নাই, অতএব তাও বাদ হবে, ২৫৩ ২৫৭ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। বৈষ্ণব যজ্ঞটি যুধিষ্ঠির কৃত রাজসূয় যজ্ঞের উত্তর হিসেবে করার কথা আছে, তা রাজসূয় যজ্ঞের প্রায় বারো বৎসর পরে কেন করা হবে?

পঞ্চদশ অনুপর্ব মৃগস্বপ্নোদ্ভব পর্ব ১৭টি শ্লোক যুক্ত একটিমাত্র অধ্যায়ে (২৫৮) সমাপ্ত। যুধিষ্ঠির যেন স্বপ্নে মৃগদের আবেদন শুনছেন, আপনারা দ্বৈতবন ছেড়ে অন্য বনে যান, না হলে এখানে মৃগের বংশ লোপ পাবে, স্বপ্নের কথা বলে যুধিষ্ঠির সকলকে কাম্যক বনে নিয়ে গেলেন। কবির কাম্যক বনের প্রতি বেশী টান, বার বার দ্বৈতবন থেকে পাণ্ডবদের কাম্যক বনে নিয়ে যান। পাণ্ডবগণ বিবেচনা করে দ্বাদশ বর্ষ দ্বৈতবনে থাকা সাব্যস্ত করেছিলেন। ব্যাসের কথায় ত্রয়োদশ মাস পরেই তাঁরা দ্বৈতবন ছেড়ে কাম্যক বনে গেলেন, তার পরে কাম্যক বনে, তীর্থে ও হিমালয়ে পাণ্ডবদের প্রায় দশ বৎসর কেটে গেল, তারপরে তাঁরা বনবাসের দ্বাদশ বৎসরটি দ্বৈতবনে কাটাবেন স্থির করলেন, সেখানে কয়েক মাসের মধ্যেই কেন মৃগদের বংশ লোপ সম্ভাবনা হবে। অতএব এই অনুপর্ব বাদ দেওয়া সঙ্গত।

ষোড়শ অনুপর্ব ২৫৯-২৬১ অধ্যায়ে বিবৃত ব্রীহিদ্রৌণিক পর্ব। বলা হয়েছে যে বনবাসের দুঃখে যুধিষ্ঠির দীনমনা হয়ে চিন্তা করছেন, তখন ব্যাস ঋষি উপস্থিত হলেন ও তাঁকে বললেন, পৃথিবীতে একটানা সুখ বা দুঃখ কখনও হয় না; সত্য, তপস্যা, দান ইত্যাদিতে সর্বদা শুভফল পাওয়া যায়; তারপরে ব্যাস উঞ্ছবৃত্তিধারী মুদ্গল নামক ব্রাহ্মণের কাহিনী শোনালেন, ধান কাটা হলে ক্ষেত্রে যে সব ধান পড়ে থাকে, ব্রাহ্মণ পক্ষকাল ধরে তা কুড়িয়ে এনে একটি দ্রোণ বা কলসে রাখতেন, তারপরে দর্শ বা পৌর্ণমাস যজ্ঞ (অমাবস্যায় বা পূর্ণিমা তিথিতে করণীয় যজ্ঞ) করে সেই কলসে সঞ্চিত ধানের চাল দিয়ে সমস্ত পরিবারের ভোজন হ'ত, এই ভাবে পরিবারে দুই সপ্তাহ পরে পরে এক এক দিন পুরো খাওয়া হ'ত; দুর্বাসা ঋষি কয়েকবার পর পর দর্শ-পৌর্ণমাস উপলক্ষে এসে সব চালের ভাত খেয়ে বা নষ্ট করে যাওয়া সত্ত্বেও মুদ্গলের কোন বিকার বা ক্রোধ হ'ল না; তিনি ক্রমে স্বর্গের মোহও ত্যাগ করে মোক্ষলাভ করলেন। এইরূপ কাহিনীর কোন সার্থকতা নাই, উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের জীবন ব্রতের মত ব্রত

কারও অবলম্বনীয় হতে পারে না। উপাখ্যান হিসাবেও অনুপর্বটি বাদ হবে; বনবাসের প্রায় শেষকালে যুধিষ্ঠিরেরও দীনমনা হবার কারণ নাই।

সপ্তদশ অনুপর্বে ২৬২-২৭১ অধ্যায়—অনুপর্বের নাম দ্রৌপদী হরণ। পাণ্ডবগণ শিকারে গেলে জয়দ্রথ অনুচরসহ পাণ্ডব-কুটিরের নিকট দিয়ে যাওয়া কালে দ্রৌপদীকে আশ্রমে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে রথে উঠিয়ে নিয়ে যায়, ভীম-অর্জুন অনুসরণ করে গিয়ে জয়দ্রথকে বেঁধে নিয়ে আসেন। ২৬২-২৬৩ অধ্যায়ে দ্রৌপদীর নৈশ ভোজন শেষের পরে দুর্বাসার সশিষ্য আগমন, এবং কৃষ্ণকে স্মরণ করে দ্রৌপদীর বিপদ হতে উদ্ধার বর্ণিত। এ দুটি অধ্যায় অনৈসর্গিকতা হেতু বর্জনীয়; সংশোধকমণ্ডলীও এ দুটি অধ্যায় বাদ দিয়েছেন। ২৬৪-২৭১ অধ্যায় গ্রাহ্য।

অষ্টাদশ অনুপর্ব জয়দ্রথ-বিমোক্ষণ ২৭২ অধ্যায়ে কথিত—জয়দ্রথকে ভীম অর্জুন বন্দী করে আনলে যুধিষ্ঠির তাকে মৃদু ভর্ৎসনা করে মুক্তি দিলেন। এই অধ্যায়ের ২৯২ শ্লোক হতে ৮০ শ্লোক পর্যন্ত সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন। ২৭২-২৯১ শ্লোকে কথিত গঙ্গাদ্বারে জয়দ্রথ শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যা করে বর পেলেন যে যুদ্ধে অর্জুন ছাড়া অন্য পাণ্ডবদের তিনি যুদ্ধে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন। শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যা করে বর পাওয়ার পরিবর্তে বলা যায় যে জয়দ্রথ গঙ্গাদ্বারে কোন বিশিষ্ট অস্ত্রগুরুর নিকট গিয়ে কিছুকাল ধরে অভ্যাস করে এতটা উৎকর্ষ লাভ করলেন যার ফলে তিনি যুদ্ধে অর্জুন ছাড়া অন্য পাণ্ডবদের ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ হলেন।

ঊনবিংশ অনুপর্ব ২৭৩ ২৯২ অধ্যায়ে বিবৃত রামোপাখ্যান, উপাখ্যান হিসাবে বাদ হবে; মহাভারতে যোজনা কালে রামায়ণ-কথায় কিরূপ ছিল তা এই উপাখ্যান থেকে জানা যায়। কিন্তু তা পরিশিষ্টে স্থান পাবে, মূল ভারতকথা মধ্যে নয়।

বিংশ অনুপর্ব ২৯৩ ২৯৯ অধ্যায়ে বিবৃত পতিব্রত্য-মাহাত্ম্য বা সাবিত্রী উপাখ্যান। সুন্দর উপাখ্যানটি মহাভারতে যোজিত হওয়ায় রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু তা মূল ভারতকথার অংশ নয়।

একবিংশ অনুপর্ব ৩০০ ৩১০ অধ্যায়ে বিবৃত কুণ্ডলাহরণ (কুণ্ডল-আহরণ) অনুপর্ব। এটিতে কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত, কুণ্ডল ও কবচ সহ জন্মের কথা, কর্ণের দান-ব্রতের সুযোগ নিয়ে ইন্দ্র কর্তৃক কর্ণের সহজাত অভেদ্য কবচ ও কর্ণকুণ্ডল নিয়ে তার পরিবর্তে একটি এক পুরুষঘাতী শক্তি বা ক্ষেপণাস্ত্র দানের কথা আছে। এটি যে বনপর্বের মধ্যে যোজনা, তা স্পষ্ট; কর্ণের কথা যুধিষ্ঠিরের কোন প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয় নাই, কিংবা পাণ্ডবগণের বনবাসকালের ঘটনা বর্ণনা করতে বলা হয়

জনমেজয় ভারতকথা শ্রবণকালে প্রশ্ন করছেন, যুধিষ্ঠিরের নিকট লোমশ ঋষি যে বলেছিলেন, ইন্দ্র বলেছেন তোমার কর্ণ সম্বন্ধে যে ভয় আছে, তা আমি দূর করে দেব, সে ভয়ের কারণ কি এবং কি ভাবে দূর করা হ'ল ? তার উত্তরে বৈশম্পায়ন কর্ণের জন্ম থেকে আরম্ভ করে ইন্দ্রের কবচ ও কুণ্ডলের পরিবর্তে একপুরুষঘাতী শক্তি দানের কথা বললেন। লোমশ ঋষির সেই উক্তি আছে ১১/২৩২-২৪২ পংক্তিতে, তা এই নির্বাচন কালে বাদ দেওয়া হয়েছে। লোমশ ঋষি যে ইন্দ্রলোকে গিয়ে সেখানে অর্জুনকে দেখেছিলেন, তা আছে ৪৭ অধ্যায়ে, সেটিও এই নির্বাচনের ফলে বাদ হয়েছে, এবং তাতে ইন্দ্রের এমন কথা নাই যে যুধিষ্ঠিরকে বলবে যে কর্ণ সম্বন্ধে তার যে ভয়, তার কারণ আমি দূর করে দেব। এই অসঙ্গতি হেতুও অনুপর্বটি বর্জনীয়। কুণ্ডল ও কবচ পরিহিত ভাবে জন্মও অসম্ভব. দেবরাজ ইন্দ্রের আগমন কথা ও কবচকুণ্ডল দান হিসাবে গ্রহণের কথাও অনৈসর্গিক। দেবরাজ ইন্দ্র এবং ইলাবৃত বর্ষের আর্যরাজা ইন্দ্র এক নয়।

দ্বাবিংশ অনুপর্ব ৩১১-৩১৫ অধ্যায়ে কথিত আরণেয় পর্ব। এই পর্বে আছে যে ধর্ম মৃগের রূপে এক ব্রাহ্মণের অরণিকাষ্ঠ হরণ করলেন, অরণির সন্ধানে গিয়ে তৃষার্ত হয়ে দ্বৈতবনের সরোবরে জল যক্ষের আদেশ উপেক্ষা করে স্পর্শ করার ফলে একে একে সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীম প্রাণ হারালেন, যুধিষ্ঠির এসে যক্ষরূপী ধর্মের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করলেন, ফলে ধর্ম পাণ্ডব ভ্রাতা চতুষ্টয়কে পুনর্জীবিত করলেন ও ব্রাহ্মণের অরণি ফিরিয়ে দিলেন। উপাখ্যান অতিপ্রাকৃত, তাই অনুপর্বের অধিকাংশ বাদ হবে। গ্রাহ্য শুধু ৩১১।১, ৩২, ৪ পরে দ্বৈতবনে তাদের বনবাসের দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হ'ল, এরূপ একটি শ্লোক বসবে (যথা 'এবং পুণ্যে দ্বৈতবনে নিবসন্তোদ্বিজৈঃ সহ। নিস্তিতিরু র্বর্ষান্তে পূর্ণান্ দ্বাদশবৎসরান্॥")। তারপরে ৩১৫।১২-৮, ২৩-৩১ শ্লোক গ্রাহ্য। বাকী সব বাদ হবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ২৭৩।১ শ্লোক এবং ৩১১।১ শ্লোক প্রায় অবিকল এক ; তার থেকেও অনুমান করা যায় যে জয়দ্রথ বিমোক্ষণ অনুপর্বের পরে রামোপাখ্যান, পতিব্রতা মাহাত্ম্য ও কুণ্ডলাহরণ পরে যোজিত; জয়দ্রথ বিমোক্ষণের পরে আরণেয় পর্ব পড়লে অর্থাৎ ৩১১ অধ্যায় থেকে আরম্ভ করলে কোন ছেদ পড়ে না। ৩১৩ অধ্যায়ে যক্ষরূপী ধর্মের প্রশ্ন ও যুধিষ্ঠিরের উত্তরসমূহ সুভাষিতাবলীর মধ্যে স্থান পেয়েছে, তবে তা অনৈসর্গিক বলে ভারত কথার অন্তর্গত নয়। সংশোধকগণ তার মধ্যেও অনেক প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পেয়েছেন।

৮. বিরাট পর্ব

প্রথম অনুপর্ব পাণ্ডব প্রবেশ (প্রমাণ সংস্করণে) বা নগর প্রবেশ (সংশোধিত সংস্করণে) প্রমাণ সংস্করণের ১- ২ অধ্যায়ে বিবৃত, তার মধ্যে ৬ নং অধ্যায়ে বর্ণিত দুর্গাস্তব সংশোধিত সংস্করণে বাদ হয়েছে। ১ অধ্যায়ের ৩, ৪ শ্লোক সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন, ৫ ৬ শ্লোকও বাদ হবে, কারণ বনপর্বে ধর্মের মৃগরূপে ও যক্ষরূপে আগমনের কথা বাদ দেওয়া হয়েছে ও সেই কারণে ১০, ১৫ শ্লোকও বাদ হবে। ২ অধ্যায়ে অর্জুন কিভাবে অজ্ঞাতবাসে থাকবেন সেই প্রশ্ন করতে যুধিষ্ঠির দীর্ঘ প্রশস্তি করেছেন, ভীমকে যেমন এক শ্লোকে সেই প্রশ্ন করা হয়েছিল, অর্জুনকেও তাই করা সঙ্গত, তাই ১১-২৪ শ্লোক বাদ দিয়ে একটি শ্লোক বসবে, যথা "গাণ্ডীবধন্বা বীভৎসুঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্। স ত্বম্ কিংকর্ম কৌন্তেয় করিষ্যসি ধনঞ্জয়॥" (১২ ও ১৯ শ্লোক মিলিয়ে)। ৩ অধ্যায়ে (নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে প্রশ্ন) সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য। ৪ অধ্যায়ে পুরোহিত ধৌম্যের দীর্ঘ উপদেশ আছে রাজার গৃহে গিয়ে পরিচারকরূপে অজ্ঞাতবাস করতে হলে কিভাবে আচরণ করতে হবে, সে উপদেশ অবান্তর মনে হয়; অতএব ৬৫৪ শ্লোক বাদ হবে, অবশিষ্ট শ্লোকের সংশোধিত পাঠ নিতে হবে। অবশিষ্ট অধ্যায় সমূহ সংশোধিত পাঠযুক্তভাবে গৃহীত হবে।

দ্বিতীয় অনুপর্ব সময় পালন ১৩-২৭ অধ্যায়ে বিবৃত, সেটি সংশোধিত পাঠ মত গৃহীত হবে।

তৃতীয় অনুপর্বে কীচক বধ ১৪-২৪ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ১৪ অধ্যায় (কীচকের কৃষ্ণাকে আমন্ত্রণ ও কৃষ্ণার উত্তর) থেকে সংশোধকগণ অনেক শ্লোক বাদ দিয়েছেন, সংশোধিত পাঠ গৃহীত হবে। কৃষ্ণার সূর্য উপাসনা করে এক অদৃশ্য রাক্ষস রক্ষী পাওয়ার কথা ১৫, ১৬ অধ্যায়ে আছে, তা অনৈসর্গিক, তা ছাড়া সেই রক্ষীর দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হয় নাই, অতএব ১৫।১৯, ২০ ও ১৬।১১।৭।১২ বাদ হবে; ১৬ অধ্যায় হতে সংশোধকগণ আরো কিছু শ্লোক বাদ দিয়েছেন, সংশোধিত পাঠ নেওয়া হবে। ১৭।২০ অধ্যায়ে কৃষ্ণার ভীমের নিকট গিয়ে বিপদের কথা বলে রক্ষা প্রার্থনা সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্য। ২১ অধ্যায় ভীমের সান্ত্বনাবাণী ও কৃষ্ণার বিলাপ সংশোধিত সংক্ষেপিত পাঠ গ্রাহ্য। ২২ অধ্যায়, কীচক বধের উপায় স্থির ও কীচক বধ, সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য;

বেশ কিছু শ্লোক সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন। ২৩-২৪ অধ্যায় কীচকের দেহ সৎকার ও উপকীচক বধ, সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য।

চতুর্থ অনুপর্ব—গোহরণ ও যুদ্ধ বর্ণনা—২৫-৬৯ অধ্যায় নিয়ে। ২৫-২৭ অধ্যায় গ্রাহ্য—অজ্ঞাতবাসে পাণ্ডবদের সন্ধান না পেয়ে চরগণের নিবেদন, দুর্যোধন কর্ণ দুঃশাসনের আরো সন্ধানের আদেশ। ২৮ অধ্যায়ে ভীষ্মের ও ২৯ অধ্যায়ে কৃপের উক্তি, কিভাবে সন্ধান করতে হবে সেই বিষয়ে—এই দুটি অধ্যায় বাদ যেতে পারে, কারণ তার পরেই দেখা যায় যে ত্রিগর্তরাজা কীচকবধের সংবাদ দিয়ে বিরাটরাজ্য আক্রমণ করে গোলুণ্ঠন প্রস্তাব করে, এবং সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়, পরে আর চরকৃত সন্ধানের কথা নাই, অতএব ভীষ্ম ও কৃপের কথা অনাবশ্যক। ৩০ অধ্যায়ে ত্রিগর্ত রাজ সুশর্মার প্রস্তাব, গ্রাহ্য। ৩১ অধ্যায়ে সুশর্মা কর্তৃক দক্ষিণ গোশালাসমূহ আক্রান্ত হলে বিরাট রাজের যুদ্ধোদ্যোগ, ৩২ অধ্যায়ে বিরাট রাজ ও সুশর্মার যুদ্ধ বর্ণন। সংশোধকগণ ৫-৬টি করে শ্লোক বাদ দিয়েছেন, সংশোধিত পাঠ নেওয়া যায়। ৩৩ অধ্যায় বিরাট রাজের বন্দী হওয়ার কথা ও ভীম কর্তৃক তীব্র যুদ্ধে বিরাট রাজকে মুক্ত করে সুশর্মাকে বন্দী করার কথা, তারপরে তাকে মুক্তি দিয়ে ৩৪ অধ্যায় বিরাট রাজার জয় ঘোষণা—এই দুটি অধ্যায় যুক্ত করে সংশোধকগণ যুদ্ধ বর্ণনা অনেক সংক্ষেপ করেছেন, ৮০ থেকে ৩০টি শ্লোক বাদ হয়েছে। সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য। ৩৫ অধ্যায়ে উত্তর গোশালা রক্ষীদের নিবেদন—কৌরব সৈন্য কর্তৃক গোধন অধিকৃত হয়েছে। ৩৬ অধ্যায়ে বৃহন্নলাকে (অর্জুনকে) উত্তর নামক রাজকুমারের সারথ্যে নিয়োগের প্রস্তাব, ৩৭ অধ্যায়ে বৃহন্নলাকে সারথি করে উত্তরের যুদ্ধার্থ গমন। ৩৮ অধ্যায়ে বিরাট কৌরব বাহিনী দেখে উত্তরের ভয় এবং বৃহন্নলার আশ্বাসন। এই অধ্যায়গুলি সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ৩৯ অধ্যায়ে শমীবৃক্ষ অভিমুখে গমন করলে উত্তরের রথে ক্লীববেশধারী সারথিকে দেখে কৌরব বীরদের জল্পনা সারথি অর্জুন কিনা, কিছু বাদ হবে, গ্রাহ্য ১ ৩, ৯-১২ ১৪-১৭ শ্লোক। ৪০-৪৩ অধ্যায়গুলি একত্রিত করে কিছু বাদ দিয়ে সংশোধকগণ একটি অধ্যায়ে পরিণত করেছেন, এই অধ্যায়গুলিতে অর্জুনের নির্দেশে শমীবৃক্ষ হতে উত্তরের অস্ত্র আহরণ, অস্ত্রগুলির পরিচয় দান, সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্য। ৪৪।৩ শ্লোকে উত্তর বলে যে শমীবৃক্ষে একটি শব বাঁধা আছে শুনেছি, মৃতশরীর স্পর্শে অশুচি হব। উত্তরে অর্জুন বলেন (৪১।৪) যে বৃক্ষে আমাদের ধনুক ইত্যাদি আছে, মৃতশরীর বৃক্ষে

বাধা নাই। পর্বটির ৫।৩১ শ্লোক থেকে মনে হয় যে শমীবৃক্ষটিতে একটি মৃতের শরীর বাঁধা হয়েছিল, ৪।১৪ শ্লোকের উক্তি ঠিক হলে ৫।৩১-৩৪ই শ্লোক কিছু পরিবর্তন করে নিতে হবে, যাতে বোঝায় যে অস্ত্রশস্ত্রাদি একসঙ্গে শরীরাকার করে সাজিয়ে নিয়ে বাঁধা হ'ল, এবং পাণ্ডবগণ বলে গেলেন যে এখানে এক মৃতের শরীর বাঁধা হয়েছে, যাতে কেহ সেখানে না যায়। ৪৪-৪৬ অধ্যায়ে অর্জুন নিজের ও যুধিষ্ঠিরাদির পরিচয় দিলেন, নিজের দশটি নামের অর্থ বললেন, তারপরে নিজের অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিয়ে শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করে উত্তরের সিংহ-লাঞ্ছিত ধ্বজপতাকা খুলে ফেলে নিজের বানর লক্ষণ ধ্বজ পতাকা রথে উড্ডীন করলেন, তারপর কৌরবদের দিকে অগ্রসর হলেন। ৪৬।৪-৫ শ্লোকে কিছু অনৈসর্গিক কথা আছে যে অর্জুন মনে মনে অগ্নিদেবের অনুগ্রহ চাইলেন, তার ফলে আকাশ থেকে তাঁর বানরলাঞ্ছিত ধ্বজ পতাকা যেমন ভূতাধিষ্ঠিত থাকতো, সেভাবে ভূতাধিষ্ঠিত হয়ে রথে লেগে গেল। এই দুটি শ্লোক বাদ হবে; অর্জুনের নিজস্ব ধ্বজ পতাকাও সম্ভবতঃ শমীবৃক্ষের নিকটে কোথায়ও রক্ষিত ছিল, সেখান থেকে নেওয়া হল।

৪৭ অধ্যায়ে দুর্যোধনের প্রশ্ন, তিনি বললেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে যদি অর্জুন এসে থাকে, তাহলে ভালই, অজ্ঞাতবাসকাল মধ্যে পাণ্ডবগণের প্রকাশ হলে তাদের আবার দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনে যেতে হবে, তবে অজ্ঞাতবাসকাল শেষ হয়েছে কিনা তা ভীষ্ম হিসাব করে বলতে পারবেন। তার উত্তর ভীষ্ম ৫২ অধ্যায়ে দিয়েছেন, মধ্যে যে কর্ণের দম্ভ প্রকাশ, কৃপ অশ্বত্থামার কর্ণকে নিন্দা ও অর্জুনের বীরত্বকে প্রশংসা, অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত করা, ইত্যাদি পরে যোজিত মনে হয়। অতএব ৪৭।১-১৯ গ্রাহ্য, ২০-৩০ শ্লোক বাদ হবে, ৪৮ (কর্ণের কথা), ৪৯ কৃপের কথা), ৫০ (অশ্বত্থামার কথা), ৫১ (ভীষ্মের ও দুর্যোধনের চেষ্টা বিবাদ থামিয়ে দিতে)—এই অধ্যায়গুলি বাদ হবে। ৫২-৫৩ অধ্যায় (যুদ্ধারম্ভ ও কর্ণের আহত হয়ে পশ্চাতে গমন) সংশোধিত পাঠে গ্রাহ্য, ৫৫ অধ্যায় থেকে সংশোধনগণ বহু শ্লোক বাদ দিয়েছেন, সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য। ৫৬ অধ্যায়ে দেবগণের বিমানে যুদ্ধ দর্শন কামনায় আগমন ও যুদ্ধক্ষেত্রের ঊর্ধ্বে স্থিতি, অনৈসর্গিক হিসাবে বাদ হবে। ৫৭,৫৮,৫৯,৬০,৬১ অধ্যায়ে যুদ্ধ বর্ণনা—সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ৬২, ৬৩ অধ্যায়ে নতুন যুদ্ধ বর্ণিত, বিরাট রাজ পক্ষে অর্জুন ভিন্ন কোন রথী ছিলেন না, যদিও কিছু সাধারণ সৈন্য ও অস্ত্রভার পূর্ণ শকট থাকা

সম্ভব ; উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধ এক একজন কৌরব রথী সহ অর্জুনের যুদ্ধ, অতএব ৬২-৬৩ অধ্যায় বাদ হবে। মহাভারতে সর্বত্র যুদ্ধবর্ণনার আতিশয্য আছে, পরের কবির যোজনা অনেক আছে। ৬৪-৬৬ অধ্যায়ে অর্জুনের সামগ্রিক জয় ও কৌরবদের অপমান বর্ণিত, ৬৭-৬৯ অধ্যায়ে উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধ জয়ঘোষণা ও বিরাট রাজের নিকট পাণ্ডবগণের পরিচয়দান বর্ণিত হয়েছে। সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্য।

৭১-৭২ অধ্যায়ে বৈবাহিক অনুপর্ব, তাতে অভিমন্যু উত্তরার বিবাহ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য।

৯. উদ্যোগ পর্ব : সেনোদ্যোগ হতে যানসন্ধি অনুপর্ব

উদ্যোগ পর্বে প্রমাণ সংস্করণে দশটি অনুপর্ব। প্রথমটি সেনোদ্যোগ. সেনা সংগ্রহের উদ্যোগ—উনিশটি অধ্যায়ে বিবৃত। ১-৬ অধ্যায়ে কৃষ্ণের নেতৃত্বে পরামর্শ সভার বিবরণ, পরামর্শে স্থির হল যে দুর্যোধন পাণ্ডবদের অর্ধরাজ্য, অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য, অজ্ঞাতের সর্তমত শান্তিতে প্রত্যর্পণ করবে কিনা, দূত পাঠিয়ে তা প্রথমে জানতে হবে ; দ্রুপদরাজ বললেন যে তাঁর সঙ্গে তাঁর দৌত্যকার্যে অভিজ্ঞ পুরোহিত আছে. তাকে উপদেশ দিয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে, কিন্তু ইতিমধ্যে সৈন্যসংগ্রহ করাও প্রয়োজন। এই অধ্যায়গুলিতে স্বাভাবিকভাবে সব কথা আছে, তা গ্রাহ্য। ৭ অধ্যায়ে দুর্যোধনের ও অর্জুনের এককালে দ্বারকায় গিয়ে কৃষ্ণকে স্বপক্ষে যোগ দিতে অনুরোধ ; অযুধ্যমান একক কৃষ্ণকে অর্জুনের গ্রহণ এবং কৃষ্ণের শিক্ষিত নারায়ণী সেনাবাহিনী দুর্যোধন কর্তৃক গ্রহণ বর্ণিত আছে। এই অধ্যায় সম্বন্ধে কিছু দ্বিধা আছে. কারণ বলরাম পরে বলেছেন যে তিনি কৃষ্ণকে বলেছিলেন—দুই পক্ষের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক আছে, অতএব দুই পক্ষকেই সাহায্য দাও, কিন্তু কৃষ্ণ তা না শুনে শুধু পাণ্ডবদের সাহায্য দিচ্ছেন (১৫৭/২৮-৩২)। ভারত মঞ্জরীতে আছে, কৃষ্ণ দুর্যোধনকে বললেন, পূর্বে আমি অর্জুনকে দেখেছি, তাকেই বেছে নিতে দেব, একদিকে অযোদ্ধা আমি, আর একদিকে বৃষ্ণিদের অক্ষৌহিণী সেনা ; অর্জুন কৃষ্ণকে বরণ করে নিলেন, দুর্যোধন কৃতবর্মাদিরক্ষিত এক অক্ষৌহিণী বৃষ্ণিসেনা পেয়ে

মনে করল, আমিই জিতেছি।[১] তা হলে ৭।১৮ শ্লোকে কৃষ্ণ কথিত "গোপানামর্বুদং মহৎ নারায়ণাঃ ইতিখ্যাতাঃ" এবং ৭।৩২ শ্লোকে কথিত কৃতবর্মার এক অক্ষৌহিনী সেনা একই সেনাবাহিনী, দুর্যোধন দ্বারকা থেকে দুটি সেনাদল পান নাই। ৭।১৮ ও ৭।৩২ শ্লোক যুক্ত করে নিতে হবে। ৮ অধ্যায়ে আছে দুর্যোধন কর্তৃক সসৈন্য মদ্ররাজ শল্যের আগমনকালে তার বিশ্রাম ও ভোজনের ব্যবস্থা করে দিয়ে কৌশলে শল্যকে স্বপক্ষে নেবার কথা, ও পরে শল্য যুধিষ্ঠির কথা; এই অধ্যায় হতে সংশোধন-মণ্ডলী ৩[১],৪[২] ৯,১০,১৫,১৬[১], ২০ ২৩, ৩৪-৩৮, ৪১[২],৪২[১] শ্লোক বাদ দিয়েছেন, তার উপর আরো বাদ হবে ৪২[২], ৪৩[২]-৪৫[১], ৪৬, কারণ শল্য কর্ণের সারথি হবে তা এইসময় অনুমান করা সম্ভব নয়; ৪৩[১] এর পরে বসবে ১৮/২৩[২], দুই শ্লোকার্দ্ধ মিলে হবে—"কর্ণার্জুনাভ্যাং সংপ্রাপ্তে দ্বৈরথে রাজসত্তম। তত্র তেজোবধঃ কার্যঃ কর্ণস্যার্জুনসংস্তবঃ॥" অর্থাৎ কর্ণার্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ যখন হবে, তখন অর্জুনের গুণগান করে কর্ণের তেজোহানি—ভয় উৎপাদন করবে। ৯।৫০-৫৪ শ্লোক বাদ হবে, তা বৃত্র ইন্দ্র নহুষ উপাখ্যানের সূচনা। ৯-১৮ অধ্যায়ে উপাখ্যানটি বর্ণিত, তা বাদ হবে, শুধু ১৮।২১,২৫ শ্লোক ৯ অধ্যায় শেষে যুক্ত হবে, শল্য যুধিষ্ঠির কথার সমাপ্তি সূচক। ১৯ অধ্যায়ে দুই পক্ষে বীর ও সেনাসংগ্রহ বিবরণ গ্রাহ্য।

দ্বিতীয় অনুপর্ব সঞ্জয়যান, ২০-৩২ অধ্যায়ে বিবৃত। ২০ অধ্যায়ে দ্রুপদ পুরোহিতের দৌত্যকালে ভাষণের বিবৃতি গ্রাহ্য। ২১ অধ্যায়ে আছে যে ধৃতরাষ্ট্র পুরোহিতকে বিশ্রাম নিয়ে ফিরে যেতে ব'লে জানিয়ে দিলেন যে তিনি নিজ দূতমুখে উত্তর পাঠাবেন, এটি গ্রাহ্য। ২২ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের প্রতি বার্তা সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ। ২৩ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের প্রতি যুধিষ্ঠিরের কুশল প্রশ্ন। ২৪ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের উত্তর। ২৫ অধ্যায়ে আছে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের বার্তা নিবেদন, ২৬ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের উত্তর, ২৭ অধ্যায়ে সঞ্জয় কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের বার্তা স্পষ্টতরভাবে কথন, ২৮ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের উত্তর ও কৃষ্ণের মত জিজ্ঞাসা, ২৯ অধ্যায়ে কৃষ্ণের উক্তি, তার মধ্যে যুধিষ্ঠিরের কর্তব্য এবং ধৃতরাষ্ট্রের বার্তার উত্তর সম্বন্ধে ইঙ্গিত। ৩০-৩১ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের বার্তার উত্তর জ্ঞাপন।

১। "পূর্ব সন্দর্শনাৎ কিন্তু পার্থ এব বৃণোতি মাম্। অক্ষৌহিনী চ বৃষ্ণীণাং অযোদ্ধা চাস্মি ভূপতে। মন্যমানোঽধিকং ভাগং বৃষ্ণিসেনাঃ সুযোধনঃ। কৃতবর্মমুখৈর্গুপ্তাং তস্মাদায় বরূথিনীম্॥"—ভারত-মঞ্জরী, ৩৪০ ৩৪১ পৃ

এই অধ্যায়গুলিতে প্রায় সব ভাষণই অনাবশ্যক রূপে দীর্ঘ। বিশেষতঃ যুধিষ্ঠিরের ভাষণ। ২৩ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের ভাষণ—এই অধ্যায়ে ১-১৪ শ্লোক গ্রাহ্য, ১৫-২৮ বাদ হবে। ৩০ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের কথা থেকে অবান্তর হিসাবে ৭-৪৬ শ্লোক বাদ হবে, গ্রাহ্য ৩০/১-৬ এবং ৪৯-৪৯। বাকী অধ্যায়গুলিতে কিছু কিছু অনাবশ্যক কথা থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করা যায়। ৩৯ অধ্যায়েও যুধিষ্ঠিরের কথা, তাঁর কৌরবদের প্রতি বার্তা। পঞ্চগ্রামের কথা পরে যোজিত, তাই এই অধ্যায়ের ১৮২-২০১ শ্লোক বাদ হবে, বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ৩২ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে, এটির কথা প্রথম খণ্ডের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে।

৩৩ ৪০ অধ্যায়ে কথিত তৃতীয় অনুপর্ব প্রজাগর পর্ব, রাত্রি জাগরণ করে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে তার নিকট নীতি কথা শুনছেন। ৪১-৪৬ অধ্যায়ে কথিত চতুর্থ অনুপর্ব, সনৎসুজাত পর্ব, বিদুর নীতিকথা বলে ধর্ম ও অধ্যাত্মতত্ত্ব বলতে সনৎসুজাত ঋষিকে ডেকে দিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের ধর্ম ও নীতিজ্ঞান যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ন্যায় ও ধর্মের পথে চলবার মত মনের দৃঢ়তা ছিল না, বিশেষ করে তাঁর পুত্র দুর্যোধনের ইচ্ছাকে অন্যায় জানলেও বাধা দিতে পারতেন না। তাঁর পক্ষে নীতি ও ধর্মতত্ত্ব শোনা অবান্তর। এই ভাবে মহাভারতকার, ভারতকথা রচনার বহুকাল পরে, সাধারণের শোনা ও জানার জন্য নীতি ও ধর্মতত্ত্ব যোজনা করেছেন। এ দুটিতে মূল্যবান ধর্ম ও নীতি কথিত আছে, সংশোধিত রূপে পরিশিষ্টে, বা পৃথক গ্রন্থে স্থান পাবে। তবে তা মূল ভারতকথার অংশ নয়, তাই দুটি অনুপর্বই সম্পূর্ণ বাদ হবে।

পঞ্চম অনুপর্ব যানসন্ধি ৪৭-৭১ অধ্যায়ে বিবৃত। এই অনুপর্বে সঞ্জয়ের মাধ্যমে প্রেরিত বার্তার পাণ্ডবগণের উত্তর সঞ্জয় কৌরব সভায় নিবেদন করছেন, তার পরে তাই নিয়ে কৌরবদের আলোচনা আছে। ৪৭ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের কৌরব সভায় আগমন, ২-১৭ শ্লোক গ্রাহ্য, ১ শ্লোকে বিদুর ও সনৎসুজাতের নীতি ও ধর্মকথার উল্লেখ থাকায় তা বাদ হবে। ৪৮ অধ্যায়ে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের বার্তার পাণ্ডবগণ যে উত্তর দিয়েছেন, তা নিবেদন করছেন। সঞ্জয়যান অনুপর্বে আছে উত্তর বাসুদেব ও যুধিষ্ঠির দিলেন, কিন্তু ৪৮ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের ও কৃষ্ণের মত মেনে তাদের অনুমতিমত উত্তর দিয়েছেন। কোন কবি বোধহয় নূতনত্ব আনতে এই ভাবে উত্তর সন্নিবেশিত করেছেন, তা মূল ভারতকথায় ছিল না, তবে পাণ্ডবদের উত্তর কিছু উগ্রভাবে হলেও সঠিক বলা হয়েছে; ৬৭/৮৮ শ্লোক বাদ হবে, তাতে কৃষ্ণের অলৌকিক কীর্তি বর্ণিত হয়েছে, ৯৮-১০৮

শ্লোকও বাদ হবে, জ্যোতিষীর ও দিব্যঅস্ত্রের কথা থাকায়, বাকীটা গ্রাহ্য। ৪৯ অধ্যায়ে ভীষ্মের মুখে অর্জুনের অলৌকিক মহিমা কীর্তন ও কর্ণের নিন্দা অনৈসর্গিক কথা থাকায় বাদ হবে। ৫০ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় কর্তৃক পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধের জন্য আগত বীরগণের নাম ও শৌর্য বর্ণনা, ১-৯, ১৫-৫০ শ্লোক গ্রাহ্য, ১০-১৪ শ্লোকে সঞ্জয়ের অকস্মাৎ মূর্চ্ছা প্রাপ্তির ও কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভের কথা অবান্তর হিসাবে বাদ হবে। ৫১ অধ্যায়ে ভীমের বীর্য স্মরণ ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ, বাহুল্য হেতু ১৯-৬১ শ্লোক বাদ হবে, ১-১৮ গ্রাহ্য। ৫২ অধ্যায়ে অর্জুনের অস্ত্রচাতুর্য স্মরণ করে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ, এটির ১-১৮ শ্লোক গ্রাহ্য, ১৯-২০ বাদ হবে। ৫৩ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের অন্য পাণ্ডবপক্ষীয় রথীদের বিক্রমের উল্লেখ, সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। ৫৪ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের উক্তি, ধৃতরাষ্ট্রের দোষ ও পাণ্ডবদের প্রতি অন্যায় আচরণের উল্লেখ করে—তা বাদ হবে; অন্তরালে যদিও সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে সৎপথে আনবার উদ্দেশ্যে তা বলতে পারেন, কিন্তু প্রকাশ্য রাজসভায় তা যুক্তিযুক্ত নয়। ৫৫ অধ্যায়ে দুর্যোধনের আশ্বাসবাণী ও জয়ের আশা প্রকাশ গ্রাহ্য, তবে ৩০ শ্লোক বাদ হবে, কারণ পঞ্চগ্রাম প্রার্থনার কথা সঞ্জয় তাঁর প্রতিবেদনে বলেন নাই, এবং ৬৯ শ্লোক বাদ হবে, তা ৫৬ অধ্যায়ের সূচনা; ৫৬ অধ্যায়ে সঞ্জয় অর্জুনের দিব্য অস্ত্র অভ্যাসের কথা বলছেন এবং অর্জুন ও অন্য পাণ্ডবগণের রথের অশ্ব ও ধ্বজার বর্ণনা দিচ্ছেন, তা অবান্তর। ৫৭ অধ্যায় ১-২৫ শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নে সঞ্জয় পাণ্ডবপক্ষের সমাগত বীরদের নাম ও বীর্য বর্ণনা দেন, তা পুনরুক্তি হিসাবে বাদ হবে, ৫০ অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে আরো আছে যে পাণ্ডবগণ মন্তব্য করেছেন কে কোন কৌরব বীরকে বধ করবেন, সে মন্ত্রণার কথা সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত। ৫৭/২৬-৪২ শ্লোক গ্রাহ্য, তাতে ধৃতরাষ্ট্রের পরাজয় আশঙ্কায় বিলাপ এবং দুর্যোধনের উত্তর আছে, তবে ৪৩-৬২ শ্লোক বাদ হবে, তাতে ধৃতরাষ্ট্রের পুনঃ বিলাপ এবং তাঁর প্রশ্নে সঞ্জয় কর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নাদি পাঞ্চাল বীরের উৎসাহ বর্ণনা, তার কোন আভাস সঞ্জয়যানে নাই। ৫৮/১-২৮ গ্রাহ্য, ধৃতরাষ্ট্র পুনঃ পরাজয় আশঙ্কায় বিলাপ করছেন ও দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের অর্দ্ধরাজ্য ফিরিয়ে দিতে বলছেন, দুর্যোধন অস্বীকার করছেন। ৫৮/২৯ শ্লোক বাদ হবে, তা স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত, ৫৯ অধ্যায়ের সূচনা। ৫৯/১ শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র আবার প্রশ্ন করছেন, বাসুদেব ও অর্জুন কি বলেছেন—যেন সঞ্জয়ের পূর্ব প্রতিবেদন শোনেন নাই। তার উত্তরে সঞ্জয় একটি নূতন গল্প বললেন, যে তিনি পাণ্ডবদের অন্তঃপুরে গিয়ে বাসুদেব ও অর্জুনকে

মদ্যপানে উত্তেজিত ও রক্তচক্ষু অবস্থায় দ্রৌপদী ও সত্যভামা সহ আসীন দেখেন, বাসুদেব বললেন যে তুমি গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে অভিবাদন জানিয়ে বলবে যে কৌরবদের মহৎ ভয় উপস্থিত হয়েছে, আমি যখন সহায়, তখন অর্জুন সহজেই সমস্ত কৌরব বীরদের শেষ করতে পারবে; তা শুনে অর্জুনও ভয়ানক সব কথা বললেন। ৬১ অধ্যায়ে দুর্যোধন তার প্রতিবাদ করলেন, যেমন ৫৭ অধ্যায়ে আছে। ৬২ অধ্যায়ে দুর্যোধনের সমর্থনে কর্ণের কথা আছে, তার উত্তরে ভীষ্মের কথা আছে কর্ণের বীর্য অর্জুনের বীর্যের তুলনায় কিছু নয়। ইন্দ্রাস্ত্র শক্তির কথা, অর্থাৎ অনৈসর্গিকতাও আছে। ৬৩ অধ্যায়ে দুর্যোধনের উত্তর, অনেকটা ৫৭/৩৬-৪২ শ্লোকের পুনরুক্তি। তারপরে বিদুরের উপদেশ, শান্তির পথ শ্রেষ্ঠ ও অবলম্বনীয় বলে, ৬৪ অধ্যায়েও বিদুরের কথা, তিনি জ্ঞাতিবিরোধের কুফল বোঝাতে দুটি শকুন ও ব্যাধের উপাখ্যান শোনালেন—জালে বদ্ধ দুটি শকুন একসঙ্গে জাল সহ উড়ে গেল, কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে পড়ে গেল ও ব্যাধের হস্তগত হল। ধৃতরাষ্ট্র পুনঃ অর্জুনের পরাক্রমের কথা এবং ভীষ্মদ্রোণের দুইপক্ষে সমান স্নেহের কথা বলে দুর্যোধনকে ধর্মের পথে যেতে বলছেন, অর্থাৎ ৫৯ অধ্যায়ের কথা টানলেন—মধ্যের ছয়টি অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে বলেছেন, ৫৯ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত, ৬০-৬৩ অধ্যায় প্রক্ষিপ্তের উপর প্রক্ষিপ্ত। সমগ্র অনুপর্ব মন দিয়ে পাঠ করলে সেই সিদ্ধান্তই করতে হয়।

এই অনুপর্বে অবশিষ্ট পাঁচটি অধ্যায়ও অবান্তর এবং প্রক্ষিপ্ত। ৬৭ অধ্যায়ে আছে যে দুর্যোধন চুপ করে রইলেন, ধৃতরাষ্ট্রের আবেদনে কোন সাড়া দিলেন না; সভায় উপস্থিত রাজন্য ও সভাগণ সভাগৃহ ছেড়ে চলে গেল। তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রশ্ন করলেন, পাণ্ডব ও কৌরবদের বল তুলনা করে তোমার কি মনে হয়? সঞ্জয় বললেন, গান্ধারী ও ব্যাসকে ডাকুন, তাদের সামনে বলব। বিদুর ব্যাস ও গান্ধারীকে নিয়ে এলেন, ৬৮ অধ্যায়ে সঞ্জয় তার মত বললেন, অর্জুন ও বাসুদেব সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ; বাসুদেব সমস্ত জগত শাসন করেন; সত্য, ধর্ম, হ্রী, ঋজুতা তাঁর ভূষণ, কৃষ্ণ যেখানে সেখানেই জয়। ৬৯ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র বলছেন, বাসুদেব মর্ত জগতের ঈশ্বর, তা তুমি কেমন করে জানলে? সঞ্জয় বললেন, ভক্তি দিয়ে। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রকে বললেন, তুমিও বাসুদেবের শরণ লও। দুর্যোধন বললেন, বাসুদেব অর্জুনের পক্ষে গেছেন, আমি কেন তার শরণ নেব? অধ্যায়ের শেষে ব্যাস কর্তৃক কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন আছে। ৭০-৭১ অধ্যায়ে সঞ্জয় কৃষ্ণের বিবিধ নামের অর্থ

বললেন, তাঁর মহিমার কথা বললেন, শুনে ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে কৃষ্ণের শরণ নিয়ে তাঁকে প্রণাম জানালেন। এই পাঁচটি অধ্যায় যে পরের যোজনা তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কৃষ্ণ যখন দূত রূপে হস্তিনাপুরে যান, তখন ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবহারে মনে হয় না যে তিনি কৃষ্ণকে দশকের ঈশ্বর মনে করেন। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতারের রূপে পূজা-আরাধনা করা আরম্ভ হয়, মনে হয় যে সেই সময় এই অধ্যায়গুলি মহাভারতে যোজিত হয়েছে। এই পঞ্চ অধ্যায় মূল ভারতকথার অংশ নয়।

১০. উদ্যোগপর্ব : ভগবদ্‌যান হতে অম্বা উপাখ্যান অনুপর্ব

ষষ্ঠ অনুপর্ব ভগবদযান ৭২-১৫০ অধ্যায়ে বিবৃত; তার মধ্যে বহু যোজনা বা প্রক্ষিপ্ত আছে। ৭২ অধ্যায়ে পাই যে কৃষ্ণ নিজে দূত হয়ে কুরুসভায় যাবেন, পাণ্ডবগণের প্রাপ্য রাজ্য অধিকার ত্যাগ না করে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করবেন। তার মধ্যে ১৪-১৭ শ্লোক বাদ হবে—তাতে আছে যে যুধিষ্ঠির বলছেন যে তিনি পাঁচটি মাত্র গ্রাম পেলেই সন্ধি করতে ইচ্ছুক ছিলেন, দুর্যোধন তাও দিতে চায় না। সেকথা যুধিষ্ঠির কি করে বলবেন, তখনো তো কৌরবদের উত্তর আসে নাই, পাণ্ডবদের প্রস্তাব নিয়ে সঞ্জয় সদ্য বিদায় নিয়েছেন। কোন কবি পঞ্চগ্রামের কথা যেখানে হোক ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছেন। অবশিষ্ট শ্লোক গ্রাহ্য। ৭৩-৮১ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবের সঙ্গে আলোচনা. কি ভাবে কি প্রস্তাব কৌরবগণের নিকট করতে হবে সেই সম্বন্ধে, তার মধ্যে সহদেবই যুদ্ধের পক্ষে পরিষ্কার ভাবে মত দিলেন, সাত্যকি তাকে সমর্থন করলেন। এই অধ্যায়গুলি গ্রাহ্য। ৮২ অধ্যায়ে দ্রৌপদীর কথা, তিনি ভীম অর্জুনের নতি স্বীকার করেও সন্ধি করার কথার নিন্দা করলেন, বললেন যে যুদ্ধ না হলে তিনি যে ভাবে অপমানিত হয়েছেন, তার শোধ হবে কেমন করে? ৮২।৭-৯ শ্লোক বাদ হবে, তাতে দ্রৌপদী বলছেন যে যুধিষ্ঠির পাঁচটি গ্রাম পেলেই সন্ধি করতে চেয়েছিলেন, তাও দুর্যোধন দেয় নাই। দ্রৌপদী বললেন সম্পূর্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য সসম্মানে ফিরিয়ে দিলেই শুধু সন্ধি করা উচিত। ২১ শ্লোকে দ্রৌপদীর বিশেষণ – বেদি মধ্যাৎ সমুত্থিতা, বাদ দিয়ে অন্য কোন বিশেষণ বসবে। ২৩-২৮ শ্লোক বাদ হবে বিপন্ন হয়ে, দ্রৌপদী কৃষ্ণের নিকট মনে মনে রক্ষা প্রার্থনা

করেছিলেন, সে কথা দ্রৌপদী বনপর্বে ১২ অধ্যায়ে যখন কৃষ্ণের সঙ্গে কথা হয়, তখন বলেন নাই, তাই এটি প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই। ৮৩ অধ্যায়ে কৃষ্ণের যাত্রারম্ভ বর্ণিত, তাব থেকে ২৭-২৯ শ্লোক বাদ হবে, কারণ বসিষ্ঠ, বামদেব, বাল্মীক, ভৃগু ইত্যাদি বহু পূর্বকালের ব্রহ্মর্ষি এবং নারদাদি দেবর্ষির কৃষ্ণকে যাত্রাকালে শুভেচ্ছা জানাতে আসার কথা অনৈসর্গিক। ৩৪-৩৬ শ্লোক বাদ হবে, কারণ তাতে কৃষ্ণকে শ্রীবৎস-লক্ষণ বিষ্ণু বলা হয়েছে; ৬০ ৭২ শ্লোকে পুনরায় পথে কৃষ্ণের সঙ্গে সেই সব ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষির সাক্ষাতের কথা, কুরুসভায় পুনরায় দেখা হবে বলা, বাদ হবে। ৮৪ অধ্যায়ে কৃষ্ণের প্রথম দিনের যাত্রা ও বৃকস্থল গ্রামে বিশ্রামের কথা আছে, ৩-১৪ শ্লোক বাদ হবে, তাতে যাত্রাকালে শুভ-অশুভ লক্ষণ বর্ণিত আছে। বাকী গ্রাহ্য। ৮৫ অধ্যায়ে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে আসবার জন্য যাত্রা আরম্ভ করেছেন তা চরমুখে জেনে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অভ্যর্থনার জন্য আয়োজন করতে বললেন, দুর্যোধন তা করালেন, ৬-৮ শ্লোকে কৃষ্ণকে "ভূতানাং ঈশ্বরঃ" ইত্যাদি বলায় তা বাদ হবে, বাকী গ্রাহ্য। ৮৬ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণকে নানা প্রকার মূল্যবান উপঢৌকন দিয়ে সন্তুষ্ট করার প্রস্তাব করলেন, ৩-৪ শ্লোক বাদ হবে, বাকী গ্রাহ্য। ৮৭ অধ্যায়ে বিদুরের উক্তি, যে এসব উপঢৌকন দিয়ে কৃষ্ণকে তার উদ্দেশ্যচ্যুত করতে পারবেন না, তাকে সাধারণ ভাবে পাদ্য ইত্যাদি দিয়ে অভ্যর্থনা করে তিনি যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় আসছেন, সেই পথ অবলম্বন করুন; গ্রাহ্য, শুধু ৮-৯ শ্লোক বাদ হবে—তাতে পঞ্চগ্রামের কথার উল্লেখ আছে। ৮৮ অধ্যায়ে দুর্যোধনের উক্তি—তার কৃষ্ণকে বন্দী করবার ইচ্ছা জ্ঞাপন ও ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের ভর্ৎসনা, গ্রাহ্য। ৮৯ অধ্যায়ে কৃষ্ণের হস্তিনাপুরে আগমন, প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে গিয়ে অভিবাদন কুশল প্রশ্নাদি বিনিময় করে বিদুরের গৃহে গমন—গ্রাহ্য। ৯০ অধ্যায়ে বিদুর গৃহে কৃষ্ণসহ কুন্তীর সাক্ষাত ও কুন্তীর দীর্ঘ বিলাপ ও প্রশ্নাবলী, এবং কৃষ্ণের সান্ত্বনা দান বর্ণিত, কুন্তীর বিলাপ কিছু আতিশয্য হেতু বাদ হবে, গ্রাহ্য ১-৫৫, ৯০-১০৫ শ্লোক। ৯১ অধ্যায়ে কৃষ্ণের সেদিনই সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে দুর্যোধনের গৃহে গমন, সায়মাশের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান, বিদুরের গৃহে ফিরলে ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদি এসে কৃষ্ণকে তাঁর জন্য প্রস্তুত সর্ব প্রয়োজনীয় সম্ভারযুক্ত গৃহে গিয়ে অবস্থানের আমন্ত্রণ, কৃষ্ণের সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান—সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। ৯২ অধ্যায়ে সায়মাশের পরে বিদুরের কথা, দুর্যোধনের পক্ষাবলম্বী বহু বীর রাজন্য যুদ্ধের জন্য সমবেত, তারা কৃষ্ণের শান্তির সৌভ্রাত্রের

বাণী কাণে না তুলে কৃষ্ণকে নিগ্রহ করতে পারে, এইভাবে কৃষ্ণের গৌরবক্ষতাক্ত যাওয়ায় বিপদ হতে পারে। ৯৩ অধ্যায় কৃষ্ণের উত্তর, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ, এবং মহাক্ষয়কারী যুদ্ধের জন্য সমবেত ক্ষত্রিয়গণকে তিনি যদি ধ্বংস হতে রক্ষা করতে পারেন, তবে সেটা মহৎ কীর্তি হবে, প্রযাস নিষ্ফল হলেও চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য। এই দুই অধ্যায় সম্পূর্ণ গ্রাহ্য।

৯৪ অধ্যায়ে কৃষ্ণের কুরুসভায় গমন ও ৯৫ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যুক্তিপূর্ণ প্রাণবন্ত বক্তৃতার বিবরণ আছে। ৯৪ অধ্যায় থেকে ১০-১১ শ্লোক বাদ হবে (ব্রাহ্মণদের দানের কথা) এবং ৪১-৪৬ শ্লোক (নারদ, জামদগ্ন্য, কণ্ব প্রভৃতি দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিদের আকাশপথে সভায় আগমন ও উপবেশন) বাদ হবে। ব্রাহ্মণকে দানের কথা এবং বহুপূর্বে মৃত ঋষিগণের উপস্থিতির কথা দিয়ে যে ভারত কথার, কৃষ্ণের কথার মহিমা নষ্ট করা হয়, তা বোধ হয় পরের কালের কবি ও লিপিকারদের ধারণার মধ্যে ছিল না। ৯৬ অধ্যায়ে জামদগ্ন্য বা পরশুরাম কথিত দম্ভোদ্ভব উপাখ্যান— দম্ভোদ্ভব নামক এক চক্রবর্তী সম্রাট সর্বত্র জয়লাভ করে নর নারায়ণ ঋষিদ্বয়কে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে যুদ্ধে আহ্বান করে সহজে পরাজিত হন; নর ও নারায়ণ এখন অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত, দুর্যোধনের কর্তব্য তাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের দুরাশা না করে সন্ধি করা। ৯৭-১০৫ অধ্যায়ে কণ্ব ঋষি মাতলির জামাতা অন্বেষণ উপাখ্যান বললেন, সুমুখ নামক নাগকে মাতলি জামাতা রূপে নির্বাচন করলে ইন্দ্র বিষ্ণুর সঙ্গে কথা বলে তাকে অমরত্ব দিলেন; তাতে গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর প্রতি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করায় বিষ্ণু নিজের বাম বাহু গরুড়ের স্কন্ধে স্থাপন করে তাকে অবশ করে দিয়ে দেখালেন যে গরুড়ের শক্তি তাঁর কাছ থেকেই এসেছে; উপাখ্যান শেষ করে কণ্ব বললেন যে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ বিষ্ণু, এবং ভীম ও অর্জুনের বল বায়ু ও ইন্দ্রের সমান, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ের আশা ত্যাগ করে দুর্যোধনের কর্তব্য সন্ধি করা। ১০৬-১২৩ অধ্যায়ে নারদ গালবের দক্ষিণাদানের উপাখ্যান শোনালেন, ঋষি বিশ্বামিত্রকে কি গুরুদক্ষিণা দেবেন তা গালব প্রশ্ন করলে বিশ্বামিত্র প্রথমে বললেন যে তিনি গালবের সেবায় তুষ্ট আছেন,- কোন দক্ষিণা দিতে হবে না। গালব তবু বার বার কি দক্ষিণা দেব প্রশ্ন করলে বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষিণারূপে চাইলেন আটশত চন্দ্রধবল শ্যামকর্ণ অশ্ব, গালব যযাতি রাজার কাছে গিয়ে সেইরূপ অশ্ব প্রার্থনা করলে যযাতি বললেন,

আমার কাছে ওরূপ অশ্ব নাই, তবে মাধবী নাম্নী শুভ লক্ষণা কন্যা আছে, সে চারটি লোক বিশ্রুত পুত্রের জন্ম দেবে, তাকে দান হিসাবে নিতে পারেন, যে রাজাদের নিকট এইরূপ অশ্ব আছে, তাদের এক একজনের কাছে থেকে অশ্বগুলি শুল্ক হিসাবে নিয়ে তার কাছে মাধবীকে দেবেন, সে পুত্রের জন্ম দিলে আবার তাকে নিয়ে যাবেন; গরুড়ের উপদেশমত গালব মাধবীকে যথাক্রমে অযোধ্যার রাজা হর্য্যশ্ব, কাশীর রাজা দিবোদাস এবং ভোজরাজ উশীনরের কাছে দিয়ে দুইশত করে চন্দ্রধবল শ্যামবর্ণ অশ্ব শুল্ক হিসাবে নিয়ে ছয় শত অশ্ব সংগ্রহ করলেন, মাধবী তাদের ঔরসে যথাক্রমে বসুমনা, প্রতর্দন ও শিবিকে জন্ম দিল, আর কোন রাজার কাছে সেই জাতীয় অশ্ব না থাকায় গরুড়ের পরামর্শে গালব ছয়শত অশ্ব ও মাধবীকে বিশ্বামিত্রের কাছে উপস্থিত করে দিয়ে বললেন, মাধবীর গর্ভে আর একটি বিশ্রুত পুত্র জন্মাবে, তার শুল্ক দুইশত চন্দ্রধবল শ্যামকর্ণ অশ্ব, মাধবীর গর্ভে আপনি পুত্র উৎপাদন করে সেই শুল্ক দিয়েছেন ও তা আবার আমার দের দক্ষিণা হিসাবে পেয়েছেন ধরে নিতে পারেন, বিশ্বামিত্র তাতে সম্মত হয়ে মাধবীর গর্ভে অষ্টক নামক পুত্র উৎপাদন করেন; পরে অভিমান হেতু রাজা যযাতির স্বর্গ হতে পতন হলে মাধবীর গর্ভে জাত পুত্র চতুষ্টয় তাদের পুণ্যের ভাগ যযাতিকে দিয়ে তাকে আবার স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করে। এই উপাখ্যান বলে নারদ দুর্যোধনকে বললেন, অভিমান হেতু যযাতির পতন হয়েছিল, তুমিও অভিমানের বশীভূত হয়েছ, তা ত্যাগ করে সন্ধি করলে তোমার মঙ্গল হবে। বলা বাহুল্য, দুর্যোধন এই তিনজনের মধ্যে কারো কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এই ঋষিদের আগমন শুধু অতিপ্রাকৃত নয়, নিষ্ফলও বটে। স্বর্গ হতে পুরাকালের ঋষিগণ ইচ্ছামত মর্ত্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন ও করতে আসেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ৯৫ অধ্যায়ে যে কৃষ্ণের সুন্দর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় সন্ধির প্রস্তাব, ৯৬-১২৩ অধ্যায়ে বিবৃত অবান্তর কাহিনী সমূহ তার মূল্য বহুল পরিমাণে নষ্ট করেছে। ১২৪ অধ্যায়ে আছে যে ধৃতরাষ্ট্র প্রথম শ্লোকে নারদের কথার উল্লেখ করলেন, পরশুরাম ও কণ্বের কোন উল্লেখ করলেন না, তারপর কৃষ্ণকে বললেন যে তিনি রাজ্যের ভার দুর্যোধনের হস্তে ছেড়ে দিয়েছেন, চরম সিদ্ধান্ত তার হাতে, তাকে বলুন। স্পষ্টই বোঝা যায় যে ৯৬-১২৩ অধ্যায় পরে যোজিত হয়েছে, তা বাদ হবে, ১২৪।১ শ্লোকও বাদ হবে। ১২৪ অধ্যায়েই দুর্যোধনের প্রতি কৃষ্ণের ভাষণ আছে, তার থেকে ৫৩, ৫৫ শ্লোক বাদ হবে।

১২৫ অধ্যায়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর দুর্যোধনকে কৃষ্ণের কথামত কাজ করতে বল্‌লেন, ধৃতরাষ্ট্র ও বললেন, তা গ্রাহ্য, শুধু ১৬[১] পংক্তি বাদ হবে। ১২৬ অধ্যায়ে ভীষ্ম দ্রোণের যুক্তভাবে কথা, তাঁরা ১২৫ অধ্যায়েই তাঁদের মত ব্যক্ত করেছেন, পুনরায় কিছু বলার প্রয়োজন নাই। অতএব ১২৬ অধ্যায় বাদ হবে। ১২৭ অধ্যায়ে কৃষ্ণের প্রতি দুর্যোধনের উত্তর, ২২ শ্লোকের পরে দুই পংক্তি বাদ হবে, অস্পষ্টতার জন্য, বাকী গ্রাহ্য। ১২৮ অধ্যায়ে আছে কৃষ্ণের পুনঃ দুর্যোধনের প্রতি ভাষণ ও দুঃশাসনের কথা, দুর্যোধনের গৃহ হতে প্রস্থান, ভীষ্মের উক্তি যে দুর্যোধন রাজ্যাভিমানী, ধর্মপথ ছেড়ে সংঘর্ষের পথ নিচ্ছে। কৃষ্ণ তখন কুরুবৃদ্ধদের দোষ দেখিয়ে দিলেন, দুর্যোধন অধর্ম করতে উদ্যত, কুরুকুলকে ধ্বংসের পথে নিতে উদ্যত জেনে কেন নিবারণ করেন না। অধ্যায়টি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। ১২৯ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে গান্ধারীকে রাজসভায় আনয়ন ও দুর্যোধনকে প্রত্যানয়ন করা হ'ল, গান্ধারী দুর্যোধনকে পাণ্ডবগণের অর্দ্ধরাজ্য ছেড়ে দিতে বল্‌লেন, এই অধ্যায়ের ২৩-৩৪ শ্লোক বাদ দেওয়া যায়, তত্ত্বকথার বাড়াবাড়ি আছে, বাকীটা স্বাভাবিক ও গ্রাহ্য। ১৩০ ১৩১ অধ্যায়ে আছে সে দুর্যোধনাদি কৃষ্ণকে বন্দী করতে মন্ত্রনা করছে বুঝতে পেরে সাত্যকি এসে জানায়, কৃষ্ণ বলেন তা যদি চেষ্টা কর তবে আমিই দুর্যোধনকে বন্দী করে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে দেব। এই দুইটি অধ্যায়ে বহু অনৈসর্গিক কথা আছে, যথা কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন, কৃষ্ণকে বিষ্ণু বলে বিদুরের উল্লেখ, সে সব বাদ দিতে হবে। গ্রাহ্য ১৩০/১-১৬, ১৭ শ্লোকের প্রথম পাদ, ২৩ শ্লোকের দ্বিতীয় পাদ হতে ৩৯ ; ১৩১।২৮-৪১।১৩২ অধ্যায়ে বিদুর গৃহে কুন্তী সহ কৃষ্ণের কথা বিবৃত, গ্রাহ্য ১-৭ (তার মধ্যে ২ শ্লোকের তৃতীয় পাদে "ঋষিভি শ্চৈব চ ময়া" স্থলে "যুদ্ধ বারণায় ময়া" বা আর কিছু হবে), ২১-৩৪। ১৩৩-১৩৬ অধ্যায়ে কুন্তী কথিত বিদুলা উপাখ্যান, ১৩৬ অধ্যায় শেষে শ্রুতিফল হতে পরের কালের যোজনা অনুমান করা যায়, এগুলি বাদ হবে। ১৩৭ অধ্যায়ে কুন্তীর পুত্রগণকে দেয় উপদেশ, শেষাংশে কৃষ্ণের হস্তিনাপুর হতে প্রত্যাবর্তনের কথা আছে, গ্রাহ্য, কেবল ৩৬[১] পংক্তি বাদ হবে। ১৩৮-১৩৯ অধ্যায় বাদ হবে, কারণ বিদুর গৃহে ফিরে কৃষ্ণ ও কুন্তীর মধ্যে কি কথা হ'ল, তা ভীষ্ম দ্রোণের জানবার কথা নয়, তা নিয়ে দুর্যোধনকে কোন কথা বলা সম্ভব নয়। ১৪০-১৪৩ অধ্যায় কৃষ্ণ ও কর্ণের মধ্যে কথোপকথনের বিবরণ, কৃষ্ণ রথে কর্ণকে উঠিয়ে নিয়ে তাকে জানিয়েছিলেন যে তিনি কুন্তীর প্রথমজ কিন্তু কানীন পুত্র,

জানিয়ে তাকে পাণ্ডবপক্ষে আনতে বলেন, কর্ণ সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। গ্রাহ্য ১৪০ অধ্যায় সম্পূর্ণ; ১৪১/১-২৭, ৫৭; ১৪২/১, ২, ১৬-২০, ১৪৩/১-৭, ৪৬-৫২। ১৪৪ অধ্যায়—কর্ণ কুন্তী সংবাদের সূচনা, ১৪৫-১৪৬ কর্ণ-কুন্তী সংবাদ —পর্বসংগ্রহে এই বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই, অধ্যায়গুলির ভাষাও ভিন্ন প্রকার মনে হয়। এই তিন অধ্যায় বাদ হবে। ১৪৭-৫০ অধ্যায়ে কৃষ্ণ উপপ্লব্যে ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরাদিকে তাঁর দৌত্যের বিবরণ ও ফল জানালেন। ১৪৭/১, ২ শ্লোকে সংক্ষেপে আছে যে দৌত্যকালে যা ঘটেছিল, তা সব জানিয়ে এবং পরামর্শ শেষ করে কৃষ্ণ বিশ্রাম করতে গেলেন। এই দুটি শ্লোক গ্রাহ্য। পরে আছে যে যুধিষ্ঠির আবার কৃষ্ণকে ডাকিয়ে আনালেন, এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, গান্ধারী কি কথা বলেছিলেন, তা সব বল। কিন্তু তারপরে ১৪৭-১৫০ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির উক্তি বলে কথা যা বললেন, বা কৃষ্ণের মুখে যা বলান হয়েছে, তার সঙ্গে ১২৫-১২৯ অধ্যায়ে দৌত্যের মূল বিবৃতিতে যা আছে তা মেলে না, অনেক নূতন কথা ১৪৭-১৫০ অধ্যায়ে আছে। ১৫০/১৬-১৮[১] শ্লোকে আছে যে কৃষ্ণ নানা তীক্ষ্ণ কথা দুর্যোধনকে বলে অবশেষে তাকে পাঁচটি গ্রাম ছেড়ে দিতে বললেন, তাও সে দিল না, এ কথা দৌত্যের মূল বিবৃতিতে নাই। পরের এক কবি বা গাথাকার, যিনি পঞ্চগ্রাম কাহিনী কল্পনা করেছেন, ১৪৭-৫০ অধ্যায়ের অধিকাংশ তাঁর রচনা। অতএব ১৪৭/১, ২ শ্লোক ছাড়া বাকী সব বাদ হবে।

সপ্তম অনুপর্ব সৈন্য নির্যাণ ১৫১-১৫৯ অধ্যায়ে বিবৃত; ১৫৩ অধ্যায়ে রুক্মী প্রত্যাখ্যান বর্ণিত, অধ্যায়টিতে অনৈসর্গিক কথা কিছু আছে, রুক্মীর অর্জুনের প্রতি বাক্য, যদি তুমি শত্রুবীরদের বীরত্বহেতু ভীত থাক, আমি সাহায্য করে শত্রু নিধন করতে পারি, তাতে অর্জুন বললেন, আমি ভীত তা কেন বলতে যাব? দুর্যোধনও রুক্মীর সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন, রুক্মী যদি সসৈন্যে দুর্যোধনের কাছে গিয়ে থাকেন, তবে মনে হয় না দুর্যোধন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবেন। তাই রুক্মীর আগমনে সন্দেহ থাকে, এই অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ দেওয়াই সঙ্গত। অন্য অধ্যায়গুলির মধ্যে ১৫৬/২ ১০ শ্লোকে কথিত সেনাপতি পদের সৃষ্টির কথা অবান্তর, তা বাদ হবে; অন্য অধ্যায় ও শ্লোকসমূহ শোধিত পাঠমত গ্রাহ্য।

অষ্টম অনুপর্ব উলূক দূতাগমন, ১৬০-১৬৪ অধ্যায়ে কথিত। এই অধ্যায়গুলি সংশোধক বহু সংক্ষেপ করেছেন; শোধিত পাঠমত এই অনুপর্ব গ্রাহ্য।

নবম অনুপর্ব রথাতিরথসংখ্যান, ১৬৫-১৭২ অধ্যায়ে কথিত, ভীষ্ম দুই পক্ষের রথী অতিরথদের নাম দুর্যোধনের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন। ১৬৮।৫^২-৯^১ শ্লোকে কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের উল্লেখহেতু বাদ হবে, অবশিষ্ট অধ্যায় ও শ্লোক শোধিত পাঠমত গ্রাহ্য।

দশম অনুপর্ব অম্বা উপাখ্যান, ১৭৩-১৯৬ অধ্যায়ে বিবৃত। অম্বা উপাখ্যান ১৭৩-১৯২ অধ্যায় নিয়ে, অবশিষ্ট চারটি অধ্যায় যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্বন্ধে। অম্বা উপাখ্যান উপাখ্যান হিসেবে বাদ হবে। তাছাড়া উপাখ্যানটিতে ত্রুটি আছে। আদি পর্বে ১০২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ভীষ্ম স্বয়ংবর সভা থেকে কাশী-রাজের তিন কন্যাকে হরণ করে নিয়ে যান, শাল্ব রাজা আক্রমণ করলে তাকে পরাজিত করেন, পরে বিচিত্রবীর্যের সাথে বিবাহ দিতে উদ্যত হলে জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বার নিবেদন সে মনে মনে শাল্ব রাজাকে বরণ করেছে—শুনে সত্যবতী ও মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে অম্বাকে মুক্তি দেন। অম্বা উপাখ্যানে পাই যে তারপরে অম্বা শাল্ব রাজের কাছে গেলে শাল্বরাজ তাকে ভীষ্ম কর্তৃক হৃতা হওয়াতে প্রত্যাখ্যান করে; অম্বা তপস্যার্থ বনে গেলে পরশুরামের এক শিষ্য অকৃতব্রণ তার কথা শুনে পরশুরামের সাহায্য প্রার্থনা করে; পরশুরাম এসে ভীষ্মকে সংবাদ প্রেরণ করেন; কুরুক্ষেত্রে পরশুরাম ভীষ্মের সাক্ষাৎ হলে পরশুরাম ভীষ্মকে বলেন তুমি অম্বাকে বিবাহ কর, ভীষ্ম চিরকৌমার্য পণের কথা বলেন, পরশুরাম যুক্তি দিয়ে এবং অস্ত্র প্রয়োগে ভীষ্মকে বধ করতে না পেরে চলে যান, তারপরে অম্বা শিবের আরাধনা করে বর পায় যে পরজন্মে মহারথ হয়ে ভীষ্মকে বধ করতে পারবে, কিন্তু পরজন্মে অম্বা দ্রুপদ রাজার কন্যা হয়ে জন্মালেন, পরে এক গন্ধর্বের সঙ্গে লিঙ্গ বিনিময় করে পুরুষ হলেন, শিখণ্ডিনী হতে শিখণ্ডী—শিখণ্ডী ভীষ্ম বধের জন্য দৃঢপ্রতিজ্ঞ, কিন্তু ভীষ্ম বলেন যে পূর্বনারীত্ব হেতু তিনি শিখণ্ডীর সংগে যুদ্ধ করবেন না। এই কাহিনীতে এবং মহাভারতের অনেক স্থলেই—পরশুরামকে বহুকালজীবী ধরে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু দাশরথী রামের পূর্বে তাঁর জন্ম, তিনি তার তিন চার শত বৎসর পরে ভীষ্মের জীবনকালে থাকতে পারেন না। শিবের কথা মহাভারতে অনেক অধ্যায়ে আছে, কিন্তু তা পরের কালের যোজনা—ভীষ্ম-বিচিত্রবীর্য এরা খ্রীঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীর মানুষ, তখন ঋগবেদীয় যুগের শেষ ভাগ, শিবের পূজা বা আরাধনা তখনো আর্যদের মধ্যে চলে নাই। অম্বা পরের জন্মে পুরুষ হবেন, এই বর পেয়ে থাকলে তিনি কেন প্রথমে কন্যা হয়ে জন্মালেন? এক গন্ধর্বের

সংগে লিংগ বিনিময় কথা অভিপ্রাকৃত, গ্রাহ্য নয়। অতএব নানা কারণে উপাখ্যানটি অগ্রাহ্য। কচিৎ কদাচিৎ লিংগ পরিবর্তনের কথা শোনা যায়, জন্ম-কালে কন্যা বলে গৃহীত শিশুর দেহাভ্যন্তর হতে পুরুষ লিংগ নির্গত হয়ে বহির্দেশে স্থিতিলাভ করে, তখন শিশুটিকে পুত্র ভাবে নিতে হয়। ১৭০।২০২-"কন্যা ভূত্বা পুমান জাতঃ ন যোৎস্যে তেন ভারত" শ্লোকার্ধের সেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সেই যে অম্বা ছিল পূর্বজন্মে, সে কথা ভীষ্ম ১৯২।৬৪ শ্লোকে বলেছেন কিন্তু শিখণ্ডীর নিজের মুখে সে কথা পাই না। অতএব শুধু উপাখ্যান হিসেবে নয়, উপাখ্যানের অর্বাচীনতার জন্যও ১৭৩-১৯২ অধ্যায় বাদ হবে।

১৯৩-১৯৪ অধ্যায় দুই পক্ষের মহাবীরদের বড়াই, কে কতদিনে শত্রুসৈন্য ধ্বংস করতে পারে। পর্বসংগ্রহে কোন উল্লেখ না থাকায় বাদ হবে। ১৯৫।১২-১৯ শ্লোক, কৌরব শিবির নির্মাণ, তা ১৫৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে। ১৯৫।১-১১ কৌরব সৈন্যের যুদ্ধার্থ নিষ্ক্রমণ, এবং ১৯৬ অধ্যায় পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধার্থ নিষ্ক্রমণ, ভীষ্মপর্বে ১৭-১৯ অধ্যায়ে তা বর্ণিত আছে, সেখানেই যুক্তিযুক্ত। অতএব ১৯৩ ১৯৬ অধ্যায় বাদ পড়বে।

১১. ভীষ্মপর্ব

প্রথম অন্তপর্ব জম্বুখণ্ড বিনির্মাণ ১-১০ অধ্যায়ে কথিত। ১ অধ্যায়ে যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালীন অবস্থা ও যুদ্ধের নিয়ম স্থাপন—১-১৭, ২৩-৩৪ গ্রাহ্য, ১৮-২২ শ্লোক আতিশয্য হেতু বাদ। ২-৩ অধ্যায়ে আছে যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, যুদ্ধের কুলক্ষণ বর্ণনা ক'রে তারপরে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধ দেখবার জন্য দিব্যচক্ষু দিতে চাইলেন, ধৃতরাষ্ট্র বললেন যে ধৃতরাষ্ট্র স্বচক্ষে স্বজনের নিধন দেখতে চান না, শুধু বর্ণনা শুনতে চান। তখন ব্যাস সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দিলেন, বললেন যে সে সব দেখতে পেয়ে তোমাকে সম্পূর্ণ বর্ণনা শোনাবে। দিব্য-দৃষ্টির কথা গ্রাহ্য নয়, সে কথা প্রথম খণ্ডের ১৪ অনুচ্ছেদে যুক্তিসহ বলা হয়েছে। এই দুটি অধ্যায়ে আর যা আছে, যথা শুভ অশুভ লক্ষণের কথা, তা অবান্তর। ২-৩ অধ্যায় বাদ হবে। ৪-১০ অধ্যায়ে ভূমি বা পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদ ধারক রূপের বর্ণনা, জম্বুদ্বীপে বা এশিয়ায় পর্বত ও দেশ বিভাগ বর্ণনা, ভারতবর্ষের পর্বত, নদী ও দেশবিভাগের বর্ণনা, এবং বিভিন্ন যুগে মানবের আয়ুর বর্ণনা আছে।

পৌরাণিক কালের ধারণা মত বর্ণনা, বর্তমান কালের উপযুক্ত বর্ণনা নয়, এবং ভারতকথা প্রসঙ্গে অবান্তর, তাই এই অধ্যায়সমূহ সম্পূর্ণ বাদ হবে।

দ্বিতীয় অনুপর্বের নাম ভূমিপর্ব, ১১-১২ অধ্যায়ে মাত্র কথিত; সে দুটিতে জম্বুদ্বীপ ছাড়া বাকী দ্বীপ বা মহাদেশ সমূহের বর্ণনা, ত কাল্পনিক এবং ভারতকথায় অবান্তর; সম্পূর্ণ বাদ হবে।

তৃতীয় অনুপর্ব ভগবদ্গীতাপর্ব, তার মধ্যে ১৩-২৪ অধ্যায়ে যুদ্ধের কথা এবং গীতার ভূমিকা ২৫-৪২ অধ্যায়ে ভগবদ্গীতা। ১৩ অধ্যায়ে আছে যে সঞ্জয় হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্র হতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হয়ে শিখণ্ডীর হস্তে ভীষ্মের মৃত্যুসংবাদ দিলেন। অধ্যায়টি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য। ১৪ অধ্যায়ে ভীষ্মেরমৃত্যুহেতু ধৃতরাষ্ট্রের দীর্ঘ বিলাপ আছে, ডঃ বেল্‌ভলকর, বলেছেন যে এই অধ্যায়টি নিকৃষ্ট ও বর্জনীয় মনে হয়, তবে বহু প্রদেশের পুঁথিতে এটি থাকায় তিনি বাদ দিতে পারেন নাই। আমার মতে শুধু ১-৪, ৫৭^{২}-৫৮^{১}, ৭৬-৭৯, এই নয়টি শ্লোক গ্রাহ্য, বাকী শ্লোক বাদ হবে। ১৫/ -৯ শ্লোক বাদ হবে, তাতে ব্যাসের বরদান ও সঞ্জয়েধৃ তিরস্কার বর্ণিত। ১৫/১০-২০ গ্রাহ্য, ১৩ অধ্যায়ে দশদিনের যুদ্ধফল বলে এখান থেকে বিস্তৃত বর্ণনার আরম্ভ। ১৬ অধ্যায়ে বাহিনীদ্বয়ের শিবির হতে নিষ্ক্রমণ বর্ণিত হয়েছে, গ্রাহ্য। ১৭/১-৪, ৭-৩৯ গ্রাহ্য, ৫-৬ শ্লোক বাদ হবে—তাতে আছে যে ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রতিদিন প্রাতে পাণ্ডুপুত্রদের জয় হোক বলে কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ করতেন, কিন্তু তাঁরাউভয়েই যথাসাধ্য যুদ্ধ করেছেন, প্রতিদিন প্রাতে পাণ্ডুপুত্রদের জয় হোক বলে কাজ আরম্ভ করতেন তা গ্রাহ্য নয়। ১৮, ১৯ অধ্যায়ের ব্যূহ নির্মাণাদি বর্ণনা গ্রাহ্য। ২০ অধ্যায় বাদ হবে, তাতে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন আছে যে যুদ্ধোদ্যম কালে কাদের সেনাকে বেশী হৃষ্ট দেখা গেল—এই প্রশ্ন আবার ২৪ অধ্যায়ে আছে, এবং ২০ অধ্যায়ের ভাষা ও বর্ণনাশৈলী নিকৃষ্ট মনে হয়। ২১ অধ্যায়ে নারদের কথা এবং কৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠপতি হরি বলা হয়েছে, এই অধ্যায় পরের কালে যোজিত সন্দেহ নাই। ২২ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির কর্তৃক পাণ্ডবগণের সেনাকে উৎসাহ দান ও পাণ্ডবগণ কর্তৃক ভীষ্মরচিত ব্যূহের প্রতিব্যূহ রচনা ইত্যাদি আছে, পাণ্ডবগণের ব্যূহগঠনের কথা ১৯ অধ্যায়েই আছে, ২২ অধ্যায়ে পুনরুক্তি, তা বাদ হবে। ২৩ অধ্যায়ে কৃষ্ণের উপদেশ মত অর্জুন কর্তৃক দুর্গাস্তব তা বাদ হবে। খৃঃপূঃ একাদশ-দশম শতকে দুর্গাপূজা প্রবর্তন হয় নাই। সংশোধকগণও এই অধ্যায় বাদ দিয়েছেন।

২৪ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন, কারা হৃষ্টমুখে যুদ্ধারম্ভ করে, কারা পূর্বে প্রহার করে, কারা গন্ধ-মাল্যভূষিত, তার সম্পূর্ণ উত্তর এই অধ্যায়ে নাই, দুই পক্ষের সৈন্য-দেরই হৃষ্ট দেখা গেল বলে অকস্মাৎ অধ্যায়টির শেষ হ'ল। ৪৪ অধ্যায়ে আবার ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন আছে কারা আগে প্রহার আরম্ভ করল, তার উত্তর সঞ্জয় দিলেন। মধ্যে ২৫-৪২ অধ্যায়ে ভগবদ্গীতা এবং ৪৩ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের কৌরব ব্যূহের মধ্য দিয়ে গিয়ে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্যকে প্রণাম জানাবার কথা আছে। ভগবদ্গীতা যুদ্ধকালে কথিত কিনা, তা মূল মহাভারতের অংশ কিনা, তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে বলা যায় যে মূল মহাভারতে কৃষ্ণ মানবরূপে চিত্রিত, গীতায় তাঁকে ভগবান রূপে কথা বলান হয়েছে। কৃষ্ণের উপর বিষ্ণুর অবতারত্ব আরোপ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহু শতাব্দী পরে হয়েছিল, সম্ভবতঃ তা হয় খৃ:পূ: দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে। উভয় পক্ষের সৈন্য যখন মুখোমুখী হয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে, তখন একপক্ষের শ্রেষ্ঠ বীর কয়েক দণ্ড ধরে ধর্মতত্ত্ব শুনবেন এবং দুই পক্ষের সেনাই চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে থাকবে তা সম্ভব নয়। গীতায় যেন ভারতযুদ্ধের বর্ণনা নূতন করে আরম্ভ করা হল, ভীষ্মপর্বে ১৬-১৯ অধ্যায়ে যে যুদ্ধোদ্যমের বর্ণনা আছে, সেটাকে যেন অস্বীকার করা হয়েছে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে কয়েকটি কথা আছে, যা মহাভারত কাহিনীর সঙ্গে মেলে না; মহাভারত আখ্যানে অর্জুন সেদিন পাণ্ডবব্যূহ রচনা করেছিলেন বলা হয়েছে (১৯ অঃ), কিন্তু গীতায় প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ধৃষ্টদ্যুম্ন তা করেন। গীতায় শৈব্য ও কাশীরাজের নাম পাণ্ডবপক্ষের শ্রেষ্ঠ বীরদের মধ্যে করা হয়েছে, কিন্তু মহাভারতে তাদের নাম যদি বা খুঁজে পাওয়া যায়, তাদের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণের কথা নাই। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য এই কথা যে গীতার উপদেশে অর্জুনের যে কোন ভাবান্তর হ'ল, তা দেখা যায় না, প্রথমদিন যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের নিকট আক্ষেপ করছেন যে ভীষ্ম দ্রোণ পাণ্ডব সেনাকে অগ্নিবৎ দগ্ধ করছেন, এক ভীম তার যথাসাধ্য প্রতিকার চেষ্টা করছেন, কিন্তু অর্জুন নির্লিপ্ত-ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করছেন। গীতা শুনে "তোমার কথামত কাজ করব" কৃষ্ণকে বলে অর্জুন কি নির্লিপ্তভাবে থাকতেন? আরো দ্রষ্টব্য যে যুদ্ধপর্বগুলির মধ্যে কোথায়ও গীতার বা গীতার উপদেশের উল্লেখ নাই। শান্তি পর্বে ও আশ্বমেধিক পর্বে আছে, কিন্তু তা স্পষ্টত পরের কালে যোজিত। যুধিষ্ঠিরের-কৌরব বাহিনীর মধ্যদিয়ে গিয়ে ভীষ্ম দ্রোণাদিকে প্রণাম করার কারণ নাই, সঞ্জয়-

ও কৃষ্ণের দৌত্যকালে তিনি তাদের প্রমুখাৎ প্রণাম জানিয়েছিলেন। অতএব ২১-৪৩ অধ্যায় বাদ হবে, তা মূল ভারতকথার অংশ নয়; ২৪ অধ্যায় বাদ হবে, কারণ ২৪ অধ্যায়ে কৃত প্রশ্ন আবার ৪৪ অধ্যায়ে করা হয়েছে, সেখানেই গ্রাহ্য।

প্রথম দিনের যুদ্ধ বিবরণের মধ্যে ৪৭।৪৩২ হতে ৪৯।২৫[১], যাতে পাণ্ডব-পক্ষীয় বীর শ্বেতের তীব্র যুদ্ধ ও মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু সংশোধকগণ নয়, প্রমাণ মহাভারতের সম্পাদকও প্রক্ষিপ্ত বলেছেন। শ্বেতের নাম রথাতিরথ সংখ্যানে নাই। ভীষ্মের দশদিন যুদ্ধ বিবরণ বহু বিস্তৃত, তার মধ্যে শ্বেতের যুদ্ধ কথার মত আরো বহু প্রক্ষিপ্ত অধ্যায় ও শ্লোক আছে সন্দেহ নাই। ভীষ্মের সৈনাপত্যে প্রকৃতই দশদিন যুদ্ধ হয়েছিল কিনা, তাতেও সন্দেহ আছে। কারণ ভীষ্ম তখন অতি বৃদ্ধ, এবং ভীষ্মের সৈনাপত্য কালে দশম দিনে ভীষ্মের পতন ছাড়া কোন প্রখ্যাত পাণ্ডব বা কৌরববীরের পতন হয় নাই। তৃতীয় দিন যুদ্ধ বিবরণে ও নবম দিন যুদ্ধ বিবরণে আছে যে কৃষ্ণ অর্জুনের মৃদুযুদ্ধে বিরক্ত হয়ে নিজেই রথ থেকে লাফিয়ে নেমে ভীষ্মের দিকে ছুটলেন, অর্জুন অনেক কষ্টে তাঁকে নিবৃত্ত করলেন। পর্বসংগ্রহে একবারই কৃষ্ণের প্রতোদ হাস্ত ভীষ্মের অভিমুখে ধাবনের কথা আছে। ডঃ বেলভল্কর বলেছেন যে তৃতীয় ও নবম দিবসে কৃষ্ণের ভীষ্ম অভিমুখে ধাবনের কথার মধ্যে একটি বাদ দিতে পারলে তিনি সুখী হতেন, অর্থাৎ একটি যে পরের কালের যোজনা, তা তিনি অনুভব করছেন, কিন্তু নানাস্থানের পুঁথিতে তা থাকায় বাদ দিতে পারেন না। হয়তো তৃতীয় দিনের যুদ্ধ ও নবম দিনের যুদ্ধ একই দিনের কথা, এবং ভীষ্মের সৈনাপত্যে যুদ্ধ চারদিনেই শেষ হয়েছিল। কিন্তু বহুশতাব্দী ধরে যে ঐতিহ্য গৃহীত হয়েছে, শুধু অনুমানের উপরে তা অন্যরকম করা সম্ভব নয়। তবে তৃতীয় দিনের যুদ্ধ বিবরণ হতে কৃষ্ণের রথ হতে লাফিয়ে পড়ে ভীষ্মের দিকে দ্রুত গমনের কথা ইত্যাদি বাদ দেওয়া বটে, কারণ তৃতীয় দিনের এই ঘটনার বিবরণে আছে যে কৃষ্ণ তাঁর বজ্রনাভ চক্র নিয়ে ছুটলেন[১], সেই চক্র তো কৃষ্ণের রথে, বা শিবিরে থাকবে তা অর্জুনের রথে কৃষ্ণ কি করে পাবেন? পর্বসংগ্রহে কৃষ্ণের প্রতোদ হস্তে গমনের কথা

১। ৫৯।৮০-৮৯: "ততঃ সুনাভং বসুদেবপুত্রঃ সূর্যপ্রভং বজ্রসমপ্রভাবম্।
ক্ষুরান্তমুদ্যম্য ভুজেন চক্রং রথাদবপ্লুত্য বিসৃজ্য বাহান।
সংকম্পয়ন্ গাং চরণৈর্মহাত্মা বেগেন কৃষ্ণঃ প্রসসার ভীষ্মম্ ॥"

আছে, নবম দিনের ঘটনায় ১০৬ অধ্যায়ে আছে যে কৃষ্ণ প্রতোদ নিয়েই ভীষ্মের দিকে ছুটলেন। ৫৯ অধ্যায়ে এবং ১০৬ অধ্যায়ে এই ঘটনার বিবরণ দিতে বহু সাধারণ শ্লোক আছে, তার থেকেও মনে হয় কোন পরের কবি শ্লোক নকল করে দ্বিতীয় ঘটনার বিবরণ লিখে বসিয়ে দিয়েছেন। অতএব ৫৯/৪৯-১০৭ শ্লোক বাদ হবে। প্রথম দিন থেকে চতুর্থ দিনের যুদ্ধ বিবরণে যে দুটি ঘটনার বিবরণ বাদের কথা বলা হল, তাছাড়া সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্য। চতুর্থ দিনের যুদ্ধ বিবরণ শুনে ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করলেন যে আমাদের দিকে এত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আছে, তারা পাণ্ডবদের কিছু ক্ষতি করতে পারছে না কেন? উত্তরে সঞ্জয় বললেন, চতুর্থ দিন যুদ্ধশেষে দুর্যোধন গিয়ে ভীষ্মকে সেই প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তরে ভীষ্ম যা বলেছিলেন, তা আপনাকে শোনাচ্ছি (৬৫/১-২০)। ভীষ্মের উত্তর হ'ল যে পাণ্ডবগণ বাসুদেবের দ্বারা রক্ষিত, বাসুদেব হলেন বিশ্বের প্রভু, বিশ্বমূর্তি, বিষ্ণুরূপে পরমপুরুষ; তিনিই আবার আত্মরূপে সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন তাঁর আত্মা স্বরূপ, প্রদ্যুম্ন হতে তিনি অনিরুদ্ধকে সৃষ্টি করেছেন আবার অনিরুদ্ধও অব্যয় বিষ্ণু স্বরূপ। সেই পরমপুরুষ বাসুদেবরূপে নরদেহ ধারণ করেছেন, পাণ্ডবগণ তাঁর রক্ষিত, তাই তারা অবধ্য এবং যুদ্ধে জয়ী হবে, বলদেব সাত্বত বিধি গানে প্রকাশ করে বাসুদেবের আরাধনা করেছিলেন। ডঃ বেলভলকর বলেছেন যে ৬৪-৬৮ অধ্যায়ে বিবৃত এই যে বিশ্ব উপাখ্যান বা চতুর্ব্যূহতত্ত্বযুক্ত সাত্বতবিধি বা নারায়ণীয় ধর্ম বিবরণ, তা পরের কালের প্রক্ষেপ এবং বাদ দিতে পারলে খুশী হতেন, কিন্তু উত্তর ভারত দক্ষিণ ভারত সব স্থানের পুঁথিতে থাকায় বাদ দিতে পারেন নাই। কিন্তু কৃষ্ণকে বিষ্ণু ভগবানের অবতার বা সাক্ষাৎ ভগবান রূপে পূজা খৃঃ পূঃ তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতকের পূর্বে হয় নাই, নারায়ণীয় বা সাত্বত ধর্ম কৃষ্ণ কর্তৃক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে প্রচারিত হয়। অতএব ৬৫-৬৮ অধ্যায় যে মূল ভারত কথার অংশ নয়, অনেক পরের কালে যোজিত, তাতে কোন সন্দেহ নাই। এই চারটি অধ্যায় বাদ হবে;

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ বিবরণের মধ্যে ৭৬ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ এবং ৭৭/১-৫ শ্লোকে সঞ্জয়ের তিরস্কার অবান্তর হিসাবে বাদ হবে। পঞ্চমদিনের যুদ্ধ বিবরণ (৬৯-৭৪ অধ্যায়) ও ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ বিবরণের (৭৫-৭৯ অধ্যায়) অবশিষ্ট অংশ সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্য। সপ্তম দিনের যুদ্ধ বিবরণও (৮০-৮৬ অধ্যায়) সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্য। অষ্টম দিনের যুদ্ধ বিবরণ (৮৭-৯৬ অধ্যায়) মধ্যে

৮৯।১-১৩ শ্লোক বাদ হবে—তাতে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ ও সঞ্জয়ের তিরস্কার আছে, তা অবান্তর মনে হয়। ৯০ অধ্যায়ে অর্জুন উলূপীর পুত্র ইরাবানের সসৈন্যে আগমন, অর্জুনের নিকট পরিচয় দান, এবং পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করে কৌরব কাহিনী বিচলিত করে অবশেষে কৌরবপক্ষে নবাগত এক রাক্ষস অতিরথ আর্যশৃঙ্গির হস্তে মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে। আদিপর্বে উলূপী সহ সঙ্গমের কথা যেখানে আছে, সেখানে অর্জুন উলূপীর পুত্রের নাম নাই, পর্বসংগ্রহ হতে বভ্রুবাহন উলূপীর পুত্র সেই কথা মনে হয়। ভীষ্মের অষ্টম দিন যুদ্ধ বিবরণে ছাডা ইরাবানের নাম মহাভারতে আর কোথাও নাই, বিষ্ণুপুরাণে আছে, মনে হয় পৌরাণিক যুগে যুদ্ধ বিবরণ স্ফীত করতে ইরাবানের কথা আনা হয়েছে। এই অধ্যায়ের ভাষায় কিছু পার্থক্য আছে, যথা "বচম্" শব্দ পরপর দুবার ব্যবহৃত হয়েছে (৩২, ৪২ শ্লোকে), সেই শব্দের ব্যবহার যুদ্ধ বর্ণনায় অন্যত্র বিশেষ নাই। এই অধ্যায় বাদ হবে, এবং ইরাবানের উল্লেখ থাকায় ৯১।১, ২[১]; ৯৬।১-১৩; ৯৫।৮৩ শ্লোক বাদ হবে।

নবম দিনের যুদ্ধ বিবরণ ৯৭-১০৭ অধ্যায নিয়ে বর্ণিত। তার মধ্যে ১০৩ অধ্যায বাদ দেওযা যায়, এটি সঙ্কুল যুদ্ধ বিবরণ, যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে নদীর তুলনা করা হয়েছে, তা অনেক অধ্যাযে আছে। এই অধ্যায়ে মধ্য দিনের যুদ্ধ বর্ণন বলে আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু ১০৪ অধ্যায়ে মধ্যদিনের যুদ্ধের কথা আছে। ১০২ অধ্যায়ের পরে ১০৪ অধ্যায পডলে স্বাভাবিক মনে হয়। ১০৩ অধ্যায় বাদ হবে। ১০৭ অধ্যাযে আছে যে যুদ্ধশেষে যুধিষ্ঠিরাদি ভীষ্মের কাছে গিযে তাঁর বধের উপায় জান্তে চাইলেন, এবং ভীষ্মও বলে দিলেন যে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে যুদ্ধ কর, তাকে আমি আঘাত করব না, সেই সুযোগে আমাকে বধ করতে পারবে। বিপক্ষের সেনাপতির নিকট গিযে তার বধের উপায় জানার চেষ্টার কথা গ্রাহ্য নয়। সে কথা অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ১৮৩ শ্লোকে ছিল, সেটি সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন। ১০৭।৪৫ ৯০[১] শ্লোক বাদ হবে।

দশম দিনের যুদ্ধ বিবরণ ১০৮ ১২২ অধ্যায়ে আছে। তারমধ্যে বহু পুনরুক্তি, অর্থাৎ নানা কবির হস্তক্ষেপের নিদর্শন পাওযা যায়। ১০৮, ১০৯ ও ১১৫ অধ্যায়ের প্রারম্ভে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন আছে, ১০৮ ও ১০৯ অধ্যাযে প্রশ্ন যে শিখণ্ডী ও পাণ্ডবগণ কিভাবে ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল? ১১৫ অধ্যায়ে প্রশ্ন যে ভীষ্ম কিভাবে পাণ্ডব ও পাঞ্চালদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। ১০৮-১১৪ অধ্যায

বাদ দিয়ে ১১৫-১১৯ অধ্যায় পড়লে দশম দিনের যুদ্ধের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। অতএব ১০৮-১১৪ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হিসাবে বাদ হবে। ১১৯ অধ্যায়ের ৯২-১০৯[১] শ্লোকে কথিত ভীষ্মের উত্তরায়ণের জন্য প্রতীক্ষার কথা বাদ হবে। সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুতেই তো ক্ষত্রিয়দের স্বর্গলাভ হয় এই ধারণা ছিল, তাছাড়া ভীষ্ম যদি শাপভ্রষ্ট বসু হয়ে থাকেন, তবে তো তাঁর মানবদেহ ত্যাগ করে যেতে বিলম্ব করবার কারণ নাই। শাপভ্রষ্ট বসুর কথা অবশ্য পৌরাণিক কল্পনা, তবু আর কোন ক্ষত্রিয় বীর উত্তরায়ণের প্রতীক্ষার কথা বললেন না, ভীষ্মই বা কেন বলবেন? ১২০-১২১ অধ্যায়ে আছে যে অর্জুন শরশয্যায় পতিত ভীষ্মের দোদুল্যমান মস্তকের জন্য তিনটি বাণ দিয়ে উপাধান বা বালিশের মত করে দিলেন, এবং ভীষ্মের পিপাসা নিবারণের জন্য বরুণ অস্ত্র প্রয়োগ করে ভূমি হতে জলের উৎস সৃষ্টি করলেন, যা ভীষ্মের মুখে গিয়ে পড়ল। এই সব অনৈসর্গিক কথা বাদ হবে, অর্থাৎ ১২০,৩৪-৫৪ ও ৬১২, ১২১ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ১২২ অধ্যায়ে ভীষ্মের পতনের পরে কর্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা আছে, তা গ্রাহ্য।

১২ দ্রোণ পর্ব : দ্রোণাভিষেক হতে জয়দ্রথ বধ অনুপর্ব

প্রথম অনুপর্ব দ্রোণাভিষেক, ১-১৬ অধ্যায়ে কথিত। যুদ্ধপর্বগুলির মধ্যে দ্রোণপর্ব বৃহত্তম, দ্রোণের সৈনাপত্যকালে পাঁচদিন যুদ্ধ হয়, তাতে দুইপক্ষের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ বীর নিহত হয়, সৈন্যক্ষয়ও সবচেয়ে বেশী হয়।[১] ভীষ্মপর্বে যেমন ১৩ অধ্যায়ে আছে যে সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র হতে সহসা এসে ভীষ্মের মৃত্যু সংবাদ দিলেন, পরে দিন অনুক্রমিক যুদ্ধ বর্ণনা দিলেন, তেমন দ্রোণ পর্বেও আছে যে সঞ্জয় রাত্রে হস্তিনাপুরে এসে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করে ভীষ্মের পতনের পরে দ্রোণকে সৈনাপত্যে বরণের কথা ও দ্রোণের পাঁচদিন যুদ্ধের সংক্ষেপ বর্ণনা দিয়ে তাঁর মৃত্যুর কথা বললেন (১।৬, ৭; ৬ ৮ অধ্যায়), তার পরে দিন অনুক্রমিক বিস্তৃত যুদ্ধ বর্ণনা ১২ অধ্যায় থেকে আরম্ভ হ'ল। তবে দ্রোণ পতনের সংবাদ ভীষ্ম পতনের সংবাদের মত তত অল্পকথায় বলা হয় নাই, প্রথম অধ্যায়গুলির মধ্যে বহু প্রক্ষিপ্ত আছে। যথা ৩, ৪ অধ্যায়ে ভীষ্ম ও কর্ণের সাক্ষাতের কথা

১ : আশ্বমেধিক ৬০।১৭

বর্ণিত আছে, তা ভীষ্মপর্বে ১২২ অধ্যায়েই বর্ণিত হয়েছে, দ্রোণ পর্বের ৩ ৪ অধ্যায় পুনরুক্তি। আরো কিছু পুনরুক্তি আছে। গ্রাহ্য মনে হয় ১।১. ২, ৪-৭, ১৩, ৪৩, ৪৪ ; ৪ ১৫, ১৬, ১৮—তার মধ্যে ৪।১৫[১] ঈষৎ পরিবর্তিত হবে—"নিশম্য বচনং তস্য চরণাবভিবাদ্য চ" স্থলে "নিশম্য স্ফেউতং তেষাং রথমারুহ্য সত্বরম্" হতে পারে। পরে ৫-৮ অধ্যায়, সংশোধিত পাঠমত ; ১-৪ অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশ বাদ হবে। ৯, ১০ অধ্যায়ে দ্রোণ বধে ধৃতরাষ্ট্রের দীর্ঘ বিলাপ, ১১ অধ্যায়ে কৃষ্ণের মাহাত্ম্যের কথা বলে বিস্তৃত বিবরণ বলার আদেশ আছে। দীর্ঘ বিলাপ ও কৃষ্ণ মাহাত্ম্য প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই, গ্রাহ্য শুধু ৯।১ ৯ (বিলাপের অল্প অংশ) এবং ১১।৫০-৫১ (বিস্তৃত বিবরণ বলতে আদেশ)।

১২-১৬ অধ্যায়ে প্রথম দিনের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। সংশোধিত পাঠে কিছু কিছু শ্লোক বাদ হয়েছে। সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্য।

দ্বিতীয় অনুপর্ব সংশপ্তক বধ ১৭-৩২ অধ্যায়ে বর্ণিত। দ্বাদশ দিবসের যুদ্ধ হতে সংশপ্তকদের কথা সপ্তদশ দিবসের যুদ্ধ পর্যন্ত আছে, দ্বাদশ দিবসের যুদ্ধেই তাদের শেষ নয়। দ্বিতীয় অনুপর্ব সমস্তটাই দ্বাদশ দিবসের যুদ্ধ বর্ণনা। ২৩ ২৪ অধ্যায়ে রথীদের অশ্বধ্বজাদি বর্ণন, এবং ধৃতরাষ্ট্রের কিছু বিলাপ ও যুদ্ধের গতি সম্বন্ধে প্রশ্ন, এই দুটি অধ্যায় অবান্তর মনে হয়, বাদ হবে। ২৯ অধ্যায়ে অর্জুন ভগদত্তের যুদ্ধ বর্ণনায় ১৭-৩৯ শ্লোক বাদ হবে, তাতে আছে যে ভগদত্তের বৈষ্ণবাস্ত্র কৃষ্ণ বক্ষ ধারণ করলেন এবং সেটা তাঁর গলায় মালা হয়ে গেল। অনৈসর্গিক হিসাবে বাদ, কৃষ্ণ যখন বিষ্ণুর অবতার রূপে গৃহীত হয়েছেন, তখনকার কালের প্রক্ষেপ। অবশিষ্ট শ্লোক ও অধ্যায় সংশোধিত রূপে গৃহীত হতে পারে।

তৃতীয় অনুপর্ব অভিমন্যু বধ, তৃতীয় দিবসের যুদ্ধ, ৩৩-৭১ অধ্যায় নিয়ে, তার মধ্যে ৫২-৭১ অধ্যায় সংশোধক মণ্ডলী বাদ দিয়েছেন ; সেগুলি ব্যাস ও নারদ কথিত নানা উপাখ্যান হিসাবেও বাদ হবে, তার মধ্যে আছে মৃত্যুর উৎপত্তি কথা, স্রুঞ্জয়-সুবর্ণষ্ঠীবী কথা ও ষোড়শ রাজক পর্ব। ৩৩ অধ্যায়ে ২২-২৪ শ্লোক বাদ হবে, তাতে অভিমন্যুকে বাল এবং "অপ্রাপ্তযৌবন" বলা হয়েছে। ৩৪ অধ্যায়ে ১-১০ শ্লোক বাদ হবে, সঞ্জয় পাণ্ডবগণের ও অভিমন্যুর গুণগান করছেন, ১৯ শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্র অধীর হয়ে যুদ্ধের বিবরণ শুনতে চাইছেন, সেটিও বাদ হবে ; ১২, ১৪[১] শ্লোক সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন, বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ৪২।১-২২

শ্লোকে শিবের বরে অর্জুন ভিন্ন পাণ্ডবগণকে নিবারণ করতে জয়দ্রথের সামর্থ্য প্রাপ্তির কথা আছে, তা অনৈসর্গিক হিসাবে বাদ হবে। জয়দ্রথ ব্যূহদ্বারে থেকে অভিমন্যুর ব্যূহ প্রবেশের পরে শুধু যুধিষ্ঠির ভীম-নকুল-সহদেবকে নয়, সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি অতিরথকেও নিবারণ করলেন, তাদের সম্বন্ধে শিব হতে বরপ্রাপ্তির কথা নাই। মনে হয় সে ব্যূহদ্বারে জয়দ্রথ একা নয়, তার সঙ্গে আরো কয়েকজন কৌরব পক্ষীয় মহারথ ছিলেন। ৫০।৩-১৫ শ্লোকে সমরভূমি বর্ণন অবান্তর হিসাবে বাদ হবে, ৫০।১, ২ শ্লোক পূর্ব অধ্যায় সহ যোগ হবে। অবশিষ্ট অধ্যায় সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য।

চতুর্থ অনুপর্ব, প্রতিজ্ঞাপর্ব, ৭২ ৮৪ অধ্যায়ে কথিত হয়েছে, প্রতিজ্ঞার কাল হ'ল ত্রয়োদশ দিবসের যুদ্ধশেষে। তার মধ্যে ৭৭-৭৮ অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্তৃক সুভদ্রা, উত্তরা ও দ্রৌপদীকে সান্ত্বনাবাণী বলার কথা, সুভদ্রার বিলাপের কথা ইত্যাদি আছে। কিন্তু পাণ্ডব নারীগণ যুদ্ধকালে উপপ্লব্যে বাস করছিলেন, সে কথা উদ্যোগ পর্বে আছে। অশ্বত্থামা যখন যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবসের রাত্রিতে অতর্কিতে পাণ্ডব পাঞ্চাল শিবির আক্রমণ করে তখন শিবিরে কোন নারী ছিল বলে উল্লেখ নাই। তার পরদিন নকুল উপপ্লব্যে গিয়ে রথে করে দ্রৌপদীকে শিবিরে নিয়ে আসেন। ত্রয়োদশ দিবসের যুদ্ধশেষে অর্জুন পরদিন জয়দ্রথ বধ করবার প্রতিজ্ঞা করবার পর তাঁরা বিশ্রাম না করে যে রথে উঠে উপপ্লব্যে যাবেন ও ফিরে আসবেন, তা মনে করবার কারণ নাই, তা সম্ভব নয়। অতএব ৭৭-৭৮ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হিসাবে বাদ হবে; ৮০ ৮১ অধ্যায়ে কথিত স্বপ্নে কৃষ্ণ অর্জুনের একসঙ্গে শিবের নিকট গমন ও পাশুপত অস্ত্রলাভের কথা আছে। সে কথা সম্পূর্ণ উদ্ভট কল্পনা হিসাবে বাদ হবে। যুদ্ধে পাশুপত অস্ত্র অর্জুন ব্যবহার করেন নাই। ৮০ ৮১ অধ্যায় যে পরে প্রক্ষিপ্ত, তা'র আরো নিদর্শন এই যে ৭৯ অধ্যায় আছে যে কৃষ্ণ দারুককে ডেকে পরদিন প্রাতে নিজের রথ অস্ত্রসজ্জিত করে রাখতে বললেন, উদ্দেশ্য যে অর্জুন যদি সূর্যাস্তের পূর্বে সব বাধা চূর্ণ করে জয়দ্রথের নিকট গিয়ে তাকে বধ করতে পারবে না মনে হয়, তবে তিনি নিজের রথে উঠে সব বাধা চূর্ণ করে দিয়ে অর্জুনের জন্য পথ করে দেবেন; ৮২/১ শ্লোকে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ ও দারুকের কথাবার্তায় রাত কেটে গেল। অতএব ৮০-৮১ অধ্যায় যে পরে প্রক্ষিপ্ত তাতে কোন সন্দেহ নাই। ৭২ অধ্যায়ে অর্জুনের বিলাপ, অভিমন্যুর মৃত্যু আশঙ্কায়, অনাবশ্যক দীর্ঘ মনে হয়। কিছু সংক্ষেপ

করা যায়, গ্রাহ্য ১-২৫, ৫৫-৮৮। ৭৩ অধ্যায়েও অর্জুনের প্রতিজ্ঞা বর্ণনায় আতিশয্য আছে, গ্রাহ্য ১ ২৪, ৪৬ ৫৩, এবং ৯ নং শ্লোকে "বরদানেন রুদ্রস্য" স্থলে আর কিছু বসবে। ৭৪ অধ্যায়ে গ্রাহ্য ১-৩, ১০-৩৫ শ্লোক, ৪-৯ শ্লোক অর্জুনের দেবসম্ভব জন্মের উল্লেখ হেতু বাদ হবে। ৮৪ অধ্যায়ে ৫-৭ শ্লোক, অর্জুনের স্বপ্নে মহাদেবের দর্শন উল্লেখ, বাদ হবে। অবশিষ্ট অধ্যায় ও শ্লোক সমূহ সংশোধিতরূপে গ্রাহ্য।

পঞ্চম অনুপর্ব জয়দ্রথ বধ পর্ব, ৮৫-১৫২ অধ্যায় নিয়ে। জয়দ্রথ বধ হয় চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধে সূর্যাস্তকালের মধ্যে। ৮৫/১-৪ শ্লোকের পরে ৮৭ অধ্যায় বসবে। ৮৫/৫-২৯ শ্লোকে আছে যে ধৃতরাষ্ট্র বলছেন কৌরব শিবির হতে মঙ্গল ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি না, বিলাপ শুনছি। এ বিষয়ে প্রথম খণ্ডে ১৪ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। হস্তিনাপুর থেকে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শিবিরের শব্দ শোনা সম্ভব নয়। ৮৫ অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ ধৃতরাষ্ট্রের প্রলাপ এবং ৮৬ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের তিরস্কার আছে, তা সব বাদ হবে। ৮৭ অধ্যায় হতে যুদ্ধ বর্ণনা আরম্ভ। ৯২ অধ্যায়ে অর্জুনের সঙ্গে শ্রুতায়ুধের যুদ্ধ বিবরণ দিতে শ্রুতায়ুধের অতিপ্রাকৃত জন্মের কথা, বরুণদেবের ঔরসে ও পর্ণাশা নদীর গর্ভে জন্ম, ইত্যাদি কথা আছে, ৪৪[২]-৫২[১] এবং ৫৭-৫৮[১] শ্লোকে, তা বাদ হবে। ৯৪ অধ্যায়ে আছে যে দুর্যোধন দ্রোণের কাছে এসে অর্জুনকে পার হয়ে যেতে দেবার জন্য অনুযোগ করেন, এবং অর্জুনকে অনুসরণ করে গিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেন। দ্রোণ বলেন, আমি ব্যূহমুখ ছেড়ে গেলে আরো বিপত্তি হবে, সমস্ত পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনী এগিয়ে যাবে, তার থেকে তোমার অঙ্গে মন্ত্রপূত কবচ বেঁধে দিচ্ছি, তুমি গিয়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। সম্ভবতঃ মন্ত্র পড়ে এক প্রস্থ কবচের উপর দ্বিতীয় এক প্রস্থ কবচ বাঁধা হল, যাতে বাণে ভেদ করা না যায়। এই সূত্রে দ্রোণ একটি উপাখ্যান বললেন, বৃত্রবধ কালে শিব ইন্দ্রের শরীর মন্ত্রপূত অভেদ্য কবচ বেঁধে দিয়েছিলেন, সেই উপাখ্যান, ৯৫/২৯-৭১, বাদ হবে। ৯৫-৯৭ অধ্যায়ে ব্যূহমুখে দুই পক্ষের যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তার মধ্যে ৯৬ অধ্যায় বাদ দেওয়া চলে, তাতে ৯৫ অধ্যায়ে বর্ণিত কিছু দ্বন্দ্বযুদ্ধের পুনঃ বর্ণনা আছে। ৯৮ অধ্যায়ে দ্রোণ সাত্যকির দ্বৈরথ যুদ্ধ বর্ণিত, তার মধ্যে দেবগণ বিমানে এসে যুদ্ধ দেখে খুশী হলেন সে কথা ৩৩-৩৪, ৪৩-৪৫[১] শ্লোকে আছে, তা বাদ হবে। বাকী শ্লোক গ্রাহ্য।

৯৯-১০০ অধ্যায়ে রথ থামিয়ে কৃষ্ণের অশ্বচর্যা বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে আছে যে অর্জুন ভূমিতে বাণ বিদ্ধ করে অশ্বগণের মার্জন ও পানের নিমিত্ত একটি জলাশয় সৃষ্টি করলেন —"হংস কারণ্ডবাকীর্ণ"। তা অনৈসর্গিক, অতএব ৯৯/৫৯-৬৩ এবং ১০০/১, ৩-১২ শ্লোক বাদ হবে। মনে হয় যে কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মধ্যে মধ্যে জলাশয়, সরোবর ইত্যাদি ছিল, যেমন কিছু দূরে হ্রদ ছিল—সেখানে দুর্যোধন আত্মগোপন করেছিলেন। সেগুলির অবস্থান অর্জুনের জানা থাকায় তার একটির কাছে কৃষ্ণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। ১০২ অধ্যায়ে দুর্যোধন অর্জুনের সম্মুখীন হলে কৃষ্ণের দীর্ঘ ভাষণ আছে, তার কিছু অংশ ৫-১৮ শ্লোক, অবান্তর হিসাবে বাদ হবে। ১০৫।১-৩০ শ্লোকে ধ্বজ বর্ণনা, বাদ হবে। ডঃ বেলভলকর বলেছেন, নানা অধ্যায়ে যে ধ্বজ বর্ণনা আছে, তা বর্জনীয় মনে হয়, কিন্তু বহু পুঁথিতে থাকায় তা বাদ দেন নাই। ১০৮ অধ্যায়ে আছে যে বক রাক্ষসের ভ্রাতা অলম্বুষ এসে অদৃশ্য থেকে প্রথমে ভীমকে আক্রমণ করে, ভীম তার দিকে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে থাকলে তাকে রথে দেখা যায়, সে বহু অস্ত্রবর্ষণে পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনী ত্রাসিত করে, ভীমের কাছে পরাজিত হয়ে সে দ্রোণের ব্যূহে আশ্রয় নেয়। ১০৯ অধ্যায়ে আছে যে অলম্বুষকে সেইভাবে তীব্র যুদ্ধ করতে দেখে ঘটোৎকচ এগিয়ে আসে ও তীব্র যুদ্ধে তাকে নিধন করে। তার থেকে মনে হয় যে ১০৮।৩৬-৪৪ শ্লোক বাদ হবে, অর্থাৎ ভীমের হস্তে পরাজিত হয়ে অলম্বুষ দ্রোণের ব্যূহে আশ্রয় নেয় তা বাদ হবে, অলম্বুষ তীব্র যুদ্ধে পাণ্ডব পাঞ্চাল সৈন্যকে ত্রাসিত করছে দেখেই ঘটোৎকচ এগিয়ে আসে ও অলম্বুষের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ আরম্ভ করে, অতএব ভীমের আর কিছু করতে হয় না। ১১০ অধ্যায়ের প্রথম অংশে দ্রোণের হস্তে সাত্যকির পরাজয় ও দ্রোণ কর্তৃক পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনী বিদ্রাবণের কথা আছে ও ১১০।৩৬ শ্লোক থেকে আছে যে যুধিষ্ঠির পাঞ্চজন্য শঙ্খের ধ্বনি শুনে গাণ্ডীবের টঙ্কার ধ্বনি শুনতে না পেয়ে অর্জুনের জন্য চিন্তিত হয়ে সাত্যকিকে তার সাহায্যার্থ প্রেরণ করলেন। কিন্তু যখন পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনী বিদ্রাবিত, তখন এক শ্রেষ্ঠ বীর সাত্যকিকে বাহিনী থেকে অন্যত্র পাঠান হবে, তা সম্ভব মনে হয় না। ৯৮ অধ্যায়ে আছে যে দ্রোণ সাত্যকি তীব্র কিন্তু সমান যুদ্ধ করলেন, কেউ জিততে পারলেন না; সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল ও চারদিক ধূলায় আবৃত হয়ে গেল। সেই সময়ে সাত্যকিকে অর্জুনের সাহায্যে প্রেরণ সম্ভব, তাই ১১০/১-৩৫ শ্লোক বাদ

হবে, না হলে অসঙ্গতি থেকে যায়। ১১০ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের দীর্ঘ ভাষণ সংক্ষেপিত হবে, যুদ্ধকালে দীর্ঘ ভাষণের অবকাশ কোথায়? তাই ১১০।৩৬ ৪৭, ৬৮-৬৯ শ্লোক শুধু গ্রাহ্য, বাকী শ্লোক বাদ হবে। ১১১, ১১২ অধ্যায় গ্রাহ্য। ১১৩ অধ্যায় হতে ১২৪ অধ্যায় পর্যন্ত সাত্যকির কৌরব ব্যূহ বিদারণ করে অগ্রসর হওয়া বর্ণিত হয়েছে, কয়েকটি অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত মনে হয়, বস্তুতঃ যুদ্ধের বর্ণনা মধ্যে সর্বত্র পরের কালের যোজনা বা প্রক্ষেপ আছে, সব নিঃসন্দেহভাবে চিহ্নিত করা যায় না। অতএব ১১৪।১-৪৬ শ্লোক—ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ ও সঞ্জয়ের ভর্ৎসনা—বাদ দিয়ে সাত্যকির অভিযান বর্ণনা সংশোধিত পাঠমত নিতে হবে। ১২৪ অধ্যায়ে পুনঃ ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ ও সঞ্জয়ের তিরস্কার আছে, যুদ্ধ বর্ণনাও আছে, সংশোধিতরূপে নিতে হবে। ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ ও সঞ্জয়ের উত্তর মধ্যে মধ্যে রাখা কর্তব্য। ১২৫ অধ্যায়ে পুনঃ অপরাহ্নে দ্রোণের অপ্রতিহত বিক্রম ও জয়ের কথা বলা হয়েছে, অনেকটা ১০৬ ও ১১০ অধ্যায়ের মত, তার পরেই আবার ১২৬ অধ্যায় আছে যে অর্জুনের গাণ্ডীবটংকার শব্দ শুনতে না পেয়ে, সাত্যকি কোথায় আছে বুঝতে না পেরে যুধিষ্ঠির ভীমকে অর্জুনের সাহায্যার্থ কৌরব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যেতে বললেন। সে কারণে ১১০।১-৩৫ বাদ দেওয়া হয়েছে, সেই কারণে ১২৫ অধ্যায় বাদ হবে। ১২৪ অধ্যায়ের পরেই ১২৬ অধ্যায় হবে, ১২৬।১, ৩, ৪, ৮২-২৬ বাদ হবে, ১২৬ অধ্যায়ের বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ১২৭ অধ্যায় সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ১২৮।৪১-৫৬ শ্লোকও ও বাদ হবে, তাতে ১২৬।৮২ ২৬ শ্লোকের মত অর্বাচীন ভাষায় যুধিষ্ঠিরের দুশ্চিন্তা বর্ণিত হয়েছে, অনৈসর্গিক কথাও আছে। বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ভীম ও কর্ণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ কথা বহু দীর্ঘ করা হয়েছে, ১২৯, ১৩১-১৩৯ এই দশটি অধ্যায়ে। ১২৯ অধ্যায়ে বলা হ'ল যে কর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে বৃষসেনের রথে আশ্রয় নিলেন। ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬-এই চার অধ্যায়ে আরো চারবার ভীমের হস্তে কর্ণের পরাজয় ও বিরথীকরণ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে কর্ণের সাহায্যার্থ প্রেরিত ৩১ জন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের ভীমের অস্ত্রে মৃত্যুর কথা আছে। সম্ভবতঃ এক শত ধার্তরাষ্ট্রের মৃত্যু বর্ণনা করতে এই উপায় অবলম্বন করা হয়েছে; না হলে কর্ণের এতবার পরাজিত ও বিরথ ভীমসহ যুদ্ধে হবার কথা নয়। প্রথমে একবার ভীমকে উপেক্ষা করে মৃদু যুদ্ধ করে কর্ণ পরাজিত ও বিরথ হতে পারেন, তার পরে তীব্র যুদ্ধ করে ১৩৮-১৩৯ অধ্যায়ে যেভাবে বর্ণিত আছে, সেভাবে কর্ণ জয়লাভ করবেন তাই স্বাভাবিক। তাই গ্রাহ্য

কেবল ১২৯, ১৩০ অধ্যায়, ১৩১।১৯-৫৮, ১৩২।৫-৮ ১৩৮।৫-২৮ ও ১৩৯ অধ্যায়, বাকী অধ্যায় ও শ্লোক বাদ হবে।

১৪০ অধ্যায় বাদ হবে, তাতে সাত্যকির হস্তে অলম্বুষের নিধন বর্ণিত, কিন্তু ১০৯ অধ্যায়ে ঘটোৎকচের হস্তে অলম্বুষের নিধন বর্ণিত আছে, সেটাই গ্রাহ্য। ১৪১ অধ্যায়ের প্রথমাংশে সাত্যকি সহ ত্রিগর্ত রাজ এবং দুঃশাসনের যুদ্ধ বর্ণিত, কিন্তু সেই যুদ্ধ একবার ১২৩ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, অতএব ১৪০।১-১১১ বাদ হবে ; ১৬-২৫ শ্লোকও বাদ হবে, সাত্যকি পথে কি করে এলেন তা কৃষ্ণের তখন জানার কথা নয়, বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ১৪২-১৪৩ অধ্যায়ে ভূরিশ্রবা সাত্যকির যুদ্ধ বর্ণিত, সংশোধিত পাঠমতে গ্রাহ্য। ১৪৪ অধ্যায়ে পূর্ব ইতিহাস কথন, ভূরিশ্রবা কেন একবার সাত্যকিকে নিজের বশ করে ফেলতে পারেন, তার অনৈসর্গিক বিবরণ, এই অধ্যায় বাদ হবে। ১৪৫ অধ্যায়ে জয়দ্রথের নিকটে সকল যুদ্ধ বর্ণনা গ্রাহ্য। ১৪৬ অধ্যায়ে অর্জুন জয়দ্রথের যুদ্ধ ও জয়দ্রথ বধ বর্ণিত—সংশোধক মণ্ডলী বহু শ্লোক বাদ দিয়ে কৃষ্ণ কর্তৃক সূর্য আবরণের অনৈসর্গিক কাহিনী দূর করেছেন, জয়দ্রথের মস্তক বাণে বাণে চালিত করে তার পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে ফেলার কথা ও আনুসঙ্গিক কাহিনীও অর্থাৎ ১০৪১-১৩১ বাদ হবে। ১৪৭ অধ্যায়ে আছে অর্জুনকে আক্রমন করে অর্জুনের মৃদু যুদ্ধ সত্বেও কৃপ অজ্ঞান হয়ে গেলেন তাতে অর্জুন দুঃখ পেয়ে বিলাপ করলেন ; বিলাপ কিছু সংক্ষেপ করতে ১৩-১৬১, ১৯২-২৭২ বাদ হবে। কর্ণ অর্জুনকে আক্রমণ করতে আসলে কৃষ্ণ ইন্দ্রদত্ত শক্তির কথা বলে অর্জুনকে কর্ণ সহ যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত করলেন ; ইন্দ্রদত্ত শক্তির কথা অনৈসর্গিক, তাই সে কথা বাদ হবে ; সাত্যকির প্রথমে কর্ণের হস্তে পরাজয়ের পরে কৃষ্ণ ঋষভ গর্জিত সুরে শঙ্খ বাজিয়ে নিজের রথ আনালেন, তাতে উঠে সাত্যকি কর্ণকে পরাজিত করল। এই অংশ পরের কালের কবির যোজিত মনে হয়। ১৯১ শ্লোকেই অধ্যায় শেষ হবে। ১৪৮ অধ্যায়ে আছে যে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে ভীম বিরথ হলে কর্ণ তাকে যে গালি দিয়েছিলেন, সে কথা ভীম অর্জুনকে বললে অর্জুন কর্ণের সমীপস্থ হয়ে তাকে ভৎর্সনা করেন ও তার পুত্র বৃষসেনকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেন। ভীমের নালিশ করা তাঁর চরিত্রের উপযুক্ত নয়। তারপরে কৃষ্ণ কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বর্ণন আছে। তাও অবান্তর। তাই ১৪৮ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ১৪৯ অধ্যায়ে আছে যে কৃষ্ণ, অর্জুন, ভীম, সাত্যকি ফিরে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের

সঙ্গে মিলিত হলেন, যুধিষ্ঠির অর্জুনের প্রতিজ্ঞা পালন হয়েছে জেনে আনন্দ প্রকাশ করলেন। এই অধ্যায় সংশোধিত পাঠমতে গ্রাহ্য। ১৫০ অধ্যায়ে দ্রোণের নিকট গিয়ে দুর্যোধনের অনুযোগ, সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য। ১৫১ অধ্যায়ে দ্রোণের উত্তর, অবহার হবে না, সারারাত যুদ্ধ হবে, শত্রু শেষ না করে নিবৃত্ত হব না। এই অধ্যায় হতে ১-৪, ৩৮ শ্লোক বাদ হবে, বাকী গ্রাহ্য। ১৫২ অধ্যায় কর্ণ ও দুর্যোধনের কথা সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য।

১৩. দ্রোণ পর্ব : ঘটোৎকচ বধ, দ্রোণ বধ ও নারায়ণাস্ত্র মোক্ষণ অনুপর্ব

দ্রোণ পর্বে ষষ্ঠ অনুপর্ব ঘটোৎকচ বধ, ১৫৩-১৮৩ অধ্যায়ে বিবৃত। ঘটোৎকচ নিহত হয় চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধের পরে রাত্রিযুদ্ধে। ১৫৩ অধ্যায়ে আছে যে দুর্যোধন প্রাণ তুচ্ছ করে পাণ্ডব সেনা মধ্যে প্রবেশ করে সেনা ধ্বংস করতে লাগলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের বাণে বিসংজ্ঞ হয়ে পড়লেন, তখন দ্রোণ তার সাহায্যে এলেন। সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ১৫৫ অধ্যায়ের দ্রোণের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে, মধ্যে ১৫৪ অধ্যায়ে সাধারণভাবে যুদ্ধ বর্ণনা অবান্তর, তা বাদ হবে। দ্রোণের পাঞ্চালরথী নিধনের উত্তরে ভীম বহু কৌরবরথী নিধন করলেন; ১৫৫ অধ্যায় সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। এই অনুপর্বে অশ্বত্থামার বীরত্ব বেশী করে দেখান হয়েছে, তা পরের কালের প্রক্ষেপ সন্দেহ নাই। ১৫৬ অধ্যায়ে ৫৬২-১৭৯ শ্লোকে ঘটোৎকচ ও তার রাক্ষস বাহিনীর সঙ্গে অশ্বত্থামার যুদ্ধের জয়ের বিস্তৃত বর্ণনা, পুনঃ ১৬৬ অধ্যায়ে ঘটোৎকচ অশ্বত্থামার যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। ১৫৬।,৬২ -১৭৯ শ্লোক বাদ হবে, ৩১-১৫ শ্লোক সংশোধকগণই বাদ দিয়েছেন। অধ্যায়ের অবশিষ্ট শ্লোক গ্রাহ্য। ১৫৭ অধ্যায় ভীম বাহ্লীক রাজের যুদ্ধ বর্ণনা ইত্যাদি গ্রাহ্য। ১৫৮ অধ্যায়ে আছে যে পাণ্ডবদের রাত্রিযুদ্ধে বল দেখে দুর্যোধন কর্ণের নিকট গিয়ে কৌরবাহিনীকে ত্রাণ করতে বললেন, কর্ণও আশ্বাস দিলেন, বললেন যে সব পাণ্ডবদের তিনি পরাজিত করবেন। তা শুনে কৃপ কর্ণকে ভর্ৎসনা করে অর্জুনের শ্রেষ্ঠতার কথা বলেন, কর্ণ উত্তর দিলে অশ্বত্থামা (১৫৯ অধ্যায়ে) কর্ণকে গালি দিতে আরম্ভ করেন, দুর্যোধন এসে বিবাদ মিটিয়ে দেন। এইরূপ বর্ণনা প্রায় অবিকল বিরাট পর্ব উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধ মধ্যে আছে; যখন

ঘোর যুদ্ধ চল্‌ছে, তখন এরূপ বিবাদ সম্ভব নয়। অতএব ১৫৮/৮ হতে ১৫৯।১৮ পর্যন্ত বাদ হবে। ১৫৮।১-৭ এবং ১৫৯।১৯-১০০ সংশোধিত পাঠক্রম অনুসারে নেওয়া যেতে পারে। ১৬০ অধ্যায়ে ধৃষ্টদ্যুম্নসহ যুদ্ধে অশ্বত্থামার জয় বর্ণিত হয়েছে, এই অধ্যায়ের মৌলিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তবে বাদ দিবার যথেষ্ট কারণ নাই। ১৬১ অধ্যায়ে নকুল যুদ্ধ বর্ণন, বাদ হবে, অনেক শ্লোক অন্যান্য অধ্যায় থেকে নেওয়া দেখা যায়। ১৬২ অধ্যায়ে সাত্যকি সহ যুদ্ধে সোমদত্তের মৃত্যু, এবং দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ বর্ণিত আছে। বাদ দিবার কারণ নাই। ১৬৩ অধ্যায়ে দীপ প্রজ্বলনের কথা আছে, গ্রাহ্য। ১৬৪-১৬৬ অধ্যায়ে দুর্যোধন কর্তৃক অন্য রথীদের প্রতি দ্রোণকে রক্ষা করার নির্দেশ, ও বিবিধ দ্বন্দ্বযুদ্ধের বর্ণনা—সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ১৬৭ অধ্যায়ে মদ্ররাজ শল্যের হস্তে বিরাটরাজ ভ্রাতা শতানীকের মৃত্যুর কথা আছে, কিন্তু ২১।২৫-২৬ শ্লোকে দ্বাদশ দিবসের যুদ্ধে দ্রোণের হস্তে শতানীকের মৃত্যুর কথা আছে; এবং রাক্ষসেন্দ্র অলম্বুষ এসে অর্জুনকে বাধা দিল সে কথা আছে, কিন্তু ১০৯ অধ্যায়ে চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধে ঘটোৎকচ সহ যুদ্ধে অলম্বুষের মৃত্যুর কথা আছে—অতএব ১৬৭।২৯-৬০ শ্লোক বাদ হবে, ১-২৮ গ্রাহ্য। ১৬৮ অধ্যায়ে নকুল পুত্র শতানীক, যুধিষ্ঠির পুত্র প্রতিবিন্ধ্য ইত্যাদির যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে, শতানীকের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র চিত্রসেনের যুদ্ধের কথা আছে, কিন্তু ১৩৭।২৯ শ্লোকে ভীমের হস্তে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র চিত্রসেনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। ১৬৭ অধ্যায় বাদ দিলেও ১৬৮ অধ্যায় কয়েকটি অবাস্তর দ্বন্দ্বযুদ্ধ বর্ণনা করে যুদ্ধ বিবরণ দীর্ঘ করা হয়েছে—মনে হয়, ১৬৮ অধ্যায় বাদ দেওয়াই সঙ্গত। ১৬৯-১৭১ অধ্যায়ে উচ্চতর পর্যায়ের রথীদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বর্ণিত, মোটের উপর পাণ্ডব পক্ষে জয় কথিত, সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ১৭২ অধ্যায়ে দুর্যোধনের দ্রোণ ও কর্ণকে তিরস্কার করার কথা আছে, যথাসাধ্য যুদ্ধ না করায়। তাতে দ্রোণ ও কর্ণ বিশেষতঃ কর্ণ তীব্রতর যুদ্ধ আরম্ভ করেন। মোটের উপর গ্রাহ্য। ১৭৩ অধ্যায়ে আছে যে কর্ণ পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনীকে ত্রস্ত করে তুলেছেন দেখে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, কর্ণকে নিবারণ কর, অর্জুনও কৃষ্ণকে বল্‌লেন, কর্ণের দিকে রথ চালিত কর, কিন্তু কৃষ্ণ বল্‌লেন, কর্ণের কাছে ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শক্তি বা বাণ আছে, তুমি এখন তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়ো না, ঘটোৎকচকে পাঠিয়ে দাও। ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শক্তি বা বাণের কথা গ্রাহ্য নয়, অতএব ১৭৩ ৩৫-৬২ বাদ হবে, ৩৪ শ্লোকের পরে একটি শ্লোক যুক্ত হবে যে

অর্জুন কথা বলছেন তখন ঘটোৎকচ উপস্থিত হ'ল, তারপরে ৬৩-৬৮ শ্লোক বসবে, ঘটোৎকচ নিজেই কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল। ১৭৪ ১৭৯ অধ্যায়ে কর্ণ ঘটোৎকচের যুদ্ধ ও ঘটোৎকচের মৃত্যুর কথা আছে, কিন্তু অবান্তর প্রক্ষেপ তার মধ্যে যথেষ্ট আছে, ১৭৪।৫-১০ শ্লোকে আছে যে জটাসুর পুত্র অলম্বুষ অকস্মাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বলে যে আমি পাণ্ডবদের মারতে চাই, দুর্যোধন তাকে বললেন, ঘটোৎকচের সঙ্গে যুদ্ধরত হয়ে তাকে নিধন কর, তারপরে ঘটোৎকচ ও জটাসুর পুত্র অলম্বুষের যুদ্ধ বর্ণনা ৪০ শ্লোক পর্যন্ত, অলম্বুষ ঘটোৎকচের হস্তে নিহত হ'ল। ১৭৬ অধ্যায় আছে যে হিডিম্ব ও কির্মীর রাক্ষসের এক বন্ধু অলায়ুধ তার রাক্ষস বাহিনী নিয়ে দুর্যোধনের কাছে এসে বলল যে আমি ভীম ও ভীম-হিড়িম্বার পুত্রকে বধ করতে চাই, দুর্যোধন তাদের গ্রহণ করে যুদ্ধ করতে বললেন, ১৭৭ অধ্যায় আছে যে অলায়ুধ ভীমকে আক্রমণ করে বিপন্ন ক'রল; ১৭৮ অধ্যায়ে আছে যে তা দেখে ঘটোৎকচ এসে অলায়ুধের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে বধ করল। জটাসুর পুত্র দ্বিতীয় অলম্বুষ এবং অলায়ুধের কথা পর্বসংগ্রহে নাই। সন্দেহ নাই যে যুদ্ধ বিবরণ স্ফীত করতে এই অধ্যায়গুলি পরের যুগের কবিদের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। অতএব ১৭৪, ১৭৭, ও ১৭৮ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ১৭৫ ও ১৭৯ অধ্যায়ে কর্ণ ঘটোৎকচের যুদ্ধ বর্ণনা আছে কিন্তু তার মধ্যেও প্রক্ষেপ আছে। ১৭৫।৩৩-৩৫ শ্লোকে আছে যে কর্ণ সাধারণ অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে যখন দেখলেন যে ঘটোৎকচকে বশে আনা যাবে না, তখন দিব্যঅস্ত্র সন্ধান করলেন, ঘটোৎকচ ও মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করল, ৩৬-১১৪ শ্লোকে সেই যুদ্ধ বর্ণিত। পুনঃ ১৭৯।১৮-২০ শ্লোকে আছে যে সাধারণ অস্ত্রযুদ্ধে কর্ণ শ্রেষ্ঠতা লাভ করতে না পেয়ে দিব্যঅস্ত্র সন্ধান করলেন, তা দেখে ঘটোৎকচ অন্তর্হিত হয়ে মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করল। তাই অনুমান সঙ্গত যে ১৭৫ ৩৪২-১১৪ শ্লোক বাদ হবে, ১৭৯।১-১৮ শ্লোক বাদ হবে, ১৭৫।৩৪১ শ্লোকার্দ্ধের পরে ১৭৯।১৯ বসবে, একটি নূতন অধ্যায়ে ১৭৯।২০-৬৪ থাকবে, তার মধ্যেও ৬০ শ্লোকের শেষার্দ্ধ হতে ৬২ শ্লোক পর্যন্ত বাদ হবে—মৃত্যুর সময় ঘটোৎকচ স্বীয় দেহ মায়াবলে বড করে কৌরবসৈন্য বহু নিষ্পিষ্ট করে নিধন করল—সে অনৈসর্গিক কথা গ্রাহ্য নয়।

১৮০-১৮২ অধ্যায়ে কথিত ঘটোৎকচের মৃত্যুর পরে কৃষ্ণের হর্ষ প্রকাশ এবং ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শক্তির উপাখ্যান বলে সেটি ঘটোৎকচের উপর প্রযুক্ত হয়ে গেছে, এখন আর কর্ণসহ যুদ্ধে অর্জুনের ভয় নাই, এই কথা আছে, তা সব বাদ হবে।

ইন্দ্রদত্ত শক্তির কথা অনৈসর্গিক, এবং ঘটোৎকচের মৃত্যুর পূর্বে অনেকবার অর্জুন ও কর্ণ পরস্পর সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করেছেন। ১৮৩ ১-১৮ বাদ হবে, তাতেও ইন্দ্রদত্ত শক্তির কথা আছে। ১৯-৫৭ শ্লোক গ্রাহ্য, তাতে ঘটোৎকচের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠিরের শোক প্রকাশ, এবং কর্ণ সহ যুদ্ধে যখন ঘটোৎকচ বিপন্ন, তকে সাহায্য করতে কোন মহারথী কেন গেল না সেই প্রশ্ন আছে। যুধিষ্ঠীর ক্রুদ্ধ হযে নিজেই কর্ণবধ করতে যাবার উদ্যোগ করলে কৃষ্ণ তাকে বুঝিয়ে নিবারণ কর'লন, মূলে ব্যাসের কথা আছে, কিন্তু মধ্যরাত্রে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ব্যাস এসে উপস্থিত হবেন, তা বিশ্ব সযোগ্য নয়।

সপ্তম অনুপর্ব দ্রোণবধ পর্ব ১৮৪-১৯২ অধ্যায় নিয়ে। যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে দ্রোণের বীর্য হ্রাস করতে কৃষ্ণের প্ররোচনায দ্রোণের পুত্র অশ্বথামার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ দিবার কথা যে মিথ্যা ও প্রক্ষিপ্ত, সেকথা প্রথম খণ্ডে ১৮ অনুচ্ছেদে আলোচিত হযেছে। দ্রোণ ধ পর্বে তার উল্লেখ যে যে শ্লোকে আছে তা বাদ হবে, আরো কিছু বর্জনীয় আছে। ১৮৪ অধ্যায়ে অর্জুনের ঘোষণা মত রাত্রি যুদ্ধকালে দুই দণ্ডের জন্য বিরতি ও সৈন্যগণের নিদ্রার কথা—সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ১৮৫ অধ্যায়ে দুর্যোধনের অভিযোগ আছে যে দ্রোণ পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ করছেন না, উত্তরে দ্রোণ অর্জুনের বীর্য্যের প্রশংসা, নিজে যথাসাধ্য যুদ্ধ ক'ছেন বলে দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনিকে অর্জুন বধের চেষ্টা করে দেখতে বলেন; আমার মতে এই অধ্যায় বাদ হবে, কারণ জয়দ্রথ বধের দিন অর্জুন ব্যূহের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে গেলে, জয়দ্রথের মৃত্যুর পরে এবং রাত্রি যুদ্ধের মধ্যে ১৭২ অধ্যাযে—এই তিনবার দুর্যোধনের দ্রোণের নিকট গিয়া অসন্তোষ প্রকাশ বা তিরস্কারের কথা আছে, চতুর্থবার সেরূপ তিরস্কার সম্ভব মনে হয় না। ১৮৬ অধ্যায়ে বিরতির পরে যুদ্ধে দ্রুপদরাজ ও বিরাটরাজের দ্রোণের হস্তে মৃত্যু ও অন্য দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বর্ণিত—সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্য। ১৮৭ অধ্যায়ে স্বর্য্যোদয়ের পরে সঙ্কুল যুদ্ধ বর্ণনা—সংশোধিত পাঠমত গ্র'হ্য। ১৮৮ অধ্য'য়েও সঙ্কুল যুদ্ধ বর্ণনা আছে, দ্রোণ অর্জুন দ্বন্দ্ব যুদ্ধ কালে দেব-গন্ধর্ব ঋষিগণের অন্তরিক্ষে আগমন ও যুদ্ধপ্রশংসা ৩৭২-৪৭ শ্লোকে আছে, তা বাদ হবে, বাকী সংশোধিত পাঠমত গ্রাহ্য। ১৮৯ অধ্যায়ে সঙ্কুল যুদ্ধ বর্ণনা—সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য।

১৯০ অধ্যায়ে কৃষ্ণের মন্ত্রনায় দ্রোণের বীর্যহ্রাসের জন্য মিথ্যা অশ্বথামার মৃত্যু সংবাদ দিবার কথা, এবং অন্তরিক্ষে বহু পুরাকালের ঋষির-বিশ্বামিত্র, বসিষ্ঠ, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ প্রভৃতির এসে দ্রোণকে বলা যে তোমার কাল পূর্ণ হয়েছে,

তখন অস্ত্র ত্যাগ করে তার জন্য প্রস্তুত হও, ইত্যাদি অগ্রাহ্য ও অনৈসর্গিক কথা আছে, সম্পূর্ণ অধ্যায়টি বাদ হবে। ১৯০ অধ্যায় বর্জন হেতু কিছু শ্লোক বদলে নিতে হবে, যথা ১৯ স্থলে "তথা দ্রোণং যোধয়ন্তমাস্থিতং রণমূর্দ্ধণি", ১০ স্থলে "স শরক্ষয়মাসাদ্য রণশ্রমেণ চার্দিতঃ," ১১ শ্লোক স্থলে "উৎস্রষ্টুকামঃ শস্ত্রাণি ভীমবাক্য প্রচোদিতঃ। তেজসা হীরমা ন যুযুধে ন যথা পুরা" ॥ হতে পারে। ১৯১-১৯২ অধ্যায় উপরোক্ত সংস্কার করে নিয়ে সংশোধিত পাঠ নেওয়া সঙ্গত, যদিও সেই অবস্থায় দ্রোণ দুইবার ধৃষ্টদ্যুম্ন আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন, তৃতীয়বার ধৃষ্টদ্যুম্নের আক্রমণ করতে হল, তা ব্রাহ্মণ দ্রোণের মহিমা বাড়াতে বলা মনে হয়।

অষ্টম অস্তপর্ব নারায়ণাস্ত্র মোক্ষণ ১৯৩-২০২ অধ্যায়ে বিবৃত। নারায়ণাস্ত্র ক্ষেপণের কথা গ্রাহ্য নয়, যে অস্ত্র নিরস্ত্রদের ক্ষতি করে না, কিন্তু অস্ত্রধারী পুরুষের উপর নানারূপে বর্ষিত হয়, সেরূপ অস্ত্র এখনও সৃষ্ট হয় নাই, তিন সহস্র বৎসর পূর্বে তো ছিলই না। ১৯৫ / ৩১-৩৭ শ্লোক দ্রোণের নারায়ণাস্ত্র প্রাপ্তির কথা আছে—যে একদিন নারায়ণ ব্রাহ্মণবেশে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হলে দ্রোণ তাঁকে উপহার-সম্ভবতঃ পাদ্য অর্ঘ্য ইত্যাদি-দিলেন, নারায়ণ সেই উপহার গ্রহণ করে বর দিতে চাইলেন, দ্রোণ বর হিসাবে পরম-অস্ত্র নারায়ণাস্ত্র চাইলেন নারায়ণ সেই অস্ত্র দিলেন। তবে সাবধান করে ছিলেন সে অস্ত্রটি যেন যখন তখন প্রয়োগ করা না হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে যারা রথ ও অস্ত্র-পরিত্যাগ করে ও যারা শরণাগত হয়, তাদের প্রতি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করা উচিত নয়, অবধ্যলোককে এই অস্ত্র নিক্ষেপে পীড়ন করলে ক্ষেপ্তা স্বয়ং নিপীড়িত হবে; এই বলে নারায়ণ স্বর্গে চলে গেলেন। এই কাহিনী অনৈসর্গিক, নারায়ণ ব্রাহ্মণ বেশে দ্রোণের কাছে কেন আসবেন? তাছাড়া নারায়ণরূপে ভগবানের আরাধনা করা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষের কয়েক বৎসর পরে কৃষ্ণ নারায়ণীয় বা ভাগবৎ ধর্ম প্রচার করবার পূর্বে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না। কৌরব পাণ্ডবদের কাল বৈদিক যুগের শেষাংশ, তখন বৈদিক দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ হত, ঋক্‌বেদসংহিতার মধ্যে নারায়ণ বা ভগবানের আরাধনার কথা নাই। নারায়ণাস্ত্রের প্রতিরোধ করতে কৃষ্ণ যে পন্থা অবলম্বন করলেন-সকলে অস্ত্রত্যাগ করে রথ থেকে নেমে দাঁড়াবে, তাতে নারায়ণাস্ত্র তাদের ক্ষতি করবেনা, সে কথা নারায়ণ অস্ত্রদানের সময় বলেন নাই, তিনি বলেছেন যে অস্ত্রত্যাগ করে রথ থেকে নেমে যারা দাঁড়ায় তাদের প্রতি যেন এই অস্ত্র প্রযুক্ত না হয়, হলে প্রয়োক্তার অনিষ্ট হবে, নারায়ণাস্ত্র অবধ্যের ও বধ

সাধন করতে ছাড়ে না। একথা ১৯৫/৩৫^{২} শ্লোকার্দ্ধে আছে। নারায়ণাস্ত্র ক্ষেপণের কথা দুবার আছে, ১৯৫/৫০ ও ১৯৭/১৫ শ্লোকে, সেও একটি অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতির কারণেও নারায়ণাস্ত্র মোক্ষণের কথা অগ্রাহ্য।

অশ্বত্থামা দ্রোণের বধকালে উপস্থিত ছিলেন না। দ্রোণ বধ বিবরণ শুনে তিনি পলায়মান কৌরব সেনা ফিরিয়ে এনে পাণ্ডব পাঞ্চালদের আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু নকুলের নিকট বাধা পেয়েই ফিরতে বাধ্য হন। এই কথা অনুক্রমণিকা অধ্যায়ের ২০২ শ্লোক থেকে মনে হয়, ২০৩ শ্লোকে নারায়ণাস্ত্রের কথাও আছে, কিন্তু তা পূর্বোক্ত কারণে বাদ হবে।

১৯৩ অধ্যায় (দ্রোণ বধ বিবরণ শুনে অশ্বত্থামার ক্রোধ) মধ্যে ১-৮, ২৮-৩৬, ৬৮ গ্রাহ্য, বাকী বাদ হবে। ১৯৪ অধ্যায় (ধৃতরাষ্ট্রের মন্তব্য) বাদ হবে।

১৯৫ অধ্যায় (অশ্বত্থামার পাঞ্চাল বধ প্রতিজ্ঞা ও কৌরব সেনার পুনঃপ্রস্তুতি) মধ্যে ৩, ৮^{১}, ৫^{২}, ৯^{১}, ১৫-২৪, ৪৩-৪৯ গ্রাহ্য, বাকী বাদ হবে।

১৯৬ অধ্যায় (গুরুবধে অর্জুনের অসন্তোষ প্রকাশ) মধ্যে ৭-১১, ১৯^{২}-২০$_{১}$, ২৫^{২} ২৭$_{১}$, ২৮ (প্রথম পাদ) ৩০ (দ্বিতীয় পাদ), ৩৩^{২} ৩৪^{১}, ৪০$_{২}$-৪৯^{১}, ৫৪ গ্রাহ্য, বাকী শ্লোক বাদ হবে।

১৯৭ অধ্যায় (ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের উত্তর) মধ্যে ২-২৬, ২৮, ২৯, ৩১-৪০ গ্রাহ্য, বাকী শ্লোক বাদ হবে। ১৯৮ অধ্যায় (সাত্যকির উক্তি এবং কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম ও সহদেব কর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকিকে শান্ত করণ) মধ্যে ৫ (প্রথম পাদ), ৮ (দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পাদ) ৯ (প্রথম দ্বিতীয় পাদ), ১২^{২}—১৫^{১}, ১৬^{২}, ১৭^{২}-২১^{১}, ২৪^{১}-৩৭^{১}, ৪৬^{২}-৫৮ গ্রাহ্য, বাকী শ্লোক বাদ।

১৯৯ অধ্যায়ে অশ্বত্থামা কর্তৃক নারায়ণাস্ত্র মোক্ষণের কথা ও কৃষ্ণের উপদেশে সেই অস্ত্র নিবারণের কথা আছে। অনৈসর্গিকতা হেতু বাদ হবে। ২০০ অধ্যায়ে অশ্বত্থামার তীব্র যুদ্ধের কথা আছে, নারায়ণাস্ত্র বিফল হলে অশ্বত্থামা তীব্র যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি ও ভীমকে পরাজিত করণ ইত্যাদি আছে। ২০০ অধ্যায়ের বহু শ্লোক সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন, আমার মনে হয় সবই বাদ হবে, কারণ প্রকৃত কথা যে অশ্বত্থামা আক্রমণ আরম্ভ করলে নকুলকেই পরাজিত করতে না পেরে নিবৃত্ত হলেন (অনুক্রমণিকা অধ্যায়, ২০২); সে কথা বাদ দিয়ে ব্রাহ্মণ কবি অশ্বত্থামার বীর্যাধিক্য দেখাতে চেয়েছেন। ২০১/১৪৭ শ্লোকে অর্জুনের হস্তে অশ্বত্থামার পরাজয় ও অশ্বত্থামার পলায়ন বর্ণিত, তাও বাদ হবে।

২০১/৪৮-৯৬ শ্লোকে ব্যাসের আগমন ও মহাদেবের মহিমা বর্ণনা, ২০২ অধ্যায়েও মহাদেবের মহিমা বর্ণিত। এগুলি পরের যোজনা হিসাবে বাদ হবে। পর্ব শেষ হবে ২০১ অধ্যায়ের শেষ তিন শ্লোক দিয়ে-১৯৮-২০০, তার মধ্যে ১৯৮ শ্লোক দ্রোণপুত্র স্থলে দুর্যোধন অবহার ঘোষনা করলেন এইভাবে পরিবর্তিত করে নিতে হবে।

১৪. কর্ণপর্ব

কর্ণপর্ব বেশ বড পর্ব, প্রমাণ সংস্করণে এই পর্বে ৫০১৪ শ্লোক আছে, কিন্তু এই পর্বের কোন অনুপর্ব বিভাগ নাই। কর্ণ সম্বন্ধে কয়েকটি অসঙ্গতি প্রথম খণ্ডের ৫ অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ডের ৯ অনুচ্ছেদে সম্পাদকের মত উদ্ধৃত করা হয়েছে—যে এই পর্বে বহু প্রক্ষেপ ও যোজনা আছে। সম্পাদক বেশ কিছু অধ্যায় ও শ্লোক বাদ দিয়েছেন। কিন্তু ডঃ সুকসংকরের নীতি অনুসরণ করতে হওয়ায় অনেক বর্জনীয় শ্লোক ও অধ্যায় রাখতে বাধ্য হয়েছেন। অতএব প্রক্ষিপ্ত নির্বাচন অন্যান্য পর্বের মত করে যেতে হবে।

১/১-১৬ শ্লোকে বৈশম্পায়ন কর্তৃক কর্ণকে সৈনাপত্যে বরণ ও দুদিন যুদ্ধের পরে কর্ণের মৃত্যু সংক্ষেপে বর্ণিত, ১৭-২৭ শ্লোক অবান্তর, বাদ হবে। ২।১-৬, ৮-৯, ২০-২৩ গ্রাহ্য, বাকী শ্লোক অবান্তর। ৩ অধ্যায়ে সঞ্জয় কর্তৃক সংক্ষেপে কর্ণের সৈনাপত্যে যুদ্ধের বিবরণ কথিত, ৪ অধ্যায়ে তা শুনে ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ, এই দুইটি অধ্যায় সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ৫ ৬ অধ্যায়ে নিহত কৌরব পাণ্ডব বীরদের নাম, ৭ অধ্যায়ে অবশিষ্ট কৌরববীরদের নাম, যুদ্ধের ফলের স্মারকলিপি হিসাবে সংশোধিত রূপে নেওয়া যায়, যদিও মূল কাহিনী বলতে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই। ৮ ৯ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের দীর্ঘ বিলাপ অনাবশ্যক মনে হয়, তবে ৭ অধ্যায় শেষে ধৃতরাষ্ট্রের শোকে মুহ্যমান হয়ে অচেতনপ্রায় হবার কথা আছে, তাই ৮ অধ্যায় সংশোধিত রূপে নেওয়া যায়, তার পর ৯। ৯৪-৯৭ গ্রাহ্য, বাকী বাদ হবে। ১০-১১ অধ্যায় কর্ণের সৈনাপত্যে অভিষেক এবং ব্যূহ রচনা বর্ণিত, সংশোধিত পাঠ গ্রাহ্য।

১২-৩০ অধ্যায়ে ষোড়শ দিনের যুদ্ধের বিবরণ। ১২-১৪ অধ্যায় সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ১৫ অধ্যায়ে অশ্বত্থামা ও ভীমের যুদ্ধ বিবরণ মধ্যে সিদ্ধ-চারণদের অন্তরিক্ষে আগমন ও প্রশংসা ২৭ ১-৩৫ শ্লোক আছে, তা অনৈসর্গিক হিসাবে

বাদ হবে। ১৬ অধ্যায়ে অর্জুন সংশপ্তক যুদ্ধ বিবরণের মধ্যেও ১৭ ১৯[১] শ্লোকে সিদ্ধ দেবর্ষি চারণদের আগমন ও প্রশংসার কথা আছে, তা বাদ হবে। ২০[১] শ্লোক হতে অশ্বত্থামার সংশপ্তক সহ যুদ্ধে লিপ্ত অর্জুনের উপর আক্রমণ ও অর্জুন সহ যুদ্ধ, ১৭ অধ্যায়ে অশ্বত্থামা অর্জুনের যুদ্ধ ও অশ্বত্থামার বিপর্যস্ত হয়ে কর্ণের ব্যূহে আশ্রয় গ্রহণের কথা আছে। ১৫ অধ্যায়ে আছে যে ভীমসহ তীব্র যুদ্ধে অশ্বত্থামা অচেতন হয়ে পড়লে তার সারথি তাকে নিয়ে সরে গেল। তার পরেই অশ্বত্থামা সে সংশপ্তকগণ সহ যুদ্ধে রত অর্জুনের উপর আক্রমণ করবে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অতএব ১৬ / ১৯[২] শ্লোক হতে অধ্যায়শেষ এবং ১৭ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। পরের যুগের ব্রাহ্মণ পুঁথিকার অশ্বত্থামার বীরত্ব বাড়াতে অনেক প্রক্ষেপ করেছে। ১৮ অধ্যায়ে অর্জুন হস্তে মগধবীর দণ্ডধার ও তার ভ্রাতা দণ্ডের নিধন বর্ণিত; দণ্ডধার শিক্ষিত হস্তীতে আরোহন করে পাণ্ডবসেনা বিদ্রুপ করছিল, কোলাহল শুনে অর্জুন সংশপ্তকসহ যুদ্ধ হতে এসে তাকে বধ করেন। এই অধ্যায় সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ১৯ অধ্যায়ের ১-২৬ শ্লোকে পুনঃ অর্জুন সংশপ্তকগণের যুদ্ধ বিবরণ, গ্রাহ্য। ২৭-৫৩ শ্লোকে কৃষ্ণ কর্তৃক যুদ্ধভূমি বর্ণনা, সেই বর্ণনা পুনঃ ৫৮। ৯-৩৩ শ্লোক আছে, সংশোধক ৫৮। ৯ ৩৩ বাদ দিয়ে ৫৮। ৩৪-৪১ শ্লোক শোধিত ১৪ অধ্যায়ে, অর্থাৎ প্রমান ১৯ অধ্যায়ে ৫০ ৫৭ শ্লোক হিসাবে যোগ করেছেন, অর্থাৎ দ্বিতীয়বার একই বর্ণনা বাদ দিয়ে প্রথম বর্ণনাটি পূর্ণ করে নিয়ে রেখেছেন। সেইভাবে ১৯ অধ্যায় গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে ১৯। ৫৩[২] ৫৮ শ্লোক, সংশপ্তক যুদ্ধ শেষে কৃষ্ণ অর্জুনকে যেখানে পাণ্ড্য রাজ কৌরবসৈন্য ধ্বংস করছিলেন সেখানে নিয়ে গেলেন, তা বাদ হবে, কারণ সেখানে গিয়ে যে অর্জুন পাণ্ড্য রাজের সাহায্যে যুদ্ধ করলেন, তা বলা হয় নাই, পরের অধ্যায়ে অশ্বত্থামাসহ যুদ্ধে পাণ্ড্য রাজের মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে অর্জুনের কথা কিছুই নাই। ২০ অধ্যায় অশ্বত্থামার হস্তে পাণ্ড্যরাজের মৃত্যু, সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ২১ অধ্যায়ে সঙ্কুল যুদ্ধ বর্ণনা আছে, তারমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নাই, ২৫ শ্লোকে দ্রুপদরাজের কথা আছে কিন্তু দ্রুপদ রাজের তো দ্রোণপর্বতেই মৃত্যু হয়েছে। যুদ্ধ বর্ণনা বাড়াবার উদ্দেশ্যে ২১ অধ্যায় পরে যোজিত মনে হয়, সেটি বাদ হবে। ২২ অধ্যায়ে পুনঃ সঙ্কুল যুদ্ধ বিবরন আছে, ২৩ ২৫ অধ্যায়ে নানা দ্বৈরথ যুদ্ধ বর্ণিত আছে, এই অধ্যায় গুলি সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ২৬

অধ্যায়ে প্রথমে কৃপ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধ বর্ণনা, তার মধ্যে কৃপের বীর্য বেশী বাড়িয়ে বলা হয়েছে, যেন ব্রাহ্মণ লিপিকার ধৃষ্টদ্যুম্ন হস্তে দ্রোণ নিধনের শোধ নিচ্ছেন, এই অংশ, ১২১[১] শ্লোক, বাদ হবে। ২১[২]-৩৮ শ্লোকে কৃতবর্মা ও শিখণ্ডীর যুদ্ধ বর্ণিত, সেই অংশ গ্রাহ্য। ২৭ অধ্যায়ে অর্জুনের নানা রথীসহ যুদ্ধে জয় বর্ণিত, শোধিতরূপে গ্রাহ্য। ২৮ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের জয় বর্ণিত, পরে সঙ্কুল যুদ্ধ বর্ণিত; ২৯ অধ্যায়ে আছে যে দুর্যোধন নূতন সজ্জিত রথে এসে আবার যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু পরাজিত ও বিসংজ্ঞ হয়ে গেলেন, তখন কৃতবর্মা এসে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করায় ভীম এসে কৃতবর্মাকে আক্রমণ করলেন; উভয় অধ্যায় সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ৩০ অধ্যায়ে সঙ্কুল যুদ্ধ বর্ণনা ও অবহার ঘোষণা গ্রাহ্য।

সপ্তদশ দিবসের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও যুদ্ধ ৩১-৯৬ অধ্যায়ে বর্ণিত। এই বর্ণনার চারভাগ করা চলে—(ক) শল্যের কর্ণ সারথ্যে নিয়োগ ও কর্ণ শল্যের বাদানুবাদ (খ) যুদ্ধের প্রথমাংশ, (গ) যুধিষ্ঠির অর্জুন কৃষ্ণ সংবাদ, (ঘ) যুদ্ধের শেষাংশ ও কর্ণ বধ। (ক) শল্যের কর্ণ সারথ্যে নিয়োগ ও বাদানুবাদ ৩১-৪৫ অধ্যায়ে বর্ণিত। কৃষ্ণ সারথি অর্জুনসহ উপযুক্তরূপে যুদ্ধ করতে কর্ণ দুর্যোধনের কাছে সপ্তদশ দিবস প্রত্যুষে গিয়ে শল্যকে তাঁর সারথি করে দিতে বলেন। শল্য প্রথমে আপত্তি করেন, দুর্যোধন শল্যকে কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সারথি বলায় এবং রথী হিসাবে তাঁকে কর্ণ অপেক্ষা হীন সূচিত করা হচ্ছে না বলায় শল্য সম্মত হলেন। ৩১-৩২ অধ্যায় শোধিতরূপে গ্রাহ্য। ৩৩-৩৫ অধ্যায়ে ত্রিপুর উপাখ্যান ব্রহ্মা কর্তৃক শিবের সারথ্য স্বীকার, মধ্যে পরশুরামের মহিমা বর্ণন—পরের কালের যোজনা হিসাবে বাদ হবে। ৩৬ অধ্যায় গ্রাহ্য, ৩২ অধ্যায়ের পরে স্বাভাবিক ভাবে বসে। ৩৭ অধ্যায় থেকে কর্ণ শল্যের বাদানুবাদ; কোন রহস্য প্রিয় কবি সেটিকে অকারণ দীর্ঘ করেছেন। শল্য প্রথমে কর্ণের সারথি হতে সম্মত হন নাই, কিন্তু সম্মত হয়ে তিনি সুষ্ঠুভাবে সারথ্যকার্য সম্পাদন করেছেন সন্দেহ নাই, তা না করলে কর্ণ তাকে দিনের শেষ পর্যন্ত বিশেষ অপরাহ্নে যখন অর্জুনসহ দ্বৈরথ হ'ল, তখন রাখতেন না। আরম্ভে তীব্র কলহ হলে রথী সারথি উভয়েরই মন তিক্ত হয়ে যায়, রথী সারথির উপর বিশ্বাস রাখতে পারে না, সারথিও রথীর নির্দেশ বিনা দ্বিধায় পালন করতে পারে না। ৩৬/২৭[২]-৩০[১] শ্লোকে শল্যের যে সাবধান বাণী আছে, তাই যথেষ্ট, ৩০[২]-৩২ শ্লোক সংশোধক বাদ দিয়েছেন।

৩৭ অধ্যায়ে দুর্নিমিত্ত দর্শনের কথা আছে, তা কেউ গ্রাহ্য করল না; দুর্নিমিত্তের কথা অবান্তর। ১৩-৩১ শ্লোকে কর্ণের আত্মশ্লাঘাপূর্ণ উক্তি ও ৩৩-৪০ শ্লোকে শল্যের বিদ্রূপপূর্ণ উত্তর দুটিই অসঙ্গত। ৩০ শ্লোক পর্যন্ত উপজাতি বৃত্তের পরে ৩১ শ্লোক হতে বৈতালীয় অর্দ্ধসমবৃত্তের ব্যবহার থেকেও পরের যোজনা মনে হয়। ৩৮ অধ্যায়ে কর্ণের ঘোষণা, যে অর্জুনকে দেখিয়ে দেবে, তাকে বহু পুরস্কার দিব, এবং ৩৯ অধ্যায়ে শল্যের উপহাস এবং ভীম-অর্জুনের তুলনায় কর্ণকে হীন বলা, দুটিই অসঙ্গত; তার থেকেই ৪০-৪১ অধ্যায়ে কথিত বিবাদ, শল্যের বিদ্রূপাত্মক হংস-কাক উপাখ্যান কথন, সবই অকবির কল্পনা মনে হয়। ৪২ অধ্যায় কর্ণের স্বমুখে ভার্গবের অভিশাপ ও ব্রাহ্মণের রথচক্র ভূমিগ্রস্ত হবার অভিশাপের বিবরণ, সেই অভিশাপের কাহিনী গ্রাহ্য নয় তা পূর্বেই বলা হয়েছে, এবং শল্য যদি কর্ণের বীরত্বকে তুচ্ছ করবার চেষ্টা করে থাকেন, তখন কর্ণের পক্ষে সেই অভিশাপদ্বয়ের কথা বলা কোন মতেই সম্ভব নয়। ৪৪-৪৫ অধ্যায়ে মদ্রদেশের ও অঙ্গদেশের নারীপুরুষের ব্যবহারের নিন্দা উভয়ের মনকে আরো তিক্ত করবে, সে তিক্ততা দুর্যোধনের দুটি কথায় দূর হবে না। তাই ৩৭-৪৫ অধ্যায় সম্যক বাদ দেওয়া সঙ্গত।

(খ) ৪৬-৬৪ অধ্যায়ে সপ্তদশ দিবসের পূর্বাহ্নের যুদ্ধ বিবরণ আছে। তার মধ্যে বহু প্রক্ষেপ আছে, সংশোধক ডঃ বৈদ্য অনেক শ্লোক বাদ দিয়েছেন, ৫৭, ৬২, ৬৩ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ ও ৫৮ অধ্যায় প্রায় সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। অতএব এই অংশ সংশোধিতরূপে গ্রাহ্য;

(গ) ৬৫-৭৪ অধ্যায়ে কর্ণবধ হয় নাই জেনে যুধিষ্ঠিরের অর্জুনকে অপমান, অর্জুনের যুধিষ্ঠিরকে বধোদ্যম ও কৃষ্ণের সত্য ও ধর্মের ব্যাখ্যা করে উভয় পক্ষকে শান্ত করার কথা আছে। যুদ্ধের মধ্যে এখানে কৃষ্ণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, কৃষ্ণের মধ্যস্থতা না থাকলে পাণ্ডবদের দুর্ভাগ্য আসতো। সংশোধক কিছু কিছু শ্লোক বাদ দিয়েছেন, সংশোধিত পাঠ সম্পূর্ণ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ঘ) ৭৫-৯৬ অধ্যায়ে সপ্তদশ দিবসের অপরাহ্ন যুদ্ধ, দুঃশাসন বধ ও কর্ণবধ বর্ণিত হয়েছে। সংশোধক কিছু শ্লোক ও অধ্যায় বাদ দিয়েছেন, তার উপরে আমার মতে অস্বাভাবিকতা ও অনৈসর্গিকতা হেতু আরো কিছু বাদ হবে যথা, ৭৬/৪০ (অর্জুনের রথ দেখা যাচ্ছে বলায় ভীমের সারথিকে পুরস্কার দিবার প্রতিশ্রুতি), ৮৭/৩৬-৮৮ (যুদ্ধ দেখতে অন্তরিক্ষে দেবগণের আগমন ও কথাবার্তা); ৮৮

অধ্যায় সম্পূর্ণ (অশ্বত্থামার সন্ধি প্রস্তাব দুর্যোধনের নিকট, কর্ণ-অর্জুনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর সেই প্রস্তাব হাস্যকর), ৯০/৮১-১১৬ (কর্ণের রথচক্র ভূমিগ্রস্ত হওয়া, কর্ণের সময় প্রার্থনা—বাদ হবে কারণ শাপের কথা গ্রহণ করা হয় নাই, এবং চক্র সত্যই প্রোথিত হলে সারথি শল্য কি করলেন তার উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক ছিল), ৯১/১-২২১, ৩৪, ৩৫ (কৃষ্ণের কর্ণের প্রতি ভৎর্সনা ইত্যাদি।

৯২ অধ্যায় (শল্য কর্তৃক বিধ্বস্ত কর্ণ রথ নিয়ে দুর্যোধনের নিকট গিয়ে যুদ্ধ বর্ণনা) ও ৯৬ অধ্যায় (যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে কর্ণের দেহ দর্শন) গ্রাহ্য। সংশোধক ৯৩ অধ্যায় (কৌরব সৈন্য পলায়ন) ও ৯৫ অধ্যায় (অবহার ঘোষণা ও শিবিরে গমন) বাদ দিয়েছেন। ৯৪ অধ্যায় কিছু শ্লোক বাদ দিয়ে রেখেছেন, সেটি বাদ দেওয়াও যেত, তবে রাখলেও ক্ষতি নাই।

১৫ শল্য পর্ব

এই পর্বের প্রধান দুই ভাগ শল্যবধ পর্ব ও গদা পর্ব, প্রমাণ সংস্করণের ১ ২৮ অধ্যায় ও ৩০ ৬৫ অধ্যায়। মধ্যে ২৯ অধ্যায়ে হ্রদ প্রবেশ নামক একটি ছোট অনুপর্ব।

প্রথম অনুপর্ব শল্যবধ পর্ব। ১ অধ্যায়ে প্রথমে জনমেজয়ের প্রশ্নে বৈশম্পায়ন কর্তৃক সংক্ষেপে কর্ণবধের পরের সব ঘটনা বর্ণিত, পরে সঞ্জয় কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কর্ণবধের পরের সব বিবরণ কথিত, সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ২ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ, তার মধ্যে ১-১৯, ২০২-৩০১, ৫৩২-৭০ গ্রাহ্য, বাকী শ্লোক পুনরুক্তি হেতু বাদ হবে। ৩ অধ্যায়ের ১,২ শ্লোক ছাড়া বাকী শ্লোক সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য। ৪ অধ্যায়ে কৃপ কর্তৃক দুর্যোধনকে সন্ধি প্রার্থনার উপদেশ, ভারত মঞ্জরীতে এই উপদেশের কথা না থাকলেও গ্রাহ্য মনে হয়, তবে কিছু সংক্ষেপ হবে, গ্রাহ্য ১-১৪, ৪৩-৫১, মধ্যে বহু শ্লোকে অর্জুনের বীর্যের ও অস্ত্রগৌরবের কথা, তা বাদ হবে। ৫ অধ্যায়ে দুর্যোধনের সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও যুদ্ধ চালাবার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন, সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ৬ অধ্যায়ে শল্যকে কৌরব সেনাপতি করবার প্রস্তাব, তার মধ্যে অশ্বত্থামার গুণগান, ৭ শ্লোকের চতুর্থ পাদ হতে ১৭ শ্লোকের প্রথমপাদ, বাদ হবে, তা ভৃগুবংশীয় কবি বা লিপিকার কর্তৃক পরের কালে যোজিত সন্দেহ নাই। বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ৭ অধ্যায়ে শল্যকে সৈনাপত্যে অভিষেক, পরে সপ্তদশ রাত্রিতে বিশ্রামের কথা, মধ্যে আছে যে শল্য কৌরব

সেনাপতি হয়েছে জেনে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন, আমাদের কি কর্তব্য, তার উত্তরে কৃষ্ণের যেন বিদ্রূপাত্মক ভাবে যুধিষ্ঠিরকেই শল্যবধ করতে বলা—বিদ্রূপ সঙ্গত মনে হয় না, অতএব ২৭২-৩৭ শ্লোক বাদ হবে, বাকী গ্রাহ্য। ৮ অধ্যায় হতে যুদ্ধ বর্ণনা আরম্ভ। ১১/১-৬ বাদ হবে, পরে যোজিত মনে হয়, কারণ ৭ শ্লোক হতে পুনঃ বর্ণনা আরম্ভ; এই অধ্যায়ে ১৪-১৮ শ্লোকে দুর্লক্ষণ বর্ণন, ভীমের গদার বর্ণনাযুক্ত ৫০-৫৭ শ্লোক বাদ হবে, ৪৫২-৪৭ সংশোধকগণ বাদ দিয়েছেন, বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ৯,১০, ১২-১৭ অধ্যায়ে যুদ্ধ বর্ণনা, ১৭ অধ্যায়ে শল্যবধ, শোধিত রূপে গ্রাহ্য। ১৮ অধ্যায় পরে যোজিত মনে হয়, ১৭ অধ্যায়ের পরে ১৯ অধ্যায় স্বাভাবিক মনে হয়, ১৮ অধ্যায় বাদ হবে। ১৯-২০ অধ্যায়ে যুদ্ধের বর্ণন ও শাল্ববধের কথা, শোধিত রূপে গ্রাহ্য। ২১ অধ্যায় বাদ হবে, কৌরবরথী ক্ষেমধূর্ত্তি বধের কথা দ্রোণ পর্বে ১০৭/১-৬ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে; এবং সাত্যকি ও কৃতবর্মার যুদ্ধের কথা শল্যপর্বে ১৭ অধ্যায়েই আছে। ২২ অধ্যায়ে সঙ্কুল যুদ্ধ বর্ণিত, বাদ দিবার কারণ নাই। ২৩ অধ্যায়ের ৪-৮ শ্লোক বাদ হবে, তা ১৭ অধ্যায়ের যুদ্ধের শেষভাগের বর্ণনার পুনরুক্তি। ২৪ অধ্যায়ে ১৭-৫০ শ্লোকে অর্জুনের দীর্ঘ উক্তি বাদ হবে, তা স্থানকালোচিত নয়। ২৭ অধ্যায়ে পুনঃ অর্জুনের অনাবশ্যক উক্তি আছে—১০২-২৭১; তা ছাড়া ২৭ অধ্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্যোধনের উপস্থিতির কথা আছে এবং তার এক ভ্রাতা সুদর্শনের ভীমের হস্তে মৃত্যুর কথা আছে; কিন্তু ২৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে দুর্যোধনকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখতে না পেয়ে কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা ও কৃপ তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন, পেলেন না, আর সুদর্শনের মৃত্যুর কথা দ্রোণ পর্বে ১২৭ অধ্যায়ে আছে। অতএব ২৭ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ২৫, ২৬, ২৮ অধ্যায়ে যুদ্ধের বিবরণ শোধিত রূপে গৃহীত হবে, ২৮ অধ্যায়ে সহদেবের হস্তে উলূক ও শকুনির মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে।

হ্রদ প্রবেশ অনুপর্ব প্রমাণ সংস্করণের ২৯ অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ে যুদ্ধের শেষাংশের বর্ণনাও কিছু আছে। কিছু পুনরুক্তি হেতু বাদ হবে। গ্রাহ্য ১ ১০, ১৫, ২০, ২২২, ২৩, ২৪২, ২৬২, ২৭, ৩৭-৯৭, ১০১ ১০২১ শ্লোক। এই অধ্যায়ে আছে যে সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হলে সাত্যকি তাকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, দ্বৈপায়নের কথায় মুক্তি দিলেন। দ্বৈপায়নের আকস্মিক উপস্থিতির কথা এখানে গ্রাহ্য মনে হয় না, যুধিষ্ঠিরের কথায় সাত্যকি সঞ্জয়কে ছেড়ে দিলেন এই ভাবে পাঠ পারিবর্তিত হবে।

গদাযুদ্ধ অন্তপর্বের ৩০ অধ্যায়ে দুর্যোধনের হ্রদে অবস্থান সম্বন্ধে ভীমের সংবাদপ্রাপ্তি এবং পাণ্ডবগণের সাত্যকি কৃষ্ণ সহ সেই হ্রদের নিকট রথ সহ গমন বর্ণিত, শোধিত পাঠ গ্রাহ্য। ৩১ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের দুর্যোধনকে হ্রদ হতে নির্গমন করতে আহ্বান ও দুর্যোধন সহ কথা, ৬২-১৬১ শ্লোকে কৃষ্ণ কর্তৃক দুর্যোধনের মায়া জয় করতে উপদেশ, অনাবশ্যক হিসাবে বাদ হবে। বাকীটা শোধিতরূপে গ্রাহ্য। কৃষ্ণের কুমন্ত্রনা দান এবং বলরামের গদাযুদ্ধকালে আগমনের কথা যে গ্রাহ্য নয় তা প্রথমখণ্ডের ১৯ অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। ৩২ অধ্যায়ে দুর্যোধনের হ্রদ হতে নির্গমন ও যুধিষ্ঠির সহ কথা, ফলে যুধিষ্ঠিরের দেওয়া কবচ শিরস্ত্রান ইত্যাদি পরিধান করে দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি এবং দুর্যোধনের সদম্ভ আহ্বানে ভীমের দুর্যোধন সহ গদাযুদ্ধের জন্য অগ্রসর হওয়া, শোধিত পাঠ গ্রাহ্য। ৩৩ অধ্যায়ে প্রথমে কৃষ্ণের উক্তি, পরে ভীম-দুর্যোধনের পরস্পরের প্রতি তর্জন, তার মধ্যে ৭২-১৭১, ২৪-২৯ বাদ হবে, কারণ কৃষ্ণ অন্যায় যুদ্ধের প্ররোচনা দিলেন বা দুর্যোধনকে অধিক কৃতী বললেন, তা গ্রাহ্য নয়। প্রথম খণ্ড ১৯ অনুচ্ছেদের আলোচনা মত বলরামের আগমন কথাবাদ অর্থাৎ ৩৪-৫৬ অধ্যায় এবং ৬০ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ। ৫৮ অধ্যায়ের প্রথমে অর্জুনের প্রশ্ন, গদাযুদ্ধ ভীম দুর্যোধনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এবং কৃষ্ণের উত্তর, ভীম বলবান কিন্তু দুর্যোধন অধিক কৃতী, অন্যায় যুদ্ধ না করলে ভীম জিত্‌তে পারবে না, শুনে অর্জুনের স্বীয় বাম উরুতে চপেটাঘাত করে ইঙ্গিত দানের কথা আছে, তা গ্রাহ্য নয়, অতএব ৫৮।১-২১ শ্লোক বাদ হবে; ৪৯ ৬২ শ্লোকে প্রাকৃতিক বিক্ষোভ ও সিদ্ধ চারণদের কথা আছে, তাও বাদ হবে; ২২-৪৮ শ্লোক গ্রাহ্য। ৫৯ অধ্যায়ে আছে জয়লাভের পরে ভীমের দুর্যোধন প্রতি উক্তি ও মস্তকে পদাঘাতের কথা, এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীমকে নিবারণ, শোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ৬০ অধ্যায়ে বলরামের কথা, বাদ হবে পূর্বেই বলা হয়েছে। ৬১।১-২১ গ্রাহ্য, পরে দুর্যোধনের কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে অধর্ম ও ছল অবলম্বনে যুদ্ধজয়ের জন্য তীব্র নিন্দা, কৃষ্ণের উত্তর, দুর্যোধনের উদ্দেশ্যে পুষ্পবৃষ্টি এবং অবশেষে কৃষ্ণের উক্তি যে অধর্ম অবলম্বন না করলে পাণ্ডবগণ ভীম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথদের পরাজিত করতে পারতেন না, কৃষ্ণ পাণ্ডবদের হিতের জন্য অন্যায় উপায় বলে তাদের বধ সম্ভব করেছেন—এই সমস্তই অগ্রাহ্য এবং অসত্য, তাই ২২-৭১ শ্লোক বাদ হবে। ৬২ অধ্যায়ে আছে যে পাণ্ডবগণ সাত্যকি ও কৃষ্ণ সহ যুদ্ধ

ক্ষেত্রে ফিরলেন, অরক্ষিত কৌরব শিবির হতে প্রচুর ধন রত্ন সংগ্রহ করলেন ইত্যাদি। ১২-৩২ শ্লোকে আছে যে রথ থেকে সকলে নামবার পরে কৃষ্ণ নামলেই অর্জুনের রথ পুড়ে গেল, কৃষ্ণ বললেন যে দ্রোণাদির ব্রহ্মাস্ত্রে রথ তপ্ত হয়েছিল, কৃষ্ণ রথে ছিলেন বলে জ্বলে যায় নাই, তিনি নামলে জ্বলে গেল। এই উপাখ্যান গ্রাহ্য নয়, কৃষ্ণের অতিপ্রাকৃত শক্তির দাবী মূল মহাভারতের অংশ নয়; এবং প্রতিরাত্রেই তো কৃষ্ণ রথ হতে নামতেন, দুর্যোধনের উদ্দেশ্যে হ্রদের নিকট গিয়েও তো কৃষ্ণ সহ সকলে রথ থেকে নেমেছিলেন, তখন কেন জ্বলে যায় নাই, সুতরাং পূর্বে জ্বলে না যাবার যে কারণ কৃষ্ণের মুখে বলান হয়েছে তাও বিচারসহ নয়। এই শ্লোক গুলি স্পষ্টতঃই প্রক্ষিপ্ত এবং বাদ হবে। ১- ২, ৩৩-৩৯ শ্লোক মাত্র গ্রাহ্য। ৪০-৪৫ শ্লোকে আছে যে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, হস্তিনাপুরে গিয়ে গান্ধারীকে শান্ত করে আসুন, না হলে গান্ধারী পাণ্ডবগণকে শাপ দিয়ে দগ্ধ করতে পারেন তাও বাদ হবে। ৬৩ অধ্যায়ে কৃষ্ণের হস্তিনাপুরে গমন এবং ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীকে সব জানিয়ে সান্ত্বনার বাণী বলা এবং অশ্বত্থামাদি রাত্রে পাণ্ডবশিবিরে হানা দিয়েছে বুঝতে পেরে ফিরে আসবার কথা আছে। এই সমস্ত পরে প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই, ৬৩ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ৬৪ অধ্যায়ে আছে যে ধৃতরাষ্ট্র শুনতে চাইলেন, দুর্যোধন ভগ্ন উরু হয়ে প'ড়ে থেকে কি বলেছিলেন, সঞ্জয় দুর্যোধনের দীর্ঘ বিলাপ বলে গেলেন; ৩৮২-৩৯১ শ্লোকে চার্বাকের উল্লেখ আছে, দুর্যোধন বলছেন যে আমার বন্ধু চার্বাক আমার এইভাবে বধের কথা জানলে প্রতিকার করবে। শান্তিপর্বে ৩৮-৩৯ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণবেশী দুর্যোধন বন্ধু চার্বাকের কথা আছে, তাকে রাজসভায় ব্রাহ্মণরাই যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করায় মেরে ফেললেন। এই ব্রাহ্মণবেশী রাক্ষসের কাছ থেকে কিছু প্রতিকার যে দুর্যোধন আশা করেছিলেন তা মনে হয় না। মহাভারতে নানা স্থানে দীর্ঘ বিলাপ বাণী আছে, আমার মনে হয় যে সে সবই পরের যুগের প্রক্ষেপ, আর্যগণ যখন তাঁদের বীর্য থেকে অনেকটা ভ্রষ্ট হয়ে সংসার দুঃখময় মনে করতে আরম্ভ করেছিলেন। অতএব ৬৪ অধ্যায় বাদ হবে। ৬৫ অধ্যায়ে আছে যে অশ্বত্থামা কৃপ ও কৃতবর্মা গদাযুদ্ধের পরে পাণ্ডবগণ চলে গেলে দুর্যোধনের নিকটে এলেন, এবং অশ্বত্থামা পাণ্ডব পাঞ্চালদের শেষ করবেন প্রতিজ্ঞা করায় দুর্যোধনের নির্দেশমত কৃপ তাকে সৈনাপত্যপদে অভিষিক্ত করলেন। রথীগণ দুর্যোধনকে সেখানে ফেলে রেখে চলে গেলেন। এই অধ্যায় ভারত কথার অংশ রূপে গ্রাহ্য।

১৬ঃ সৌপ্তিক পর্ব

১-৯ অধ্যায় নিয়ে সৌপ্তিক অনুপর্ব। ১ অধ্যায়ে ১-৬, ১৭-৬৯ শ্লোক গ্রাহ্য, তাতে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত অশ্বত্থামা ও অন্য দুই রথীর শিবির অভিমুখে গমন ও কার্য প্রণালী চিন্তন বর্ণিত। ৭-১৬ শ্লোকে দুর্যোধনের উদ্দেশ্যে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ বাদ হবে, কারণ সঞ্জয় যখন অশ্বত্থামাদির নিশীথ অভিযান বর্ণনা করছেন তখন দুর্যোধনের জন্য বিলাপ প্রাসঙ্গিক নয়। ২ অধ্যায়ে কৃপ কথিত দৈব ও পুরুষকার সম্পর্কে তত্ত্বকথা এবং বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর পরামর্শ গ্রহণের কথা আছে; তত্ত্বকথা কিছু বাদ দিয়ে ১-৩১, ১৯-৩৫ শ্লোক নেওয়া যেতে পারে। ৩ অধ্যায়ে অশ্বত্থামার উত্তর ও সুপ্ত পাণ্ডব পাঞ্চালদের সহসা আক্রমণ করে বধ করার প্রস্তাব, সে সংকল্প অশ্বত্থামার মনে পূর্ব হতেই ছিল, তাই ভনিতা কিছু বাদ দিযে ১-৩, ১৬-৩৬ শ্লোক নেওয়া যেতে পারে। ৪ ৫ অধ্যায় সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য, তার মধ্যে কৃপের উক্তি ও সুপ্ত শিবিরে আক্রমণের ধারা স্থির করণ বিবৃত আছে। ৬ অধ্যায়ে বর্ণিত মহাভূত রূপে শিবের পাঞ্চাল শিবিরের দ্বাররক্ষার কথা এবং ৭ অধ্যায়ে বর্ণিত অশ্বত্থামার শিবস্তুতি ও শিবের নিকট হ'তে অস্ত্রপ্রাপ্তির কথা অতিপ্রাকৃত হিসাবে বাদ হবে। শিব যদি সুখসুপ্ত সৈনিকগণের নিদ্রিত অবস্থায় হত্যার প্রয়াসী লোকের সামান্য স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে তার সাহায্য করেন, তাহলে শিবকে যে উচ্চ শ্রেণীর দেব বলা যায় না, তা প্রক্ষেপকারীর চিন্তায় স্থান পায় নাই। ৮ অধ্যায়ে ৬৯-৭৫ শ্লোকে কথিত রক্তাম্বর ধারিণী কালীর আবির্ভাবের কথা ও ১৩৪-১৪২ শ্লোকে কথিত পিশাচ ও রাক্ষসগণের আবির্ভাব কথা বাদ হবে, বাকী বিবরণ গ্রাহ্য। ৯ অধ্যায়ে ১-৬১ শ্লোক গ্রাহ্য, কৃপ অশ্বত্থামা কৃতবর্মার দুর্যোধনের নিকট এসে তাকে অচেতন দেখে বিলাপ, দুর্যোধনের চেতনা সঞ্চার হ'লে তার কাছে ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী দ্রৌপদেয়গণ ও অন্যান্য পাঞ্চাল পাণ্ডব সৈন্যের বধ জ্ঞাপন ও দুর্যোধনের সন্তোষ প্রকাশ করে মৃত্যু তাতে বর্ণিত হয়েছে; ৬২-৬৩ শ্লোক বাদ—সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্তি গ্রহণ না করায় দিব্যদৃষ্টিশক্তি বিলুপ্তির কথাও বাদ হবে।

১০-১৮ অধ্যায় নিয়ে ঐষীক অনুপর্ব। ইষীকা একটি বিশেষরূপে নির্মিত বাণ, যা দিয়ে ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ করা যায়।[১] অশ্বত্থামা ও অর্জুন ইষীকা

১। শোধিত সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড, Critical Notes P. 112

যোগে ব্রহ্মশির অস্ত্র ক্ষেপণ করলেন তার থেকে এই অস্ত্রপর্বের নাম। ১০ অধ্যায় গ্রাহ্য, তাতে আছে যে ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথির নিকট হতে যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী দ্রৌপদী পুত্রগণ ও অন্যান্য পাঞ্চাল বীর ও সেনাদের রাত্রে নিধনের কথা শুনে নকুলকে পাঠিয়ে দিলেন উপপ্লব্য থেকে দ্রৌপদীকে নিয়ে আসতে। ১১ অধ্যায়ে আছে যে দ্রৌপদীর কথায় ভীম নকুলকে সারথি ভাবে নিয়ে অশ্বত্থামা বধের জন্য যাত্রা করলেন, তার মধ্যে ১৬-২১ শ্লোক অবান্তর হিসাবে বাদ হবে, বাকী গ্রাহ্য। ১২-১৩ অধ্যায়ে অর্জুনকে নিয়ে কৃষ্ণের ভীমকে অনুসরণ এবং জাহ্নবী কূলে অশ্বত্থামাকে ব্যাস প্রভৃতি ঋষির সঙ্গে আসীন দর্শন, ভীমসেনকে ধনু উদ্যত করতে দেখে অশ্বত্থামার ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগ বর্ণিত ; এই দুই অধ্যায়ে অনৈসর্গিক কথা অনেক আছে, তা বাদ হবে, গ্রাহ্য ১২।১-৬, ৮, ৪১ ; ১৩।১-৩, ৬-২২, বাকী শ্লোক বাদ হবে। ১৪ অধ্যায়ে অর্জুন কর্তৃক ব্রহ্মশির অস্ত্র প্রয়োগের কথা আছে ; কিন্তু তার পরে অনৈসর্গিক কথা আছে—যে নারদ সহসা আবির্ভূত হলেন, নারদ ও ব্যাস দুই ক্রমবর্দ্ধমান দিব্যাস্ত্র জাত অগ্নিজ্বালার মধ্যে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর ধ্বংস নিবারণ করতে অশ্বত্থামা অর্জুন দুজনকেই তাদের অস্ত্র প্রত্যাহার করতে বললেন, অর্জুন করলেন কিন্তু অশ্বত্থামা পারলেন না, ইত্যাদি। তার থেকে ভাগবত পুরাণে অধিক স্বাভাবিক বর্ণনা আছে, যে অর্জুন প্রতি অস্ত্র প্রযোগ করে অশ্বত্থামার অস্ত্র উপশম করলেন, তারপর নিজের অস্ত্র প্রত্যাহার করে নিলেন এবং অশ্বত্থামাকে বন্দী করে ফেললেন (ভাগবত-১।৭।২৯-৩৩)। অতএব ১৪/১-৫১, ৬২, ৭-৯ শ্লোকের পরে বসবে-"দৃষ্ট্বা লোকান্ দহ্যমানান্ অর্জুনঃ পরমাস্ত্রবিৎ। সংজহার দ্বয়ং অস্ত্রং মহদবীর্যং প্রদর্শয়ন।

অনিচ্ছন্ তু গুরুপুত্রং নিহন্তুং সহসার্জুনঃ। জহার তু মূর্দ্ধমণিং অসিনা সহমূর্ধজম্ ॥ বিসৃষ্টবান্ ততঃ পাপং দ্রোণপুত্রং হতত্বিষম্।" অথবা এই অর্থ প্রকাশক অন্য শ্লোক।

১৪ অধ্যায়ের বাকী শ্লোক বাদ হবে। ১৫ অধ্যায় বাদ দিয়ে কয়েকটি শ্লোকে বলা যেতে পারে যে যে এইভাবে হতমান হয়ে অশ্বত্থামা অভিশাপ দিল যে পাণ্ডববধূ উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হবে। তারপরে ১৬ অধ্যায়ের ১-২২ শ্লোক বাদ দিয়ে কয়েকটি শ্লোকে বলা হবে যে কৃষ্ণ বললেন যে তিনি অশ্বত্থামার শাপাগ্নিদগ্ধ সন্তানকে বাঁচিয়ে দেবেন, সেই অভিমন্যু পুত্র শিক্ষা লাভ করে ষাট বৎসর রাজত্ব করবে, বংশ পরিক্ষীণ অবস্থায় তার জন্ম হওয়ায় তার নাম হবে

পরিক্ষিৎ তারপরে ২৩ ৩৭১ শ্লোক হ'ব, ৩৭২ বাদ হবে। ১৭, ১৮ অধ্যায়দ্বয় বাদ হবে, ত'তে শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে, মহাভারত যুগের কয়েক শতাব্দী পরে তা যোজিত হয়েছে সন্দেহ নাই।

১৭. স্ত্রী পর্ব

এই পর্বে তিনটি অনুপর্ব আছে—(১) জল প্রাদানিক পর্ব, ১-১৫ অধ্যায় নিয়ে, অনুপর্বের নাম সংশোধক মণ্ডলী পরিবর্তিত করে "বিশোক" নাম দিয়েছেন ; সেই নামই অধিক যুক্তিযুক্ত, (২) স্ত্রী-বিলাপ, ১৬ ২৫ অধ্যায় নিয়ে ; (৩) শ্রাদ্ধ অনুপর্ব, ২৬-২৭ অধ্যায়ে—এই অনুপর্বই জল প্রাদানিক অনুপর্ব, এখানে উদকক্রিয়া বা মৃতের উদ্দেশ্যে জলদানের কথা আছে, শ্রাদ্ধের কথা শান্তিপর্বের আরম্ভে আছে।

বিশোক অনুপর্ব : ১ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ, তার থেকে সংশোধকগণ যা বাদ দিয়েছেন, তার উপর ২, ৩, ১৩ শ্লোক অবান্তর বা অসঙ্গতি হেতু বাদ হবে। ২ অধ্যায়ে বিদুর কর্তৃক সান্ত্বনা বাণী কথন, গ্রাহ্য। ৩-৭ অধ্যায়ে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে নানা সান্ত্বনা বাণী ও তত্ত্বকথা শোনাচ্ছেন, ৮ অধ্যায়ে দ্বৈপায়ন ঋষি এসে সান্ত্বনা বাণী শোনালেন। এই ছয়টি অধ্যায় অনাবশ্যক ও পরে যোজিত মনে হয়। ৩ ১১ শ্লোকার্দ্ধে আছে যে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা শুনে বিগত-শোক হলেন, তাহলে আর নানা কথা জিজ্ঞাসা কেন, এবং ব্যাসের আগমন কেন ? ৩-৮ অধ্যায় বাদ হবে। ৯ অধ্যায় বহুলাংশে ২ অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি হওয়ায় সংশোধকগণই বাদ দিয়েছেন। ১০ অধ্যায় প্রথম শ্লোক সহ গ্রাহ্য—এই অধ্যায়ে কুরুস্ত্রীগণ সহ ধৃতরাষ্ট্রের কুরুক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ ; প্রথম শ্লোক সংশোধক বাদ দিয়েছেন, কিন্তু এখানে ৩-৮ অধ্যায় বাদ দেওয়াতে প্রথম শ্লোকটি রাখা প্রয়োজন। ১১ অধ্যায়ে আছে যে কুরুক্ষেত্র পানে যাত্রাকালে কৃপ, কৃতবর্মা ও অশ্বত্থামা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে দেখা করলেন ও পাণ্ডবগণ তাদের সন্ধানে আসবে ভয়ে তিনজন তিনদিকে চলে গেলেন। শোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ১২ অধ্যায়ে পাণ্ডব-গণের ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আগমন, লৌহভীম চূর্ণ করণ ইত্যাদি ; ১৩ অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দান ও সান্ত্বনা ; ১৪ অধ্যায়ে গান্ধারীর নিকট কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের গমন, ১৫ অধ্যায়ে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী সহ গান্ধারীর কথা—এই অধ্যায়গুলি সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য।

স্ত্রী বিলাপ অনুপর্ব ১৬-২৫ অধ্যায় নিয়ে, তার মধ্যে ১৬-২৪ অধ্যায় সংশোধিত পাঠ মত গ্রাহ্য। ২৫ অধ্যায়ের ৩৮-৫০ শ্লোক বাদ হবে—কারণ ৩৪ শ্লোকে গান্ধারী বলছেন কৃষ্ণকে, যে তুমি যখন ব্যর্থকাম হয়ে উপপ্লব্যে ফিরে গেলে, তখনই আমি বুঝেছি যে আমার পুত্রগণ নিহত হ'ল[১], তার পরে আবার কৃষ্ণকে যুদ্ধ নিবারণ না করবার জন্য দোষী বলবেন এবং বৃষ্ণিকুলের নিধন ও জ্ঞাতিশোকে কাতর অবস্থায় কৃষ্ণের কুৎসিৎ উপায়ে মৃত্যু হবে, এই অভিশাপ দেবেন, তা গ্রাহ্য নয়। ২৫।৩৭ শ্লোকের পরে ২৬ অধ্যায় বসলেই সঙ্গত হয়।

শ্রাদ্ধ বা জল প্রাদানিক অনুপর্ব ২৬-২৭ শ্লোক নিয়ে। মৃতদেহ সমূহ সংকার ও মৃতের উদ্দেশ্যে জল প্রদান করা হ'ল তাই বিবৃত হয়েছে। ২৭ অধ্যায়ে কুন্তী কর্ণের পরিচয় দিয়ে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনকে তার উদ্দেশ্যেও জল প্রদান করতে বললেন। এই অধ্যায়দ্বয় সংশোধিত রূপে গ্রহণ করা যায়।

১৮ শান্তি পর্ব ও অনুশাসন পর্ব

শান্তি পর্বে প্রমাণ সংস্করণে ১৩,৭৩২ শ্লোক ও অনুশাসন পর্বে ৭৭০১ শ্লোক আছে, এই দুই পর্বেই প্রমাণ মহাভারতের প্রায় এক চতুর্থাংশ শ্লোক আছে। কিন্তু যখন প্রথম মহাভারত কাহিনী পর্বে পর্বে বিভক্ত করে পুঁথিতে লিখিত হয়, তখন অনুশাসন নামে পৃথক পর্ব ছিল না, শল্য পর্ব ও গদাপর্বে পৃথক পৃথক পর্ব ধরে অষ্টাদশ পর্ব বলা হত। যবদ্বীপে যে মহাভারত পাওয়া গেছে, তার মধ্যে শান্তি বা অনুশাসন কোনটাই পাওয়া যায় নাই, সেখানে প্রাপ্ত আটটি পর্বের মধ্যে আদি পর্ব আছে, সেই আদিপর্বের পর্বসংগ্রহে শান্তিপর্বে ৩৩৩ অধ্যায় ও ১৪,৫২২ শ্লোক আছে বলা হয়েছে, অনুশাসন পর্বের উল্লেখ নাই। সংশোধিত সংস্করণের পর্বসংগ্রহ মতে শান্তি পর্বে ৩৩৭ অধ্যায় ও ১৪,৫২৫ শ্লোক, এবং অনুশাসন পর্বে ১৫৩ অধ্যায় ও ৮০০০ শ্লোক, অতএব যবদ্বীপে যখন মহাভারত গিয়েছে, তখন অনুশাসন পর্ব ছিল না, এবং অনুশাসন পর্ব শান্তিপর্বের অন্তর্ভুক্ত ও ছিল না। প্রমাণ সংস্করণে অনুশাসন পর্বের ১৬৭ অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ১৬৬ অধ্যায় সম্পূর্ণ অবান্তর বিষয় ও অর্বাচীন কাহিনী নিয়ে রচিত—বার বার ব্রাহ্মণ মহিমা ঘোষণা,

---

১। "তদৈব নিহতাঃ কৃষ্ণ মম পুত্রাস্তরস্বিনঃ। যদেবাকৃতকামস্ত্বং উপপ্লব্যং গতঃ পুনঃ॥"

ব্রাহ্মণকে দানে পুণ্যের কথা, ব্রাহ্মণের বিত্ত জেনে বা না জেনে নিলে অমার্জনীয় অপরাধ এবং শাস্তি হয়, তার উদাহরণ, ব্রাহ্মণের অবধ্যতা ও লঘু দণ্ডের বিধান, ইত্যাদি আছে; ভৃগুবংশের মহিমার কথা বার ব'র উক্ত হয়েছে, ভৃগুর মহিমা দেখাতে পূর্ব কথিত কাহিনীর পরিবর্তিত রূপ আছে, যথা উদ্যোগপর্বে ৯-১৮ অধ্যায়ে কথিত ও শান্তি পর্বে ৩৪২ অধ্যায়ে কথিত ও বনপর্বে ১৮১ অধ্যায়ে কথিত নহুষ উপাখ্যানে আছে যে অগস্ত্যের শাপে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত নহুষ সর্পে পরিণত হয়, কিন্তু অনুশাসন পর্বে ৯৯-১০০ অধ্যায়ে বলা হযেছে যে ভৃগু অগস্ত্যের জটার মধ্যে থেকে অগস্ত্যকে অভিশাপ দিয়ে সর্পে পরিণত করেছিলেন। অনুশাসন পর্বের উপাখ্যান সমূহ সম্বন্ধে সংশোধকমণ্ডলী বলেছেন যে এক একটি উপাখ্যান মহাভরতের অন্তর্ভুক্ত করবার উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে অর্বাচীনের মত প্রশ্ন করানো হয়েছে, অনেক স্থলে প্রশ্নের উদ্ভবের সঙ্গে উপাখ্যানের কোন সঙ্গতি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কৃষ্ণ চরিত্রে বলেছেন, "কতকগুলা বাজে কথা লইয়া এই অনুশাসন পর্ব গ্রথিত হইয়াছে। সমুদয়ই বোধ হয তৃতীয স্তরের। পর্বের শেষে ভীষ্ম স্বর্গারোহণ করলেন ইহাই কেবল প্রথম স্তরের।" অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র শরশয্যায় শায়িত অবস্থায় ভীষ্ম কর্তৃক রাজধর্মাদি বিষয় কথন মূল ভারত কথার অংশ বলে মেনেছেন। তবে তাঁর মত যে অনুশাসন পর্বের ১-১৬৬ অধ্যায তৃতীয স্তরের, অর্থাৎ বহু শতাব্দী পরের যোজনা, তা যে গ্রাহ্য তাতে সন্দেহ নাই। যবদ্বীপে মহাভারত যায় অনুমান খৃষ্টীয দ্বিতীয শতাব্দীতে, তখন অনুশাসন পর্ব এবং তাতে বিবৃত উপাখ্যানাদি ছিল না। আলবেরুণি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক, তিনি সুলতান মামুদের অভিযান কালে ভারতে এসে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তিনি মহাভারতের পর্বগুলির নাম করেছেন, তার মধ্যে অনুশাসন পর্বের নাম নাই। ক্ষেমেন্দ্রের ভারত মঞ্জরী অনুমান ১০৫০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়, তাতে অনুশাসন পর্ব নাই। অনুশাসন পর্বের ১-১৬৬ অধ্যায যে মূল ভারত কাহিনীর অংশ নয, তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। এখন অনুশাসন পর্বের ১৬৭ অধ্যায় এবং দীর্ঘ শান্তিপর্বের কতটা মূল কাহিনীর অংশ তাই বিবেচ্য।

শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের কথা আছে ৪০ অধ্যায়ে. অভিষেকের পরে প্রজাদের রাজসভা হতে বিদাযদানের কথা ৪১/৮-৯ শ্লোকে, ৪৪/১ শ্লোকে ও অনুশাসন পর্বের ১৬৭/১ শ্লোকে। এই তিনটির মধ্যে একটি মাত্র গ্রাহ্য। কবি বা লিপিকারগণ দেখাতে চেয়েছেন যে অনুশাসন ১৬৭/১ শ্লোকে যে প্রজাগণকে

বিদায় দিবার কথা আছে, তা অভিষেকের পরে নয়, ত্রিশদিন ধরে ভীষ্মের কথা শুনে ভীষ্মের অনুমতিতে সকলকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরবার পরে—অনুশাসন ১৬৬ অধ্যায়ে আছে যে ভীষ্ম সব কথা শেষ করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে এখন ফিরে যাও, উত্তরায়ণ আরম্ভ হলে আমার বিদায় গ্রহণ করবার সময় এসো ; তখন পৌরজানপদগণ এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী প্রভৃতি সবাইকে নিয়ে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে ফিরলেন (অনু ১৬৬/১৫-১৭), অনু ১৬৭/১ শ্লোকে সেই পৌরজানপদগণকে বিদায় দেবার কথা বলা হয়েছে। তা যে নয়, তা শান্তিপর্বের ৫৩/ ৪-১৩ শ্লোক থেকে প্রতিপন্ন হয়,—যুধিষ্ঠির বলছেন, ভীষ্মকে এখন বহুজনের উপস্থিতি দিয়ে পীড়ন করা কর্তব্য নয়, তিনি গুহ্য উপদেশও দিতে পারেন, অতএব সৈন্য ও পরিজনদের না নিয়ে শুধু আমরা নিজেরা তাঁর কাছে যাব। অনুশাসন পর্বের ১৬৭ অধ্যায় সবটা পড়লেও স্পষ্ট হয় যে ১৬৭/১ শ্লোকে অভিষেক সভা থেকে প্রজাগণকে বিদায় দেবার কথাই বলা হয়েছে। ৪ শ্লোকে অভিষেকের কথা আছে, ২ শ্লোকে হতপতি হতপুত্র নারীদের ব্যবস্থা করে দেবার কথা আছে, ৩ শ্লোকে প্রজাদের উপযুক্ত কার্যে ব্যাপৃত করবার কথা আছে। এই অধ্যায়ে পঞ্চাশ রাত্রি হস্তিনাপুরে কাটিয়ে উত্তরায়ণ আরম্ভে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সরঞ্জাম নিয়ে গিয়ে ভীষ্মের সঙ্গে দেখা করবার কথা আছে, সেদিনেই ভীষ্ম দেহত্যাগ করলেন। অতএব মনে হয় যে এক সময় শান্তিপর্বের ৪০ অধ্যায়ের পরে অনুশাসন পর্বের ১৬৭ অধ্যায় ছিল ; তখন ভীষ্মের ৫৮ রাত্রি শরশয্যা ও ইচ্ছা মৃত্যুর কথা কল্পিত হয়েছে, কিন্তু রাজধর্মাদি কথন কল্পিত হয় নাই। অর্থাৎ শান্তিপর্বের ৪১ (বা ৪৫) অধ্যায় হতে অনুশাসন পর্বের ১৬৬ অধ্যায় পর্যন্ত সমস্তই আরো পরের কালের যোজনা। তার সমর্থক আর একটি উক্তি শান্তিপর্বে ৪৭।৩ শ্লোকে—"নিবৃত্ত মাত্রে ত্বয়ন উত্তরে বৈ দিবাকরে" (সূর্যের উত্তরায়ন আরম্ভ হলেই)[১]—সেই সময় ভীষ্ম তাঁর স্তব আবৃত্তি করছিলেন, যা কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে থেকেই শুনলেন, এবং তার পরে পাণ্ডবগণকে ভীষ্মের কাছে নিয়ে গেলেন। অনুশাসন পর্বের ১৬৭/৬২ শ্লোকার্দ্ধে ও উত্তরায়ন আরম্ভের কথা আছে। তাহলে বহুদিন ধরে তত্ত্ব কথা ও কাহিনী শোনা হয় কেমন করে ?

১। নিবৃত্ত=returned, turned back (Apte's Sanskrit English Dictionary)—শ্লোকার্দ্ধের আক্ষরিক অর্থ সূর্য উত্তর অয়নে ফিরে আসা মাত্র।

ভীষ্মের শরশয্যায় শয়নকাল সম্বন্ধে বহু অসঙ্গতি পূর্ণ শ্লোকের আলোচনা ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক অসঙ্গতির কথা প্রথম খণ্ডে ১৭ অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। তার থেকে অনুমান সঙ্গত যে শরশয্যা কাহিনী পরের কালের কল্পনা, যুধিষ্ঠির বহুবর্ষ রাজত্ব করেছেন, ধর্মজ্ঞানও তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্ত; তাঁর পক্ষে রাজধর্মাদি কথা শোনা নিষ্প্রয়োজন, মোক্ষধর্মানুশাসনে যে সাংখ্য ও একান্ত বৈরাগ্য মূলক ধর্মের কথা শান্তিপর্বে আছে, তা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালের পরে প্রচলিত হয়। তা ছাড়া ভীষ্ম-স্তববাক্যে (৪৭ অধ্যায়) কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান বলা হয়েছে; সেটি ভারত কাহিনীর মূল পর্যায়ের কথা নয়, সেটা হ'ল খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর যোজনা, যখন ভগবদ্ গীতা মহাভারতে সন্নিবেশিত হয়েছে। অতএব শান্তিপর্বের ৪৫ অধ্যায় হতে শেষ পর্যন্ত পরের কালের যোজনা হিসাবে, মূল ভারত কথার অংশ নয় হিসাবে, বাদ হবে। এখন শান্তিপর্বের ১-৪৪ অধ্যায় মধ্যে কতটা মূল ভারত কাহিনীর অংশ, তাই বিচার করতে হবে। শান্তিপর্বের নামের এই সার্থকতা যে যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিদের দেহ সংস্কার করিয়ে জ্ঞাতি বর্গের, বিশেষতঃ না জেনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণকে বধ করার জন্য, অত্যন্ত সন্তপ্ত হন, রাজ্য ছেড়ে বনে যেতে চান, শেষে অর্জুন ভীমাদির কথা শুনে, বিশেষতঃ ব্যাস ঋষি ও কৃষ্ণের উপদেশে, মনে শান্তি পান ও রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

১ অধ্যায়ে নারদ, কণ্ব প্রভৃতির কথা আছে। কণ্ব পাণ্ডবগণের কয়েক শতাব্দী পূর্বের ঋষি, নারদ দেবলোকের দূত ও গায়ক বলে কল্পিত। তদ্ভিন্ন ১ অধ্যায়ে কর্ণের প্রতি ভার্গবের অভিশাপ ও আর এক ব্রাহ্মণের অভিশাপের সূচনা আছে। পরশুরাম ভার্গবও কর্ণ ও পাণ্ডবগণের কালের বহু পূর্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁর অভিশাপ এবং অন্য ব্রাহ্মণের অভিশাপ পরে কল্পিত হিসাবে বাদ হবে, তা প্রথমখণ্ডের ৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। কর্ণের জন্ম কথাও আদি পর্বে বলা হয়েছে। অতএব ১ অধ্যায় এবং কর্ণের জন্ম ও অভিশাপাদির কথাপূর্ণ ২-৫ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ হবে। ৬ অধ্যায়ে কুন্তীর উক্তি এবং যুধিষ্ঠিরের অভি-শাপ—স্ত্রীগণ গুহ্য কথা গোপন রাখতে পারবে না, তাও অবান্তর এবং গ্রাহ্য নয়।

৭ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের নির্বেদ বাণী ও রাজ্যত্যাগের সংকল্প প্রকাশ, ৮-১৯ অধ্যায় অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর উক্তি এবং যুধিষ্ঠিরের অনমনীয় উত্তর। যুধিষ্ঠির যদিও প্রধানতঃ অর্জুনকে সম্বোধন করে কথা বলছেন

তবু, ভীম, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী—তাঁরা চুপ করে বসে থাকবেন তা বলা যায় না। অতএব ১-১৯ অধ্যায় সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ২০ ২১ অধ্যায় দেবস্থান ঋষির উক্তি ২২ অধ্যায় অর্জুনের উক্তি, গ্রাহ্য। ২৩ অধ্যায় ব্যাসের উক্তি, তার মধ্যে সুদ্যুম্নের উপাখ্যান (১৫-৪৫ শ্লোক) বাদ হবে বাকী গ্রাহ্য। ২৪, ২৫ অধ্যায়, ব্যাস যুধিষ্ঠিরের কথা গ্রাহ্য।

২৬ অধ্যায় যুধিষ্ঠিরের উক্তি, ধনের প্রয়োজনীয়তার কথা খণ্ডনের চেষ্টা, বহুলাংশে ১৯ অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি, এটি বাদ হবে। সংশোধক মণ্ডলীও এই অধ্যায় বাদ দিয়েছেন। ২৭ অধ্যায়ে ভীষ্ম ও দ্রোণকে অধর্ম পথ অবলম্বন করে বধ করার জন্য সন্তাপ প্রকাশ আছে, তা বাদ হবে কারণ ভীষ্ম ও দ্রোণ বধে পাণ্ডবগণ অধর্মের পথ নিয়েছিলেন, তা পরের কালের কল্পনা। ২৮ অধ্যায়ে ব্যাস কথিত অশ্ম-জনক উপাখ্যান ও বাদ হবে, কারণ উপাখ্যানে প্রতিপাদ্য হল যে মানুষ তার অদৃষ্ট নিয়ে আসে, সেই অনুসারে সুখ দুঃখ পায়, তবু শাস্ত্র নির্দিষ্ট পথে চলা উচিত। এই নীতি গ্রাহ্য মনে হয় না, এবং যুধিষ্ঠিরের মনে শান্তি আনার ব্যাপারে অবান্তর মনে হয়। ২৯ অধ্যায়ে অর্জুনের অনুরোধে কৃষ্ণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ—১-১৪৩ শ্লোক গ্রাহ্য, তার মধ্যে ষোড়শরাজক কথার মূল রূপ আছে। ২৯।১৪৪-১৪৯ শ্লোক ও ৩০ ৩১ অধ্যায়, নারদ কথিত সুবর্ণষ্ঠীবী ও সৃঞ্জয়ের উপাখ্যান, বাদ হবে, কারণ নারদের উপস্থিতি গ্রাহ্য নয়, ২৯।১৪ শ্লোকেও নারদের উল্লেখ বাদ হবে। ৩২, ৩৩ অধ্যায়ে পুনঃ ব্যাসের ও যুধিষ্ঠিরের কথা, গ্রাহ্য।

৩৪-৩৫ অধ্যায়ে ব্যাস কথিত প্রায়শ্চিত্ত বিধি ও ৩৬ অধ্যায়ে কথিত ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার, অবান্তর হিসাবে বাদ হবে। ৩৭।১-১৭ শ্লোকে ভীষ্মের নিকট গিয়ে রাজধর্মাদি শ্রবণের সূচনা আছে, তা বাদ হবে, ৩৭।১৮-৪৯ শ্লোক গ্রাহ্য। ব্যাসের উপদেশ ও কৃষ্ণের উপদেশ শুনে যুধিষ্ঠিরের মন শান্ত হল ও তিনি হস্তিনাপুর অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করলেন। ৩৮ অধ্যায়ে বিবৃত হস্তিনাপুরে প্রবেশ ও দুর্যোধনের ব্রাহ্মণবেশীবন্ধু চার্বাকের বধ গ্রাহ্য। ৩৯ অধ্যায়ে বিবৃত চার্বাকের পূর্ব জন্মকথা বাদ হবে। ৪০ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক বর্ণিত, ৪১ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের কৃত কর্ম বিভাগ বর্ণনা, ও ৪২ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের আদেশে যুদ্ধে মৃত বীরদের শ্রাদ্ধক্রিয়া ও যুদ্ধের ফলে অনাথা নারীদের ভরণ পোষণ ব্যবস্থা বর্ণন, এগুলি গ্রাহ্য। ৪৩ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণকে ঈশ্বর

-রূপে স্তুতি, তা পরের কালের যোজনা হিসাবে বাদ হবে, গ্রাহ্য শুধু ৪৩।১-৩ শ্লোক, তা পরের অধ্যায়ে যুক্ত হতে পারে। ৪৪।১ শ্লোক বাদ হবে, প্রজাদের বিদায়দানের কথা ৪১ অধ্যায়েই আছে, ৪৪।২-১৬ গ্রাহ্য। অনুশাসন পর্বের ১৬৭ অধ্যায়ও বাদ হবে।

১৯. আশ্বমেধিক পর্ব

এই পর্বের প্রথমে ভীষ্মের দেহ সৎকারের পরে যুধিষ্ঠিরের নির্বেদ ভাব ও ভৈক্ষ্য অবলম্বনের ইচ্ছার প্রকাশ আছে; কিন্তু ভীষ্মের সদ্য মৃত্যু হয়েছিল, অষ্টপঞ্চাশৎ দিন শরশয্যার পরে নয়, তা মনে রাখলে যুধিষ্ঠিরের পুনঃ বিষাদ ও নির্বেদের কারণ থাকে না। অতএব ১ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের নির্বেদ প্রকাশ ও ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনা বাণী, ২ অধ্যায়ে কৃষ্ণের উপদেশ, এবং ৩।১-১০ শ্লোকে ব্যাসের উপদেশ বাদ হবে। পুনরায় শোক ও তার শান্তির কথা যে প্রক্ষিপ্ত, তা ১৪ অধ্যায় হতে পরিস্কার বোঝা যায়; সেখানে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ, ব্যাস, দেবস্থান, অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ইত্যাদির কথায় যুধিষ্ঠিরের শোক দুঃখ ও মানসিক সন্তাপ দূর হয়ে গেল, কিন্তু আশ্বমেধিক পর্বে যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা বাণী বললেন শুধু ধৃতরাষ্ট্র, কৃষ্ণ, ব্যাস, দেবস্থান, অর্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর উক্তি শান্তি পর্বে আছে, আশ্বমেধিক পর্বে যুধিষ্ঠিরের শোকের পুনরুদ্রেকের পরে নাই। অর্থাৎ লিপিকার শান্তিপর্ব থেকে যুধিষ্ঠিরের শোক ও সান্ত্বনের কথার জের টেনে চলেছেন। ৩।১১-১৯ শ্লোকে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধের জন্য ব্যয় সংগ্রহের কথা জিজ্ঞাসা করছেন ও ব্যাস তার উত্তর দিচ্ছেন, গ্রাহ্য, তবে ভূমিকা হিসাবে তার পূর্বে কয়েকটি পংক্তি বসাতে হবে—তা এই ভাবে হতে পারে:—

"অভিষিক্ত স্তথা রাজ্যে হৃষীকেশপুরোগমৈঃ।
অন্বশাসৎ স ধর্মাত্মা পৃথিবীং সাগরাম্বরাম্॥
অথ কদাচিৎ সংপ্রাপ্তং ব্যাসং সত্যবতীসুতম্।
উবাচ বিনীতো রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥
অনুজ্ঞাতোঽস্মি ভগবন্ বাজিমেধং সদক্ষিণম্।"

তারপরে ৩।১১-১৯ শ্লোক বসবে। ৪ অধ্যায়ে মরুত্ত রাজা ও তাঁর স্বর্ণপাত্র ভূয়িষ্ঠ যজ্ঞের বিবরণ গ্রাহ্য; ৫-১০।৩৩ পর্যন্ত যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ বাদ হবে, তার মধ্যে ইন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতির কথা আছে, ১০।৩৩-৩৭ গ্রাহ্য, স্বর্ণ পাত্র দি

কিছু ভূপ্রোথিত হয় রইল তা বোঝাতে। ১১-১৩ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে কৃষ্ণের উপদেশ গ্রাহ্য নয়, কারণ ১০।৩১ শ্লোকে আছে যে মরুত্তের স্বর্ণ-পাত্রের কথা জেনে যুধিষ্ঠির খুসী হয়ে সেই বিত্ত সংগ্রহ করে যজ্ঞ করবেন ঠিক করে মন্ত্রণা আরম্ভ করলেন, তখন তিনি আর শোকাচ্ছন্ন নন; তাছাড়া ১২ অধ্যায় প্রায় শান্তি পর্বের ১৬ অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি। ১৪ অধ্যায়ের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, সেটিও বাদ হবে।

১৫ অধ্যায়ে কৃষ্ণ ও অর্জুনের চারিদিকের বনে ও ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে ভ্রমণের কথা, ও কৃষ্ণের নিজ দেশে ফিরবার ইচ্ছা জ্ঞাপন, গ্রাহ্য। ১৬-৫১ অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্নে কৃষ্ণ কর্তৃক অনুগীতা ও ব্রাহ্মণ গীতা এই দুই ভাগে ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দানের কথা আছে, কিন্তু ভগবদ্ গীতাই মূল মহাভারতে অনুমান খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে যোজিত হয়েছিল, অনুগীতা ও ব্রাহ্মণ গীতার যোজনার জন্য অর্জুনের মুখে বসান হয়েছে, কৃষ্ণ, তুমি যুদ্ধারম্ভে যে ধর্মের উপদেশ দিয়েছিলে তা আমি ভুলে গেছি, তা আবার বল, কৃষ্ণ বললেন, ঠিক সেইভাবে এখন আমি বলতে পারব না, তবে তোমাকে ধর্মের কথা শোনাচ্ছি। তার থেকেই দেখা যায় যে অনুগীতা ও ব্রাহ্মণ গীতা ভগবদ্ গীতার পরে যোজিত, সম্ভবতঃ কয়েক শতাব্দী পরে যোজিত। সংশোধক মণ্ডলী মন্তব্য করেছেন যে অনুগীতায় ভগবদ্-গীতার কিছু শ্লোক অবিকল বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং ভগবদ্গীতায় কথিত কিছু কিছু তত্ত্ব বিস্তৃততর ভাবে বুঝাবার চেষ্টা আছে, তবু মোটের উপর নূতন তত্ত্ব অনুগীতা বা ব্রাহ্মণ গীতা হতে পাওয়া যায় না। মূল ভারত কথার অংশ নয় বলে ১৬-৫১ অধ্যায় বাদ হবে।

৫২ অধ্যায় ১৫ অধ্যায়ের পরে স্বাভাবিকভাবে বসে, এই অধ্যায়ে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট হতে বিদায় নিলেন। ৫৩।১-৬ শ্লোকে কৃষ্ণের দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা বর্ণিত, গ্রাহ্য; ৫৩।৭ হতে ৫৯।২ শ্লোক পর্যন্ত কৃষ্ণ উত্তঙ্ক সংবাদ, অবান্তর কথায় পূর্ণ এবং পর্বসংগ্রহে তার কোন উল্লেখ নাই, এই অধ্যায় ও শ্লোক সমূহ বাদ হবে। সংশোধক মণ্ডলী বলেছেন যে ৫৬-৫৮ অধ্যায় আধুনিক কালে—অর্থাৎ ভারত-মঞ্জরী রচিত হবার পরে—যোজিত, ৫৫ অধ্যায়ের পরে ৫৯ অধ্যায় বসালে কোন ছেদ পড়ে না, তা ছাড়া ৫৬-৫৮ অধ্যায়ে কথিত উত্তঙ্ক কর্তৃক গুরুপত্নীর জন্য কুণ্ডল আহরণ আদিপর্বে পৌষ্য অনুপর্বেই বিবৃত হয়েছে। আমার মতে ৫৩।৭ হতে ৫৫ অধ্যায় এবং ৫৯।১,২ও বাদ হবে। তার মধ্যে আছে

যে কুরু পাণ্ডব যুদ্ধ নিবারণ না করবার জন্য উত্তঙ্ক কৃষ্ণকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হ'ল ইত্যাদি, তা ভৃগুকুলের গৌরব বাড়াতে যোজিত হয়েছে, উত্তঙ্ক ভৃগুকুলজাত। ৫৯।২^{২}-২১ শ্লোকে কৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন বর্ণিত, ৬০ অধ্যায়ে পিতা বসুদেবের নিকট সংক্ষেপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বিবরণ কথন, ৬১।১-২৪^{১} শ্লোকে অভিমন্যুর মৃত্যু বিবরণ—এই সমস্তই গ্রাহ্য। ৬১।২৪^{২}-৪২ শ্লোকে দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রভৃতির অভিমন্যুর মৃত্যুতে শোক বর্ণিত, অবান্তর হিসাবে বাদ হবে। ৬২।১-২ শ্লোক ৬১।১-২৪^{১} শ্লোকের পরে সেই অধ্যায়ে যুক্ত হবে, ৬২।৩-৮^{১} ব্রাহ্মণদের শ্রাদ্ধে বহুদানের কথা, বাদ হবে। ৬২।৮^{২}-৯^{১}, ১০-২১ গ্রাহ্য, তাতে ব্যাস কর্তৃক যুধিষ্ঠির, অর্জুন ইত্যাদির সাক্ষাতে উত্তরাকে আশ্বাসদানের কথা ও গুণবান পুত্রলাভের কথা আছে।

৬৩-৬৫ অধ্যায়ে পাণ্ডব ভ্রাতৃগণের সৈন্য ও অনুচর সহ হিমালয়ে গমন। সেখানে মরুত্তের যজ্ঞভূমি নির্ণয় করে ধনাধ্যক্ষ কুবের ও সগণ রুদ্রের উদ্দেশ্যে স্বস্ত্যয়ন করে ভূমিখনন করে বহু স্বর্ণপাত্র প্রাপ্তি ও হস্তী, অশ্ব, শকট ও অশ্বতর যোগে সেগুলি হস্তিনাপুরে আনয়নের কথা আছে, সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ৬৬ অধ্যায়ে কৃষ্ণের সুভদ্রাসহ হস্তিনাপুরে আগমন কথা, ২নং শ্লোক বাদ হবে, কারণ তখন বাজিমেধের সময় নয়, উত্তরার প্রসবকাল। বাকী শ্লোক গ্রাহ্য, শুধু যেখানে অশ্বত্থামার অস্ত্রে দগ্ধ এইভাবে শিশুর বর্ণনা আছে তা পরিবর্তিত করে নিতে হবে, যথা ১৬^{২} পাক্তিতে "অশ্বত্থাম্না হতো জাত" স্থলে "সোঽয়ং শোতে মৃতো জাত" হতে পারে। ৬৭ অধ্যায় বাদ হবে, ৬৬ অধ্যায়ে কুন্তী কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন মৃত বা মৃতপ্রায় শিশুকে বাঁচিয়ে দিতে, তারপরে ৬৭ অধ্যায়ে সুভদ্রার অনুরোধ নিষ্প্রয়োজন। ৬৮।১-১৩ গ্রাহ্য—সূতিকাগৃহে কৃষ্ণের গমন ও উত্তরার বিলাপ, তারমধ্যে ১৩ শ্লোকে "দ্রোণ পুত্রাস্ত্র নির্দগ্ধং" স্থলে "তীব্রশোকাগ্নিনা দগ্ধং" বসবে, কারণ পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীর মৃত্যুর শোকের দাহনে গর্ভস্থ শিশু বিপন্ন হয়েছিল মনে হয়। এই অধ্যায়ের অবশিষ্ট শ্লোক প্রলাপ হিসাবে বাদ হবে। ৬৯ অধ্যায়ে কৃষ্ণ কর্তৃক উত্তরার মৃত বা মৃতবৎ শিশুকে সঞ্জীবকরণ বিবৃত হয়েছে, গ্রাহ্য। কেবল ১৬ শ্লোক বাদ হবে, উত্তরার গর্ভস্থ শিশুর দেহে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র প্রবেশ করেছিল, তা অসম্ভব। সেই কারণে ৭০।১-৩ শ্লোকও বাদ হবে, বাকী শ্লোক গ্রাহ্য।

তাতে অভিমন্যুপুত্রের সংজ্ঞা প্রাপ্তি এবং পাণ্ডবগণের স্বর্ণসম্ভার সহ হিমালয় হতে প্রত্যাবর্তনের কথা আছে।

৭১-৭২ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞার্থ দ্রব্য সম্ভার আহরণের কথা আছে আরো আছে যে উৎসৃষ্ট অশ্বরক্ষার্থ অর্জুন রক্ষী হ যাবেন। ৭৩ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞার্থ দীক্ষাগ্রহণ এবং অর্জুনের যথাক্রমে ত্রিগর্ত রাজ্যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে, সিন্ধু দেশে, মণিপুরে, মগধে, নানা দক্ষিণ দেশীয় রাজ্যে ও গান্ধারে গমন ও অশ্বমোচনার্থে যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। সর্বত্রই অর্জুন কোথায়ও তীব্র যুদ্ধ করে, কোথাও মৃদুযুদ্ধ করে জয়ী হয়েছেন বলে বর্ণিত, কেবল মণিপুরে তিনি পুত্র বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বিসংজ্ঞ মুমূর্ষু হন, তখন উলূপী মণির সংস্পর্শে—অর্থাৎ উপযুক্ত ঔষধ দিয়ে—অর্জুনকে সচেতন বা সঞ্জীবিত করেন। পূর্ব নির্ণয় মতে চিত্রাঙ্গদার কথা বাদ হবে, অতএব ৭৯। ৩৮-৩৯, ৮০। ১-১৯ শ্লোক বাদ হবে; ৮০।৫৭ শ্লোক সংশোধিত হবে, যথা "উলূপ্যা সহ তিষ্ঠন্তীং" স্থলে "উলূপীং তত্র তিষ্ঠন্তীং" হতে পারে। ৫৯[২] শ্লোকার্দ্ধ বাদ হবে। ৮১/১২-৪, ৮-১৯ বাদ হবে, ২৩[১]ও বাদ হবে, ২৪ শ্লোকে মাতৃভ্যাং সহিতঃ "স্থলে মাত্রা চ সহিতঃ", ২৭ শ্লোকে ভার্যাভ্যাং স্থলে ভার্যয়া বসবে। এই সংশোধন যোগ করে ৭৪ ৮৪ অধ্যায়ের শোধিত পাঠ গ্রাহ্য।

৮৫ অধ্যায়ে অশ্বমেধের যজ্ঞবাট প্রস্তুতি বর্ণিত, ৮৬ অধ্যায়ে কৃষ্ণ সহ বৃষ্ণিবীরদের আগমন বর্ণিত, উভয় অধ্যায় গ্রাহ্য। ৮৭ অধ্যায়ে অর্জুনের অশ্বসহ প্রত্যাবর্তন বর্ণিত, ২৭ শ্লোকে বভ্রুবাহনের আগমন, "মাতৃভ্যাং সহিতঃ স্থলে স্বমাত্রা সহিতঃ বা এইরকম কিছু হবে। সংশোধিত রূপে গ্রাহ্য। ৮৮ অধ্যায়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের আরম্ভ বর্ণিত, মধ্যে ২নং শ্লোক হতে চিত্রাঙ্গদার উল্লেখ বাদ হবে, এবং ২-৪ শ্লোকে চিত্রাঙ্গদা উলূপী দুজনকে বোঝাতে দ্বিবচন ব্যবহৃত হয়েছে, তার স্থানে একবচন বসাতে হবে। এই ভাবে শুদ্ধ করে অধ্যায় গ্রাহ্য। ৮৯ অধ্যায়ে যজ্ঞের বর্ণনা ও সমাপ্তি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য।

৯০ অধ্যায়ে কথিত স্বর্ণ নকুল উপাখ্যান বাদ হবে। তা অনৈসর্গিক এবং অবিশ্বাস্য। ৯১ অধ্যায়ে যজ্ঞে পশুবধের নিন্দা আছে, সংশোধকগণ বলেছেন যে সেটি বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষতঃ সম্রাট্ অশোকের স্থাপিত নিয়মের প্রভাব সূচিত করে; ৯২ অধ্যায়ে ক্রোধরূপী ধর্মের জমদগ্নি ঋষিকে পরীক্ষার কথা ও পিতৃগণের শাপে ধর্মের নকুলরূপ প্রাপ্তি ইত্যাদি কথা আছে। এই দুটি অধ্যায় ও বাদ হবে, তা মূল ভারত কাহিনীর অংশ নয়।

২০. আশ্রমবাসিক পর্ব

১ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের ধৃতরাষ্ট্রকে আরামে রাখবার বর্ণনা, তার মধ্যে ১৩ শ্লোক বাদ হবে, কারণ সৌপ্তিক পর্বের এক নায়ক কৃপকে আবার পাণ্ডবগণ রাজ-গৃহে স্থান দেবেন, তা মনে হয় না, ২৩[১] শ্লোকার্দ্ধ বাদ হবে, উলূপী পাণ্ডব প্রাসাদে থাকতেন না, চিত্রাঙ্গদাকে কাল্পনিক সাব্যস্ত করা হয়েছে। বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। ২-৪ অধ্যায়ে ভীমের দুর্ব্যবহারে জন্য অন্যদের যথাসাধ্য সম্মান দেওয়া সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রের সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা, ব্যাসের সমর্থনে যুধিষ্ঠিরের সম্মতি দান—গ্রাহ্য। সন্ন্যাসগ্রহণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে পঞ্চদশ বর্ষে। ৫।১ ৬ গ্রাহ্য, ৫।৭ শ্লোক হতে ৭ অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত বাদ হবে—ধৃতরাষ্ট্রের বিদায় নেবার পূর্বে যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেবার কারণ নাই. ১৪।১৫ বৎসর এক প্রাসাদেই তো কাটালেন। সেই সঙ্গে ৮।১-৩, যুধিষ্ঠিরের উত্তর, বাদ হবে। ৮।৪।৯ শ্লোক গ্রাহ্য। ৮।১০ শ্লোক হতে ৯ অধ্যায় শেষ পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্রের প্রজাগণকে সম্ভাষণ ও বিদায় বাণী, ১০ অধ্যায়ে প্রজাগণের মুখপাত্রের উত্তর; ভারতমঞ্জরীতে এই প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ নাই, এই প্রসঙ্গ তার পরের প্রক্ষেপ মনে হয়, তাই বাদ হবে। ১১-১৯ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রের ভীষ্ম, দ্রোণ, স্বপুত্রগণ ও জয়দ্রথের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ ও দানের জন্য অর্থযাচন, ভীমের অসম্মতি হেতু যুধিষ্ঠির ও অর্জুন কর্তৃক তাদের পৃথক অংশ হতে প্রয়োজনীয় অর্থ দান, ধৃতরাষ্ট্রের শ্রাদ্ধ ও দান বর্ণিত ; পরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সন্ন্যাসে দীক্ষাগ্রহণ ও শতযূপ রাজর্ষির আশ্রমে গমন, কুন্তীরও পুত্রদের সনির্বন্ধ অনুরোধ অগ্রাহ্য করে তাদের সঙ্গে বনে গমন বর্ণিত হয়েছে। বিদুর ও সঞ্জয় একই সময় বনে গিয়ে পৃথকভাবে তপস্যা করার কথাও আছে। মোটের উপর গ্রাহ্য, মধ্যে মধ্যে দুই একটি শ্লোক, যথা ১৭।১৪২, ১৮[২], বাদ হবে। ২০ অধ্যায়ে আছে নারদের আগমন ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির গতি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী অনৈসর্গিক হিসাবে বাদ হ'ব।

২১-২৪ অধ্যায়ে আছে যে যুধিষ্ঠিরাদি মাতার অদর্শন হেতু দুঃখিত ভাবে দিন কাটিয়ে অবশেষে বনে গিয়ে মাকে ও ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে দর্শন করে আসা স্থির করে ধৌম্য ও যুযুৎসুর উপর রাজ্যভার দিয়ে দর্শন করতে গেলেন; তাদের দুঃখের আতিশয্য বর্ণন বাদযোগ্য মনে হয়। বহু পৌর-জানপদ সঙ্গে নেবার কথাতেও সন্দেহ জাগে, তবু দুই একটি শ্লোক, যথা ২৩।৬ কৃপের উল্লেখ হেতু

বাদ দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। ২৫ অধ্যায়ে পাণ্ডব ও পাণ্ডবস্ত্রীগণের বর্ণনার মধ্যে ৫-৮ শ্লোক বিরাটপর্বে ৭১।১৩-১৭ শ্লোকের পুনরাবৃত্তি, ৫-৮ শ্লোকও বাদ হবে ; ২৫। -৪ গ্রাহ্য, ৪নং শ্লোকে যে আছে সূত সবার পরিচয় দিলেন, তাই যথেষ্ট। ২৬ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের আলাপ গ্রাহ্য, পরে বর্ণিত বিদুরের আত্মার যুধিষ্ঠিরের দেহে আশ্রয় গ্রহণ গ্রাহ্য নয়, তাই ২৬, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩ শ্লোক বাদ হবে, বাকী গ্রাহ্য। ২৭ অধ্যায়ে পাণ্ডবগণের আশ্রম বাসের বর্ণনা, ও ব্যাসের আগমন কথা, গ্রাহ্য।

২৮ অধ্যায় পুত্রদর্শন পর্বের সূচনা—ব্যাস এসে বললেন, আমার তপোবনে তোমাদের অদ্ভুত দৃশ্য দেখাব। ২৯-৩৩ অধ্যায়ে পুত্র দর্শন পর্ব ; ব্যাস সকলকে নিয়ে ভাগীরথীর তীরে গেলেন, সেখানে সন্ধ্যা হয়ে গেলে আহ্নিক করে ব্যাস ভাগীরথী জলে অবগাহন করে যুদ্ধে মৃত পাণ্ডব-কৌরববীরদের আবাহন করলেন, তার ফলে পাণ্ডব কৌরববীরগণ সশরীরে যুদ্ধের পূর্বে যেমন ছিলেন তেমন ভাবে ভাগীরথীর জল থেকে উঠে এলেন, সমস্ত রাত্রি পিতা, মাতা, বন্ধু, স্ত্রীগণসহ সুখে কাটিয়ে ভোর হতেই তাঁরা ভাগীরথী জলে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেলেন ; ব্যাস বললেন কুরুস্ত্রীদের মধ্যে যারা পতির সান্নিধ্য চায়, তারা ভাগীরথীতে অবগাহন করে প্রাণ ত্যাগ করলেই পতিলোকে যাবে ; তখন যুধিষ্ঠির সহ যে কৌরবস্ত্রীগণ আশ্রমে এসেছিল, সকলেই নদীতে ডুব দিল। এই কাহিনী অনৈসর্গিক, এবং ৩৩ অধ্যায় শেষে পাঠ ও শ্রুতিফল থাকায় পরের কালের যোজনা অনুমান করা যায়, সে কথা সংশোধকও বলেছেন। ভারতমঞ্জরীতে শুধু আছে যে ব্যাস স্বর্গনদীজলে (অর্থাৎ ছায়াপথে) মৃত বীরগণ সঞ্চরণ করছে তাই কুরুস্ত্রীদের দেখালেন। অতএব বর্তমান আকারে পুত্র দর্শন কথা খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে ; ২৮-৩৩ ও সেই সঙ্গে ৩৪ অধ্যায়, সশরীরে মৃতের দর্শন দেওয়া সম্ভব কিনা তার বিচার, ও ৩৫ অধ্যায় জনমেজয়ের পিতা পরিক্ষিৎকে দর্শন কথা, বাদ হবে। ভারতমঞ্জরীতে যেমন আছে, সেই সেই ভাবে ছায়াপথে মৃত বীরদের বিচরণ করতে দেখা গেল, সেই ভাবে কয়েকটি শ্লোক যোগ করে নিতে হবে।

৩৬ অধ্যায়ে ব্যাসের কথায় ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবগণকে স্বরাজধানীতে ফিরবার উপদেশ দান ও পাণ্ডবগণের প্রত্যাবর্তন বর্ণিত। তার মধ্যে ১-৪, ১৯, ২০ শ্লোক বাদ হবে, বাকী গ্রাহ্য।

৩৭-৩৯ অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে যুধিষ্ঠিরের শোক

ও তাঁদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন বর্ণিত হয়েছে; তা মোটের উপর গ্রাহ্য, কিন্তু নারদ এসে সংবাদ ও সান্ত্বনা দিলেন, তা বাদ দিয়ে একজন ঋষি এসে সংবাদ দিলেন ও সান্ত্বনা বাণী বলে গেলেন, এইভাবে পরিবর্তন করে নিতে হবে।

২১. মৌসল পর্ব

কৃষ্ণ পাঞ্চরাত্র বা নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্ম নামক একটি নূতন ধর্ম প্রচার করে-ছিলেন, এবং সেই ধর্ম বলরাম বা সংকর্ষণের নিকট হতে আয়ত্ত করে শাণ্ডিল্য তা বিবৃত করে একখানা সংহিতা প্রণয়ন করেছিলেন, তার প্রমাণ আমরা পাই ব্রহ্মসূত্রের ২/২/৪২-৪৫ সূত্রে এবং তার শঙ্করভাষ্যে; এবং মহাভারতের শান্তিপর্বের নারায়ণীয় অংশে, ৩৩৪-৩৫১ অধ্যায়ে; ভীষ্মপর্বের বিশ্ব উপাখ্যানেও (৬৪-৬৮ অধ্যায়ে) তার কিছু কথা আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩ অধ্যায় ১৪ খণ্ড (শাণ্ডিল্য বিদ্যা) এবং ৩ অধ্যায় ১৭ খণ্ড (পুরুষ যজ্ঞ, ঘোর ঋষির কৃষ্ণকে উপদেশ) কৃষ্ণের প্রচারিত ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। পুরুষ যজ্ঞ খণ্ড হতে অনুমান করা যায় যে মানুষের জীবনকে যজ্ঞ রূপে মনে করে সত্য, ঋজুতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে জীবনের কর্তব্য সম্পাদন করলেই পরম শ্রেয়োলাভ হয়, বৈদিক দ্রব্যযজ্ঞের কোন প্রয়োজন নাই, ভগবানকে ভক্তিভরে আরাধনা করতে হবে, এই শিক্ষা কৃষ্ণের প্রচারিত ধর্মের অঙ্গ ছিল। খৃঃপূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে পাণিনি কৃষ্ণের ধর্মকে বেদ বিরোধী বলে বর্ণনা করেছেন। বৈদিক দ্রব্যযজ্ঞ করণীয় নয়, এই শিক্ষা দেওয়াতে সমসাময়িক ব্রাহ্মণগণ, এবং পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণ বিরোধী ছিলেন। অবশেষে ক্রমবর্দ্ধমান কৃষ্ণউপাসক ভাগবত সম্প্রদায়কে স্বীকার করে ভাগবদ্ গীতা প্রণীত করে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সমসাময়িক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের মুখপাত্র হিসাবে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃষ্ণের নব-ধর্মের প্রচার বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন, করতে না পেরে যাদবদের বিভিন্ন গোষ্টির মধ্যে বিরোধের সুযোগ নিয়ে এবং যাদবদের মদ্যপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে প্রভাসে যাদবগণের এক বার্ষিক উৎসবে তিনি তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিয়ে তাদের প্রায় নির্মূল করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে প্রভাসে যাদবদের আত্মহননের পরিকল্পনা করেন, তার আভাস পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ১।৬।৩ প্রকরণে, এই খ্রী পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর পুস্তকে আছে যে অতিমাত্রায় হর্ষের বশীভূত হয়ে দ্বৈপায়ন ঋষিকে আক্রমণ করে বৃষ্ণিসঙ্ঘ বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এখানে হর্ষ অর্থে

মদ্যপান জনিত উত্তেজনা। বৌদ্ধ জাতক কাহিনী মতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুসলাঘাতে যাদবকুল ধ্বংসের অভিশাপ দিয়েছিলেন। মহাভারত কাহিনী মতে কণ্ব, বিশ্বামিত্র ও নারদ অভিশাপ দিয়েছিলেন, কিন্তু কণ্ব ও বিশ্বামিত্র কৃষ্ণ অর্জুনের তিন চার শত বর্ষের পূর্বকার ঋষি, এবং নারদ দেবলোকের গায়ক, তাঁরা এসে অভিশাপ দেবেন তা রূপকথা হিসাবে বর্জনীয়। যাদবকুল ধ্বংসের ব্যাপারে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ভূমিকা গোপন করতে মুসলপর্বকে সম্পূর্ণ অবাস্তব রূপ দেওয়া হয়েছে। তাই মুসল পর্ব থেকে মূলভারত কাহিনী উদ্ধার করা সম্ভব নয়। পর্বটির পুনর্লিখন প্রয়োজন। যা হোক, কিছু অংশ এইভাবে রাখা যায়:—

১ অধ্যায়ে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে তা বাদ হবে। ২৮২-৩১-গৃহে গৃহে মদ্য প্রস্তুতি নিষেধ গ্রাহ্য. তার পূর্বে শ্লোক বসবে যে যাদবগণের পানমত্ততা বেড়ে গিয়েছিল।

২ অধ্যায়ে গ্রাহ্য ১০, ১১, তার পরে ২৩২-২৪; ২৩১ শ্লোকার্দ্ধের পূর্বে শ্লোক বসবে যে প্রতি বৎসরই যাদবদের প্রভাসে তীর্থযাত্রা এবং উৎসব হত।

৩ অধ্যায়ে ৭-৪৭ গ্রাহ্য, যদিও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে বিবাদ হ'ল, যজ্ঞ করা না করা নিয়ে বিবাদ হল, তাতে সন্দেহ আছে। হয়তো যজ্ঞ করা না করা নিয়ে বিবাদ আরম্ভ হতে পুরানো কথাও উঠে গেল; যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণদের অন্ন না দিয়ে বানরদের দেওয়া হল তার উল্লেখ ১৪ শ্লোকে আছে। ৪/১৪২-১৭১, ১৯, ২৫-২৮ বাদ হবে অনৈসর্গিকতা হেতু, বাকী শ্লোক গ্রাহ্য। এখানে কৃষ্ণের প্রয়াণ বর্ণিত হয়েছে।

৫ অধ্যায়ে অর্জুনের দ্বারকায় আগমন বর্ণিত, ৬ শ্লোক বাদ, কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর উল্লেখ হেতু। ৬ অধ্যায়, বসুদেব সহ অর্জুনের কথোপকন, গ্রাহ্য ১৩২-১৭ অনৈসর্গিক, বাদ হবে, বাকী গ্রাহ্য। ৭ অধ্যায়ে ইন্দ্রপ্রস্থ অভিমুখে অর্জুনের হতাবশিষ্ট যাদব বৃদ্ধ শিশু ও স্ত্রীগণ সহ যাত্রা ও পথে দস্যুগণ কর্তৃক বহু নারী-হরণ, অর্জুন কর্তৃক মার্তিকাবতে কৃতবর্মার পুত্র ও স্ত্রীগণকে, ইন্দ্রপ্রস্থে কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র ও বৃষ্ণি ভোজ বংশীয় স্ত্রীগণকে ও সরস্বতী নদীকূলে এক জনপদে সাত্যকি পুত্র ও সম্পর্কিত স্ত্রীগণকে স্থাপন বর্ণিত। ৩৮ শ্লোক বাদ হবে, ষোড়শ সহস্র কৃষ্ণের স্ত্রীর উল্লেখ হেতু, ৭৬ শ্লোক বাদ হবে ব্যাসের উল্লেখ হেতু, বাকী সব শ্লোক গ্রাহ্য।

৮ অধ্যায়ে অর্জুনের ব্যাসের সঙ্গে কথা বর্ণিত আছে, পরে যুধিষ্ঠিরের

নিকট নিবেদন আছে। ব্যাস সহ কথা বাদ হবে, অতএব গ্রাহ্য ৩৮ শ্লোক, তারপর অর্জুন উবাচ বলে ৭[২], ১৯[১] ২৩[২] গ্রাহ্য, বাকী সব শ্লোক বাদ হবে।

২২. মহাপ্রস্থানিক পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব

১ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভার পরিক্ষিতের উপর দিয়ে ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সহ রাজধানী ত্যাগ ও ভারত পরিক্রমা আরম্ভ বিবৃত, গ্রাহ্য, কিন্তু ১২, ১৪-১৫[১] ২৭[২]-২৮[১] ৩৪-৪৩[১] অনৈসর্গিকতা হেতু বা অন্য কারণে বাদ হবে।

২ অধ্যায়ে বর্ণিত ভারত পরিক্রমা শেষ করে হিমালয়ে আরোহণ, দ্রৌপদী এবং সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীমের ক্রমে ক্রমে প্রাণহীন হয়ে পতন গ্রাহ্য।

৩ অধ্যায়ে আছে যে ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরের জন্য দিব্য রথ নিয়ে এলেন, কুকুরকে নেওয়া হবে কিনা সেই তর্কের পরে কুকুর ধর্মদেব হয়ে গেলেন, যুধিষ্ঠির স্বর্গ-নদীতে স্নান করে দিব্য দেহ প্রাপ্ত হলেন। অনৈসর্গিকতা হেতু বাদ হবে, প্রকৃত কথা মনে হয় যে দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণের মৃত্যুর পরে যুধিষ্ঠির পর্বতশিখরে উঠে যোগ অবলম্বন করে দেহত্যাগ করলেন, তাঁর আত্মাকে নিয়ে যেতে চর্ম-চক্ষুর অদৃশ্য রথ আস্‌লো ও তাঁকে উর্দ্ধলোকে নিয়ে গেল।

স্বর্গারোহণ পর্বে সবই মৃত্যুর পরের কথা, এবং তার মধ্যে অংশাবতরণ কাহিনীর জের টানা হয়েছে। এই পর্ব সম্পূর্ণ বাদ হবে।

২৩. উপসংহার

মূল ভারত কাহিনীর উপাখ্যানবর্জিত ও প্রক্ষিপ্ত বর্জিত রূপ কি ছিল, কি হতে পারে, তাই আমাদের নির্ণয় প্রয়াস। যে ভাবে নির্ণয় করা হল, তাতে গ্রাহ্য শ্লোকসংখ্যা অনুমান ২৪০০০ হবে। আদিপর্বে বলা হয়েছে যে উপাখ্যান-বর্জিত ভারত কাহিনী ২৪০০০ শ্লোকে বিবৃত হয়েছিল, পরে উপাখ্যান ও খিল পর্ব হরিবংশ যোগ করে লক্ষ শ্লোকময় মহাভারতে পরিণত হয়। অনৈসর্গিক-কথাও মূল ভারত কাহিনীতে ছিল না এই আমার বিশ্বাস, আদিপর্বের ৬১ অধ্যায়ে বিবৃত ভারতসূত্রে কোন অনৈসর্গিক কথা নাই। অনৈসর্গিক কথা, প্রক্ষিপ্ত ও উপাখ্যান বাদ দিয়ে কি কাহিনী পাওয়া গেল তা যদিও প্রথম তিন খণ্ডের পাঠকের কাছে অজানা নয়, তবু সেই মূল ভারত কাহিনীর সারমর্ম পরের খণ্ডে বিবৃত হল।

চতুর্থ খণ্ড

মহাভারতের মূল কাহিনী

১. আদিপর্ব—পুরু, ভরত ও কুরু-পাঞ্চাল বংশ

মহাভারত কাহিনীর নায়ক যুধিষ্ঠির এবং প্রতিনায়ক দুর্যোধন উভয়েই কুরু-বংশীয় নৃপতি। কুরুবংশ চন্দ্রবংশের একটি শাখা, চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ চন্দ্রের পুত্র বুধ। মনে হয় যে শ্যামাভ শ্বেত আর্যগণ চন্দ্রের উপাসক ছিলেন, তাদের মধ্যে কোন বীর্যবান রাজা চন্দ্র নামধারী ছিলেন। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে পৃথিবীতে চতুর্থ বা শেষ তুষার যুগের আরম্ভ হয় অনুমান পঞ্চাশ সহস্র বৎসর পূর্বে; তখন উত্তর মেরুর চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত তুষারের গভীর স্তর বিস্তৃত হয়ে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশ আচ্ছাদিত করে, এবং সমুদ্রের জল কমে গিয়ে ভূমধ্য সাগর, লোহিত সাগর ইত্যাদি প্রায় জলশূন্য হয়ে যায়। অনুমান দ্বাদশ সহস্র বৎসর পূর্বে সেই তুষার যুগ শেষ হয়, তুষার স্তরের বহুলাংশ গলে সমুদ্রের জল বৃদ্ধি করে, ভূমধ্য সাগর, লোহিত সাগর প্রভৃতি পুনরায় ক্রমে জলপূর্ণ হয়, এবং বহু নিম্নভূমিস্থ মানুষের বাসস্থান প্লাবিত করে। এই মহা প্লাবনের কথা বহু দেশের পুরাণে বা জনশ্রুতিতে বিদ্যমান আছে। তুষার আবরণ মুক্ত হয়ে পৃথিবীর বহু ভূভাগ বাসযোগ্য হয়, এবং প্লাবনের জলও ক্রমে ক'মে নিম্নভূমিকে পুনঃ বাসযোগ্য করে। এই সময়ে আর্যজাতির দুটি প্রধান গোষ্ঠীর কথা জানা যায়, উত্তর দেশে যারা অল্প তুষারাবৃত ভূমিতে শীতের মধ্যে প্রধানতঃ পশুশিকার করে প্রাণ ধারণ করত, তারা গৌরবর্ণ বা ধবলশ্বেত আর্য—নর্ডিক (Nordic); এবং তুষার আচ্ছাদনের দক্ষিণে যারা কৃষি, পশুপালন, ইত্যাদি করে জীবনধারণ করত, তারা শ্যামাভ শ্বেত আর্য (dark white)। গৌরবর্ণ আর্যগণ প্রাণ ধারণের জন্য সূর্যের তাপের আবশ্যকতা ভাল করে বুঝত, তারা ছিল প্রধানতঃ সূর্য উপাসক—তাদের থেকেই সূর্যবংশীয় আর্য হ'ল। শ্যামাভ শ্বেত জাতি চন্দ্রের সৌন্দর্য দেখে আনন্দ পেত, চন্দ্রমানে মাস ও বৎসরের পরিমাপ করতে শিখল—তারা চন্দ্রের উপাসন, তাদের থেকেই চন্দ্রবংশ।

সূর্যের তাপে তুষার আচ্ছাদন দূর হয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমি বাসযোগ্য হ'ল, তাই সূর্য উপাসক আর্যগণ নূতন যুগকে বৈবস্বত যুগ বা মন্বন্তর নাম দিল—বিবস্বান্

বা সূর্য হিমের উপর জয়ী হওয়ায় বৈবস্বত নাম হ'ল। এবং গৌরবর্ণ আর্যগোষ্ঠীর প্রথম নায়ক বা প্রধান বৈবস্বত মনু নামে পরিচিত হলেন। বৈবস্বত মনুর পুত্রগণ— ইক্ষাকু, নাভাগ, নরিষ্যন্ত প্রভৃতি পৃথিবীর নানা দেশে ভিন্ন ভিন্ন সূর্যবংশীয় কুলের সৃষ্টি করে। মনুর কন্যা ইলাকে চন্দ্রপুত্র বুধ বিবাহ করে, তাদের পুত্র পুরুরবা। পুরুরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ, তার পুত্র যযাতি। পুরুরবা, আয়ু নহুষ ও যযাতির কথা ঋগ্‌বেদে আছে, কিন্তু তাদের জন্ম ও নিবাস স্থান ককেশাসের পার্বত্য অঞ্চলে বা কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরে ছিল অনুমান করা সঙ্গত, তারা ভারতবর্ষে আসে নাই।

যযাতি অসুরকুলের পুরোহিত শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে এবং অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন। দেবযানীর পুত্র যদু ও তুর্বসু; শর্মিষ্ঠার পুত্র দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু। সূর্যবংশীয় আর্যগণের এক বা একাধিক শাখা স্থল পথে ইলাবৃতবর্ষ, অর্থাৎ কাস্পিয়ান সাগর থেকে পামীর মালভূমি পর্যন্ত পারস্যের উত্তরস্থ দেশ দিয়ে কারাকোরম ও হিমালয় পর্বতমালা ভেদ করে ভারতবর্ষে এসে কয়েকটি রাজ্য স্থাপন করে। তার মধ্যে অযোধ্যা উল্লেখযোগ্য। যযাতি কোন কারণে তার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর উপর প্রীত হয়ে তাকে নিজ রাজ্য দিয়ে যান। ফলে পুরুর সমৃদ্ধি ও পুরুবংশের বহু বিস্তার হয়। সূর্যবংশীয় আর্য গোষ্ঠীর ভারতবর্ষে আগমনের পরে পুরুবংশের এক গোষ্ঠী স্থলপথে ভারতবর্ষে আসে, কুরুপাঞ্চাল ও অন্যান্য রাজ্য তাদের উত্তর-পুরুষেরা স্থাপন করে।

দুষ্মন্ত নামক এক পুরুবংশীয় বীর ভারতবর্ষের এক জনপদে রাজ্যস্থাপন করেন, সম্ভবতঃ এই দুষ্মন্ত ভারতবর্ষে প্রথম পৌরব বা পুরুবংশীয় রাজা, তিনি পরাক্রমশালী এবং সুশাসক রাজা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একদিন তিনি সঙ্গে অমাত্য, পুরোহিত ও সেনাদল নিয়ে অরণ্যে মৃগয়ায় যান ও বহু মৃগ শিকার করেন। তারপরে একটি বৃক্ষশূন্য প্রান্তর পার হয়ে মালিনী নদীর তীরস্থ কণ্বমুনির আশ্রমের নিকটে উপস্থিত হ'ন। সেই প্রান্তরে সেনাদলকে অপেক্ষা করতে বলে তিনি অমাত্য ও পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে কণ্বমুনিকে দর্শন করবার ইচ্ছায় আশ্রমসীমার মধ্যে প্রবেশ করেন। তখন কণ্বমুনি ফলমূল আহরণার্থ গিয়েছিলেন, রাজার আহ্বানে একটি সুন্দরী তরুণী বাইরে এসে রাজাকে অভ্যর্থনা করে তাঁকে মুনির আগমন প্রতীক্ষা করতে বলে। রাজার প্রশ্নের উত্তরে তরুণীটি জানায় যে মালিনী নদীর তীরে শিশু অবস্থায় পক্ষীগণ বা শকুন্তগণ রক্ষিত অবস্থায় তাকে পেয়ে

কণ্বমুনি তাকে কন্যার মত পালন করেছেন ও শকুন্তলা নাম দিয়েছেন। রাজা তার সঙ্গে আশ্রম কুটীরে প্রবেশ করে তাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করে স্ত্রী হতে আমন্ত্রণ করেন; শকুন্তলা কিছু দ্বিধা করে সম্মত হয়, তবে শর্ত করে নেয় যে তার গর্ভে জাত পুত্রকে দুষ্মন্তের রাজ্যে যুবরাজ করতে হবে। নির্জন আশ্রম কুটীরে শকুন্তলার সঙ্গে মিলন করে রাজা কণ্বমুনির প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা না করেই আশ্রম থেকে নির্গত হয়ে সৈন্যদল, অমাত্য ইত্যাদি নিয়ে নিজ রাজ্যে চলে যান।

কণ্বমুনি ফলমূল সংগ্রহ করে আশ্রমে ফিরলে শকুন্তলা প্রতিদিনের মত তাঁকে পাদ্য, আসন নিয়ে অভ্যর্থনা করতে এল না। মুনি দুষ্মন্তের আগমন সংবাদ পেয়ে ব্যাপার বুঝে শকুন্তলাকে ডেকে বললেন, তোমাকে আমি সম্প্রদান করব, তার জন্য প্রতীক্ষা না করে তুমি নিজেই আত্মদান করেছ, তাতে তোমার লজ্জা করতে হবে না; তুমি ক্ষত্রিয় কন্যা, বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে তোমার জন্ম, ক্ষত্রিয় রাজার সঙ্গে গান্ধর্ব মতে মিলিত হয়েছ, তাতে অধর্ম হয় নাই। শকুন্তলা তখন মুনির আহৃত ফল উঠিয়ে রেখে তাঁর পা ধুইয়ে দিয়ে আসন পেতে দিয়ে বলল, পৌরব-বংশের রাজা দুষ্মন্ত আপনাকে দর্শন করতে এসেছিল, আমি তাকে পতিত্বে বরণ করেছি, আপনি তার ও আমার প্রতি প্রসন্ন হোন্। কণ্বমুনি শকুন্তলাকে আশীর্বাদ করে বললেন, তোমার গর্ভে জাত পুত্র রাজচক্রবর্ত্তী হবে।

যথাকালে শকুন্তলা একটি সুস্থ সবল পুত্র প্রসব করল। পুত্রের ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত শকুন্তলা পুত্র সহ কণ্বমুনির আশ্রমে মুনির স্নেহধন্য হয়ে রইল। পুত্রটি বলবান্ ও নির্ভীক হল, সব রকম বন্য পশুকে ভয় না করে নিজের আয়ত্তে এনে বৃক্ষের সঙ্গে বেঁধে রাখত। তার ছয় বৎসর পূর্ণ হলে কণ্বমুনি বললেন, শকুন্তলা, এবার তোমার পতিগৃহে যাবার সময় হয়েছে; বিবাহিত কন্যা বহুকাল পিতৃগৃহে থাকবে, তা বাঞ্ছনীয় নয়; তোমার পুত্রেরও অস্ত্রবিদ্যা ও রাজধর্ম আয়ত্ত করতে হবে। কণ্ব মুনির আদেশে তাঁর কয়েকজন শিষ্য শকুন্তলা ও তার পুত্রকে দুষ্মন্ত রাজার রাজসভায় নিয়ে তাদের পরিচয় দিয়ে ফিরে চলে গেল। কিন্তু দুষ্মন্ত প্রথমে শকুন্তলা ও তার পুত্রকে নিজের স্ত্রী ও পুত্র বলে স্বীকার করলেন না; বললেন, দুষ্ট তাপসি, তুমি আমার গান্ধর্বমতে বিবাহিতা স্ত্রী ও এটি আমার পুত্র তা আমি মেনে নিতে পারি না; তোমার যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। শকুন্তলার মুখ ক্রোধে ও দুঃখে রক্তবর্ণ হয়ে গেল; তিনি নিজেকে বহু চেষ্টায় সংবরণ করে বললেন, তোমার হৃদয় জানে যে আমি সত্য বলছি;

তুমি যদি আমাকে ও তোমার পুত্রকে অস্বীকার কর, তার কি কোন সাক্ষী থাকবে না, তোমার অন্তর্যামী সেই পাপের জন্য তোমাকে দণ্ড করবেন না? স্ত্রী পতির ধর্ম অর্থ-কাম সিদ্ধির সহায়ক, আমি কি তোমার যোগ্য নই? আমাকে যদি গ্রহণ নাও কর, তবে তোমার পুত্রকে আশ্রয় দাও। দুষ্মন্ত আবার বললেন দুষ্ট নারীগণ মিথ্যাভাষিনী হয়, এই পুত্র যে আমা হতে জাত তা আমি কেমন করে জানব? শকুন্তলা দৃপ্তভাবে দুষ্মন্তের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি হৃদয়ের সত্য অস্বীকার করছ, ভুলে যাচ্ছ যে সত্য সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের থেকে বেশী ফলপ্রদ। এই পুত্রকে যদি তুমি নাও স্বীকার কর, এ কালে তোমার রাজ্য শুধু নয় আরো অনেক দেশ জয় করে রাজচক্রবর্তী হবে।

তখন রাজার সঙ্গে যে পুরোহিত কণ্ব মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, রাজন্ সত্য ও ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ো না; এই পুত্রকে গ্রহণ করে তার ভরণ পোষণ কর ও তার মায়ের অপমান কোর না। সাত বৎসর পূর্বে তুমি কণ্ব মুনির আশ্রমে তাঁর এই পালিতা কন্যার সঙ্গে নির্জন কুটিরে ছিলেন, আর এই বালকের মুখ যেন তোমার মুখের প্রতিচ্ছবি।[১] রাজা তখন বালকটিকে পুত্র বলে স্বীকার করে কোলে নিয়ে আদর করলেন, শকুন্তলাকে মহার্ঘ্য বস্ত্র দিয়ে সম্মানিত করলেন, বললেন যে তোমাকে লোকে যাতে দুষ্টনারী মনে না করে তাই লোকসমক্ষে তোমাকে পরীক্ষা করে নিলাম।

পুরোহিতের কথা—ভরণ কর (ভরত)—থেকে দুষ্মন্ত শকুন্তলার পুত্রের নাম ভরত হল। যথাকালে সে নানা অভিযানে নিজের বীর্য প্রমাণ করে রাজচক্রবর্ত্তী হয়েছিল। তার নাম থেকেই দেশের নাম হল ভারতবর্ষ।[২]

ভরতের প্রপৌত্র হস্তী, তিনি হস্তিনাপুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন। হস্তীর পুত্র বা পৌত্র অজমীঢ, অজমীঢের পুত্রদের মধ্যে ঋক্ষ হতে কুরুবংশের উৎপত্তি-

---

১। মূলে দৈববানীর কথা আছে, তা অনৈসর্গিক।

২। ভাগবত পুরাণ মতে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতের প্রপৌত্র ঋষভদেবের পুত্র ভরত রাজার নাম হতে দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়। কিন্তু বৈবস্বত মনুর পূর্বের ছয়জন মনুর কথা পুরাণকারদের কল্পনা মনে হয়। হরিবংশ ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে যে বৈবস্বত মন্বন্তরের রাজা পৃথুর কালে রাজপদ দৃষ্টি কৃষি গোপালন প্রভৃতির আরম্ভ হয় অর্থাৎ সভ্যতার আরম্ভ হয়।

হয়—ঋক্ষের পুত্র সংবরণ, সংবরণের পুত্র কুরু। কুরু থেকে শান্তনু সপ্তম পুরুষ। অজমীঢের আর এক পুত্র নীল বা নীলী হতে পাঞ্চাল বংশের উৎপত্তি হয়।

২. আদিপর্ব—কথারম্ভ, উপরিচর বসু ও সত্যবতী

উপরিচর বসু ছিলেন পুরুবংশের এক শাখার রাজপুত্র। তিনি প্রথম যৌবনে আশ্রমে থেকে তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু একদিন মনের মধ্যে আদেশ পেলেন যে আশ্রমে মুনির মতন জীবন যাপন না করে নূতন দেশে আর্যনিবাস স্থাপন করে রাজত্ব করলে তাঁর জীবনের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করা হবে। তিনি কুরুপাঞ্চাল দেশের দক্ষিণে পর্বত ও নদীবহুল প্রদেশে গিয়ে একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করেন, তার নাম হল চেদি রাজ্য। তার রাজধানী ত্রৈপুরী, বর্তমান কালে তেভুর নামে পরিচিত, জব্বলপুর হতে কয়েক-মাইলে পশ্চিমে অবস্থিত। উপরিচর বসু অশ্বপৃষ্ঠে পর্বতের সানুদেশে মাল-ভূমিতে বিচরণ করতে ভালোবাসতেন, সেই জন্যই তাঁর উপরিচর নাম হয়। পূর্তকর্মেও তাঁর উৎসাহ ছিল। তাঁর রাজ্য মধ্যে কোলাহল পর্বত হতে মাটি ও পাথরের ধ্বস্ নেমে শুক্তিমতী নদীর স্রোত অবরুদ্ধ করে ফেলে, রাজা নূতন বসতিকারী ও স্থানীয় লোক নিয়ে নদীর স্রোত বাধামুক্ত করবার কাজে ব্রতী হন। এই কার্যে একজন পুরুষ তাঁকে দক্ষভাবে সাহায্য করেন, তাকে পরে রাজা তাঁর সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন, একটি সুশ্রী নারীও স্রোত বাধা মুক্ত করবার পরিকল্পনা কালে কার্যকর উপায় নির্ণয়ে সহায়তা করেন, উপরিচর প্রীত হয়ে সেই নারীকে বিবাহ করেন, তার নাম গিরিকা। রাজার পঞ্চপুত্রের মধ্যে একজন ছিল বৃহদ্রথ, সে পিতার রাজ্য ছেড়ে গিয়ে মগধের একাংশে নূতন রাজ্য স্থাপন করে, তার রাজধানী হয় গিরিব্রজ। উপরিচর বসুর শিকারেও কৃতিত্ব ছিল। একদা পিতৃগণের শ্রাদ্ধে মৃগমাংস নিবেদন করবার ইচ্ছায় তিনি মৃগয়ায় বাহির হন, মৃগের অনুসরণ করতে করতে বহু দূরে যমুনা কূলস্থ এক বনে উপস্থিত হন। সেখানে নিকটে যমুনা নদী পার হবার খেয়াঘাট ছিল, খেয়াঘাটের অধিকারী ছিলেন এক দাসরাজা, তিনি যমুনায় মৎস্য-জীবীদেরও প্রধান বা রাজা ছিলেন, তাঁর কুলের পুরুষ নারী নানা কাজে যমুনার কূলে ও নিকটস্থ বনে যাতায়াত করত। উপরিচর রাজার সেখানে রাত্রিবাস আবশ্যক হওয়ায় যমুনা কূল হতে একটি দাসকুলের নারীকে আমন্ত্রণ

করে তার সঙ্গে রাত্রিযাপন করেন, তার নাম অদ্রিকা। কালে অদ্রিকা যমজ পুত্রকন্যা প্রসব করে মারা যায়। উপরিচর বসু পুত্রটিকে নিয়ে গিয়ে পালন করেন, তার নাম দেন মৎস্য, সেই পুত্র চেদি রাজ্যের পশ্চিমে নূতন ভূখণ্ডে মৎস্য রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। কন্যাটিকে দাসরাজা নিয়ে পালন করেন, তার নাম হয় সত্যবতী, সে খুব সুন্দরী হয়ে ওঠে। মৎস্যজীবীদের সঙ্গে কাজ করায় গায়ে তার প্রায়ই মৎস্যের গন্ধ থাকত, তাই সে মৎস্যগন্ধা নামেও পরিচিত ছিল। মধ্যে মধ্যে সেই কন্যা খেয়া নৌকা বেয়ে লোক পারাপার করে দিত।

একদিন পরাশর ঋষি তীর্থযাত্রার পথে যমুনার খেয়া পার হবার সময় সত্যবতী বা মৎস্যগন্ধাকে দেখে মুগ্ধ হন ও তার সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনা করেন। সত্যবতী বলে, নৌকায় আর লোক নাই বটে, তবে পারে লোকজন আছে তারা সব দেখতে পাবে। তখন দৈবযোগে কুয়াসায় দুই পার আচ্ছন্ন হয়ে যায় পারের লোকজনদের দেখা যায় না। সত্যবতী তবু আপত্তি জানায়, বলে আমি কুমারী কন্যা পিতার শাসনে আছি, কন্যাত্ব নষ্ট হলে আমি কেমন করে গৃহে ফিরে যাব। পরাশর বলেন তুমি কন্যাত্ব ফিরে পাবে, অর্থাৎ সন্তান জন্ম দিয়ে তার ভার আমাকে দিয়ে তুমি পিতৃগৃহে ফিরতে পারবে, তাছাড়া যে বর চাও তা তোমাকে দেব। সত্যবতী চাইল যে তার দেহ থেকে মৎস্যের গন্ধ দূর হয়ে সুগন্ধ হোক, পরাশর সেই বর দিলেন। অর্থাৎ তাকে খড়িমাটি, যবচূর্ণ ইত্যাদি দিয়ে গাত্র মার্জনা করে সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে প্রসাধন করতে শেখালেন। তাদের সঙ্গমের ফলে সত্যবতীর গর্ভসঞ্চার হল, যথাকালে পরাশরের উপদেশ মত নির্জন এক দ্বীপে পুত্র প্রসব করে সূতিকাস্নানের পরে পুত্রটির ভার পরাশরের উপর দিয়ে সত্যবতী পিতৃগৃহে ফিরে গেল ও আগের মত খেয়া পারাপার ইত্যাদি করতে লাগল।

৩. আদিপর্ব—শান্তনু, ভীষ্ম ও সত্যবতী

গঙ্গা নদীর এক দক্ষিণমুখী প্রবাহিনীর কূলে হস্তিনাপুর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পুরুবংশীয় হস্তী নামক রাজা সেই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি কুরুর পূর্ব-বর্তী। সেই নগরকে কেন্দ্র করে সমৃদ্ধ কুরুরাজ্য গড়ে ওঠে। পাঞ্চালগণও হস্তীর বংশধর, পুরুবংশ কুরু ও পাঞ্চাল এই দুই বংশে ভাগ হয়, পাঞ্চালগণ কুরু রাজ্যের পূর্বদিকে রাজ্যস্থাপন করে। পুরুবংশের থেকে আরো শাখা উদ্ভূত

হয়ে উত্তর ভারতে ও মধ্যভারতে আরো কয়েকটি রাজ্য স্থাপন করে। কুরু বংশে এক রাজা ছিলেন প্রতীপ, তার পুত্র শান্তনু প্রতাপশালী রাজা ছিলেন, তিনি কুরুরাজ্য বিস্তার করেন এবং চক্রবর্তী বা রাজরাজ বলে স্বীকৃত হন। শান্তনু রাজা মৃগয়া করতে প্রায়ই বাহির হতেন। একদিন গঙ্গাতীরে একটি পরম সুন্দরী যুবতীকে দেখে তাকে স্ত্রীরূপে বরণ করেন। এই স্ত্রীর নামও ছিল গঙ্গা। সেই স্ত্রী ভীষ্ম বা দেবব্রতকে জন্ম দিয়ে শান্তনু রাজাকে ছেড়ে চলে যায়, সম্ভবতঃ সে ককেশাস্ থেকে উপনিবেশ স্থাপনার্থ আগত এক গোষ্ঠিভুক্ত নারী ছিল, কুরুরাজ্যে সেই গোষ্ঠীর অবস্থানকালে সে শান্তনুকে বিবাহ করে, কিন্তু একটি পুত্রের জন্ম হলে তার পিতৃগোষ্ঠী কুরুরাজ্য ছেড়ে অন্যত্র বসতি সন্ধানে গেলে তাদের সঙ্গে চলে যায়। শান্তনু ধাত্রী ও পরিচারিকার সাহায্যে পুত্রটিকে পালন করেন ও তার শস্ত্র-শাস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, কালক্রমে সে অস্ত্রবিদ্যায় অপরাজেয় হয়ে ওঠে। তার নাম ছিল দেবব্রত। উপযুক্ত বয়স হলে শান্তনু তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তাকে নিয়ে রাজ্যে ভ্রমণ করতেন। শান্তনু নিজের গুণে প্রজাদের প্রিয় ছিলেন, দেবব্রতও প্রজাদের প্রিয় হয়ে ওঠেন।

গঙ্গা দেবী চলে যাবার পরে অনেক বৎসরের মধ্যে শান্তনু আর বিবাহ করেন নাই। দেবব্রতকে যৌব রাজ্যে অভিষেক করার পরে একদিন কার্য উপলক্ষে যমুনাতীরে গিয়ে খেয়া নৌকার পাটনি সত্যবতীকে দেখে মুগ্ধ হন এবং দাসরাজার কাছে গিয়ে তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেন। দাসরাজ সুযোগ বুঝে বলেন যে কন্যার পুত্র হলে সেই রাজ্যের অধিকারী হবে, সেই সর্ত মেনে নিলে বিবাহ হতে পারে। শান্তনু তাঁর উপযুক্ত পুত্র দেবব্রতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন, তাকে বঞ্চিত করে দাসরাজ কন্যার পুত্রকে রাজ্য দেবার সর্ত তিনি মেনে নিতে পারলেন না, দুঃখিত মনে ফিরে গেলেন, কিন্তু বাঞ্ছিতা কন্যাকে না পাবার দুঃখ হেতু তাঁর মন বিষন্ন ও দেহ অসুস্থ হয়ে গেল। দেবব্রত তাই দেখে সন্ধান নিয়ে ব্যাপার কি জানতে পারলেন ; তিনি দাসরাজার কাছে গিয়ে বললেন, আপনি আপনার পালিত কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে রাজা শান্তনুর বিবাহ দিন, আমি তাঁর পুত্র দেবব্রত রাজ্যের উত্তরাধিকারের দাবী ছেড়ে দিচ্ছি। দাসরাজ তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বললেন, তুমি উত্তরাধিকারের দাবী ছেড়ে দিচ্ছ, কিন্তু তোমার পুত্রগণ ভবিষ্যতে দাবী করতে পারে। দেবব্রত বললেন, আপনি যদি সে ভয় করেন তবে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি

বিবাহই করব না। এই প্রতিজ্ঞা করাতে দেবব্রত ভীষ্ম নামে খ্যাত হলেন, পিতার সুখের জন্য ভীষণ স্বার্থত্যাগ করায়। দাসরাজ তখন শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহ দিতে সম্মত হলেন। ভীষ্ম সত্যবতীকে মাতৃসম্বোধন করে রথে চড়িয়ে হস্তিনাপুরে নিয়ে গেলেন এবং পিতার নিকট সব কথা জানিয়ে সত্যবতীকে উপস্থিত করে দিলেন। শান্তনু ভীষ্মকে আশীর্বাদ করে সত্যবতীকে বিবাহ করলেন।[১]

কালক্রমে শান্তনু সত্যবতীর দুইটি পুত্র হ'ল, চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য। শান্তনুর মৃত্যু হলে চিত্রাঙ্গদ রাজপদে অধিষ্ঠিত হল। চিত্রাঙ্গদ অস্ত্রশিক্ষায় নিপুণ ও বীর্যাভিমানী ছিল, মনে করত যে দেব দানব গান্ধর্ব-মানুষের মধ্যে তার সমকক্ষ বীর আব নাই। তার দর্পের কথা জেনে গন্ধর্বরাজ চিত্রাঙ্গদ তাকে যুদ্ধে আহ্বান করেন, কুরুক্ষেত্র ও সরস্বতী নদী তীরে তিন বৎসর ক্রমাগত এই যুদ্ধ চলতে থাকে, অবশেষে গন্ধর্বরাজ জয়ী হয়ে কুরুবংশীয় চিত্রাঙ্গদকে বধ করেন, তখনো তার বিবাহ হয় নাই। চিত্রাঙ্গদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যকে সিংহাসনে বসালেন, বিচিত্রবীর্য অপ্রাপ্তযৌবন ছিল, অতএব ভীষ্মই তার অভিভাবক রূপে রাজ্য চালাতেন। বিচিত্রবীর্য প্রাপ্তযৌবন হলে ভীষ্ম তার বিবাহের কথা চিন্তা করতে লাগ্‌লেন; চিত্রাঙ্গদ বিবাহ না করেই যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করে, তাই বোধ হয় ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য ত্বরান্বিত হলেন। সেই সময় কাশীরাজের তিনটি সুন্দরী কন্যার স্বয়ম্বর সভা হবে জেনে ভীষ্ম সেখানে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে গেলেন। স্বয়ম্বর সভায় তিন কন্যাকে এনে রাজাদের নাম কীর্তন আরম্ভ হ'ল, ভীষ্ম তিন কন্যাকেই নিজের রথে তুলে নিয়ে বল্‌লেন যে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কন্যা হরণ করে বিবাহ শ্রেষ্ঠ বলে কীর্তিত, আমি এই কন্যা তিনটিকে হরণ করছি, আপনারা পারলে বাধা দিন। উপস্থিত রাজন্যগণ ভীষ্মকে আক্রমণ করল, কিন্তু ভীষ্ম তাদের প্রতিরোধ কাটিয়ে কুরুরাজ্যের দিকে অগ্রসর হলেন। শাল্ব নামক একজন নৃপতি ভীষ্মকে অনুসরণ করে গিয়ে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করে, ভীষ্ম রথ ঘুরিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। শাল্ব রাজ প্রথমে বহু বাণ নিক্ষেপ করে ভীষ্মকে বিব্রত করে তোলেন, ভীষ্ম "সাধু, সাধু" বলে নিজেও তীব্র যুদ্ধ আরম্ভ করেন, শাল্বরাজের

১। শান্তনু ভীষ্মকে স্বেচ্ছা মৃত্যু বর দিয়েছিলেন বলে কাহিনীতে আছে, কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে বর দেবার সামর্থ্য শান্তনুর থাক্‌তে পারে না।

অস্ত্র কেটে তার সারথি ও রথের অশ্বগণকে বধ করেন, তার পরে আবার হস্তিনাপুর অভিমুখে যান। হস্তিনাপুরে গিয়ে তিন কন্যাকেই বিচিত্র বীর্যের হস্তে সম্প্রদান করতে উদ্যত হলে কাশীরাজের জ্যেষ্ঠ কন্যা অম্বা বলে যে সে শাল্বরাজকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করেছে, তার পিতারও তাতে সম্মতি ছিল, স্বয়ম্বরে সে শাল্বরাজকেই বরণ করত। ভীষ্ম তখন সত্যবতীর ও মন্ত্রী পুরোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করে অম্বাকে তার ইচ্ছা মত স্থানে চলে যেতে অনুমতি দিলেন, এবং অন্য যে দুটি কন্যা, অম্বিকা ও অম্বালিকা, তাদের সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিলেন।

বিচিত্রবীর্যের তখন নূতন যৌবন, মৃগয়ায় বা রাজকার্যে তার ঔৎসুক্য জন্মান হয় নাই। দুটি সুন্দরী তরুণী স্ত্রী লাভ করে সে মাত্রাধিক ভোগে লিপ্ত হ'ল, ফলে সাত বৎসর পরে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হল। কোন সন্তানও রেখে গেল না। এখানে ভীষ্মের কর্তব্য পালন ত্রুটির কথা মনে হয়। চিত্রাঙ্গদ তার পিতা শান্তনুর জীবনকালের মধ্যেই অস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করেছিল, রাজকার্যও শিখেছিল। পিতার মৃত্যুর পরে তাকে নিজের ইচ্ছায় চালিত করা ভীষ্মের সম্ভব হয় নাই। হলে তিন বৎসর ধরে তাকে গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে দিতেন না, যথাকালে বিবাহ করতেও সম্মত করাতে পারতেন। বিচিত্র-বীর্য পিতার মৃত্যুর সময় অপ্রাপ্তযৌবন ছিলেন। তার অস্ত্রশিক্ষা ও শাস্ত্রবিদ্যা যাতে পূর্ণ হয়, ক্ষত্রিয় রাজন্যের মত মৃগয়ায় স্পৃহা হয়, রাজকার্যও শেখে, তা দেখা প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া ক্ষত্রিয় রাজন্য বীরত্বে খ্যাত হয়ে নিজে স্বয়ম্বরে বৃত হবে বা নিজের জন্য নিজেই কন্যা হরণ করে আনবে, তাই বাঞ্ছিত ছিল। ভীষ্মের মত অতিরথ তার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যৌবন প্রাপ্ত হতেই তার জন্য সুন্দরী দুটি কন্যা হরণ করে এনে তাকে দিলেন, তাতে তার ক্ষতি হবে, তাকি বোঝেন নাই? এ যেন নিজের ভোগের ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে অপরকে অতিরিক্ত ভোগের ব্যবস্থা করে দিয়ে একপ্রকার তৃপ্তি লাভ করা, অপরিমিত ভোগে ধর্ম-অর্থ কাম বিষয়ে অনভিজ্ঞ যুবককে ধ্বংসের পথে যেতে দেওয়া। যেন রাজ অধিকার ছেড়ে দিয়েও রাজ্য শাসনের দায়িত্ব স্বহস্তে রাখবার ইচ্ছার প্রকাশ।

৪. আদি পর্ব—ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুরের জন্ম ও বিবাহ ঃ পাণ্ডুর মৃত্যু

উভয় পুত্রেরই নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হ'লে সত্যবতী ভীষ্মকে কুরুকুলের মঙ্গলের জন্য নিজে রাজ্যভার সম্পূর্ণ গ্রহণ করে বিবাহ করতে অনুরোধ করলেন ; ভীষ্ম বললেন, রাজ্য ত্যাগ ও চিরকুমার থাকবার প্রতিজ্ঞা করে তিনি তা করতে পারেন না, করলে সত্যচ্যুত হবেন। বিচিত্রবীর্যের পত্নীদ্বয়ের গর্ভে নিয়োগ মতে পুত্র উৎপাদন করতেও তিনি সম্মত হলেন না। সত্যবতী তখন নিজ কানীন পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করতে নিয়োগ করবার কথা বললেন। ভীষ্ম সম্মতি দিলেন। সত্যবতী কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে ডেকে পাঠালেন ও বধূদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য তাকে নিয়োগ করতে চাইলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সম্মত হলেন। বধূদের সে কথা জানিয়ে সত্যবতী প্রথমে অম্বিকাকে দ্বৈপায়নের নিকট প্রেরণ করলেন। দ্বৈপায়নের রক্ত পাটল শ্মশ্রু ও জটাভার এবং দীপ্ত চক্ষু দেখে অম্বিকা ভয় পেলেন ও চক্ষু বুজলেন ; যথাসময়ে অম্বিকার একটি পুত্র সন্তান হ'ল, তার নাম দেওয়া হল ধৃতরাষ্ট্র, কিন্তু সঙ্গমকালে অম্বিকা চক্ষু বুজে থাকার জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণে হোক, পুত্রটি অন্ধ হয়ে জন্মাল। পরের বৎসর আবার দ্বৈপায়নকে ডেকে পাঠিয়ে সত্যবতী অম্বালিকাকে তার কাছে প্রেরণ করলেন, অম্বালিকাও ঋষির রক্তপাটল শ্মশ্রু ও জটা ও দীপ্ত চক্ষু দেখে ভয় পেলেন, তার মুখ রক্তশূন্য পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করল। যথাসময়ে অম্বালিকার একটি পুত্র জন্মাল, তার মুখবর্ণ পাণ্ডুর বা ফ্যাকাশে বলে তাকে পাণ্ডু নাম দেওয়া হল। তৃতীয় বার দ্বৈপায়নকে ডেকে পাঠিয়ে সত্যবতী অম্বিকাকে বললেন ঋষির কাছে গিয়ে উত্তম পুত্র সন্তান লাভ কর, কিন্তু অম্বিকা ব্যাসের রূপ ও গাত্রগন্ধ স্মরণ করে নিজে তার কাছে না গিয়ে তার এক সুরূপা দাসীকে নিজের বস্ত্র ও অলঙ্কারে সাজিয়ে ব্যাসের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই দাসীর গর্ভে যে পুত্র হল, তার নাম হল বিদুর, বিদুর কালে পরম ধার্মিক বলে খ্যাতি লাভ করেন, বলা হ'ত যে তিনি ধর্মের অংশে জন্মেছেন।

ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে জাত পুত্রত্রয়ের যথোচিত শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন, রাজ্যশাসনের ভার ভীষ্মের উপরই রইল। রাজপুত্রেরা সাবালক

হলে পাণ্ডুকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হ'ল, ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হলেও অন্ধত্ব হেতু রাজপদে অভিষিক্ত হতে পারলেন না। কিন্তু অন্ধ হলেও তিনি দীর্ঘকায় মহাবল পুরুষ হয়ে উঠ্লেন। ভীষ্ম তখন রাজপুত্রদের বিবাহের উদ্যোগ করতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করে স্থির করলেন যে গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা তার উপযুক্ত স্ত্রী হবে, স্থির করে সুবলরাজের নিকট তিনি প্রস্তাব পাঠালেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ জেনে প্রথমে গান্ধাররাজ দ্বিধা করেছিলেন, পরে কুরুবংশের গৌরব স্মরণ করে সম্মতি দিলেন; সুবলরাজের পুত্র শকুনি তার বোনকে হস্তিনাপুরে নিয়ে এল, হস্তিনাপুরেই ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বিবাহ উৎসব হ'ল। পাণ্ডু কুন্তিভোজ রাজার কন্যা সুন্দরী পৃথা বা কুন্তীকে স্বয়ম্বরে লাভ করেন। পৃথা যদু নায়ক শূরের কন্যাদের মধ্যে একজন, কুন্তিভোজ ছিলেন শূরের পিসাত ভাই, নিঃসন্তান, তিনি পৃথাকে কন্যা হিসাবে নিয়ে পালন করেন। কুন্তিভোজের গৃহে দুর্বাসা কিছুকাল অতিথিরূপে ছিলেন, অতিথির পরিচর্যার ভার কুন্তীর উপর ছিল। এই পরিচর্যার ফলে কুন্তীর একটি কানীন পুত্র হ'ল, সেই পুত্রই কর্ণ; লোকাপবাদের ভয়ে কুন্তী কাঠের বাক্সে করে নবজাত পুত্রকে ভাসিয়ে দিলেন, নদীর প্রবাহে বাক্স ভেসে যায় দেখে সূত অধিরথ সেটিকে টেনে এনে দেখ্লেন যে তার মধ্যে একটি জীবিত পুরুষ শিশু আছে; তার নিজের কোন সন্তান ছিল না, তিনি শিশুটিকে তুলে তাঁর স্ত্রী রাধাকে দিলেন, দুজনেই খুসী হয়ে শিশুটিকে নিজেদের পুত্রের মত পালন করতে লাগলেন, তার নাম দিলেন বসুষেণ, কারণ শিশুটির সঙ্গে বাক্সে মূল্যবান বস্ত্রাদি ছিল। এই ব্যাপার ঘটেছিল কুন্তীর স্বয়ম্বরের পূর্বে, শিশুটির জন্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট গোপনতা অবলম্বন করা হয়েছিল, তাই ঘটনাটি জন-সাধারণের গোচর হয় নাই। কুন্তীর বিবাহে কুন্তিভোজ পাণ্ডুকে বহু যৌতুক দান করেন। যৌতুক সহ কুন্তীকে নিয়ে পাণ্ডু হস্তিনাপুরে এসে নিজের ভবনে বাস করতে লাগলেন। ভীষ্ম উদ্যোগী হয়ে পাণ্ডুর আর একটি বিবাহ দেন। মদ্ররাজের কন্যার খুব সুন্দরী বলে খ্যাতি রটেছিল; মদ্ররাজদের কুলপ্রথা অনুসারে কন্যাশুল্ক নিয়ে কন্যার বিবাহ দেওয়া হত, স্বয়ংবর হত না। শুল্কের পরিমাণ স্থির করে সেই পরিমাণ অর্থ দিয়ে মদ্ররাজকন্যাকে হস্তিনাপুরে এনে ভীষ্ম তার সঙ্গে পাণ্ডুর বিবাহ দিলেন। ভীষ্ম বিদুরের বিবাহও উদ্যোগ করে দিলেন, দেবক নামক সঙ্কর বর্ণের রাজার সুন্দরী কন্যার সঙ্গে বিদুরের বিবাহ হ'ল।

তারপরে পাণ্ডু চতুরঙ্গ সৈন্য নিয়ে দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হলেন। মগধরাজ দীর্ঘ পাণ্ডুর প্রতিরোধ করতে গিয়ে পরাজিত ও নিহত হ'ল। মগধ জয় করে পাণ্ডু ক্রমান্বয়ে বিদেহ, কাশী, সুহ্ম, পুণ্ড্র ইত্যাদি নানা দেশ জয় করে বহু ধনরত্ন ও বহু পশু—গো, অশ্ব, অবি অজা এবং বহু রথ লাভ করলেন। বিজয় গৌরবে হস্তিনাপুরে ফিরে এসে ভীষ্মকে, মাতাকে ও অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করলেন ও তাদের সাদর আলিঙ্গন লাভ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে পরামর্শ করে ধনরত্ন ও পশুধন সত্যবতী, ভীষ্ম, মাতা অম্বালিকা ও বিদুরকে ভাগ করে দিলেন। পাণ্ডুর বীর্যে ও আহৃত ধনে হস্তিনাপুরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করা সম্ভব হ'ল। কিন্তু ভীষ্মের নির্দেশে সেই যজ্ঞের যজমান হলেন ধৃতরাষ্ট্র। রাজপদে যিনি অধিষ্ঠিত, তারই অশ্বমেধ যজ্ঞের যজমান হবার কথা, ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ, কিন্তু অন্ধত্ব হেতু রাজা পান নাই, তাই বোধ হয় তাকে হীনমন্যতা থেকে বাঁচাতে তাকে যজ্ঞের যজমান করা হ'ল। পাণ্ডু সেই নির্দেশের প্রতিবাদ মুখে করলেন না, কিন্তু তিনি তারপর রাজ্য ছেড়ে বনে বনে মৃগয়া করে জীবন যাপন করতে আরম্ভ করলেন। কুন্তী ও মাদ্রী পাণ্ডুর কাছে গিয়ে বনে তার সঙ্গে বাস করতে লাগ্‌লেন। হিমালয় পার হয়ে গন্ধমাদন হয়ে শত-শৃঙ্গ পর্বতে পাণ্ডু নিবাসস্থান ঠিক করে নিলেন। সেখানে পাণ্ডুর পুত্রদের জন্ম হয়; যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন কুন্তীর গর্ভে, নকুল ও সহদেব মাদ্রীর গর্ভে। পুত্রদের জন্ম হস্তিনাপুরে কুরুকুলের নিবাসে হয় নাই, পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে ঋষিগণ শিশু পুত্রগণকে ও কুন্তীকে হস্তিনাপুরে পৌঁছে দেন, বলেন যে শিশুগণ পাণ্ডুর পুত্র, বলে তারা চলে যান। তখন কেউ সন্দেহ করেছিল যে শিশুগণ সত্যই পাণ্ডুর পুত্র কি না, কেউ কেউ বলেছিল এরা পাণ্ডুরই পুত্র। ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ইত্যাদি শিশুদের পাণ্ডুর পুত্র হিসাবে গ্রহণ করে তাদের ভরণ পোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।[১] কালে এই শিশুদের দেবসম্ভব জন্মের কাহিনী রচিত হয়েছে, যথা দুর্বাসার বরে প্রাপ্ত মন্ত্রবলে ধর্মদেবকে আকর্ষণ করে তার ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম, বায়ুদেবকে আকর্ষণ করে তার ঔরসে ভীমের জন্ম, ইন্দ্রদেবকে আকর্ষণ করে তার ঔরসে অর্জুনের জন্ম, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আকর্ষন করে তাদের ঔরসে নকুল ও সহদেবের জন্ম। কিন্তু পাণ্ডুর উপর কিন্দম ঋষির অভিশাপ কাহিনী ইত্যাদি অবান্তর কাহিনী বাদ দিয়ে শিশুগণ পাণ্ডুরই ঔরসজাত

১। অনুক্রমণিকাধ্যায়, ১১৬-১২০ শ্লোক।

পুত্র ছিল সেই অনুমানই সঙ্গত। পুত্রগণের অতি শৈশব অবস্থায় পাণ্ডুর মৃত্যু হয়, মাদ্রীর পাণ্ডুর চিতায় বা অন্যভাবে মৃত্যু হয়, তার পরে ঋষিগণ কুন্তী ও পাণ্ডুপুত্রদের হস্তিনাপুরে পৌঁছে দেন।

ধৃতরাষ্ট্র বহু পুত্র ও একটি কন্যার জনক হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন, যুধিষ্ঠিরের জন্মের একবর্ষ পরে জাত। জ্যেষ্ঠ পুত্র গর্ভে থাকা কালে গান্ধারীর শারীরিক গ্লানি থাকায় ধৃতরাষ্ট্রের সেবার জন্য একটি বৈশ্য সেবিকা নিযুক্ত করা হয়। তার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে যুযুৎসুর জন্ম হয়। তারপরে গান্ধারীর গর্ভে দুঃশাসনাদি বহু পুত্র ও দুঃশলা নামে একটি কন্যা জন্মে। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর শতপুত্রের কাহিনী আছে, সম্ভবতঃ ১৭।১৮টি পুত্র জন্মেছিল, বহুপুত্রকে গৌরবার্থে শতপুত্র বলা হত। পুত্রদের মধ্যে দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুর্মর্ষণ,দুর্মুখ ও বিকর্ণ উল্লেখযোগ্য, বাকী পুত্রদের জন্মও মৃত্যু ছাড়া মহাভারতে বিশেষ কোন কথা নাই। দুঃশলার বিবাহ হয়েছিল সিন্ধুপতি জয়দ্রথের সঙ্গে।

৫. আদি পর্ব : ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রদের শিক্ষালাভ ও গুরুদক্ষিণা দান

ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ হস্তিনাপুরের রাজভবনে একসঙ্গে বাল্যক্রীড়া ও শিক্ষা আরম্ভ করে। ভীম সবচেয়ে বলবান ছিলেন, ছেলেবেলার দুষ্টুমিও তার ছিল। সে মধ্যে মধ্যে কাউকে মাটিতে ফেলে চুল ধরে টেনে নিয়ে যেত, নদীতে স্নানের সময় জলে মাথা ডুবিয়ে ধরে শ্বাসরোধের উপক্রম হলে ছেড়ে দিত, কেউ গাছে চড়লে গাছ ধরে এত জোরে নাড়া দিত যে সে পড়ে যাবার ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতো। এই ভাবে পীড়ন বেশীর ভাগ ধার্তরাষ্ট্রদের উপর হওয়ায় তারা ভীমের উপর রাগ ও হিংসা পোষণ করত, বিশেষতঃ দুর্যোধন কয়েকবার ভীমকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে, ধার্তরাষ্ট্রদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ বলী ছিল, কিন্তু ভীমের সঙ্গে পেরে উঠত না। ভীমের পীড়ন ছিল নিজের বলের মত্ততায়, তার মধ্যে কৌতুক ছিল কিন্তু দ্বেষভাব ছিল না, কিন্তু পীড়িত ধার্তরাষ্ট্রদের জ্যেষ্ঠ দুর্যোধনের মনে হিংস্র দ্বেষভাব ছিল। একবার প্রমাণ কোটিতে জলবিহার করে পটমণ্ডপ তুলে ভোজনের আয়োজন হ'ল, অতিরিক্ত সন্তরণে শ্রান্ত ভীম ভোজনের পরে পটমণ্ডপে শীতল ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। দুর্যোধন

তখন কয়েকজন ভাইকে নিয়ে ভীমের হাত পা বেঁধে যেখানে নদীর তীব্র স্রোত সেখানে নদীর মধ্যে ফেলে দিল। ভীম জেগে উঠে বাঁধন ছিঁড়ে কূলে উঠে এলো। আর একবার ভীম যখন ঘুমিয়ে ছিল, তখন দুর্যোধনাদি কয়েকটি বিষাক্ত সাপ ভীমের গায়ের উপর ফেলে দেয়, জেগে উঠে ভীম সাপগুলি মেরে ফেলে, কয়েকটির দংশনে বিষের জ্বালা ভোগ করে বেঁচে যায়। আর একবার খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ভীমকে খেতে দেয়, ভীম বিষের জ্বালা ভোগ করেও ভোজ্য ও বিষ জীর্ণ করে ফেলে। এইসব ঘটনা নিয়ে পাণ্ডবগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত, যুধিষ্ঠির বলেন যে এইসব ঘটনা ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে জানাবার দরকার নাই, তবে ভীমকে ও অন্য পাণ্ডবদের খুব সাবধানে থাকতে হবে, ভীমকে আরো বলেন যে ধার্তরাষ্ট্রদের উপর বলের মত্ততায় যেন আর পীড়ন না করে। এইভাবে পাণ্ডবগণ সাবধান হয়ে যাওয়ার আর অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই, কিন্তু ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ মধ্যে বিদ্বেষভাব ও সন্দেহ থেকে যায়।

কৃপাচার্য এই রাজপুত্রদের শস্ত্র ও শাস্ত্রশিক্ষার জন্য প্রথম গুরু নিযুক্ত হন। মহর্ষি গৌতমের পুত্র শরদ্বান্ গৌতম শিশুকাল হতে ধনুঃশর নিয়ে খেলা করতেন, গুরুর আশ্রমে তিনি শাস্ত্র পাঠের থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিখতেই বেশী উৎসুক ছিলেন। যখন অন্য আশ্রমিকগণ বেদাভ্যাস করত, শরদ্বান্ গৌতম অস্ত্রচালনা অভ্যাস করতেন, এইভাবে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ্ হয়ে ওঠেন। তিনি গুরুগৃহ থেকে ফিরে নিজের আশ্রম স্থাপন করে শিষ্যদের অস্ত্রশিক্ষা দিতেন। তাঁর আশ্রমের সংলগ্ন জনপদের একটি কন্যা শরদ্বানের রূপ ও অস্ত্রচাতুর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তার কাছে যায়, শরদ্বানের ঔরসে সেই কন্যার গর্ভে যমজ পুত্রকন্যা জাত হয়। শরদ্বান কন্যাটিকে বিবাহ না করায় সে শিশুদের শরবনে ফেলে দিয়ে চলে যায়। শান্তনু রাজার একজন সৈনিক শরবনে শিশুদের দেখতে পায়, তাদের কাছে ধনুর্বাণ ও কৃষ্ণাজিন দেখে বুঝতে পারে যে তারা শরদ্বানের সন্তান, সৈনিক সেকথা শান্তনু রাজার নিকট নিবেদন করলে শান্তনু কৃপাবিষ্ট হয়ে শিশুদ্বয়কে আনিয়ে পালনের ব্যবস্থা করেন, তারা কিছু বয়ঃপ্রাপ্ত হলে শরদ্বান্ গৌতম এসে পরিচয় দিয়ে তাদের নিয়ে যান ও পুত্রটির শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই পুত্রটিই কৃপ ও কন্যাটির নাম কৃপী, শান্তনুরাজার কৃপায় তাদের জীবন রক্ষা হওয়ায় এইভাবে তার পরিচিত হয়। কৃপ শিক্ষা সমাপ্ত করে আচার্যের কাজ করতে থাকেন, তাকেই প্রথমে ভীষ্ম রাজভবনের মধ্যে বাসস্থান ঠিক করে দিয়ে পাণ্ডব ও

ধার্তরাষ্ট্রদের আচার্য পদে নিযুক্ত করেন। কন্যাটির যথাকালে দ্রোণের সঙ্গে বিবাহ হয়। পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রদের শিক্ষা কিছুদূর অগ্রসর হলে ভীষ্ম যোগ্যতর আচার্যের সন্ধান করতে থাকেন। যোগ্যতর আচার্য দ্রোণ নিজের থেকেই সেই রাজপ্রাসাদে এসে উপস্থিত হ'ন॥ দ্রোণও ছিলেন অবিবাহিত নারী পুরুষের পুত্র, ভরদ্বাজ ঋষির ঔরসে তার জন্ম। তার মাতা ঘৃতাচী পুত্রের জন্মের পরে একটি দ্রোণ বা কলসের মধ্যে সদ্যোজাত শিশুটিকে রেখে যায়, ভরদ্বাজ শিশুটিকে পালন করেন। দ্রোণ বা কলসীর মধ্যে ছিল বলে বালকটি নাম দেওয়া হল দ্রোণ। প্রথমে অগ্নিবেশ ঋষির কাছে দ্রোণ শিক্ষালাভ করে; রাজা পৃষতের পুত্র দ্রুপদও অগ্নিবেশ ঋষির শিষ্য হয়, একসঙ্গে শিক্ষাকালে দ্রোণ ও দ্রুপদের মধ্যে সখ্য হয়েছিল। দ্রোণ গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপ্ত করে কৃপীকে বিবাহ করেন, তাদের একটি পুত্র হয়, নাম অশ্বত্থামা, তার কান্না নাকি অশ্বের হ্রেষাধ্বনির মত ছিল। দ্রোণ প্রথমে উপযুক্ত ঋত্বিক্ বা আচার্যের কাজ না পেয়ে স্ত্রীপুত্র নিয়ে দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ করেন। রাজা পৃষতের মৃত্যুর পরে দ্রুপদ পাঞ্চাল রাজ্যের রাজা হন। আশ্রমজীবনের সখার কাছে গেলে তার দানে তার দারিদ্র্যদুঃখ দূর হবে, এই মনে করে দ্রোণ দ্রুপদরাজার কাছে গিয়ে তাকে সখা বলে সম্বোধন করে সাহায্য প্রার্থনা করেন। দ্রুপদ রাজসভায় দরিদ্র ব্রাহ্মণের সখা সম্বোধনে বিরক্ত হন, বলেন যে সখ্য হয় সমানে সমানে, এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একজন রাজপুত্র সহ গুরুর আশ্রমে বাসকালীন যে সখ্য, তা সমৃদ্ধ রাজন্যের সঙ্গেও থাকবে তা দাবী করতে পারেন না। দ্রোণ তা শুনে নিজেকে অপমানিত মনে করে দ্রুপদ রাজসভা ত্যাগ করে নানা স্থানে ঘুরে অবশেষে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হয়ে কৃপের শিষ্য পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রদের নিকট এসে দেখলেন যে তারা দণ্ড ও বীটা—একটি হাতদুই লম্বা লাঠি বা বাঁশ ও একটি বিঘতপ্রমাণ কাঠের বা বাঁশের কাঠি—দিয়ে খেলছে (ডাণ্ডা-গুলি খেলা), বীটাটি একটি জলশূন্য কূপে পড়ে গেল, রাজপুত্রগণ অনেক চেষ্টা করে সেটিকে তুলতে পারল না। দেখে দ্রোণ বললেন, তোমাদের দেখি শিক্ষার অনেক বাকি আছে, এই বীটা তুলতে পারছ না? বলে তিনি কয়েকটি তীক্ষ্ণাগ্র ঈষিকা বা শর তুলে নিয়ে একটি কায়দা করে ছুঁড়ে দিলেন, ঈষিকার তীক্ষ্ণ কাঁটার মত অগ্রভাগ বীটায় বিঁধে গেল, তারপরে কায়দা করে একটির পর একটি ঈষিকা ছুঁড়লেন, যাতে প্রত্যেকটি তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ আগেরটির কোমল শেষভাগের মধ্যে ঢুকে যায়। এমনি করে ঈষিকার সারি কূপের উপরের দিকে পর্যন্ত বিস্তৃত হ'ল,

তখন হাত দিয়ে সন্তর্পণে টেনে বীটাসহ সব ঈষিকা উপরে তুলে আনলেন। দেখে রাজপুত্রগণ মুগ্ধ হয়ে বলল, আপনার জন্য কি করতে পারি। দ্রোণ বললেন, আমার কথা ভীষ্মের কাছে গিয়ে বল। ভীষ্ম এসে দ্রোণের পরিচয় পেয়ে বললেন, আপনার মত আচার্য খুঁজছিলাম, আপনার বাসস্থানাদি ঠিক করে দেব, আপনি এই কুমারদের শিক্ষার ভার নিন। এইভাবে দ্রোণ রাজভবনে নিবাস পেলেন ও কুমারদের প্রধান আচার্য পদে বৃত হলেন, তাঁর আর পরিবার ভরণ পোষণের দুশ্চিন্তা রইল না। কুমারগণ নূতন আচার্যের পদবন্দনা করে তাকে ঘিরে বসল। দ্রোণ হাসিমুখে তাদের বললেন, তোমাদের আমি ভাল করে অস্ত্রশিক্ষা দেব, তোমাদের গুরুদক্ষিণা হিসাবে আমার একটি কাজ করে দিতে হবে। অন্য কুমারগণ চুপ করে রইল, শুধু অর্জুন বলল, আপনি যা আদেশ করেন, তা করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করব; দ্রোণ প্রীত হয়ে অর্জুনকে তুলে ধরে তাকে আলিঙ্গন ও তার মস্তক আঘ্রাণ করলেন।

তারপর দ্রোণ কুমারগণকে নানা প্রকার অস্ত্রশিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। অর্জুন গুরুর শিক্ষামত অতন্দ্রিতভাবে অস্ত্রচালনা অভ্যাস করতে লাগলো। একদিন সন্ধ্যার পরে ভোজনের সময় হঠাৎ দীপ নিবে গেলে অর্জুন দেখল যে অন্ধকারেও খাদ্য নিয়ে হাত ঠিক মুখে পৌছে দিচ্ছে। তার থেকে তার মনে হ'ল যে দিক নির্দিষ্ট করে অন্ধকারে বাণ ছুঁড়লেও লক্ষ্যে পৌছে যেতে পারে। অর্জুন একটি লক্ষ্য স্থির করে তার দিক নির্ণয় করে বাণ নিক্ষেপ করলে, বাণ লক্ষ্যে বিদ্ধ হয়ে গেল। উৎসাহিত হয়ে অর্জুন অন্ধকারে লক্ষ্যে বাণ বিদ্ধ করা অভ্যাস আরম্ভ করলো। ধনুকের টঙ্কার শুনে দ্রোণ এসে ব্যাপার দেখে অত্যন্ত খুসী হলেন, অর্জুনকে বললেন, তোমাকে আমি শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ করে দেব। তাকে দক্ষিণ হস্তে জ্যা আকর্ষণ করে বাম হস্তে তীর নিক্ষেপ করাও অভ্যাস করালেন. দুই হাতেই সমান পটুতার সঙ্গে বাণ লক্ষ্যে নিক্ষেপ সমর্থ হওয়ায়. তাকে সব্যসাচী নাম দিলেন।

সকল কুমারকেই রথ চালনা, অসমান গতিতে রথ চলতে থাকলেও লক্ষ্য বিদ্ধ করা. রথারোহণে যুদ্ধ, অশ্বচালনা, অশ্বারোহণে যুদ্ধ, হস্তীপৃষ্ঠ হতে যুদ্ধ, গদাযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হ'ল, সব অস্ত্রেই অর্জুন পটুতা লাভ করে এবং শ্রেষ্ঠ রথী হয়। ভীম ও দুর্যোধন গদাযুদ্ধে কুশল হ'ল, তার মধ্যে ভীম বলাধিক্য হেতু শ্রেষ্ঠ হ'ল। দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামাও কুমারদের সঙ্গে অস্ত্রশিক্ষা

লাভ করে। দ্রোণের অস্ত্রশিক্ষার খ্যাতি বিস্তৃত হওয়ায় অন্যান্য স্থান হতেও শিক্ষার্থী হস্তিনাপুরে এসে দ্রোণের নিকট হতে শিক্ষালাভ করে। একদিন দ্রোণ শিল্পীকে দিয়ে কাষ্ঠ নির্মিত ভাস বা নীল পক্ষী প্রস্তুত করিয়ে সেটি একটি বৃক্ষের উঁচু শাখায় রেখে একে একে কুমারদের পরীক্ষা করতে লাগলেন, একটি স্থান নির্দেশ করে বললেন, এইস্থানে একে একে দাঁড়িয়ে ভাসটির শিরের দিকে ধনুকে বাণ যোজনা করে লক্ষ্য কর, আমি বলামাত্র বাণ ছাড়বে। প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করতে বলে প্রশ্ন করলেন, ভাসটিকে দেখতে পাচ্ছ? যুধিষ্ঠির বলল, পাচ্ছি। দ্রোণ প্রশ্ন করলেন, তোমার দৃষ্টিপথে আর কি কি আছে? যুধিষ্ঠির বলল, বৃক্ষটিকে দেখতে পাচ্ছি, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, কুমারদের অনেককে দেখতে পাচ্ছি। দ্রোণ বললেন, তুমি সরে এস, তোমার লক্ষ্যে একাগ্রতা নাই। এইভাবে ক্রমে অন্য কুমারদের ভাসের শিরের দিকে লক্ষ্য করতে বললেন, প্রশ্ন করে বুঝলেন, সকলেই ভাসটিকে ছাড়া বৃক্ষটিতে ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ অন্য সব কিছু দেখতে পাচ্ছে। শেষে অর্জুনকে লক্ষ্য করতে বললেন, অর্জুন বলল, ভাসটিকে দেখতে পাচ্ছি, আর কিছু আমার দৃষ্টিপথে পড়ছে না। দ্রোণ আবার প্রশ্ন করলেন, ভাসটিকে সমগ্র দেখতে পাচ্ছ? অর্জুনের উত্তর হ'ল, না, শুধু ভাসের শির দেখতে পাচ্ছি। দ্রোণ আদেশ দিলেন, বাণ মেরে ভাসের শির কেটে ফেল। অর্জুন বাণ ছুড়লেন, ভাসের শির কেটে ভাসের শির ও দেহ পড়ে গেল। দ্রোণ অর্জুনের একাগ্রতাকে প্রশংসা করে অন্য শিষ্যদের বললেন, এইরকম একাগ্রতা আয়ত্ত করতে না পারলে অস্ত্রচালনায় পরম শ্রেষ্ঠতা আয়ত্ত করা যায় না, প্রত্যেকের এইভাবে লক্ষ্যে একাগ্রতা লাভের চেষ্টা করতে হবে।

কিছুদিন পরে গঙ্গাস্নান কালে একটি হাঙ্গর এসে দ্রোণের হাঁটুর নীচে কামড়ে ধরল। দ্রোণ শিষ্যদের ডেকে বললেন, হাঙ্গরে আমার ডান পা কামড়ে ধরেছে, শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর। অন্য শিষ্যরা কি ভাবে উদ্ধার করা যায় স্থির করতে না পেরে বল্লম আনো, অসি আনো, ইত্যাদি চীৎকার করতে করতে অস্ত্র সংগ্রহ করতে করতেই অর্জুন ধনুর্বাণ নিয়ে দ্রোণের দক্ষিণ পায়ের নীচে জলের মধ্যে পাঁচটি তীক্ষ্ণ বাণ মেরে হাঙ্গরটিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলল ও গুরুকে রক্ষা করল। দ্রোণ উঠে বললেন, তোমার তুল্য ধনুর্ধর আর দেখি না, তুমি আমার নিকট হতে ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র গ্রহণ কর। এই কথা বলে অর্জুনকে

নিরালায় নিয়ে ব্রহ্মশির অস্ত্রের প্রয়োগবিধি শিখিয়ে দিলেন, এবং সেই অস্ত্র, বিশেষরূপে নির্মিত অগ্নিবাণ—তাকে দিয়ে বললেন যে এই অস্ত্র প্রয়োগ করলে তীব্র অগ্নিশিখা জ্বলে উঠবে, যদি অমানুষ শত্রু আক্রমণ করে, বা বিশেষ বিপদ আসে, তবেই শুধু এই অস্ত্র প্রয়োগ করবে, সাধারণ যুদ্ধে প্রয়োগ করবে না।

তার পরে দ্রোণ ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে জানালেন যে কুমারগণের অস্ত্রশিক্ষা শেষ হয়েছে, তাঁরা ইচ্ছা করলে একদিন রঙ্গস্থল প্রস্তুত করিয়ে তাদের অস্ত্রপটুত্ব দেখতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে বললেন, দ্রোণ যে ভাবে রঙ্গস্থল প্রস্তুত করতে বলেন, শিল্পী ডেকে সেই ভাবে রঙ্গস্থল প্রস্তুত কর। দ্রোণের সঙ্গে পরামর্শ করে বিদুর একটি বিস্তীর্ণ রঙ্গভূমি ও তার চারদিকে ঘিরে কয়েক সারি মঞ্চ প্রস্তুত করিয়ে প্রেক্ষাগার তৈয়ার করলেন, মঞ্চে রাজন্যদের, প্রজাদের; রাজকুলের স্ত্রীদের বসবার স্থান পৃথক্ পৃথক্ ভাবে করা হ'ল। অস্ত্র শিক্ষা প্রদর্শনীর দিন স্থির করে সকলকে জানান হল, নির্দিষ্ট দিনে দ্রোণ শিষ্যদের নিয়ে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করলেন, শিষ্যগণ ভূমিতে দাঁড়িয়ে লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ, অশ্বপৃষ্ঠ থেকে লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ, হস্তীপৃষ্ঠে উঠে যুদ্ধের অভিনয়, রথ মণ্ডলাকারে চালিয়ে অন্য রথীর অস্ত্র নিবারণ, অসি চর্ম হস্তে যুদ্ধের অভিনয়, ইত্যাদি দেখালো। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সব বর্ণনা করে যেতে থাকলেন। ভীম ও দুর্যোধন গদাযুদ্ধের অভিনয় দেখাতে গিয়ে প্রদর্শনীর কথা ভুলে পরস্পরকে ভূপাতিত করবার চেষ্টা আরম্ভ করল, তখন দ্রোণ অশ্বত্থামাকে পাঠিয়ে তাদের গদাযুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। শেষে অর্জুনকে ডেকে দ্রোণ সব রকম অস্ত্রে পটুত্ব দেখাতে বললেন। অর্জুন নানা অস্ত্র চালনা দেখাল, আগ্নেয়াস্ত্রে অগ্নি সৃষ্টি করল, বরুণাস্ত্রে জল বর্ষণ দেখাল, বায়ব্যাস্ত্রে বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করল, রথে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করতে করতে অকস্মাৎ যেন অন্তর্হিত হ'ল, ঘূর্ণ্যমান কৃত্রিম বরাহের মুখে একসঙ্গে পাঁচটি বাণ বিদ্ধ করল, রশিবদ্ধ ঘূর্ণায়মান বৃষভশৃঙ্গে একুশটি বাণ বিঁধে দিল। তার অস্ত্র কৌশল দেখে সকলে জয়ধ্বনি করল।

এমন সময় রঙ্গস্থলের দ্বারদেশ হতে বজ্রকণ্ঠে একজন বলে উঠল, অর্জুন, তুমি যত অস্ত্র খেলা দেখালে, তা সবই আমি দেখাতে পারি; সেই আগন্তুক কর্ণ, সে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে বিশেষ শ্রদ্ধা না দেখিয়ে দ্রোণ ও কৃপকে প্রণাম জানাল, দ্রোণের অনুমতি নিয়ে অর্জুনের মতই পটু ভাবে নানা অস্ত্রের প্রয়োগ দেখাল। আগন্তুক কে, তা জানতে সকলে উৎসুক হ'ল। দুর্যোধনের মনে হল, অর্জুনের

যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছি, একে আমার পক্ষে নিতে হবে। আগন্তুক অর্জুনের সঙ্গে অস্ত্রযুদ্ধ দেখাবার অনুমতি চাইল। তখন কৃপ এসে বললেন, অর্জুন পাণ্ডুরাজ ও কুন্তীর তৃতীয় পুত্র, তুমি তোমার নাম ও কুলপরিচয় দাও, রাজপুত্রগণ প্রতিদ্বন্দ্বীর পরিচয় না পেয়ে তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেন না। তা শুনে আগন্তুকের মুখে লজ্জা ও ক্ষোভ দেখা দিল। দুর্যোধন বলে উঠল, আচার্য কৃপ, অর্জুন যদি রাজা বা রাজপুত্র সহ ছাড়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ না করতে চায়, তাহলে আমি এই আগন্তুককে অঙ্গরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করে দিচ্ছি, বলে তখনই পুরোহিত ডেকে সে ণার চৌকিতে বসিয়ে মঙ্গলঘট থেকে শিরে জল ঢেলে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের সামন্ত রাজপদে অভিষিক্ত করল। কর্ণ দুর্যোধনকে বলল, হে নরশ্রেষ্ঠ, তোমাকে আমি এই অভিষেকের কি প্রতিদান দিতে পারি? দুর্যোধন বলল, তোমার আজীবন সখ্যই শুধু আমি কামনা করি। কর্ণ দুর্যোধনকে আলিঙ্গন করে আজীবন সখ্যের প্রতিজ্ঞা করল।

এমন সময় লাঠিতে ভর করে সূত অধিরথ রঙ্গস্থলে এলো, তাকে দেখে কর্ণ অভিষেকসিক্ত শির নত করে তার চরণ বন্দনা করল, অধিরথ তাকে পুত্র বলে ডেকে 'তুমি ধন্য' বলে তাকে আলিঙ্গন করল। তা দেখে ভীম পরিহাস করে বলে উঠল, সূতপুত্র, তুমি প্রতোদ হাতে নিয়ে রথ চালাও, অঙ্গরাজ্য পাবার যোগ্যতা তোমার নাই। দুর্যোধন লাফিয়ে সেখানে এসে বলল, ভীম তুমি কেন এমন কথা বল? বীরত্ব যার আছে, সেই রাজপদের যোগ্য, কুলের গৌরব অবান্তর। এই বীর যে বীর্য ও অস্ত্র চাতুর্য দেখিয়েছে, তাতে শুধু অঙ্গরাজ্যের কেন, আরো বড় রাজ্যের এমন কি সমস্ত পৃথিবীর রাজা হবার সে উপযুক্ত। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল, দুর্যোধন একটি মশাল এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে কর্ণকে ধরে রঙ্গস্থলের বাইরে চলে গেল। তখন ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিও রঙ্গস্থল থেকে চলে গেলেন, দ্রোণও শিষ্যদের নিয়ে স্বভবনে প্রস্থান করলেন. কর্ণকে পেয়ে দুর্যোধনের মনে অর্জুন হতে ভয় দূর হল, আর যুধিষ্ঠিরের মনে কর্ণ সম্বন্ধে ভয় জন্মাল।

রঙ্গস্থলে অস্ত্রের খেলা দেখিয়ে অস্ত্রশিক্ষাদান সম্পূর্ণ হয়েছে বলে দ্রোণ এবার গুরুদক্ষিণার কথা উঠালেন। বললেন, তোমাদের রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে পাঞ্চাল-রাজ্য আক্রমণ করে দ্রুপদ রাজকে বন্দী করে আমার কাছে এনে দিতে হবে, দ্রুপদরাজকে বা তার পুত্রদের বধ করবে না, অযথা সৈন্যক্ষয় ও করবে না, তোমাদের

উদ্দেশ্য হবে শুধু প্রতিরোধ চূর্ণ করে দ্রুপদরাজকে জীবিত ধরে আমার কাছে নিয়ে আসা, আমি পাঞ্চাল রাজধানীর বাইরে থাকব, তোমরা ভিতরে অভিযান করে যাবে। কুমারগণ রণসজ্জা করে রথে রথে দ্রোণসহ অগ্রসর হয়ে গেলেন, দ্রোণ রাজধানীর বাইরে একটি স্থান বেছে নিয়ে সেখানে স্থিতি করে কুমারদের এগিয়ে যেতে বললেন। কুরুপাণ্ডবদের অস্ত্রসজ্জিত হয়ে এসে আক্রমণ করতে দেখে দ্রুপদরাজ তাঁর সৈন্য সজ্জিত করে বাধা দিতে এলেন, কিন্তু কুমারদের, বিশেষতঃ ভীম ও অর্জুনের সম্মুখে পাঞ্চালবীরগণ দাঁড়াতে পারলেন না, ভীম উত্তেজনা হেতু বিপক্ষের রথী ও সৈন্য বধ করছেন দেখে অর্জুন তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে রথী বা সৈন্য বধ তাঁদের উদ্দেশ্য নয়, দ্রুপদরাজকে ঘিরে নিয়ে বন্দী করতে হবে। তাই করা হ'ল, এই একটি মাত্র অভিযান যাতে পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রগণ একসঙ্গে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করেছেন। দ্রোণের কাছে কুমারগণ দ্রুপদরাজকে নিয়ে গেলেন। দ্রোণ বললেন, রাজা, তুমি প্রাণের ভয় কোর না; তুমি আর আমি গুরুগৃহে সতীর্থরূপে অন্তরঙ্গ সখা ছিলাম, তারপর তুমি বলেছিলে যে রাজা ও অরাজা দরিদ্র ব্রাহ্মণের সখ্য থাকতে পারে না; তাই আমি তোমার রাজ্যের অর্দ্ধেক ভাগ নিয়ে সেখানে রাজা হব, বাকী অর্দ্ধে তোমার রাজত্ব থাকবে। গঙ্গানদী তোমার রাজ্যের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, এই নদীর উত্তরস্থিত পাঞ্চাল রাজ্য, অহিচ্ছত্র জনপদ নিয়ে, আমি নিয়ে নিলাম; দক্ষিণ ধারে স্থিত অংশ, কাম্পিল্য-পুর ও চর্মন্বতী পর্যন্ত বিস্তৃত মাকন্দী জনপদ তোমার ভাগে রইল। এখন আমাদের আবার সখ্য হতে কোন বাধা নাই। দ্রুপদরাজ সেই ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হলেন. তাঁর রাজ্যের উত্তরাংশ দ্রোণের হাতে ছেড়ে দিতে হল। কিন্তু তাতে দ্রোণ ও দ্রুপদের সখ্য আর ফিরে এল না তা বলাই বাহুল্য। পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্র কুমারগণ এইভাবে গুরুদক্ষিণা দিয়ে স্বভবনে ফিরলেন।

৬. আদি পর্ব—জতুগৃহদাহ ও পাণ্ডবগণের গুপ্ত বাস; হিড়িম্ব ও বক বধ

কুমারগণের শিক্ষাসমাপ্তি ও গুরুদক্ষিণা দানের পরে দুই বৎসর কাল পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরেই ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের নানা শাস্ত্রে ও ভাষায় অধিকার এবং সকলের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহারে এবং ভীম-অর্জুনের অদ্ভুত বীরত্ব দেখে প্রজাগণ তাদের

প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। সমিতিতে ও রাজপথে তারা প্রকাশ্যভাবেই বল্‌তে আরম্ভ করল যে ধৃতরাষ্ট্র অন্ধত্ব হেতু প্রথমে রাজা হতে পারেন নাই, তিনি পাণ্ডুর বনগমনের পরে রাজ্যভার নিয়ে ভীষ্মের সাহায্যে শাসনকর্ম চালাচ্ছিলেন, এখন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যভার দিয়ে দিন, যুধিষ্ঠির রাজ্যভার গ্রহণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়েছে। দুর্যোধন প্রজাদের কথাবার্তা শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন, এক সময় ধৃতরাষ্ট্রকে একলা পেয়ে বল্‌লেন যে প্রজাগণ তাঁকে ও ভীষ্মকে উপেক্ষা করে যুধিষ্ঠিরকে রাজা করে দেওয়া কামনা করছে, সময়মত তার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে বল্‌লেন, পাণ্ডু কখনও আমার অসম্মান করে নাই; তার পুত্র যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ ও সকলের প্রিয়; তাকে রাজধানী থেকে সরিয়ে দিলে প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে বিদ্রোহ ঘটতে পারে। দুর্যোধন উত্তর দিলেন, এখন রাজকোষ ও সৈন্যবল আমাদের আয়ত্তে আছে, আপনি যদি নির্বাসনের উদ্দেশ্য বুঝতে না দিয়ে পাণ্ডবগণকে বারণাবতে পাঠিয়ে দেন, তাহলে অর্থ ও মান দিয়ে আমরা প্রজাপ্রধানদের বশ করে নিতে পারি। ধৃতরাষ্ট্র বল্‌লেন, সে কথা আমিও ভেবেছি, কিন্তু প্রকাশ করি নাই, কারণ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর এরা পাণ্ডবগণকে নির্বাসন দেওয়া সমর্থন করবেন না। তাদের মতে আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুর পুত্রগণ সমান অধিকারী। দুর্যোধন বল্‌লেন, দ্রোণপুত্র আমার পক্ষে আছেন, দ্রোণ তার প্রিয় পুত্রের বিরুদ্ধে যাবেন না, কৃপ ও তার ভাগিনেয় ও ভগিনীপতির বিরুদ্ধতা করবেন না। ভীষ্মও নির্লিপ্ত, আমাদের ও পাণ্ডুপুত্রদের মধ্যে ইতরবিশেষ করেন না। এক বিদুর পাণ্ডবদের পক্ষপাতী, কিন্তু একা তিনি কি করবেন?

ধৃতরাষ্ট্র তখন দুর্যোধনের প্রস্তাবে সম্মত হ'লেন। প্রথমে মন্ত্রীদের অর্থ ও মান দিয়ে বশ করা হ'ল, তারা ধৃতরাষ্ট্রের ইঙ্গিতে বারণাবতের শোভা খুব বাড়িয়ে বর্ণনা করতে লাগল। ধৃতরাষ্ট্র একদিন পাণ্ডবদের ডেকে বল্‌লেন, মন্ত্রীরা বলছে বারণাবত একটি গঙ্গার কূলে অবস্থিত সুন্দর স্থান, সেখানে গিয়ে তোমরা কিছুদিন থেকে আস্‌তে পার। যুধিষ্ঠির তাতে সম্মতি দিলেন, তিনি ভীষ্ম, বাহ্লীক, দ্রোণ কৃপ, বিদুর প্রভৃতির নিকট গিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে মাকে ও ভাইদের নিয়ে বারণাবত যাত্রা করলেন। ইতিমধ্যে দুর্যোধন পুরোচন নামক এক মন্ত্রীকে ডেকে বল্‌লেন, তুমি শীঘ্র বারণাবতে গিয়ে একটি সুন্দর কিন্তু সহজে দাহ্য গৃহ প্রস্তুত কর, তুমি পাণ্ডবগণের নিকটে কোথাও তোমার নিজের বাসস্থান ঠিক

করে নিয়ে তাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবে, তাদের প্রয়োজন মত ভোজ্য, শকট, রথ ইত্যাদি সংগ্রহ করে দিয়ে তাদের বিশ্বাসভাজন হবে, তারপরে একদিন অকস্মাৎ তাদের গৃহে অগ্নি সংযোগ করে তাদের পুড়িয়ে মারবে। বিদুর দুর্যোধনের অভিপ্রায় বুঝে পাণ্ডবদের যাত্রাকালে সাবধান করে দিলেন, যুধিষ্ঠিরের জানা ম্লেচ্ছভাষায় বললেন, তোমরা পুরোচন ও অগ্নি সম্বন্ধে সাবধান থাকবে, গৃহভিত্তির নীচে গভীর সুরঙ্গ করে সেখানে আশ্রয় নিলে গৃহে অগ্নি লাগলেও তোমরা দগ্ধ হবে না, আগে থেকে চারদিক ঘুরে পথঘাট চিনে রাখলে ও রাত্রিতে নক্ষত্র দেখে দিক্‌নির্ণয় করা অভ্যাস করলে কোন বিপদ আসলে দিনে বা রাত্রিতে তোমরা নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে পারবে। যুধিষ্ঠির বললেন, বুঝেছি। বারণাবতে পৌঁছে প্রথম দশদিন ব্রাহ্মণদের ও গ্রামনীদের আতিথ্য লাভ করলেন, তারপরে পুরোচন জানাল, আপনাদের জন্য গৃহ নির্মিত হয়ে গেছে, এখন সেখানে যেতে পারেন। পাণ্ডবগণ সেই নবনির্মিত গৃহে বাসের জন্য গেলেন, পুরোচন এসে গৃহের ব্যবস্থা সব দেখিয়ে দিল। পুরোচন চলে গেলে যুধিষ্ঠীর বললেন, ভীম, দেখ, কেমন বসা বা চর্বি, ধূপ ইত্যাদির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, এই গৃহের সব বেড়ায় প্রচুর পরিমাণে বসা, লাক্ষা, ধূপ ইত্যাদি লাগান হয়েছে, যাতে আগুন লাগলে মুহূর্তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, জতু বা লাক্ষার গন্ধ নাই, তবে বেড়া পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝবে যে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা দিয়ে বেড়ায় শরের ও বাঁশের ফাঁক পূর্ণ করা হয়েছে ; আমাদের পুড়িয়ে মারতে এই জতুগৃহ প্রস্তুত হয়েছে। ভীম বললেন, তাহলে আমরা এখানে থাকি কেন, চলুন অন্যত্র যাই। যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের পুড়িয়ে মারবার পরিকল্পনা করেছে, আমাদের সাবধানে চলতে হবে, এখনই অন্যত্র গেলে পুরোচন বুঝবে যে আমরা তার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছি, তাহলে সে কোন উপায়ে আমাদের শীঘ্র বধ করতে চেষ্টা করবে। তাই এখন আমাদের কর্তব্য, এখানেই থেকে রক্ষার উপায় করি ; ভিত্তির নীচে গভীর-সুরঙ্গ কেটে পাটাতন ও মাটি দিয়ে ঢেকে রাখি, যাতে সহসা সুরঙ্গের অস্তিত্ব বোঝা না যায়, আর মৃগয়ার নাম করে বাইরে গিয়ে চারদিকের পথ ঘাট চিনে রাখি, রাত্রিতেও যাতে দিকভ্রম না হয়, তাই নক্ষত্র চিনে রাখি। পাণ্ডবগণ সেই পরিকল্পনা মতে চলতে লাগলেন, শীঘ্রই বিদুর একজন অভিজ্ঞ খনক পাঠিয়ে দিলেন, যে অভিজ্ঞান দেখিয়ে বিদুর প্রেরিত প্রমাণ করে রাত্রিতে সুরঙ্গ কাটতে থাকল, দিনে মাটির প্রলেপ দেওয়া পাটাতন পেতে ভিত্তির সঙ্গে মিলিয়ে রাখত।

এইভাবে গভীর সুরঙ্গ ও গৃহের প্রবেশ দ্বারের পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়ে সুরঙ্গ হতে নির্গমন পথ করে নির্গমন দ্বারও লতাগুল্মে প্রচ্ছন্ন করে রাখল।

এইভাবে পাণ্ডবগণের বারণাবতে এক বৎসর কেটে গেল ; পুরোচন মনে করল যে পাণ্ডবগণ নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, এইবার তাদের আগুনে পুড়িয়ে ফেলা যাক। তার মুখের ভাব দেখে যুধিষ্ঠির বুঝলেন যে আগামী কৃষ্ণা চতুর্দশী বা অমাবস্যাতে গৃহে আগুন লাগবে। তাঁর পরামর্শে কৃষ্ণা চতুর্দশীর আগের দিন কুন্তী ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করলেন, ব্রাহ্মণ পুরুষ স্ত্রীর সঙ্গে রবাহুত অন্য লোকও এসে পান ভোজন করল, তাদের মধ্যে এক নিষাদস্ত্রী ও তার পঞ্চপুত্র ছিল। পান ভোজন করে ব্রাহ্মণ ও অন্য লোকেরা চলে গেল, নিষাদী ও তার পুত্রগণ মাত্রাধিক পান ভোজনের ফলে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। নিমন্ত্রিতেরা চলে গেলে ভীম প্রথমে পুরোচনের গৃহে, পরে জতুগৃহে আগুন লাগিয়ে দিলেন, পুরোচনের গৃহও জতুগৃহের খুব নিকটে প্রস্তুত হয়েছিল। নিষাদী ও তার পুত্রগণকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন না, শ্বেতকায় আর্যগণ কৃষ্ণবর্ণ আদিবাসীদের প্রাণের বিশেষ মূল্য দিতেন না। গৃহে আগুন লাগিয়ে সুরঙ্গপথে পাণ্ডবগণ নির্গত হয়ে গঙ্গা নদীর খেয়ানৌকায় গঙ্গা পার হয়ে গভীর বনের মধ্যে চলে গেলেন, কুন্তী চলতে না পারায় ভীম তাঁকে বহন করে নিয়ে চললেন। অনেকদূর গিয়ে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ তলে তাঁরা আশ্রয় নিলেন। ভীম পিপাসার্ত হয়েছিলেন, সারস ও জলচর পক্ষীর কলরব শুনে বুঝলেন যে নিকটেই জলাশয় আছে। যুধিষ্ঠিরকে বলে ভীম সেদিকে গিয়ে জলপান ও স্নান করলেন, তারপর উত্তরীয় ভিজিয়ে জল নিয়ে বটবৃক্ষ তলে এসে দেখেন যে মাতা ও ভ্রাতৃগণ সকলেই সুপ্ত, একজনের পাহারা দেওয়া উচিত মনে করে ভীম জেগে বসে রইলেন।

সেই বনে হিড়িম্ব নামক রাক্ষস ও তার বোন হিড়িম্বার বাস ছিল। কয়েকজন মানুষ কাছাকাছি কোথায়ও এসে আশ্রয় নিয়েছে, তা শব্দে ও গন্ধে বুঝে হিড়িম্ব তার বোনকে বলল, দেখ কাছে কোথায় মানুষ এসে বিশ্রাম নিচ্ছে ; তুমি গিয়ে তাদের মেরে নিয়ে এস, বহুদিন পরে আমরা মানুষের মাংস খেয়ে তৃপ্তিলাভ করব ; হিড়িম্বা গিয়ে দেখল যে কয়েকজন বট বৃক্ষতলে সুখে নিদ্রা যাচ্ছে, আর একজন দীর্ঘকায় সুদর্শন পুরুষ জেগে বসে পাহারা দিচ্ছে, পুরুষটিকে দেখে হিড়িম্বা মুগ্ধ হয়ে গেল, তার মনে হল, এই আমার উপযুক্ত ভর্তা, একে মেরে মাংস না খেয়ে একে পতিত্বে বরণ করলে আমি বহুকাল সুখ পাব। এই মনে করে হিড়িম্বা নিজের

কেশ বাস সম্বৃত করে গুছিয়ে নিল, তারপর ভীমের কাছে গিয়ে বল্‌ল, এই বনে রাক্ষস আছে, আমার ভাই হিড়িম্ব আমাকে পাঠিয়েছে তোমাদের মাংস খাবার জন্য তোমাদের মেরে নিয়ে যেতে ; কিন্তু আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ কামাহত হয়েছি, তোমাকে আমি পতিরূপে কামনা করি, তাই জেনে তুমি আমার সঙ্গে উচিত ব্যবহার কর, আমি তোমাকে দুর্গম গিরিগুহায় নিয়ে নরমাংস লোভী রাক্ষসদের হাত হতে রক্ষা করব। ভীম বল্‌লেন, এই যে এরা ঘুমিয়ে আছে, এরা আমার মা ও ভাই, এদের রাক্ষসের হাতে ফেলে কি আমি একা পালাব? হিড়িম্বা বল্‌ল, এদের জাগিয়ে দাও, আমি সবাইকেই নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব। ভীম বললেন, আমি যক্ষ রাক্ষস কাউকেই ভয় করি না, তুমি যা খুসী করতে পার ; ইচ্ছা হলে তোমার ভাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। ইতিমধ্যে হিড়িম্বার বিলম্ব দেখে হিড়িম্ব সেখানে উপস্থিত হল, হিড়িম্বার সংবৃত কেশবাস দেখে ও তাকে ভীমের সঙ্গে আলাপ করতে দেখে তাকে প্রথমে ধমকাল, বল্‌ল আজ তুই যাদের আশ্রয় করেছিস্, তাদের সঙ্গে তোকেও মেরে শেষ করব, তুই রাক্ষসকুলে কলঙ্ক দিলি। এই বলে হিড়িম্ব প্রথমে হিড়িম্বাকে লক্ষ্য করে ছুটে এল। এর মধ্যে ভীম বলে উঠ্‌লেন, তোর বোন আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রেম নিবেদন করেছে, ওর কি দোষ, তুই ওর দিকে বা ঘুমন্ত মানুষদের দিকে না গিয়ে আমার দিকে আয় দেখি, তোর মানুষের মাংস খাবার লোভ জন্মের মত শেষ করে দিই।

তারপর ভীম ও হিড়িম্বের মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল, এগুনো পিছানোর ধাক্কায় অনেক বৃক্ষশাখা ভেঙ্গে পড়ল। শব্দ শুনে কুন্তী ও পাণ্ডবভ্রাতাগণ জেগে উঠলেন, ভীমকে রাক্ষসের হাতে নিপীড়িত মনে করে অর্জুন বল্‌লেন, তোমার ভয় নাই, আমি তোমার সাহায্যে আস্‌ছি। ভীম বল্‌লেন, তুমি দাঁড়িয়ে দেখ, আমি একাই এই রাক্ষসকে শেষ করে দিচ্ছি। এই বলে যেন নূতন বল পেয়ে হিড়িম্বকে তুলে ধরে ঘুরিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, এবং আবার পতিত অবস্থাতেই তাকে মুষ্টি, জঙ্ঘা ইত্যাদি দিয়ে দারুণ প্রহার দিলেন, হিড়িম্ব আর্তনাদ করে মারা গেল। পাণ্ডবগণ ভীমের বলের প্রশংসা করলেন ; অর্জুন বললেন, অদূরেই একটি নগর আছে মনে হয়, চলুন আমরা সেই দিকে গিয়ে নগরে আশ্রয় নিই। পাণ্ডবগণ কুন্তীসহ নগর অভিমুখে বললেন, হিড়িম্বাও সঙ্গে চল্‌ল। ভীম বললেন, তুই কেন আস্‌ছিস্, ভ্রাতৃ বধ স্মরণ করে আমাদের কখন কি ক্ষতি করবি, আয় তোকেও শেষ করে দিই। যুধিষ্ঠির বল্‌লেন, এই রাক্ষসী আর আমাদের কি করতে পারবে,

মিছামিছি স্ত্রীহত্যা কোর না। হিড়িম্বা যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে কুন্তীকে বল্‌ল আমি আপনার এই পুত্র ভীমকে দেখে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে রাক্ষসধর্ম ত্যাগ করে তাকে পতিত্বে বরণ করেছি, এখন তিনি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে আমি কি করে বাঁচবো? আপনি দয়া করে ওর সঙ্গে আমার মিলন ঘটিয়ে দিন, দুঃখ হতে ত্রাণ করা ধর্ম, প্রতিদানে আমিও আপনাদের বিপদকালে রক্ষা করব। যুধিষ্ঠির বল্‌লেন, তোমাকে আমরা বিশ্বাস করছি, কিন্তু আমি যা বলি তাই পালন করতে হবে; তুমি স্নানাহ্নিক সেরে বিবাহের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে ভীমসেনের সঙ্গে দিনের বেলায় যথেচ্ছ বিহার করতে পারো, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই ভীমসেনকে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে হবে, রাত্রে সে আমাদের সঙ্গে থাকবে। হিড়িম্বা সেই শর্ত মেনে নিল; ভীম বল্‌লেন, তোমার যে পর্যন্ত সন্তান জন্ম না হয়, সেই পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে বিহার করব, সে কথাতেও হিড়িম্বা রাজি হল। তারপর বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ করে হিড়িম্বা ভীমসেনকে নিয়ে চলে গেল. তার সঙ্গে কখনও রমণীয় পুষ্পবনে, কোনদিন সুন্দর পদ্মসরোবরকূলে, কোনদিন গিরিশৃঙ্গে উঠে বিহার করতে লাগল। রাত্রি হলেই ভীম ভাইদের কাছে চলে আসতেন, কখনও হিড়িম্বার সঙ্গে, কখনও একা। এইভাবে দুইবৎসর কাটলে হিড়িম্বার একটি পুত্রসন্তান হ'ল, জন্মের সময় তার মস্তক কেশহীন ও ঘট সদৃশ হওয়ায় তার নাম দেওয়া হ'ল ঘটোৎকচ, অর্থাৎ যার ঘট বা শির উৎকচ বা কেশহীন। হিড়িম্বা তার পুত্রকে নিয়ে কুন্তীর কাছে দেখাতে আনলে কুন্তী তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, তুমি পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তুমি কুরুকুল জাত, তাই মনে রেখে প্রয়োজন মত পিতা-পিতৃব্যকে সাহায্য করতে এসো। পাণ্ডবগণ স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলে এই শিশুকে নিয়ে ভীম শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন অনুমান করা যায়, না হলে যে আর্য যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে কর্ণের মত অতিরথ হতে পারতো না।

এদিকে বারণাবতে জতুগৃহ যেদিন পুড়ে গেল, নগরবাসীগণ এসে পোড়া ঘরের মধ্যে একটি স্ত্রীর ও পাঁচটি পুরুষের দেহ দেখে মনে করল যে পাণ্ডবগণ কুন্তীসহ পুড়ে মরেছেন, পুরোচনের গৃহও দগ্ধ এবং পুরোচনকে মৃত দেখে তারা খুশী হ'ল, বল্‌ল যে দুর্যোধনের এই দুষ্ট অমাত্য পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারতে গিয়ে নিজেও পুড়ে মরেছে। তারা হস্তিনাপুরে সংবাদ পাঠিয়ে দিল। সংবাদ শুনে ধৃতরাষ্ট্র আদেশ দিলেন, কুন্তীর ও তার পুত্রগণের দেহ সৎকার করতে এখনই বারণাবতে লোক পাঠিয়ে দাও। তাই দেওয়া হ'ল; উদক ক্রিয়া হস্তিনাপুরেই

করা হ'ল, ধৃতরাষ্ট্র সবার সম্মুখে কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদির নাম করে শোক প্রকাশ করলেন। ভীষ্ম দ্রোণাদিও শোক প্রকাশ ক'রলেন। বিদুরকে ততটা শোকাভিভূত দেখা গেল না, বিদুরের বিশ্বাস ছিল যে পাণ্ডবগণ পলায়ন করতে পেরেছে, তবে সে কথা তিনি কাউকে বলেন নাই।

বন থেকে বনান্তরে গিয়ে কয়েক বৎসর কাটিয়ে পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরে গেলেন, সেখানে ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় নিলেন। সেখানে পাণ্ডবগণ বেদ, বেদাঙ্গ ও অন্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে এবং পর্যায়ক্রমে নগরে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তারা তাদের দেহ সৌষ্ঠবে ও ভদ্র আচরণে পুরবাসীদের প্রীতি অর্জন করলেন। একদিন সেই ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠ্‌ল। তখন কুন্তী ও ভীম গৃহে ছিলেন; অন্য পাণ্ডবগণ ভিক্ষার্থ বহির্গত হয়েছেন। ভীম কুন্তীকে বললেন, ক্রন্দন এরা কেন করে জেনে এসো। কুন্তী ভিতরে গিয়ে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলে ব্রাহ্মণ বল্‌ল যে এই নগর ও নিকটস্থ জনপদ একজন রাক্ষসরাজার অধীন, তার নাম বক, সে তার রাক্ষস সৈন্য নিয়ে নগর ও জনপদ অন্য শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করে, কিন্তু তাকে প্রতিদিন ভক্ষণের জন্য একটি মানুষ, দুইটি মহিষ, ও কুড়ি ভার শালি তণ্ডুলের পক্ক অন্ন দিতে হয়, নগর ও জনপদের গৃহস্থদের পালা করে এতদিন তা দিতে হয়, কয়েক বৎসর পরে এখন আমার পালা এসেছে, আমি, আমার স্ত্রী, আমার কন্যা ও শিশুপুত্র আছে, কে রাক্ষসের ভক্ষ্য হতে যাবে তাই নিয়ে ক্রন্দন উঠেছে। কুন্তী বল্‌লেন, আমার পঞ্চপুত্র আছে, তারমধ্যে একজন রাক্ষস বধও করেছে, সেই রাক্ষসের কাছে মহিষদ্বয়ও অন্ন নিয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ মুখে আপত্তি করলেও শেষে খুশী হয়ে সম্মত হল এবং মহিষ ও পক্ক অন্ন সংগ্রহ করে দিল, পরদিন তাই নিয়ে বকের বাসস্থানের কাছে গিয়ে ভীম বককে নাম ধরে কয়েকবার ডেকে পক্ক অন্ন ভক্ষণ করতে আরম্ভ করলেন। বক এসে একজন মানুষ তার জন্য প্রেরিত অন্ন ভক্ষণ করছে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমকে পিঠের উপর প্রহার করতে আরম্ভ করল। ভীম ভ্রূক্ষেপ না করে অন্ন ভক্ষণ শেষ করলেন, তারপরে বকরাক্ষসের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধে তাকে নিস্তেজ করে তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন, তারপরে পিঠে জানু দিয়ে চেপে ধরে একহাতে তার চুল ধরে, আর এক হাতে তার কটিবস্ত্র ধরে এমন উপর দিকে টান দিলেন যে রাক্ষসের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে গেলে, সে রক্তবমন করে মারা গেল; বকের চীৎকার শুনে

তার পরিবারস্থ রাক্ষস রাক্ষসী সেখানে এলো, ভীম তাদের বললেন, তোমরা এখানে থাকতে পার, তবে মানুষের মাংস খাওয়া ছেড়ে দিতে হবে, তোমাদের কেউ যদি মাংসের লোভে মানুষ মারে, তাহলে তারও এই দশা হবে। তারা বলল যে এখন থেকে তারা আর মাংসের লোভে মানুষ মারবে না। ভীমের বিক্রমে একচক্রা নগরবাসী ও সন্নিহিত জনপদবাসী প্রতিদিন একটি করে মানুষকে রাক্ষসের ভক্ষণার্থ পাঠাবার দায় থেকে মুক্ত হ'ল ; কিন্তু ভীম নগরবাসী ও জনপদবাসীদের নিকট আত্মপ্রকাশ না করে, রাক্ষসরাজ পরিবারকে শাসনবাক্য ব'লে, অলক্ষিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

৭. আদিপর্ব—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ও পাণ্ডবগণের অর্দ্ধরাজ্য প্রাপ্তি

দ্রুপদ রাজ দ্রোণ-শিষ্যদের হস্তে পরাজিত হয়ে দ্রোণকে রাজ্যের অর্দ্ধভাগ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ; দ্রোণ আগেকার সখ্য ফিরে আসবার কথা বলেছিলেন, কিন্তু দ্রোণও নিশ্চয়ই জানতেন যে এরূপ ভাবে হতমান যাকে করা হল, তার মনে বন্ধুপ্রীতি আসবে না। দ্রুপদ রাজের মনে প্রতিহিংসা স্পৃহা প্রবল হয়ে উঠলো, নিজ পুত্র শিখণ্ডী বীর ছিল বটে, কিন্তু অতিরথ পর্যায়ের নয়, তাই তিনি চিন্তা করে স্থির করলেন যে দ্রোণবধের সামর্থ্য যার হবে আশা করা যায় এমন একজন তরুণকে দত্তক পুত্র নেবেন। পাঞ্চাল কুলে ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে একটি ১৫।১৬ বয়স্ক তরুণ অস্ত্রশিক্ষায় পটুত্বের পরিচয় দিয়েছে, তাকেই দ্রুপদরাজ দত্তক পুত্র নেওয়া স্থির করলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের কনিষ্ঠা সহোদরা কৃষ্ণা তখন ১২।১৩ বৎসরের তরুণী, নর্ডিক আর্যগণের মত তার গৌরবর্ণ দেহ নয় বটে, তবে কৃষ্ণাভ শ্বেত আর্যদের মত তার দেহের ঔজ্জ্বল্য, মুখমণ্ডল অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন, সমস্ত অঙ্গই সুঠাম ও লাবণ্যময়, এক কথায় সে অপূর্ব সুন্দরী, যেমন সুন্দরী কুলে হয়তো শতবর্ষে একবার জন্ম নেয়। এই কন্যাটিকেও দ্রুপদরাজ দত্তক রূপে গ্রহণ করা স্থির করলেন, ভ্রাতা-ভগ্নী যাতে পূর্বের মত এক সঙ্গেই বড় হয়ে উঠে। তিনি তাদের দত্তক নেবার জন্য একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন, ঋত্বিকদের বলে দিলেন যে প্রচার করতে হবে পুত্রটি যজ্ঞাগ্নি হতে জাত ও দ্রোণ বধের জন্য দীক্ষিত ও কন্যাটি যজ্ঞবেদী হতে জাত ও কুরুকুলের ক্ষয়ের জন্য উদ্ভূত। ঋত্বিকগণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান শেষ করে এসে যজ্ঞাগ্নিতে

শুষ্ক অশ্ব-শক নিক্ষেপ করে ঘন ধূমের সৃষ্টি করল, সেই ধূমের মধ্যে যজ্ঞাগ্নির উপর দিয়ে তরুণটিকে নিয়ে দেখিয়ে বলল যে কুমার যজ্ঞাগ্নি থেকে আবির্ভূত, এবং কন্যাটিকে যজ্ঞবেদীর উপর দিয়ে তুলে ধরে বলল যে কন্যাটি যজ্ঞবেদী হ'তে আবির্ভূত হয়েছে। লোকসাধারণের মধ্যে সেই কথাই প্রচার হল। দ্রুপদরাজ তাদের নিজ সন্তানের মত পালন করতে ও শিক্ষা দিতে লাগলেন। তরুণটিকে অস্ত্রশিক্ষার উৎকর্ষের জন্য দ্রোণের শিষ্য করা হয়েছিল এই কথা মহাভারতে আছে বটে, কিন্তু তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না, দ্রোণের উপর বিদ্বেষে তার উপর প্রতিহিংসা নিতে যাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন, তাকে দ্রুপদরাজ দ্রোণের কাছেই কেন পাঠাবেন? ভারতবর্ষে তখন বহু অস্ত্রবিদ্ আচার্য ছিল; অবন্তিপুরে সান্দীপণি মুনির আশ্রমে অস্ত্রশিক্ষা লাভ করে কৃষ্ণ অতিরথ ও শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবিদ্ হয়েছিলেন; অগ্নিবেশ মুনির আশ্রমে দ্রোণ ও দ্রুপদরাজ শিক্ষালাভ করেন, অগ্নিবেশ ধৃষ্টদ্যুম্নের শিক্ষাকালে না থাকলেও তার আশ্রমে উপযুক্ত আচার্য তার স্থান নিয়েছিলেন এই অনুমান সঙ্গত। কোন বিখ্যাত অস্ত্রগুরুর কাছে ধৃষ্টদ্যুম্নের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হয়, এবং সেও অতিরথ পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করে।

কৃষ্ণার রূপ বয়সের সঙ্গে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠে; তাকে কন্যা হিসাবে দ্রুপদরাজ গ্রহণ করবার অনুমান সাত বৎসর পরে তার জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হয়। দ্রুপদরাজের ইচ্ছা ছিল যে কন্যাটির বিবাহ দেবেন অর্জুনের সঙ্গে; তার সন্ধান না পেয়ে তিনি কৃষ্ণার পাণিপ্রার্থীদের কঠিন পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। কঠিন লৌহদণ্ড দিয়ে ধনুকের কোদণ্ড প্রস্তুত করা হয়, সেই কোদণ্ড বেঁকিয়ে জ্যা-রোপণ করতে খুব বল ও কৌশলের প্রয়োজন; তারপর ঘূর্ণায়মান চক্রের ছিদ্র দিয়ে উপরে বংশদণ্ডে আবদ্ধ একটি মৎস্য, তাকে যুগপৎ পাঁচটি বাণ মেরে বিদ্ধ করতে হবে। অর্থাৎ অর্জুন বা তার তুল্য কুশলী ধনুর্বিদ ছাড়া কেহ কৃষ্ণাকে লাভ করতে পারবে না। রাজা দ্রুপদ এইভাবে কৃষ্ণার পণ স্থির করে স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করতে লাগলেন এবং চারিদিকে রাজন্যবর্গের নিকট স্বয়ম্বর সভায় আসতে আমন্ত্রণ পাঠালেন। রাজন্যদের ও অন্যান্য অভ্যাগতদের বাসের জন্য সপ্ততল বিশিষ্ট বংশদণ্ড ও কাষ্ঠ নির্মিত আবাস প্রস্তুত হ'ল। এরূপ সপ্ততল আবাসকে বিমান বলা হ'ত।

পাণ্ডবগণ একচক্রায় থাকতে স্বয়ম্বরের সংবাদ পেলেন ভীম কর্তৃক বক রাক্ষস বধের অল্প কয়দিন পরেই। তাঁরা যে ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করছিলেন, সেখানে

কয়েকজন ব্রাহ্মণ অতিথি এসে জানালো যে তারা দ্রুপদরাজকন্যার স্বয়ম্বর দেখতে যাচ্ছে, স্বয়ম্বরসভা হবে পাঞ্চাল রাজধানী কাম্পিল্যপুরে, সেখানে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, কারণ দ্রুপদরাজ বিত্তশালী নৃপতি ও দানে উদারহস্ত। তাদের কাছ থেকে দ্রুপদরাজকন্যার অপরূপ রূপের কথা শুনে পাণ্ডবগণও সেখানে যাওয়া স্থির করলেন; তাঁরা ব্রাহ্মণদের ছাড়িয়ে অগ্রসর হয়ে গেলেন। যখন গঙ্গাতীরে পৌঁছালেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অর্জুন এক হাতে মশাল, এক হাতে ধনুক ও পিঠে বাণপূর্ণ তৃণ নিয়ে আগে আগে চললেন। সেই সময় গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ সপরিবারে জলক্রীড়া করছিলেন, তিনি পাণ্ডবগণকে গঙ্গানদী পার হতে উপক্রম করতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রির পূর্বভাগে গন্ধর্বগণের নদীতে জলক্রীড়ার অধিকার, অতএব কেহ এখন নদীপার হতে গেলে আমার বধ্য হবে, আমি গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ, কুবেরের প্রিয় সখা, সন্ধ্যাকালে গঙ্গায় জলকেলি করবার সময় দেবগণও আমার কাছে আসে না। অর্জুন বললেন, গঙ্গানদীতে ও সমুদ্রে সর্বকালে সকলের সমান অধিকার, তোমার কথা শুনে ভয় পেয়ে আমরা কেন গঙ্গা পার করা হতে বিরত হব? তা শুনে অঙ্গারপর্ণ রথে উঠে অর্জুনের প্রতি শাণিত শর নিক্ষেপ আরম্ভ করল, অর্জুন দ্রুতহস্তে সেসব বাণ কেটে দিয়ে অগ্নিবাণ দিয়ে অঙ্গারপর্ণের রথে আগুন ধরিয়ে দিলেন, কাঠের রথ জ্বলে গেল। গন্ধর্বরাজ আহত অবস্থায় রথ থেকে লাফিয়ে পড়তে মাটিতে পড়ে গেল, অর্জুন তাকে চুল ধরে টেনে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে গেলেন। গন্ধর্বরাজপত্নী কুম্ভীনসী যুধিষ্ঠিরের নিকটে এসে স্বামীর জীবন ভিক্ষা চাইলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, গন্ধর্ব হৃতগৌরব হয়েছে, এখন তার স্ত্রী তার রক্ষাকর্ত্রী হয়েছে, ওকে না মেরে ছেড়ে দাও। অর্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথায় গন্ধর্বরাজকে ছেড়ে দিলেন। অঙ্গারপর্ণ তখন অর্জুনের সঙ্গে সখ্য প্রার্থনা করল এবং আগ্নেয়াস্ত্রবিদ্যা শিখতে চাইল, তার পরিবর্তে চাক্ষুষীবিদ্যা শিখিয়ে দিতে চাইল, যার ফলে দূরের দ্রব্য নিকটের দ্রব্যের মত স্পষ্ট দেখা যায়, তাছাড়া পঞ্চপাণ্ডবদের প্রত্যেককে একশত গন্ধর্বদেশীয় অশ্ব দিতে চাইল। অর্জুন তার সখ্য গ্রহণ করে বিদ্যা বিনিময় করলেন, আর বললেন, গন্ধর্বদেশীয় অশ্ব এখন আপনার কাছেই থাক, আমাদের প্রয়োজন মত চেয়ে নেব।

তারপরে পাণ্ডবগণ গঙ্গানদী পার হয়ে গেলেন, উৎকোচক নামক তীর্থে তাঁরা ধৌম্য নামক একজন ব্রাহ্মণকে পুরোহিতরূপে নিযুক্ত করে সঙ্গে নিয়ে চললেন।

দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী কাম্পিল্যপুরে পৌঁছে তাঁরা দ্রুপদরাজের প্রাসাদ-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে স্বয়ম্বরের আয়োজন দেখলেন। তারপর তাঁরা ব্রাহ্মণবেশেই এক কুম্ভকারের গৃহে আশ্রয় নিলেন।

স্বয়ম্বরের দিন পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণবেশে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই বসলেন। যথাসময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃষ্ণাকে নিয়ে পুরোহিত সঙ্গে করে সভায় উপস্থিত হলেন। পুরোহিত মঙ্গলাচরণ শেষ করলে ধৃষ্টদ্যুম্ন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, যিনি এই ধনুকে জ্যা পরিয়ে ঘূর্ণায়মান চক্রের ছিদ্র দিয়ে যুগপৎ পাঁচটি বাণ মেরে উপরে বংশদণ্ডে লম্বিত মৎস্যটি বিদ্ধ করতে পারবেন, তিনি এই রূপবতী কন্যাকে লাভ করবেন। তারপরে ধৃষ্টদ্যুম্ন উপস্থিত রাজগণকে একে একে দেখিয়ে কৃষ্ণার কাছে তাদের পরিচয় জানালেন।

রাজগণ এক একজন করে উঠে লক্ষ্যবেধের চেষ্টা আরম্ভ করলেন। কিন্তু অধিকাংশ রাজা ধনুর্দণ্ড নত করে জ্যা পরাতেই পারলেন না, চেষ্টা করতে গিয়ে কেউ কেউ উল্টে পড়ে গেলেন। দুই একজন রাজা জ্যা রোপণ করতে পারলেন, কিন্তু তাঁরা ঘূর্ণায়মান চক্রের ছিদ্র দিয়ে পরপর পাঁচটি বাণ মারতে গিয়ে একটি দিয়েও লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারলেন না। তার পরে আর কোন রাজা উঠছে না দেখে ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন উঠে ধনুর্দণ্ডকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে ধনুর্দণ্ডে জ্যা রোপণ করে চক্রের ছিদ্র দিয়ে দ্রুতহস্তে পাঁচটি বাণ নিক্ষেপ ক'রে লক্ষ্য বিদ্ধ করলেন, মৎস্যটি বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। লক্ষ্যবিদ্ধ হয়েছে জেনে ও লক্ষ্যভেদকারীর দেহসৌষ্ঠব দেখে কন্যা স্মিতমুখে বরমাল্য হস্তে তার দিকে অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে রাজগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন, বলে উঠলেন যে স্বয়ম্বরে ক্ষত্রিয়দের অধিকার, রাজন্যবর্গকে স্বয়ম্বর সভায় আমন্ত্রণ করে সে তাদের কাউকে কন্যাদান না করে এক ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করে দ্রুপদরাজ তাদের অপমান করেছেন, অতএব তিনি বধ্য। অনেকে দ্রুপদরাজার দিকে অগ্রসর হচ্ছে দেখে অর্জুন লক্ষ্যবেধের ধনুক ও বাণগুলি তুলে নিলেন ও দ্রুপদরাজের সামনে এসে দাঁড়ালেন, ভীমও এসে তার পাশে দাঁড়ালেন। রাজন্যদের পক্ষে কর্ণ অগ্রসর হয়ে দ্রুপদকে লক্ষ্য করে বাণ ছুঁড়লেন, অর্জুন সে বাণ অর্দ্ধপথে কেটে দিলেন, কর্ণ দ্রুতহস্তে বাণ নিক্ষেপ আরম্ভ করলে অর্জুনও দ্রুতহস্তে বাণ দিয়ে কর্ণের সব বাণ কেটে দিলেন ; তা দেখে কর্ণ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সাক্ষাৎ ধনুর্বেদ, বা পরশুরাম, বা বিষ্ণু? অর্জুন ও ইন্দ্র ছাড়া কাউকে

জানি না যে আমার বাণ এভাবে কাটতে পারে। অর্জুন বললেন, আমি সাক্ষাৎ ধনুর্বেদ বা পরশুরাম নই, আমি ব্রাহ্মণ, গুরুর নিকট হতে ধনুর্বিদ্যা ভাল করে আয়ত্ত করেছি। কর্ণ তাকে ব্রাহ্মণ জেনে তার সঙ্গে আর বাণ বিনিময় করলেন না। ইতিমধ্যে শল্য বিনা অস্ত্রে আক্রমণ করতে এগিয়ে এলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ মল্লযোধী ছিলেন, আর্যদের নিয়ম ছিল যে বিনা অস্ত্রে যে আক্রমণ করে, তাকে বিনা অস্ত্রেই প্রতিরোধ করিতে হবে। শল্য দ্রুপদরাজের দিকে অগ্রসর হতে গেলে ভীম তাকে আটকালেন, দুজনের তীব্র মল্লযুদ্ধ হল, কিছুক্ষণ পরে ভীম শল্যকে তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। তখন বিরতির সুযোগ নিয়ে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চ গম্ভীর স্বরে বললেন, রাজগণ, আপনারা নিবৃত্ত হন, কৃষ্ণা ধর্মতঃ জিতা হয়েছে। সে কথা শুনে রাজগণ আর আক্রমণ চেষ্টা না করে স্ব স্ব নিবাসে ফিরে গেলেন, তারপরে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন। অর্জুন ও ভীম কৃষ্ণাকে নিয়ে তাঁদের কুম্ভকার শালায় গেলেন; যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে নিয়ে লক্ষ্যভেদ হলে সভায় তূর্য নিনাদ আরম্ভ হলেই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।

কৃষ্ণাকে সঙ্গে নিয়ে ভীম ও অর্জুন কুম্ভকার শালায় পৌঁছে কুন্তীকে ডেকে বললেন, দেখ আজ কেমন ভিক্ষা এনেছি, কুন্তী গৃহের ভিতর থেকেই বললেন, তোমরা সকলে মিলে তা ভোগ কর। গৃহের বাইরে এসে কৃষ্ণাকে দেখে তার পরিচয় পেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে বললেন, আমি রাজপুত্রীকে না দেখে বলেছি যে তোমরা সকলে মিলে ভোগ কর, এখন আমাকে যাতে মিথ্যা কথনের দোষ স্পর্শ না করে আর রাজপুত্রীকে পাপ স্পর্শ না করে, তার তোমরা বিধান কর।

এখানে কুন্তীর যে উক্তি, আমাকে যেন মিথ্যা কথনের দোষ স্পর্শ না করে, সে কথার বিশেষ মূল্য নাই; উত্তম কোন ভোজ্য ভিক্ষারূপে পাওয়া গেছে মনে ক'রে কুন্তী সকলে মিলে ভোগ করার কথা বলেছিলেন, রাজকন্যাকে আনা হয়েছে জানলে সে কথা বলতেন না, ভ্রান্ত ধারণায় যে কথা বলেছেন, তা রাজকন্যা সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে না। মনে হয় যে এখানে মহাভারতকার একটু পরিহাস দিয়ে কৃষ্ণার পঞ্চ পতিত্বের ব্যাপারটিকে লঘু করতে চেয়েছেন।

যুধিষ্ঠির কুন্তীকে বললেন, তোমার মিথ্যা ভাষণের দোষ হবে না। অর্জুনকে বললেন, তুমি লক্ষ্যভেদ করে রাজকন্যাকে জয় করেছ, তোমার সঙ্গেই কন্যার বিবাহ হলে শোভন হয়, তুমি অগ্নি জেলে যথারীতি রাজকন্যাকে বিবাহ কর। অর্জুন বললেন, আপনি ও ভীম আমার জ্যেষ্ঠ, আপনারা অবিবাহিত থাকতে

আমার প্রথমে বিবাহ করা উচিত হবে না, আমরা চার ভাই ও এই কন্যা আপনার শাসনাধীন, আপনি চিন্তা করে স্থির করুন কি করলে আমাদের ধর্ম ও যশ নষ্ট হবে না। তখন পঞ্চভ্রাতা সকলেই কন্যার দিকে লক্ষ্য করে দেখ্‌লেন, কন্যার অপরূপ রূপ দেখে সকলেই মুগ্ধ ও কামপীড়িত হলেন। তা বুঝে যুধিষ্ঠির বললেন, যাতে আমাদের ভাইদের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা, দ্বেষ, শত্রুতা না হয়, তার জন্য আমি বলি যে আমরা পঞ্চভ্রাতাই এই অপরূপা কন্যাকে বিবাহ করি। তাতে অর্জুন আপত্তি করলেন না, অন্য ভ্রাতারা অনুমোদন করল। কৃষ্ণার কি ইচ্ছা তা কেউ জিজ্ঞাসা করল না।

এই সময় কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে সেই কুম্ভকার শালায় উপস্থিত হয়ে কুন্তীকে পিতৃস্বসা বলে প্রণাম করলেন, তারা দূর থেকে ভীম-অর্জুন কৃষ্ণার অনুসরণ করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিলেন, এবং যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা গুপ্তভাবে বাস করছি, আপনারা চিন্‌লেন কেমন করে? কৃষ্ণ হেসে বললেন, অগ্নি গুপ্ত রাখলেও প্রকাশ পায়, স্বয়ম্বর সভায় অর্জুন ও ভীম যে বীর্য দেখালেন, তাতেই তাদের আমি চিন্‌লাম; ভাগ্যে আপনারা সকলে অগ্নিদাহ থেকে বেঁচেছেন, আপনাদের কল্যাণ হোক। আপনারা গুপ্তভাবে আছেন, আমরা আপনাদের কথা প্রকাশ করব না, বলে কৃষ্ণ ও বলরাম চলে গেলেন।

এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্নও ভীম-অর্জুন-কৃষ্ণাকে অনুসরণ করে সেই কুম্ভকার কর্ম-শালায় তাদের প্রবেশ করতে দেখে ভিতরে না গিয়ে বাইরে থেকে তাদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে চেষ্টা করলেন তারা কে। তারা যে ক্ষত্রিয় রাজপুত্র, তা বুঝে ফিরে গিয়ে দ্রুপদরাজের কাছে তা নিবেদন করলেন। তখন দ্রুপদরাজ স্বীয় পুরোহিতকে পাঠিয়ে দিলেন, এবং রথ পাঠালেন, কুন্তী কৃষ্ণা ও যুধিষ্ঠিরাদিকে রাজভবনে যেতে আমন্ত্রণ করলেন। তাঁরা রাজভবনে সকলে গেলেন, কুন্তী কৃষ্ণাকে নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন, এ দিকে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে দ্রুপদরাজের কথা হ'ল। যুধিষ্ঠির তাঁদের গোপন বাসের কারণ বুঝিয়ে বললেন, দ্রুপদরাজ বললেন যে পাণ্ডবদের রাজ্যলাভে তিনি সাহায্য করবেন। অর্জুনই লক্ষ্যভেদ করেছেন জেনে দ্রুপদরাজ আনন্দিত হয়ে অর্জুন-কৃষ্ণার বিবাহ অনুষ্ঠানের কথা বললেন, যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা স্থির করেছি যে কৃষ্ণা হেন রত্নকে আমরা পঞ্চভ্রাতা যুক্তভাবে বিবাহ করব। তা শুনে দ্রুপদরাজ বললেন,

সে তো বেদ-বিরুদ্ধ লোকাচারবিরুদ্ধ হবে। যুধিষ্ঠির বললেন, ধর্মবিরুদ্ধ হবে না, এরূপ বিবাহ আর্যদের মধ্যে পূর্বেও হয়েছে। দ্রুপদরাজ বললেন, আগামী কাল কুন্তী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইত্যাদির সামনে তোমার সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করব। পরদিন আলোচনায় দ্রুপদরাজ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন যুক্তবিবাহের বিরুদ্ধে মত দিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, পুরাতন কালে এরূপ বিবাহ হয়েছে—জটিলা গৌতমী একসঙ্গে সাতজন ঋষির পত্নী হয়েছিল, বার্ক্ষী মারিষা দশ প্রচেতার স্ত্রী হয়েছিল। ইতিমধ্যে দ্বৈপায়ন ঋষি এসেছিলেন, তিনি দ্রুপদরাজকে ডেকে নিয়ে রাজভবনে প্রবেশ করে কি সব তাকে বললেন। সভায় ফিরে এসে ব্যাস কিছু কথা বললেন, এরূপ বিবাহকে অধর্ম বললেন না, অর্জুন বা কৃষ্ণা কোন কথাই বলল না, শেষে দ্রুপদরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাব স্বীকার করে নিয়ে পঞ্চভ্রাতার সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই বিবাহের সংবাদ গেলে ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধন ও কর্ণের মত উপেক্ষা করে ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শ মত রাজ্যের অর্দ্ধভাগ পাণ্ডবগণকে দিয়ে তাদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা স্থির করে বিদুরকে উপহার সহ দ্রুপদভবনে পাঠিয়ে কুন্তী, কৃষ্ণা ও পাণ্ডবগণকে হস্তিনাপুরে আনালেন। কৃষ্ণ ও বলরাম তাদের সঙ্গে হস্তিনাপুরে গেলেন, বোধহয় দেখাতে চাইলেন যে প্রয়োজন হলে পাণ্ডবগণ যাদব বীরদের সাহায্যও পাবে। হস্তিনাপুরে তাদের যথারীতি অভ্যর্থনা করা হল, পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিদের প্রণাম জানালেন। ধৃতরাষ্ট্র তাদের বিশ্রাম করে ক্লান্তি দূর করতে বললেন। দুতিন দিন পরে পাণ্ডবদের ডাকিয়ে বললেন, জ্ঞাতি বিরোধের মূল উৎপাটন করা কর্তব্য, তাই এই হস্তিনাপুর রাজ্য দুইভাগ করে তোমাদের ও আমার পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া স্থির করেছি; হস্তিনাপুর নগর সহ কুরুরাজ্যের পূর্বার্দ্ধ ধার্তরাষ্ট্রদের দখলে থাকবে, তোমরা কুরুরাজ্যের পশ্চিমভাগ নিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদের রাজধানী স্থাপন করে নিতে পার। পাণ্ডবগণ সেভাবে রাজ্য বিভাগ মেনে নিলেন, যদিও বনভূমি হতে বৃক্ষগুল্মাদি কেটে নূতন রাজধানী পত্তনের ভার তাদের নিতে হল। তাঁরা কৃষ্ণ ও বলরাম সহ খাণ্ডবপ্রস্থে গেলেন, যেখানে সাময়িক বাসস্থান সবার জন্য ঠিক করে নিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে পরামর্শ করে নূতন রাজধানীর পরিকল্পনা করলেন, জঙ্গল কেটে স্থপতি ও নগরশিল্পী নিয়োগ করে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে নূতন নগর গড়ে তুললেন,

সেটিকে প্রাকার বেষ্টিত করা হল, নাম দেওয়া হ'ল ইন্দ্রপ্রস্থ। তারপর কৃষ্ণ ও বলরাম পাণ্ডবদের নিকট হতে বিদায় নিয়ে দ্বারকায় চলে গেলেন।

৮. আদিপর্ব—অর্জুন বনবাস ও সুভদ্রা হরণ; খাণ্ডব-বন-দহন

পঞ্চ ভ্রাতার একটি সুন্দরী স্ত্রী হওয়াতে স্বভাবতই কৃষ্ণার সহ সঙ্গ করা সম্বন্ধে পাণ্ডবগণ একটা নিয়ম করে নিয়েছিলেন, কৃষ্ণা পর্যায়ক্রমে এক এক ভ্রাতার সঙ্গ করবে, এক ভ্রাতার সহিত সঙ্গকালে অন্য কোন ভ্রাতা সঙ্গাভিলাষে কৃষ্ণার কাছে গেলে তার একবৎসর একমাস বনে নির্বাসন স্বীকার করে নিতে হবে। কৃষ্ণার প্রথমে লক্ষ্যভেদকারী অর্জুনের প্রতি বেশী আকর্ষণ ছিল; যুধিষ্ঠিরের সহিত কৃষ্ণার সঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট পর্যায়কালে কৃষ্ণা একবার অর্জুনের সঙ্গে বিহার করেছিলেন। ফলে অর্জুনকে একবৎসর একমাসের জন্য বনে নির্বাসন স্বীকার করে নিতে হল। বনবাস কালে প্রথমে অর্জুন গঙ্গাদ্বারে গিয়ে যেখানে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি ছিল, সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে পুরাণকথা, বেদবেদাঙ্গ পাঠ ইত্যাদি শ্রবণ করতেন ও অগ্নিহোত্রাদি করতেন। একদিন স্নান করতে গঙ্গায় নেমেছেন, তখন কয়েকজন লোক তাঁকে নৌকায় উঠিয়ে দূরে একটি প্রাসাদে নিয়ে গেল, সেখানে একটি সুন্দরী নাগকন্যা দেখ্‌লেন এবং অগ্নিহোত্রের সব ব্যবস্থা দেখ্‌লেন। অর্জুন গঙ্গায় স্নান করে অগ্নিহোত্র করবেন মনস্থ করেছিলেন, সেই প্রাসাদেও অগ্নিহোত্রের ব্যবস্থা রয়েছে দেখে তিনি অগ্নিহোত্র সম্পন্ন করলেন, তারপর নাগ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে, এখানে কেন আমাকে আনা হয়েছে। কন্যা বল্‌ল, আমি কৌরব্য নামক নাগরাজের কন্যা উলূপী, তোমাকে দেখে আমার মনে তোমার প্রতি কামনার উদ্রেক হয়েছে, তাই তোমাকে পিতার প্রাসাদে আনিয়েছি। অর্জুন বললেন, আমি এখন বনবাসী ও ব্রহ্মচারী, তোমার কামনা কেমন করে পূর্ণ করব? উলূপী বল্‌ল, আমি তোমার ব্যাপার জানি; তুমি কৃষ্ণা সম্বন্ধে ব্রহ্মচারী ব্রত নিয়েছ, অন্য সকামা কন্যার কামনা পূরণে তোমার ব্রত নষ্ট হবে না, আমার কামনা পূরণ না করলে আমি খুব দুঃখ পাব। অর্জুন তার কথায় সম্মতি দিলেন, সেখানে আতিথ্য গ্রহণ করে রাত্রি উলূপীর সঙ্গে কাটালেন। পরদিন আবার নাগরাজের ভবন থেকে অর্জুন গঙ্গাদ্বারে তাপসদের কাছে ফিরে এলেন। সেখান থেকে

নানা তীর্থে ভ্রমণ করতে করতে অর্জুন প্রভাসে উপস্থিত হলেন। তিনি প্রভাসে এসেছেন শুনে কৃষ্ণ প্রভাসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলেন, অর্জুনের প্রভাসে আসবার কারণ জেনে নিলেন। তারপর তাকে অতিথির মত সমাদর করে রৈবতক পর্বতে নিয়ে গেলেন, সেখানে পর্বত, তীর্থ, নদী, বন ইত্যাদি দেখালেন, তারপর দ্বারকায় নিজভবনে নিয়ে গেলেন ও যাদব নায়ক ও কুমারদের সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন, তারাও অর্জুনকে অভ্যর্থনা করল। তারপর গিরিযজ্ঞ উপলক্ষ্যে রৈবতক গিরির একাংশ নানাভাবে সাজান হল, যাদব নায়ক ও কুমার কুমারীগণ রথে, শকটে ও পদব্রজে গিরি পরিক্রমা করে উৎসব করল। কুমারীদের মধ্যে একটি সুন্দরীকে দেখে অর্জুনের মন চঞ্চল হল, তা দেখে কৃষ্ণ তাকে উপহাস করে পরে বললেন এটি আমার বোন সুভদ্রা, সারণের সহোদরা। অর্জুন বললেন, তুমি যদি তোমার এই বোনের সঙ্গে আমার বিবাহ ঘটিয়ে দিতে পার, তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকব। কৃষ্ণ বললেন, ক্ষত্রিয়দের স্বয়ম্বরে ও হরণ করে কন্যা বিবাহ করা প্রশস্ত, স্বয়ম্বর করলে কন্যা কাকে বরণ করবে বলা যায় না, তুমি সুভদ্রাকে বিবাহার্থ হরণ করতে পার, আমার রথ সেজন্য তোমাকে দিতে পারি। অর্জুন কৃষ্ণের রথ নিয়ে সুভদ্রা গিরিদেবতাকে অর্ঘ্য দিয়ে যখন ফিরে যায়, তখন রক্ষীদের মধ্য হতে তাকে সহসা রথে তুলে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ অভিমুখে রথ চালিয়ে দিলেন। রক্ষীগণ ছুটে গিয়ে নায়কদের সমিতিগৃহে সংবাদ দিলে ভেরী বাজিয়ে নায়কদের সমবেত করা হ'ল, বলরাম ও অন্য অনেক নায়ক অর্জুনের আচরণে ক্রোধ প্রকাশ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ বললেন যে হরণ করে বিবাহ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রশস্ত, এবং অর্জুন সব দিক দিয়ে সুভদ্রার যোগ্য পাত্র; তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে বন্দী বা বধ করবার চেষ্টা না করে তাকে ও সুভদ্রাকে বন্ধুভাবে ফিরিয়ে এনে বিবাহ অনুষ্ঠান করলে ভাল হবে। কৃষ্ণের কথা যাদব নায়কগণ মেনে নিলেন, অর্জুন সুভদ্রাকে ফিরিয়ে এনে দ্বারকাতে তাদের বিবাহ অনুষ্ঠান করা হ'ল। যুধিষ্ঠিরকে সংবাদ পাঠান হ'ল, তিনি এই সম্বন্ধে আনন্দ প্রকাশ করে উত্তর পাঠালেন।

নির্বাসন কাল শেষ হলে অর্জুন সুভদ্রাকে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরলেন, সেখানে সুভদ্রা কুন্তীকে ও কৃষ্ণাকে প্রণাম করল, তারা তাকে আদর করে গ্রহণ ক'রলেন, যদিও কৃষ্ণা নতুন বিবাহ করে তাকে আনায় অর্জুনের প্রতি শ্লেষ করে প্রথমে কথা বলেছিলেন। অর্জুন সুভদ্রা ইন্দ্রপ্রস্থে পৌছাবার কয়েকদিনের মধ্যেই কৃষ্ণ, বলরাম, সারণ ও আরো অনেক যাদব নায়ক প্রচুর উপহার নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে

অর্জুনকে সেই সব উপহার দিলেন, যুধিষ্ঠির যাদব নায়কদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও সম্মান করলেন। কয়েকদিন বিবাহ সংক্রান্ত আনন্দ উৎসবের পরে বলরামের নেতৃত্বে অন্য যাদব নায়ক ও কুমারগণ দ্বারকায় ফিরে গেল, কৃষ্ণ আরো কিছুদিন পরে যাবেন বলে রয়ে গেলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থের বহির্দেশে নানাদিকে বেড়িয়ে দেখলেন, একদিন তাঁরা যমুনায় দীর্ঘকাল সন্তরণ করে যমুনাতীরস্থ এক উদ্যানভবনে কৃষ্ণা ও সুভদ্রার সঙ্গে বসে প্রচুর ভোজ্য ও পানীয় সেবন করলেন ও নৃত্যগীত উপভোগ করলেন, তারপরে তাঁরা দূরে যমুনা তীরস্থ বনে গিয়ে আলাপ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ বললেন, ইন্দ্রপ্রস্থের বহির্দেশে যমুনার তীরে বিস্তীর্ণ অরণ্য আছে, সেটাকে পুড়িয়ে ফেলে পরিষ্কার করলে সেখানে একটি সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠ্‌তে পারে। সেই অরণ্য খাণ্ডব বন, তার কিছুটা পরিষ্কার করে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর স্থাপিত হয়েছিল, বিস্তীর্ণ অংশ বনরূপেই ছিল। অর্জুন বললেন, এই বন পোড়াবার চেষ্টা পূর্বে করা হয়েছে, কিন্তু বনবাসী অনার্য ও আদিবাসী আগুন নিবিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে আবার বৃষ্টি হয়ে সব আগুন নিবিয়ে দেয়; আর বনে হিংস্র পশু, সর্প ইত্যাদি অনেক আছে, আগুন যদি সমস্ত বনে ধরে ওঠে, তারা বেরিয়ে এলে বিপদ ঘটাতে পারে। কৃষ্ণ বললেন, বনবাসীদের অন্যত্র চলে যাবার আদেশ দেওয়া যায়, যারা না গিয়ে আগুন নেবাতে চেষ্টা করবে, তাদের বধ করা হবে জানিয়ে দেওয়া যায়, আর বন্য পশুরা যেমন বেরিয়ে আসে, সংগে সংগে তাদের বধ করতে পারি তুমি আর আমি দুটি রথে অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকলে। অর্জুন বললেন, তার পূর্বে আমার উপযুক্ত কঠিন টান সহ ধনুক, এবং কঠিন চাপ সহ পাটাতনযুক্ত ও অস্ত্রের জন্য অনেক প্রকোষ্ঠযুক্ত একখানি রথ প্রস্তুত করে নিতে হবে। রথশিল্পী ও কর্মকার ডেকে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে অর্জুন একখানি সুদৃঢ় রথ ও স্বয়ম্বরের জন্য প্রস্তুত ধনুকের মত দৃঢ় কোদণ্ড যুক্ত ধনুক প্রস্তুত করালেন, কৃষ্ণও একটি বজ্রনাভ চক্র প্রস্তুত করালেন, তার নাভিদণ্ডে বদ্ধ গোচর্ম নির্মিত সূক্ষ্ম কিন্তু দৃঢ় রজ্জুকুণ্ডলীর মত জড়ানো, এবং নেমিকে বলয়াকার ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ ফলক; রজ্জুকুণ্ডলীর মত লক্ষ্যে নিক্ষেপ করলে তার নেমিফলক লক্ষ্য কেটে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়ে ক্ষেপ্তার হস্তে ঘূর্ণনের বেগে ফিরে আসে। রজ্জুকুণ্ডলী নিক্ষেপের বহুদিনের অভ্যাস না থাকলে এই বজ্রনাভ চক্র নিষ্ফল হয়, তাই যদিও কৃষ্ণ তাঁর বজ্রনাভ চক্র দিয়ে যুদ্ধে শত্রু বিনাশ করেছেন, অন্য রথীগণ সেরূপ চক্র ব্যবহারের চেষ্টা করেন নাই।

এইভাবে রথ ও অস্ত্র প্রস্তুতিতে কিছুকাল কাটিয়ে কৃষ্ণ ও অর্জুন প্রস্তুত হয়ে খাণ্ডবদাহের অনুমতি যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে নিয়ে দাহ করবার দিন স্থির করলেন, অরণ্যবাসীদের তা জানিয়ে দিয়ে বন ছেড়ে যাবার আদেশ পাঠালেন, নির্দিষ্ট দিনে বনের নানাস্থানে অগ্নিসংযোগ করে যে পথে পশু ও মানুষ নির্গত হতে পারে, সেখানে কাছাকাছি ভিন্ন ভিন্ন রথে থেকে কৃষ্ণ ও অর্জুন যত হিংস্র পশু ও সর্প বাইরে এল, তাদের বধ করলেন; বন্য জাতির লোকের মধ্যে যারা বন ছেড়ে না গিয়ে আগুন নেবাবার চেষ্টা করে বিফল হয়ে বাইরে এল, তারাও নিহত হ'ল। বনের মধ্যে দানবশিল্পী ময় ছিলেন, তিনি বাইরে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে জীবন ভিক্ষা চাইলে অর্জুন তাকে অভয় দিলেন, তা শুনে কৃষ্ণও তাকে যেতে দিলেন। বনদহনকালে আকাশে মেঘ হয়ে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু আগুনের শিখা উঁচু ও প্রখর হয়ে ওঠার বৃষ্টি পড়তে না পড়তে বাষ্পীভূত হয়ে গেল। বন পুড়ে কয়েকদিনের মধ্যে ভস্মে পরিণত হ'ল। ক্রমে সেখানে নানা দেশ থেকে আর্য উপনিবেশকারী এসে বসতি স্থাপন, ভূমি কর্ষন ও পশু পালন আরম্ভ করে একটি সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে তুলল।

অর্জুন সুভদ্রার বিবাহের বর্ষকাল বা তার কিঞ্চিদধিকাল পরে সুভদ্রা একটি সুন্দর পুত্র সন্তান প্রসব করে, তার নাম হয় অভিমন্যু। কালে শিক্ষিত হয়ে যে অর্জুনের সমকক্ষ অতিরথ হয়ে উঠেছিল। সুভদ্রার পুত্র জন্মের পরে কৃষ্ণার যুধিষ্ঠিরের ঔরসে একটি পুত্র জন্মে, তার নাম হয় প্রতিবিন্ধ্য। তার এক বৎসর পরে ভীমের ঔরসে কৃষ্ণার সুতসোম নামক পুত্র হয়, তার এক বৎসরান্তে অর্জুনের ঔরসে কৃষ্ণার শ্রুতকর্মা নামক এক পুত্র হয়। তারপরে এক এক বৎসর অন্তর নকুলের ঔরসে কৃষ্ণার শতানীক নামে এক পুত্র ও সহদেবের ঔরসে শ্রুতসেন নামে এক পুত্র হয়। কৃষ্ণার গর্ভে পুত্র জন্মের বিলম্ব দেখে অনুমান করা যায় যে অর্জুনকে যখন নির্বাসনে যেতে হল, সেই ত্রয়োদশ মাস কৃষ্ণাও ব্রহ্মচারিণী-রূপে বাস করেছেন, অন্য পতিদের সঙ্গে সহবাস করেন নাই। অর্জুন সুভদ্রাকে বিবাহ করে আনলে পরে কৃষ্ণা জ্যেষ্ঠানুক্রমে পঞ্চপতির প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন। সেই কারণেই বোধ হয় মহাপ্রস্থান কালে কৃষ্ণার পতন হলে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, এর অর্জুনের প্রতি বেশী পক্ষপাত ছিল, সেই দোষে এর পতন হ'ল। কিন্তু সেই পক্ষপাত কি অন্যায় বলা যায়?

পাণ্ডবগণের পুত্রগণ বেদবেদাঙ্গে শিক্ষাপ্রাপ্ত হ'ল, তার সঙ্গে অর্জুনের কাছে

থেকে তারা অস্ত্রবিদ্যা শিখ্‌ল, নানাবিধ অস্ত্র ও অস্ত্রের প্রয়োগ শিখ্‌ল। সুগঠিত দেহ মহারথ পুত্রদের নিয়ে পাণ্ডবগণ সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

৯. সভা পর্ব—দানবশিল্পী ময় কর্তৃক বিচিত্র সভাগৃহ নির্মাণ

খাণ্ডব বনদাহকালে অর্জুন দানবশিল্পী ময় যখন দাহ্যমান বন হতে নির্গত হয়, তার পরিচয় জেনে তাকে অভয় দিয়েছিলেন, অন্য আদিবাসীদের মত বধ করেন নাই। খাণ্ডব বন পুড়ে ভস্ম হ'য়ে গেলে একদিন ময়দানব অর্জুনের নিকট এসে বল্‌ল, আপনি আমাকে প্রাণ ভিক্ষা দিযেছিলেন, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? অর্জুন বললেন, আমি কোন প্রতিদান চাই না। ময়দানব বার বার বলায় কৃষ্ণ বল্‌লেন, আপনি বিখ্যাত শিল্পী, আপনি রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য একটি রমণীয় সভাগৃহ প্রস্তুত করে দিন, যা দানবীয় ও ভারতীয় স্থাপত্য বিদ্যার উপযুক্ত প্রয়োগে ভারতবর্ষে অতুলনীয় হবে। ময়দানব তাই করে দেবে বলে শুভদিনে কৃষ্ণ ও অর্জুন সমভিব্যাহারে চতুর্দিকে সহস্র হস্ত পরিমিত সমচতুরস্র ভূমি মাপ করে নিল। তার প্রস্তুতি চলছে এমন সময় কৃষ্ণ পাণ্ডবদের বল্‌লেন, বহুদিন এখানে কেটে গেল, এবার আমার দ্বারকায় ফিরতে হবে। তাঁর আজ্ঞায় তাঁর রথ যাত্রার জন্য সজ্জিত করা হ'ল; তিনি সুভদ্রা ও কৃষ্ণার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রথে উঠ্‌লেন, যুধিষ্ঠির রথে উঠে দারুকের হাত হতে প্রগ্রহ বা লাগাম নিয়ে নিজেই রথ চালাতে আরম্ভ করলেন, অর্জুন রথে উঠে কৃষ্ণকে চামর দিয়ে বাতাস দিতে সুরু করলেন, ভীম, নকুল, সহদেব রথের পিছনে পিছনে চল্‌লেন। কিছুদূর গেলে কৃষ্ণ বল্‌লেন, আপনারা অনেক দূর এসেছেন, এবার ফিরে যান। তখন আর একবার প্রণাম ও আলিঙ্গনের পালা শেষ করে পাণ্ডবগণ ফিরলেন, কৃষ্ণ তাঁর রথে দ্বারকায় চলে গেলেন।

ময় দানব অর্জুনের কাছে এসে বল্‌ল, আমি কিছুদিনের জন্য চলে যাব, বিন্দুসর নামক সরোবরের নিকটে হিমালয়ের উত্তরে আমি মণিমুক্তা সংগ্রহ করে বৃষপর্বার সভাগৃহ প্রস্তুত করেছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখি যদি দেওয়াল ও ভিত্তি-গাত্র হতে মণি বৈদূর্য সংগ্রহ করা যায়, আর শিল্পী ও শ্রমিক সংগ্রহ করে আনতে হবে। বলে ময়দানব পূর্ব-উত্তর দিকে যাত্রা করে কৈলাস ও ও মৈনাক পর্বতের কাছে হিরণ্যশৃংগ পর্বত ও বিন্দুসরের কাছে পৌঁছে গেল, সেখানে বৃষপর্বার পতিত সভাগৃহ হতে যথেষ্ট মণিবৈদূর্য সংগ্রহ করল। বিন্দুসরে বৃষপর্বার ব্যবহৃত স্বর্ণ-

বিন্দু চিহ্নিত গুরুভার গদা এবং দেবদত্ত নামক শঙ্খ নিমজ্জিত ছিল, ময় সেগুলিও সংগে নিল, পর্বত গাত্র হতে স্ফটিক যথেষ্ট পরিমাণে নিল, পরে শ্রমিক ও শিল্পী নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরল। গদা ভীমের ব্যবহারের উপযুক্ত বলে তাকে দিয়ে দিল, দেবদত্ত শঙ্খটি অর্জুনকে দান করল। তারপর বৎসর কাল ধরে সভাগৃহ প্রস্তুত করল। সভাগৃহ মধ্যে মণিবৈদূর্য খচিত কৃত্রিম পদ্ম ও মৃণালযুক্ত স্বচ্ছ জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরোবর আর ভিত্তি গাত্রে স্ফটিক, মণি-বৈদূর্য ইত্যাদি খচিত এমন ভাবে সমচতুরস্র কয়েকটি স্থান প্রস্তুত করল যে হঠাৎ দেখে জলপূর্ণ মনে হয়। সভাগৃহের দেওয়াল, ছাদের অভ্যন্তর ভাগ ইত্যাদি স্থানেও বিচিত্র কারুকার্য করল। সভাগৃহের চারিদিকে পুষ্পবৃক্ষশোভিত সরণি এবং পদ্মসরোবর হ'ল। এইভাবে চৌদ্দ মাসে অপূর্ব সভাগৃহ প্রস্তুত করে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিবেদন করল। তার যথেষ্ট প্রশংসা করে তাকে উপহার দিয়ে যুধিষ্ঠির সভা প্রবেশের দিন স্থির করলেন, সেদিন মাংগলিক অনুষ্ঠান করে যুধিষ্ঠির সভাগৃহে প্রবেশ করলেন, অনেক ঋষি মুনি ও অনেক রাজন্য সেদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যুধিষ্ঠিরের সভারোহণ উৎসব সম্বর্ধিত করলেন।

১০. সভা পর্ব—ইন্দ্রপ্রস্থের সমৃদ্ধি, রাজসূয় যজ্ঞের কল্পনা, জরাসন্ধ বধ

ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধ রাজ্য হয়ে উঠল। যুধিষ্ঠিরের সুশাসনের খ্যাতি ব্যাপ্ত হওয়ায় নূতন নূতন আর্যগোষ্ঠী এসে তাঁর রাজ্যমধ্যে নিবাস স্থাপন করল। খাণ্ডব বন ভস্মসাৎ হওয়ায় সেখানে শস্যক্ষেত্র, গোচারণভূমি ইত্যাদি সহ বিস্তীর্ণ জনপদ গড়ে উঠল। রাজ্যমধ্যে আরো বহু পতিত গুল্ম-তৃণাকীর্ণ ভূমি ছিল, সেগুলিও ধীরে ধীরে শস্যক্ষেত্র রূপে, বা পশুচারণ ভূমিতে, বা গ্রাম-জনপদ রূপে পরিণত হ'ল। ভীম ও অর্জুনের বীর্যের খ্যাতি হেতু কোন শত্রু রাজ্য বা সাম্রাজ্য স্থাপন প্রয়াসী রাজা ইন্দ্রপ্রস্থ আক্রমণ করতে সাহস করে নাই। তাই রাজ্যের পুষ্টি ব্যাহত কোন দিকে হয় নাই। যুধিষ্ঠির বেদনির্দিষ্ট যজ্ঞ শ্রদ্ধা করে সম্পন্ন করতেন ও ব্রাহ্মণদের বহু দান করতেন, বেদ-বেদাঙ্গ চর্চাতেও তাঁর স্পৃহা ছিল, তাই তিনি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের প্রিয় ছিলেন। যুধিষ্ঠির কোন বৃহৎ রাষ্ট্র আক্রমণ করে ইন্দ্রপ্রস্থ রাষ্ট্রভুক্ত করতে চেষ্টা করেন নাই, তবে ইন্দ্রপ্রস্থের

সংলগ্ন বা নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যাধিপতি পাণ্ডবরাষ্ট্রের ছত্রতলে এসে নিরাপদ হবার বাসনায় নিজেদের সামন্ত রাজা বলে যুধিষ্ঠিরকে অধিরাজ বলে মেনে নিল। বাইরে যেমন, রাজ অন্তঃপুরেও তেমন, এই সময় পাণ্ডবগণের সুখসমৃদ্ধির কাল। পাণ্ডবগণের পুত্রদের জন্মকথা পূর্বেই বলা হয়েছে, তবে তাদের জন্ম হয় খাণ্ডবদাহের পরে, ময়দানব কর্তৃক সভাগৃহ প্রস্তুতেরও পরে। অভিমন্যুর জন্মের পরে অন্নপ্রাশন-নামকরণ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণ দ্বারকা থেকে আসেন এবং সেই স্মার্ত যজ্ঞে প্রধান অংশ নিয়ে সুভদ্রাকে ও পাণ্ডবদের তুষ্টিসাধন করেন। কৃষ্ণার পুত্রদের জন্মের পরে তাঁর আসবার কথা জানা যায় না; তবে তাদের জন্মে রাজগৃহে আনন্দ উৎসব হতে থাকে তা বলাই বাহুল্য। পুত্রগণের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে আচার্যগণ তাদের বেদ বেদাঙ্গ শিক্ষা দেন, অর্জুন স্বয়ং তাদের অস্ত্রশিক্ষা দেন, তারা দ্রুত শিক্ষা আয়ত্ত করে পিতামাতাদের প্রীতি অর্জন করল। ঘরে বাইরে সুখ সমৃদ্ধি দেখে যুধিষ্ঠিরের পুরাকালের বিখ্যাত রাজাদের মত রাজসূয় যজ্ঞ করবার ইচ্ছা হ'ল, তবে তিনি তার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র হয়েছেন কিনা তাই স্থির করতে নানা লোকের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাঁর ভ্রাতৃগণ, পুরোহিত ধৌম্য, সভাসদ্‌গণ, এমন কি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি, যিনি মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ উপস্থিত হতেন, তিনিও যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির স্থির করলেন যে কৃষ্ণের পরামর্শ না নিয়ে তিনি অগ্রসর হবেন না। তিনি দূত পাঠিয়ে কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করলেন, কৃষ্ণও আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে এসে পাণ্ডবগণ, কুন্তী, সুভদ্রা, কৃষ্ণা প্রভৃতির সঙ্গে কুশল ও প্রণাম অভিবাদন বিনিময় করে বিশ্রামার্থ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে গেলেন। বিশ্রাম ও ভোজনের পরে যুধিষ্ঠির তাঁর সমস্যা জানালেন, বললেন তোমার কৃপায় আমার রাজ্যের বেশ সমৃদ্ধি হয়েছে, ভীম অর্জুনের মত বীর আছে, তাদের দ্বারা গঠিত ও শিক্ষিত চতুরঙ্গ সেনাদল আছে, সকলে বলছে যে আমি রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারি, কিন্তু তোমার মত না জেনে আমি অগ্রসর হতে চাই না। কৃষ্ণ বললেন, আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করবার উপযুক্ত বটে, কিন্তু এখন ভারতবর্ষে সবথেকে শক্তিশালী নৃপতি হলেন জরাসন্ধ, মগধরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বৃহদ্রথের পুত্র। তার একুশ অক্ষৌহিনী সৈন্য ও বহু বীর্যবান সেনাপতি আছে, এবং তার প্রতাপের ভয়ে হোক বা অন্য কারণে হোক, ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজন্য তার সমর্থনকারী। জরাসন্ধ থাকতে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবেন না, সম্মুখ সমরে তাকে জয় করা সম্ভব মনে করি না। কংস

তার জামাতা ছিল, কংস বধের পরে জরাসন্ধ একবার মথুরা অবরোধ করে আক্রমণ করে, সেবার আমরা অনেকটা দৈবের অনুগ্রহে জরাসন্ধের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারি; কিন্তু বার বার আক্রমণ করলে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না বিবেচনা করে যাদব নায়কদের মত নিয়ে আমরা পর্বত ও সমুদ্র রক্ষিত দ্বারকায় গিয়ে নিবাস স্থাপন করি। আমার মতে তাকে দমন করার একমাত্র উপায় তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয় ও বধ করা, ভীম, অর্জুন ও আমি যদি তার রাজধানী রাজগৃহে উপস্থিত হয়ে তাকে সঙ্গত কারণ দেখিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করি, তাহলে ক্ষত্রিয় ব্যবহার নীতি অনুসারে সে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না; সঙ্গত কারণও আছে, কারণ সে তার সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিরোধ চেষ্টাকারী ছিয়াশিজন রাজন্যকে বন্দী করে কারাগৃহে রেখেছে, তার উদ্দেশ্য যে একশত জন রাজন্য বন্দী হলে তাদের সকলকে রুদ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে বলি দেবে; যজ্ঞে এককালে নরবলি হ'ত, কিন্তু এখন তা অধর্ম বিবেচিত হয়; আমরা গিয়ে জরাসন্ধকে বলব, আপনি এই অধর্ম উদ্দেশ্য ত্যাগ করে বন্দী রাজাদের মুক্তি দিন, বিকল্পে আমাদের একজনের সঙ্গে মরণ পণ করে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করুন। এই কথা শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, আমি জরাসন্ধের প্রতাপ সম্যক না বুঝে রাজসূয় যজ্ঞের কল্পনা করছিলাম, এখন মনে করছি যে সে কল্পনা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ হবে। তোমাকে, ভীমকে, অর্জুনকে শত্রুরাষ্ট্রে বিপদের মধ্যে সৈন্যবলশূন্যভাবে প্রেরণ করতে আমার মন উঠ্‌ছে না। কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন তিনজনেই যুধিষ্ঠিরকে উৎসাহবাণী দিলেন; অর্জুন বললেন, আমরা যদি জরাসন্ধ বধ করে আসতে নাও পারি; অন্ততঃ ছিয়াশি জন রাজন্যের মুক্তির জন্য বিপদবরণ পুণ্য কর্ম হবে। কিছুক্ষণ দ্বিধা করে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মে সম্মতি দিলেন। ভীম ও অর্জুনকে নিয়ে কৃষ্ণ গিরিব্রজ অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করলেন, গিরিব্রজের তোরণ দ্বার দিয়ে নগরে প্রবেশ না করে যেখানে নগর প্রাচীর পর্বতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সেখানে একটি চৈত্য বা বুরুজের উপর উঠে সেখানে রক্ষিত ভেরী এত জোরে বাজালেন যে ভেরীর চর্ম ছিঁড়ে গেল। রক্ষীরা শব্দ শুনে ছুটে এল; কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুনকে নিরস্ত্র ও স্নাতক বেশ-ধারী দেখে তাদের ব্রাহ্মণ মনে করে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা তাদের আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে কৃষ্ণ বললেন, রাত্রি হ'লে আপনাকে বলব। রাজা তাদের নিয়ে যজ্ঞগৃহে পাহারায় রাখ্‌তে বললেন। রাত্রি হলে কৃষ্ণ সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন; নিজেদের পরিচয় দিলেন, এবং বললেন, আপনি ছিয়াশি জন

রাজন্যকে রুদ্রের উদ্দেশ্যে বলি দিবার জন্য বন্দী করে রেখেছেন, তা বর্তমান আর্য ধর্ম বিরুদ্ধ ও অধর্ম ; আপনি হয় তাদের সকলকে মুক্তি দিন, না হয় আমাদের একজনের সঙ্গে মরণ পণ করে যুদ্ধ করুন। জরাসন্ধ বললেন, আপনাদের কথায় আমি আমার সংকল্পচ্যুত হ'ব না, দ্বন্দ্বযুদ্ধই করব, তবে যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত ; কাল আমি মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতিকে ডেকে নির্দেশ দিতে চাই যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমার মৃত্যু হলে আমার পুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষেক করবে। কৃষ্ণ বললেন, তাই করুন। পরদিন রাজা জরাসন্ধ মন্ত্রী, সেনাপতি, পুত্র সহদেব প্রভৃতিকে ডেকে পরিস্থিতি জানিযে বললেন, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমার মৃত্যু হলে সহদেবকে যেন রাজ্যে অভিষেক করা হয়। তারপরে প্রস্তুত হয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য ভীমকে বেছে নিলেন, বহুক্ষণ মল্লযুদ্ধের পরে জরাসন্ধ অবসন্ন হয়ে পড়লেন ও সেই সুযোগে ভীম তাকে বধ করলেন। কৃষ্ণ কারাগার হতে বন্দী রাজাদের মুক্তি দিয়ে বললেন, রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করতে ইচ্ছুক, আপনারা সকলে তাঁকে সেই যজ্ঞে সহযোগিতা দেবেন। কৃষ্ণের সম্মুখেই সহদেবকে মগধরাজ্যে অভিষেক করা হ'ল ; সহদেবও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন, এবং কিছু ধনরত্নাদি সহ একখানি রথ কৃষ্ণ ভীম-অর্জুনকে উপঢৌকন দিলেন। সেই রথে কৃষ্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে যুধিষ্ঠিরকে ঘটনা জানালেন, বললেন যে এখন আপনার রাজসূয় যজ্ঞ করাতে বাধা আসবে না। যুধিষ্ঠির বললেন, তোমার বুদ্ধিতেই এটা সম্ভব হ'ল। কৃষ্ণ তারপরে বিদায় নিয়ে দ্বারকায় ফিরে গেলেন, যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন।

১১. সভাপর্ব—রাজসূয় যজ্ঞের জন্য দিগ্‌বিজয় ও ধনরত্ন সংগ্রহ

কৃষ্ণ চলে গেলে অর্জুন বললেন, আমাদের এবার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট ধনরত্ন সংগ্রহার্থ অভিযান করতে হবে। যুধিষ্ঠির বললেন, শুভক্ষণে তোমরা এক একজন এক একদিক চতুরঙ্গ বাহিনী নিযে অগ্রসর হও, ধনরত্ন সংগ্রহ করে বৎসরকাল অন্তে, ফিরে আসবে। অর্জুন উত্তর দিকে অভিযান করলেন—ভীমসেন পূর্বদিকে, সহদেব দক্ষিণ দিকে ও নকুল পশ্চিম দিকে।

ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী নিযে অর্জুন উত্তরদিকে অগ্রসর হলেন,

কুলিন্দগণের দুটি জনপদ তিনি প্রথমে জয় করলেন, সুমণ্ডল রাজা তার সেনা নিয়ে অর্জুনের পক্ষে যোগ দিল, তাকে সঙ্গে নিয়ে শাকল দ্বীপ আক্রমণ করে সেখানকার রাজা প্রতিবিন্ধ্যকে পরাজিত করলেন, শাকল দ্বীপ ছাড়া সপ্তদ্বীপের রাজগণের সঙ্গেও অর্জুনকে যুদ্ধ করতে হ'ল, তীব্র যুদ্ধে অর্জুন তাদের পরাজিত করলেন। এই রাজ্যগুলি বর্তমান পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পাকিস্থানি পাঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশ বলে মনে হয়, পাঞ্জাব নদী বহুল, দুই নদীর মধ্যস্থিত দেশকেই দ্বীপ বলা হ'ত, পরে দোয়াব নাম হয়। সপ্তদ্বীপের রাজগণের মধ্যে অনেকে অর্জুনের সঙ্গে মিলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর আক্রমণ করে ভগদত্তের সম্মুখীন হলেন। মহাভারত যুগে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হিমাচল প্রদেশে বা তার অংশে অবস্থিত ছিল, পৌরাণিক যুগে ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ কামরূপ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে পরিচিত হয়েছিল। ভগদত্তও অসাধারণ বীর ছিলেন ও তাঁর কিরাত ও চীন সৈন্য যথেষ্ট ছিল। আটদিন তীব্র যুদ্ধ করে ভগদত্ত শ্রান্ত হয়ে অর্জুনের নিকট নতিস্বীকার করে প্রশ্ন করলেন, তোমার বীরত্ব দেখে সন্তুষ্ট হলাম, তুমি কি চাও? অর্জুন বললেন, আপনি আমার পিতা পাণ্ডুর সখা, আপনাকে আমি আদেশ দিতে পারি না, যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করেছেন, তাতে বহু দক্ষিণা দিতে হবে, আপনি প্রীতিভরে কিছু ধনরত্ন দান ক'রে সাহায্য করুন। ভগদত্ত যথেষ্ট ধনরত্ন অর্জুনকে দিলেন। সেখান থেকে উত্তরে গিয়ে অর্জুন অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, উপগিরি নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য হতে কর আদায় করলেন। সেখান থেকে এগিয়ে কুলূত রাজ্য আক্রমণ করলেন, বর্তমানে যা কুলু উপত্যকা, হিমাচল প্রদেশের অংশ। কুলূতের রাজা বৃহন্ত পরাজয় স্বীকার করে যথেষ্ট কর দিলেন, এবং কুলূতের রাজা হিসাবেই রয়ে গেলেন। কুলূতরাজের সাহায্যে অর্জুন কুলূতের উত্তরস্থ কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য জয় করে কর আদায় করে বিবগর্ধ নামক এক পৌরবরাজ কর্তৃক রক্ষিত দেশ, সম্ভবত, জম্মু, আক্রমণ করলেন; পৌরবরাজের সাহায্যার্থ আগত পার্বতীয় মহারথদের জয় করে অর্জুন পৌরব রাজের রাজধানী জয় করলেন, তারপর পর্বতবাসী দস্যুদের পরাভূত করলেন। তারপর কাশ্মীর দেশের উপর অভিযান করে তার নানা প্রদেশস্থ রাজগণকে বশীভূত করে কর আদায় করলেন। পরে অভিসারী নগরী, উরগানগরী, সিংহপুর, বাহ্লীক দেশ, দরদ ও কাম্বোজ দেশ জয় করে যথেষ্ট ধনরত্ন পেলেন, নানা জাতীয় অশ্ব, বিচিত্র কম্বল ইত্যাদিও করের অংশ রূপে লাভ করলেন, তার পরে পূর্বদিকে ফিরে এসে কিন্নর ও গন্ধর্বদের দেশ জয়

করলেন ; কিন্নরদের দেশ চিনি উপত্যকা তিব্বতসংলগ্ন কিন্তু আধুনিক উত্তর প্রদেশের অংশ ; গন্ধর্বদের দেশ ভারতের সীমানা থেকে উত্তরে কৈলাস পর্বত, মানস সরোবর পর্যন্ত বিস্তৃত। সে দুটি দেশ থেকে কর নিয়ে তিনি হরিবর্ষে—তিব্বতের মালভূমিতে—প্রবেশ করতে উদ্যত হলেন। হরিবর্ষের সীমানায় রক্ষীদল তাঁকে বলল, এই উচ্চমালভূমিতে যাদের জন্ম নয়, তারা এখানে বেঁচে থাকতে পারবে না, তুষারপুঞ্জ শীতাধিক্য, কুয়াসা ইত্যাদি বাধা হেতু সম্মুখে কি আছে তা দেখ্‌তে পাবেন না, সৈন্যদল হঠাৎ কোন গহ্বরে পড়ে আর উঠ্‌তে পারবে না। আপনি কি উদ্দেশ্যে এতদূর এসেছেন? অর্জুন রাজসূয় যজ্ঞের জন্য ধনরত্ন সংগ্রহের চেষ্টার কথা বললে তারা রেশমী বস্ত্র, বিচিত্র অলঙ্কার ও সুন্দর মৃগচর্ম উপহার দিল, তাই নিয়ে অর্জুন ফিরলেন। সেখান থেকে সমস্ত লব্ধ সম্পদ সাবধানে রক্ষা করে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট সব নিবেদন করলেন।

ভীম পূর্বদিকে অভিযান করে বহু দেশ জয় করলেন। পাঞ্চালরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কল্পনার কথা শুনে স্বেচ্ছায় ধনরত্ন দিলেন, চেদিরাজ শিশুপাল ভীমকে সসৈন্য উপস্থিত হতে দেখে অতিথিরূপে অভ্যর্থনা করে নিজ প্রাসাদে কিছুদিন রাখ্‌লেন, তারপর যজ্ঞের জন্য কিছু ধনরত্ন কর হিসাবে দিলেন। বিদেহ, কোসল, উত্তর কোসল, অযোধ্যা, দশার্ণ, কাশী ইত্যাদি রাজ্য ভীম যুদ্ধে জয় করে যজ্ঞের জন্য কর নিলেন। জরাসন্ধের মৃত্যুর পরে মগধের সামন্তরাজ দণ্ড ও দণ্ডধর নিজেদের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেছিল, তাদের পরাজিত করে ভীম কর আদায় করলেন ; রাজগৃহের রাজা সহদেব প্রীতিপূর্বক যজ্ঞের জন্য ধনরত্ন দিলেন। সহদেবের সাহায্য নিয়ে ভীম অঙ্গদেশ আক্রমণ করে কর্ণকে পরাজিত করে যজ্ঞের জন্য কর নিলেন, নিষাদরাজ ও কিরাত রাজকে পরাজিত করে যজ্ঞের জন্য ধনরত্ন নিলেন ; পরে সুহ্ম, বঙ্গ, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি দেশ জয় করে নিজের বীর্যের পরিচয় দিলেন। পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন, কৃষ্ণ বাসুদেবের সঙ্গে তিনি স্পর্ধা করে নিজেকে তার সমান বলে প্রচার করলেন, কিন্তু ভীমের কাছে হেরে গিয়ে কর দিলেন। এইভাবে অভিযান শেষ করে বিপুল ধনরত্ন সংগ্রহ করে ভীম ইন্দ্রপ্রস্থে এসে যুধিষ্ঠিরের নিকট সব ধনরত্ন নিবেদন করলেন।

সহদেব সৈন্যদল নিয়ে দক্ষিণ মুখে যাত্রা করলেন। তিনি শূরসেন রাজ্য, মৎস্য রাজ্য, অপর মৎস্যদেশ ও বিন্ধ্যপর্বতস্থ নিষাদরাজ্য জয় করে কর আদায়

করলেন। কুন্তিভোজে প্রীতিপূর্বক যজ্ঞের জন্য ধনরত্ন উপহার দিলেন। অবন্তি দেশে বিন্দ অনুবিন্দ তীব্র যুদ্ধ করে পরাজয় স্বীকার করে কর দিল। মাহীষ্মতী আক্রমণ করলে নীলরাজার সৈন্যদলসৃষ্ট অগ্নিপ্রবাহে সহদেবের সৈন্যদল প্রথমে বিপর্যস্ত হল; শুষ্ক তৃণভূমিতে অনুকূল বায়ুপ্রবাহ তীব্র অগ্নিস্রোত সৃষ্টি করে, তবে তৃণ দগ্ধ করে অগ্নি অবশেষে শান্ত হয়। অগ্নি শান্ত হলে সহদেব তার সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে যান ও জয়লাভ করেন। নীলরাজ কিছু ধনরত্ন কর হিসাবে দেন। ভোজকটরাজ রুক্মী ও বিদর্ভরাজ ভীষ্মক কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বিবেচনা করে স্বেচ্ছায় রাজসূয় যজ্ঞের জন্য ধনরত্ন উপহার দিলেন। তারপর সহদেব শূর্পারক তালাকট, দণ্ডক প্রভৃতি অনার্য অধ্যুষিত রাজ্য জয় করে যজ্ঞার্থ কর আদায় করেন; পাণ্ড্যরাজ, দ্রাবিড়রাজ, লঙ্কাধিপতি প্রভৃতির কাছে সহদেব দূত পাঠিয়েই যজ্ঞের জন্য কিছু কিছু কর প্রাপ্ত হন। এইভাবে অভিযান সমাপ্ত করে সহদেব ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যুধিষ্ঠিরের হস্তে সংগৃহীত ধনরত্ন তুলে দেন।

নকুল অভিযান করেন পশ্চিম দিকে। দক্ষিণ পাঞ্জাবস্থ রোহিতক (বর্তমানে রোহতক) দেশ ও শৈরীষক দেশ (বর্তমানে হিসার) তীব্র যুদ্ধে জয় করে তিনি যজ্ঞের জন্য কর আদায় করলেন। তারপরে শিবি, ত্রিগর্ত, অম্বষ্ঠ, বাটধান প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করে গোধন ও যবধান্যাদি কর হিসাবে গ্রহণ করলেন। তারপর সিন্ধুকূলস্থ আভীরদের জয় করে কর আদায় করলেন, তারপর উত্তরে গিয়ে উত্তর জ্যোতিষ, দিব্যকটপুর ইত্যাদি জয় করে যথেষ্ট ধনরত্ন পেলেন। আবার দক্ষিণে গিয়ে রামঠ, হারহূণ, প্রভৃতি সৌরাষ্ট্র সন্নিহিতস্থ রাজ্য জয় করলেন, সেখানে অবস্থান করে দ্বারকায় বাসুদেবের নিকট দূত পাঠালেন, কৃষ্ণ বাসুদেবের কথায় যাদবগণ কিছু ধনরত্ন যজ্ঞের কর হিসাবে পাঠিয়ে দিল। পরে শাকল দ্বীপ পার হয়ে মদ্রদেশের রাজধানীতে গেলেন, সেখানে তার মাতুল শল্য তার উদ্দেশ্য জেনে প্রীতিভরে যজ্ঞার্থ ধনরত্ন দিলেন। এইভাবে ধনরত্ন, যব, ধান্য, গোযূথ সংগ্রহ করে নকুল ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরলেন ও লব্ধ সম্পদ যুধিষ্ঠিরের কাছে বুঝিয়ে দিলেন।

১২. সভাপর্ব—রাজসূয় যজ্ঞ ও শিশুপাল বধ

এইভাবে দিগ্‌বিজয় ও অর্থ সংগ্রহ শেষ হলে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞারম্ভের কথা চিন্তা করছেন, এমন সময় কৃষ্ণ যাদবকুলের একাধিক নায়ক নিয়ে এবং প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞের জন্য যুধিষ্ঠিরকে সেই ধনরত্ন দান করলেন।

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকেই রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষা নেবার কথা বল্লেন, কৃষ্ণ বল্লেন, আপনিই সম্রাট হবার উপযুক্ত পাত্র, আপনি যজ্ঞের দীক্ষা নিন। তখন যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের যজমান রূপে দীক্ষা নিলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যজ্ঞের ব্রহ্মা বা প্রধান ঋত্বিক হয়ে হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্গাতা রূপে ভিন্ন ভিন্ন ঋত্বিক নিয়োগ করলেন॥ যুধিষ্ঠির সহদেবকে ও মন্ত্রীদের আদেশ দিলেন, ধৌম্যের পরামর্শমত যজ্ঞের সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ যথাসম্ভব দ্রুত সংগ্রহ কর; ইন্দ্রসেন, বিশোক প্রভৃতি সারথিদের যজ্ঞ সম্ভার বয়ে আন্তে নিযুক্ত কর। যজ্ঞের দিন স্থির করে যুধিষ্ঠিরের আদেশ মত ভারতের সমস্ত রাজন্যবৃন্দের নিকট যজ্ঞে উপস্থিত হবার আমন্ত্রণ দিয়ে দূত পাঠানো হ'ল; ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, ধার্তরাষ্ট্রদের আমন্ত্রণ করতে নকুল নিজে গেলেন, তাঁরা যথাকালে যজ্ঞের জন্য কিছু ধনরত্ন উপহার নিয়ে সকলেই উপস্থিত হলেন। সপুত্র দ্রুপদরাজ, শাল্ব, প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্ত, পার্বতীয় মহারথ রাজগণ, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, কুন্তিভোজ, ভীষ্মক, ইত্যাদি প্রায় সব রাজন্যই যথাকালে উপস্থিত হলেন। রাজ্যের প্রধান বৈশ্য শূদ্রগণকেও যজ্ঞে আমন্ত্রণ দেওয়া হ'ল। সকলের জন্য পাণ্ডবগণ যথাযোগ্য আবাসস্থান শয্যা ও ভোজনের ব্যবস্থা করলেন।

যজ্ঞ আরম্ভ হবার পূর্বে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নানা কার্যের ভার ভাগ করে দেওয়া হল; যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদিকে প্রণাম জানিয়ে এবং উপস্থিত রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে কর্ম বিভাগ করে দিলেন—দুঃশাসনকে দিলেন ভোজ্যপেয় দ্রব্যের রক্ষা ও পরিবেশনের অধ্যক্ষতা, অশ্বত্থামাকে দিলেন ব্রাহ্মণদের অভ্যর্থনা করে তাদের নির্দিষ্ট আবাসে পৌঁছে দিয়ে তাদের সুখসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখবার ভার, সঞ্জয়কে দিলেন রাজগণের অভ্যর্থনা ও দেখাশুনা করবার ভার; কৃপাচার্যকে দিলেন স্বর্ণ রজত ইত্যাদি রক্ষার ভার ও দক্ষিণাদানের ভার; দুর্যোধনকে দিলেন রাজন্যদের প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করে তার রক্ষণের ভার; ভীষ্ম দ্রোণের উপর দায়িত্ব দিলেন যে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কর্তব্য অকর্তব্য সম্বন্ধে কথা উঠ্‌লে তার মীমাংসা করে দেবেন। কৃষ্ণের উপর যজ্ঞ রক্ষার ভার দেওয়া হল—যজ্ঞে মাঝে মাঝে অনার্যদের আক্রমণ হ'ত, বিরোধী পক্ষের আক্রমণে বা পরস্পর বিবাদ হয়েও বিপর্যয় ঘটে যেত, তাই প্রত্যেকটি বৃহৎ যজ্ঞে রক্ষার সুবন্দোবস্ত করতে হ'ত।

যজ্ঞের আরম্ভে উপস্থিত সকল ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত ব্যক্তিকে অর্ঘ্যদানের প্রথা ছিল। ভীষ্মের উপদেশ নিয়ে যুধিষ্ঠির সহদেবকে বললেন,

কৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান কর। সহদেব তাই করলেন, কৃষ্ণও অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন। তখন শিশুপাল উঠে আপত্তি জানালো, যে কৃষ্ণ অর্ঘ্যদানের যোগ্য পাত্র নয়, তাকে অর্ঘ্যদান করে যজ্ঞকর্তা যুধিষ্ঠির উপস্থিত সকলের অসম্মান করেছেন। যুধিষ্ঠির শিশুপালকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন, ভীষ্ম বুঝিয়ে বললেন যে কৃষ্ণ বীর হিসাবে, বেদজ্ঞ হিসাবে, সকলের শ্রেষ্ঠ ও সর্বাংশে অর্ঘ্যের উপযুক্ত। শিশুপাল তীব্রভাবে কৃষ্ণের ও ভীষ্মের নিন্দা করল, অবশেষে স্বীয় মতানুবর্তী কয়েকজন রাজাকে নিয়ে যজ্ঞের দ্রব্যাদি নষ্ট করতে আরম্ভ করল। ভীম তাকে আক্রমণ কর্‌তে উদ্যত হলেন, কিন্তু ভীষ্ম ভীমকে নিবৃত্ত করে বল্‌লেন, শিশুপাল কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বাস করে না, কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করে তার বীর্য পরীক্ষা করুক। তখন শিশুপাল কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করল, যজ্ঞবাটের বহির্দেশে বিস্তৃত ক্ষেত্রে শিশুপাল ও তার অনুবর্তী কয়েকজন রাজা রথে অস্ত্রাদি সজ্জিত করে প্রস্তুত হ'ল। কৃষ্ণও তাঁর রথ সজ্জিত করে নিয়ে তাদের সম্মুখীন হ'লেন, তাঁর তীব্র আক্রমণের ফলে শিশুপালের অনুবর্তী রাজগণ রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করল, শিশুপাল যথাসাধ্য যুদ্ধ করে কৃষ্ণের অস্ত্রে নিহত হ'ল।[১] তখন শিশুপালের দেহের সৎকার করা হ'ল, তার পুত্রকে চেদির রাজা বলে অভিষেক করা হ'ল, বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় তখন অবশ্য ছিল না, শিরে মন্ত্রসহ জল ঢেলেই অভিষেক সম্পন্ন হ'ল। তারপরে নির্বিঘ্নে মহাসমারোহে যজ্ঞের সব অনুষ্ঠান নিয়মমত সম্পন্ন করা হ'ল। প্রাপ্ত ধনরত্নের অধিক ভাগ যুধিষ্ঠিরের আদেশ মত ব্রাহ্মণদের ও ঋত্বিক্‌দের দক্ষিণা হিসাবে দিয়ে দেওয়া হ'ল, তাতে ঋত্বিক ও ব্রাহ্মণগণ খুব সন্তোষ প্রকাশ করল, ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ জানাল।

যজ্ঞ সমাপ্তির পরে উপস্থিত রাজগণ যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট বলে অভিনন্দন করলেন। তারপর স্বদেশে ফিরবার অনুমতি চাইলেন। যুধিষ্ঠির তাদের ধন্যবাদ দিয়ে স্বদেশে ফিরবার অনুমতি দিলেন, তাঁর আদেশে তাঁর ভ্রাতৃগণ, পাণ্ডবপুত্রগণ, মন্ত্রীগণ রাজগণের অনুগমন করলেন, অর্থাৎ কিছুদূর তাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে সম্মান দেখালেন। অভিমন্যু ও দ্রৌপদী পুত্রগণ পার্বতীয় মহারথদের অনুগমন কর্‌ল—

১। উদ্যোগের ২২।২৫-২৯

তখন তারা নিতান্ত শিশু নয়; অভিমন্যু অনুমান ১৮।১৯ বৎসর বয়স্ক, দ্রৌপদেয়-গণ ১৭।১৮ থেকে ১৩।১৪ বৎসর বয়স্ক।

১৩. সভাপর্ব—দ্যূত ও অনুদ্যূত

রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্তির পরে জ্ঞাতিদের প্রতি সৌহার্দ্য দেখাতে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে কয়েকদিন ইন্দ্রপ্রস্থে থেকে যেতে বললেন। দুর্যোধন শকুনিকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্য রয়ে গেলেন। যজ্ঞকালেই যুধিষ্ঠিরের সম্পদ ও উপহারের প্রাচুর্য দেখে দুর্যোধনের মনে ঈর্ষা জেগেছিল, ময় নির্মিত অপূর্ব সভাগৃহ দেখে এবং ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য দেখে সেই ঈর্ষা আরো প্রবল হয়ে উঠলো,। হস্তিনাপুরে ফিরে যাবার পথে শকুনিকে দুর্যোধন বলে উঠলেন, তুমি চলে যাও, যুধিষ্ঠিরের তুলনায় হীন ও দরিদ্র হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না। তাকে শকুনি বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেল, তাকে বলল যে যুধিষ্ঠিরের সব ঐশ্বর্য আমি দ্যূত ক্রীড়াযোগে তোমার করায়ত্ত করে দেব, তুমি তোমার পিতাকে বলে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ার জন্য আমন্ত্রণ কর। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দুর্যোধন ও শকুনি তাদের উদ্দেশ্য জানালো, ঐশ্বর্যের বিশদভাবে বর্ণনা করল। ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে দ্যূত ক্রীড়ার নিমন্ত্রণ করতে সম্মত হন নাই; ইতস্ততঃ করছিলেন, দুর্যোধন আত্মহত্যা করবার ভয় দেখিয়ে তার সম্মতি করালেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডাকিয়ে বললেন, তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য আমন্ত্রণ করে নিয়ে এস। বিদুর দ্যূতক্রীড়ার কুফলের কথা বলতে গেলেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তার আপত্তি অগ্রাহ্য করে তার আদেশ বলবৎ রাখলেন। তাই বিদুরকে ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার আমন্ত্রণ জানাতে হ'ল। যুধিষ্ঠির বললেন, দ্যূত ক্রীড়ার ফলে বহু অনর্থ হয়। বিদুর বললেন, সেকথা আমি মহারাজকে বলেছিলাম, তবু তিনি আদেশ দিলেন, এখন তুমি যা ভাল বিবেচনা কর, তাই করতে পার। যুধিষ্ঠির বললেন, দ্যূতে আমন্ত্রিত হয়ে নিবৃত্ত হওয়া ক্ষত্রিয়দের ধর্ম নয়, অতএব আমি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

ভ্রাতৃগণকে ও স্ত্রীগণকে নিয়ে ও কিছু পরিচারক সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে গেলেন। সেখানে কুরুস্ত্রীগণ দ্রৌপদীর শ্রী ও মূল্যবান অলঙ্কার দেখে ঈর্ষা কাতর হয়ে তার সঙ্গে নির্লিপ্তভাবে কথাবার্তা বলল। পরদিন যুধিষ্ঠির দ্যূত সভায় উপস্থিত হয়ে বললেন, কার সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া করতে হবে? দুর্যোধন-

উত্তর দিলেন, আমার মাতুল শকুনি আমার প্রতিনিধি হয়ে দ্যূতক্রীডা করবে, আমি পণের অর্থের জন্য দায়ী থাক্‌ব। যুধিষ্ঠির বললেন, একজনের আহ্বানে দ্যূতক্রীড়া করতে এসে তার প্রতিনিধির সঙ্গে দ্যূতক্রীডা করা কেমন হবে? শকুনি, তুমি দ্যূতক্রীডায় নিপুণ, ছল করে আমাকে পরাজিত কোর না। দ্যূত-ক্রীডা থেকে অকপট যুদ্ধ শ্রেষ্ঠ, আর্যগণ ছল করে রাজ্য বা অর্থ জয় করতে চান না। শকুনি বললো, তোমার যদি ভয় থাকে, তবে নিবৃত্ত হও। যুধিষ্ঠির বললেন, দ্যূতের আহ্বানে এসে নিবৃত্ত হব না।

তার পরে দ্যূতক্রীডা আরম্ভ হ'ল। যুধিষ্ঠির বললেন, আমি মহামূল্য মণি মুক্তা খচিত এই সোনার হার পণ করছি, তোমার পণ কি? দুর্যোধন বল্‌লেন, আমারও যথেষ্ট মণি মুক্তা সঞ্চয় আছে, তা নিয়ে গর্ব করি না, তুমি দ্যূতে জয় লাভ করলে তা দেব। প্রতিপণ ঠিক নির্দিষ্ট হ'ল না, কিন্তু ইতিমধ্যে শকুনি পাশার দান ফেলে বল্‌ল, এই পণ জিতে নিলাম। দুর্যোধন ও শকুনির আচরণ থেকে অনুমান করা সঙ্গত, যে কোনরকম ছল করে শকুনি পাশার দান ফেলছিল, শকুনি ও দুর্যোধনের জানা ছিল যে কোন দানই যুধিষ্ঠির জিততে পারবেন না।

দ্বিতীয়বার খেলার পূর্বে যুধিষ্ঠির বললেন, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা (নিষ্ক) পূর্ণ বহু ভাণ্ড আমার কোষে আছে, তাই পণ করছি। শকুনি পাশার দান ফেলে বলল, তা সব জিতে নিলাম।

তৃতীয় বার খেলার সময় যুধিষ্ঠির বললেন, যে অষ্ট-অশ্ব-বাহিত রাজরথে আমরা এসেছি, সেই ব্যাঘ্রচর্মের আস্তরণযুক্ত, সোনার জালের ঝালর যুক্ত রথ, যার মূল্য সহস্র রথের সমান, তাই পণ করছি। শকুনি দুষ্টকৌশলে পাশার দান ফেলে বল্‌ল, তা জিতে নিলাম।

চতুর্থ বার খেলার সময় যুধিষ্ঠির বললেন, আমার সহস্র তরুণী দাসী আছে, তারা সুন্দর বেশ ভূষায় সজ্জিত, নৃত্যগীত পারদর্শিনী, সেবা কুশল ; আমার সেই ধন পণ করছি। শকুনি কৌশলে পাশার দান ফেলে বল্‌লো, তা জিতে নিলাম।

তার পরে যুধিষ্ঠির ক্রমান্বয়ে (৫) সহস্র সুশিক্ষিত যুবক পরিচারক (৬) সহস্র শিক্ষিত হস্তী, (৭) যুদ্ধরথ সহ বহুরথী, (৮) গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের (অঙ্গারপর্ণের) প্রদত্ত পাঁচশত গন্ধর্বদেশীয় অশ্ব (৯) বাহন সংযুক্ত দশ সহস্র শকট, এবং (১০) চারশত স্বর্ণপূর্ণ তামার বা লোহার ভাণ্ড—পণ করলেন ; শকুনি প্রতিটি পণিত দ্রব্য কৌশলে পাশার দান ফেলে জিত নিল।

এই সময় বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে দ্যূত ক্রীড়ার অনিষ্টতা, এবং শকুনির ছলনার কথা নিবেদন করলেন; বললেন যে দুর্যোধনের এই পাপে কুরুকুল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। ধৃতরাষ্ট্র কোন উত্তর করলেন না। দুর্যোধন বিদুরকে ভর্ৎসনা করে চুপ করে থাক্‌তে বলে শকুনিকে বললেন, দ্যূতক্রীড়া চালিয়ে যাও। যুধিষ্ঠিরকে তখন দ্যূতের নেশা পেয়ে বসেছে, তিনি (১১) তাঁর অবশিষ্ট ধন, (১২) তাঁর সব গো, অশ্ব, ছাগ, মেষের যূথ, (১৩) তাঁর রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ ও রাজ্য, (১৪) রাজপুত্রদের—অর্থাৎ ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবের—পরিহিত মহার্ঘ বসন ভূষণ রাজি, (১৫) নকুল, এবং (১৬) সহদেবকে পণ করে সব হারলেন।

তারপর যুধিষ্ঠিরকে স্তব্ধ দেখে শকুনি বিদ্রূপ করে বল্‌ল, তুমি মাদ্রীপুত্রদের পণ রেখে হারালে, কিন্তু তোমার সহোদর অর্জুন ও ভীমকে কখনও পণ রাখ্‌তে পারবে না। শুনে যুধিষ্ঠির (১৭) অর্জুনকে, ও (১৮) ভীমকে পণ রেখে কপট দানে হেরে গেলেন। শকুনি বল্‌ল, তুমি দ্রৌপদীকে পণ কর নাই। যুধিষ্ঠির তখন (১৯) দ্রৌপদীকে পণ করলেন, এবং কপট পাশার দানে হেরে গেলেন। তখন দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতি হর্ষে মত্তপ্রায় হ'ল, ধৃতরাষ্ট্রও তাঁর হর্ষ গোপন রাখতে পারলেন না।

দ্রৌপদীকে দ্যূতপণে জয় করে দুর্যোধন উৎফুল্ল হয়ে বিদুরকে বললেন, দ্রৌপদীকে সভায় আনো, সে সভাগৃহ ঝাটু দিয়ে পরিষ্কার করে দাসীদের সঙ্গে থাকুক। বিদুর বললেন, দ্রৌপদীকে অপমান করলে অত্যন্ত কুফল হবে। দুর্যোধন তখন প্রতিকামী বা সংবাদবাহককে আদেশ দিলেন, তুমি গিযে দ্রৌপদীকে সভায় আনো। প্রতিকামী দ্রৌপদীর নিকট গিয়ে জানালো, যুধিষ্ঠির দ্যূতের নেশায় আপনাকে পণ করে হেরেছেন, এখন দুর্যোধন দাসীভাবে কাজ করতে আপনাকে সভায় আস্‌তে বলছেন। দ্রৌপদী বললেন, তুমি গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এসো, রাজা পূর্বে আমাকে পণ করেছেন, না পূর্বে নিজেকে পণ করেছেন। প্রতিকামী সভায় গিয়ে সেকথা জানালে যুধিষ্ঠির মাথা নীচু করে রইলেন, দুর্যোধন বললেন, দ্রৌপদী সভায় এসে নিজেই সেই প্রশ্ন করুন। প্রতিকামী দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে সেকথা বল্‌লে দ্রৌপদী বল্‌লেন, ভগবান মানুষকে সুখ ও দুঃখ দেন, কিন্তু ধর্ম ত্যাগ না করলে শান্তি আসে; তুমি গিয়ে সভাস্থ সদস্যদের জিজ্ঞাসা কর, এস্থলে ধর্ম সঙ্গত কর্ম কি? প্রতিকামী সভায় গিয়ে সেকথা বললে সদস্যগণ কোন উত্তর দিল না। তা দেখে দুর্যোধন আবার প্রতিকামীকে বল্‌লেন, দ্রৌপদীকে সভায়

আনো, সভায় এসে সদস্যদের মত জানুক। প্রতিকামী ইতস্ততঃ করায় দুর্যোধন বললেন, প্রতিকামী ভীমকে ভয় পাচ্ছে ; দুঃশাসন, তুমি গিয়ে দ্রৌপদীকে সভায় আনো। দুঃশাসন রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করে বললো, কৃষ্ণা, তুমি দুর্যোধন কর্তৃক বিজিতা হয়েছ, লজ্জা না করে সভায় এসে তাকে ভজনা কর। কৃষ্ণা তখন কুরুবৃদ্ধাদের আশ্রয় নিতে চাইলেন, কিন্তু দুঃশাসন দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে কৃষ্ণার চুল ধরে সভায় টেনে নিয়ে গেল। সভায় এসে কৃষ্ণা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনের দিকে লজ্জা রোষ ও দুঃখভরে তাকালেন, দেখ্‌লেন য তারাও লজ্জিত, ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত হয়ে আছে। ইতিমধ্যে দুঃশাসন কৃষ্ণাকে সবেগে নাড়া দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লো, তুমি দাসী হয়েছ ; তাকে কর্ণ, শকুনি, দুর্যোধন সমর্থন করে হাস্‌তে লাগ্‌লো। কৃষ্ণা বললেন, রজস্বলা একবস্ত্রা আমি প্রকাশ্য রাজসভায় কুরুবৃদ্ধদের সামনে থাকৃতে চাই না, আমাকে টেনে এনে যে অধর্ম করা হয়েছে, ভীষ্ম দ্রোণাদি কি তা বুঝ্‌তে পারছেন না ? আমি ধর্মতঃ জিতা হয়েছি না অজিতা আছি, তা তাঁরা বিচার করে বলুন। ভীষ্ম বল্‌লেন, কৃষ্ণা, তুমি যে প্রশ্ন তুলেছ, তুমি ধর্মতঃ জিতা কি অজিতা, সে প্রশ্নের অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন, সহসা তার উত্তর দেওয়া যায় না। দ্রৌপদী ক্রন্দনরুদ্ধ স্বরে বল্‌লেন, এই সভায় কুরুবৃদ্ধগণ আছেন, তাঁরা তাঁদের পুত্রদের পুত্রবধূদের শাসন কর্তা, তাঁরা বিচার করে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

দ্রৌপদীর অবস্থা দেখে ভীমের অত্যন্ত রাগ হল, তিনি বল্‌লেন, আমাদের রাজগৃহে বহু নটী আছে, তাদের কাউকে আমরা কোনদিন দ্যূতের পণ করি নাই ; রাজা যে আমাদের সব ধন ঐশ্বর্য পণ করে নষ্ট করেছেন, তাতে আমার তত দুঃখ নাই ; কিন্তু আমাদের সকলের প্রিয়া দ্রৌপদীকে পণ করে তাকে যে ক্লেশ দিয়েছেন, তা ক্ষমার যোগ্য নয় ; সহদেব, তুমি আগুন আনো, রাজার বাহুদ্বয় আজ দগ্ধ করব। অর্জুন বললেন, ভীম, আমাদের ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান কোর না, তিনি নিজের ইচ্ছায় তো দ্যূতক্রীড়া করেন নাই, ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক আহূত হয়ে দ্যূতক্রীড়া করেছেন। তখন দুর্যোধনের এক ভ্রাতা বিকর্ণ বললো, সভাসদগণ যে বিচার করে দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না, তা অত্যন্ত অন্যায় ; আমি আমার মত বলি, দ্যূত একটি ব্যসন, তাতে লিপ্ত হয়ে লোকে ধর্ম ভুলে যায় ; যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ার আহূত হয়ে দ্যূতের মত্ততায় নিজেকে প্রথমে পণ করে হারলেন, তারপরে পঞ্চ পাণ্ডবের সাধারণ স্ত্রীকে পণ করলেন, নিজে

বললেন, ধার্তরাষ্ট্রগণ ধর্ম অতিক্রম করে নিজেদের বিপদ উপস্থিত করেছে; যুধিষ্ঠির অজিত থাকতে যদি কৃষ্ণাকে পণ করে হারতেন, তাহলে কৃষ্ণা জিতা হত, কিন্তু নিজে জিত ও দাস হযে তার কোন অধিকার ছিল না কৃষ্ণাকে পণ করতে। দুর্যোধন বললেন, ভীম বা অর্জুন সে কথা বললে মেনে নিতে পারি। অর্জুন বললেন, রাজা যুধিষ্ঠির অজিত থাকতে আমাদের সবার প্রভু ছিলেন, কিন্তু জিত হয়ে দাস হয়ে তিনি কেমন করে আমাদের বা কৃষ্ণার প্রভু থাকতে পারেন?

সেই সময় ধৃতরাষ্ট্রের যজ্ঞগৃহে ও অন্যান্য স্থানে অশুভ লক্ষণ দেখা গেল। যজ্ঞগৃহে ঢুকে শৃগালের দল উচ্চ রব করতে লাগলো, বাইরে গর্দভের দল উচ্চস্বরে ডেকে উঠল, নানা অশুভ সূচক পাখীর ডাকও শোনা গেল। গান্ধারী ও বিদুর গিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে অশুভের প্রতিকার করতে বললেন, ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বললেন, তুমি কুলস্ত্রীকে সভায় এনে কুকথা বলে অমঙ্গল এনেছ। কৃষ্ণাকে ডেকে বললেন, তুমি পরমা সতী, আমার বধূদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমায় আমি বর দিতে ইচ্ছা করি। কৃষ্ণা প্রার্থনা জানালেন, আমার পতি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবকে দাসত্ব মুক্ত করে দিন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তাই হবে। ধৃতরাষ্ট্র আরো বর দিতে চাইলেন, কৃষ্ণা আর কোন বর চাইলেন না, ধৃতরাষ্ট্র স্বতঃ—প্রবৃত্ত হয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য রাজধানী ধন সম্পদ সব ফিরিয়ে দিলেন।

কর্ণ পাণ্ডবদের বিদ্রূপ করবার ইচ্ছা সম্বরণ করতে পারলেন না, বলে উঠলেন যে এ বড আশ্চর্য যে পাণ্ডবগণের উদ্ধার কর্তা হ'ল তাদের স্ত্রী। ভীম রেগে উঠে বললেন, আমি সব শত্রুকে এখনই ধ্বংস করি। যুধিষ্ঠির তাকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিবারণ করলেন, তারপর ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করলেন। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, তোমরা নিজ রাজধানীতে ফিরে গিয়ে যেমন রাজ্য ও ধনসম্পাদ ভোগ করছিলে, তাই কর, দ্যূতে অপমানের কথা ভুলে যাও, ধার্তরাষ্ট্রদের সঙ্গে সৌভ্রাত্র্য যেন তোমাদের বজায় থাকে। তাই হবে, বলে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণকে নিয়ে রথে আরোহণ করে ইন্দ্রপ্রস্থের পথে যাত্রা শুরু করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য সম্পদ সব ফিরিয়ে দিলে দুঃশাসন গিয়ে দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনিকে বলল, বৃদ্ধ রাজার কীর্তি দেখ, তিনি আমাদের সব প্রয়াস নষ্ট করে দিয়েছেন। দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে বললেন, রাজসভায় দ্রৌপদীর ও পাণ্ডবদের যে অপমান হয়েছে, তা তারা ভুলবে না, সৌভ্রাত্র্য পূর্বের মত অব্যাহত রাখবার আশা বাতুলতা, পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই আমাদের বিনাশ করবে,

তার থেকে তাদের আবার এনে তাদের রাজ্য দ্যুতক্রীড়ার ছলে আমাদের আয়ত্ত করে নিলে আমরা ধনরত্ন দিয়ে অনেক রাজাকে বশ করে আমাদের পক্ষে আনতে পারবো। ধৃতরাষ্ট্রও ঝোঁকের মাথায় পাণ্ডবদের সব ফিরিয়ে দিয়ে তার প্রতিক্রিয়া অনুভব করছিলেন, তিনি পাণ্ডবদের আবার দ্যূতের জন্য ডাকতে অনুমতি দিলেন। যুধিষ্ঠিরের কাছে ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বান আস্‌লে তিনি তাতে সাড়া দিলেন—দ্বিতীয় বার দ্যূতক্রীড়ার আহ্বানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না, দ্যূতের আহ্বানে একবার গেলেই ক্ষত্রিয়দের ধর্মপালন করা হ'ত, তবে বিপৎকালে বুদ্ধিমান ধার্মিক লোকেরও মতিভ্রম হয়। এইবার দ্যূতের পণ হ'ল যে, যে পক্ষ হারবে, তার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে, অজ্ঞাতবাসে প্রকাশ হ'লে আবার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করতে হবে। শকুনির পাশার দানে যুধিষ্ঠিরের পরাজয় হ'ল। পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী বনবাসের জন্য প্রস্তুত হলেন অজিন চর্ম ধারণ করে। বিদুরের কথামত কুন্তী বিদুরের গৃহে আশ্রয় নিলেন। পাণ্ডবগণ মৃগচর্ম পরিধান করে যাচ্ছেন দেখে দুঃশাসন তাদের বিদ্রূপ করতে লাগলো, বল্‌ল, তোমাদের ধনসম্পদের বড় গর্ব হয়েছিল, এখন কি হ'ল? দ্রৌপদীকে ডেকে বলল, তোমার এই ক্লীব পতিদের ত্যাগ করে আমাদের মধ্যে কাউকে বরণ কর, তাহলে বনে না গিয়ে সুখে থাকবে। শুনে ভীম বল্‌লেন, তুমি আমাদের মর্মঘাতী কথা বলে যাচ্ছ, যুদ্ধকালে তোমার মর্মচ্ছেদ করব। দুঃশাসন "গরু, গরু" বলে পাণ্ডবদের উপহাস করতে লাগ্‌লেন, ভীম আরো ক্রুদ্ধ হযে বল্‌লেন, যুদ্ধকালে তোর বুক চিরে রক্ত পান করব। অর্জুন বল্‌লেন, এসব কথা এখন বলে কি লাভ, তেরো বৎসর কেটে গেলে প্রতিকার করা যাবে। দুর্যোধন ভীমের গতির অনুকরণ করে তাকে উপহাস করছিলেন। ভীম বল্‌লেন, যুদ্ধকালে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির রক্ত পৃথিবী রঞ্জিত করবে।

এত বিপর্যয়ের মধ্যেও যুধিষ্ঠির তার ধৈর্য হারালেন না। ধৃতরাষ্ট্র ও অন্য কুরুবৃদ্ধদের নমস্কার ও অভিবাদন করে বল্‌লেন, আমরা যাই, আবার যথাসময়ে দেখা হবে।

পাণ্ডবগণ কৃষ্ণা সহ বিদুরের গৃহে গিয়ে কুন্তীর সঙ্গে দেখা করলেন, কুন্তী কৃষ্ণাকে আলিঙ্গন করে বল্‌লেন, বৎসে, তুমি শোকে ভেঙ্গে পোড়ো না, তুমি পতির প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ভাল করে জান, তোমাকে আর কি উপদেশ দেব? তুমি পতিদের বিশেষ করে সহদেবের, ভালো করে দেখাশোনা করবে। পুত্রদের

দিকে তাকিয়ে পাণ্ডু ও মাদ্রীর নাম করে চোখের জল ফেলে বললেন, এই দুর্দৈব কেন তোমাদের ভোগ করতে হচ্ছে, জানি না, আমারই দুর্ভাগ্য যে তোমাদের এই অবস্থায় দেখ্ছি। যা হোক, তোমরা বনে ধর্ম অবলম্বন করে থেক, ধর্মের জয় শেষ পর্যন্ত হবেই।

১৪. বনপর্ব (আরণ্যক পর্ব)—পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে নিবাস স্থাপন

দ্যূতে পরাজিত পাণ্ডবগণ সশস্ত্র হয়ে কৃষ্ণা সহ হস্তিনাপুরের পথ দিয়ে পদব্রজে গিয়ে প্রধান তোরণদ্বার দিয়ে নির্গত হলেন। তাদের পিছন পিছন হস্তিনাপুর-বাসী ব্রাহ্মণ ও অন্য জাতীয় প্রজাগণ এসে ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ প্রভৃতির ব্যবহারের নিন্দা করে তাঁদের সঙ্গে বনে যেতে চাইল। যুধিষ্ঠির তাদের বুঝিয়ে অনেক কষ্টে নিবৃত্ত করে গৃহে ফেরত পাঠালেন। প্রজারা বিদায় নিয়ে চলে গেলে যুধিষ্ঠিরাদি ইন্দ্রসেনাদি সারথি চালিত রথে উঠে ইন্দ্রপ্রস্থ অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রজাদের আচরণের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে প্রজানুরঞ্জন করা যেতে পারে। বিদুর বললেন, পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিন, এবং দুঃশাসন প্রকাশ্যভাবে দ্রৌপদী ও ভীমের প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক, তা হলেই প্রজাগণ সন্তুষ্ট হবে। তা শুনে ধৃতরাষ্ট্র সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বললেন, তুমি সর্বদাই পাণ্ডবগণের হিত ও আমার পুত্রদের অহিত কামনা কর, তুমি যেখানে খুসী চলে যাও, আমার রাজ্যে থাকবার দরকার নেই। শুনে বিদুর পাণ্ডবদের অনুসরণ করে তাদের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ বনে মিলিত হলেন, তাদের-সঙ্গে কথা আরম্ভ করার অল্পকাল পরেই সঞ্জয় এসে বিদুরকে মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুতাপ ও আহ্বানের কথা জানাল, বিদুর হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন।

পাণ্ডবগণ "বনবাসায় দীক্ষিত" হয়ে হস্তিনাপুর থেকে বেরিয়েছিলেন, তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁদের রাজ-প্রাসাদে না গিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের উপকণ্ঠে এক বনে আশ্রয় নিয়ে রাজ-প্রাসাদে সংবাদ পাঠালেন, সেখান থেকে দ্বারকায়, পাঞ্চালদেশে, চেদিরাজ্যে ও কেকয়দেশে দ্রুতগামী দূত পাঠিয়ে নিজেদের বিপর্যয়ের কথা জানালেন। প্রাসাদ হতে দীর্ঘকাল বনে বাসের জন্য পাচক, দাস, দাসী, রথ, সকলের সমস্ত অস্ত্র ও স্বকীয় যুদ্ধরথ, বস্ত্র, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভার ইত্যাদি আনিয়ে নিলেন।

অল্প কালের মধ্যে কয়েকজন বৃষ্ণিবীরকে নিয়ে কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু ও কেকয়রাজপুত্রগণ এসে বনে পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। কৃষ্ণ এসে বললেন, যা শুনলাম তাতে দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণ সত্য বধযোগ্য; আপনাদের ইন্দ্রপ্রস্থে যে শ্রী ও সম্পদ দেখে গিয়েছিলাম, তা ধার্তরাষ্ট্রগণ অন্যায় ভাবে হরণ করেছে; আমার ইচ্ছা বৃষ্ণিবীরদের নিয়ে যুদ্ধ করে তাদের শেষ করে দিয়ে আপনাদের রাজ্যশ্রী উদ্ধার করে দিই। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে তার শুভেচ্ছার জন্য সম্বর্ধনা করে বললেন, রাজগণের সামনে যে সময় যা পণ করেছি, সেটা রক্ষা করতে আমি ধর্মতঃ বাধ্য, তাই দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাসের পরে যদি প্রয়োজন হয়, যদি ধার্তরাষ্ট্রগণ তাদের সর্তমত আমাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ না করে, তবে তোমার ও বৃষ্ণিবীরদের সাহায্য নেব। ধৃষ্টদ্যুম্নাদি সেই কথায় অনুমোদন করলেন। কৃষ্ণ জানালেন, ইতিমধ্যে তাঁর অনুপস্থিতি কালে সৌভপতি শাল্বরাজ দ্বারকা আক্রমণ করে বহু অনিষ্ট করেছিল, তাঁকে শাল্বরাজের দেশে গিয়ে তার উপযুক্ত উত্তর দিয়ে আসতে হয়েছে। আলোচনা শেষ করে যুধিষ্ঠির তাঁর পণ রক্ষায় অটল দেখে কৃষ্ণ সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে নিয়ে বৃষ্ণিবীরগণ সহ দ্বারকায় ফিরলেন, সেখানে অভিমন্যুর শিক্ষা সমাপ্তির ব্যবস্থা হ'ল। ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঁচজন দ্রৌপদী-পুত্রকে নিয়ে পাঞ্চাল রাজধানীতে গিয়ে তাদের শিক্ষাপূর্তির ব্যবস্থা করলেন। চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু তার বোন করেণুমতীকে—নকুলের স্ত্রীকে নিয়ে দেশে ফিরলেন এবং কেকয় রাজপুত্রগণ তাদের বোন সহদেবের স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেল।

তারা চলে গেলে পাণ্ডবগণ যখন দূরে বনের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন ইন্দ্রপ্রস্থের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র প্রজাগণ এসে বলল, আপনার স্থাপিত এই সুন্দর পুরী, আপনার সুন্দর সভাগৃহ, আপনাদের ভক্ত প্রজা আমাদের ফেলে আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? পাণ্ডবগণের পক্ষে অর্জুন উত্তর দিলেন, রাজা বনে গিয়ে তপস্যা করে শত্রুদের ধন-মান-যশ জয় করবেন, আপনারা প্রার্থনা করুন সেই উদ্দেশ্য যেন সিদ্ধ হয়। প্রজাগণ ফিরে গেলে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কোন বনে গিয়ে বাস করি? অর্জুন বললেন, আমার মতে দ্বৈতবন আমাদের দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের উপযুক্ত বন, সেখানে সুপেয় জলপূর্ণ পদ্ম-কল্হার শোভিত সুন্দর সরোবর আছে, চারদিকে মৃগযূথ ও অন্যান্য পশুপূর্ণ ঘন বন আছে। যুধিষ্ঠির দ্বৈতবনে গিয়ে বনবাসের কাল কাটানো অনুমোদন করলেন,

তাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের নিজস্ব রথে দ্বৈতবন অভিমুখে যাত্রা করলেন, বিশজন ভৃত্য, যথেষ্ট ধনুঃশর, কোদণ্ড, মৌর্বী (ধনুর জ্যা), অন্যান্য অস্ত্র, পাণ্ডবভ্রাতাগণের বস্ত্রাদি, রন্ধনের সরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে তাদের অনুসরণ করল, আর কয়েকটি রথে দ্রৌপদীর ধাত্রী ও দাসীগণ দ্রৌপদীর বস্ত্র-অলঙ্কারাদি ও প্রসাধন দ্রব্যাদি নিয়ে তাদের সঙ্গে চলল। দ্বৈতবনে পৌঁছে সেখানে সুন্দর সরোবর ও গভীর বন, মধ্যে মধ্যে তপস্বীদের কুটির, দেখে পাণ্ডবগণ খুশী হলেন, এবং পুষ্প ও লতাজাল শোভিত একটি বৃক্ষের নিকটে এসে রথ হতে নামলেন। বনবাসী মুনি ঋষিগণ তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন, তাঁরাও প্রতি অভিবাদন জানালেন। সেই বিরাট বৃক্ষছায়ায় পাণ্ডবগণের ও তাঁদের অনুচরদের জন্য কুটির প্রস্তুত করা হ'ল, গোশালা অশ্বশালাও প্রস্তুত করা হ'ল। সেখানে মৃগ পক্ষী শিকার করে খাদ্য সংগ্রহ করে পাণ্ডবগণ দিন কাটাতে লাগলেন।

বনে বাস আরম্ভ করে কৃষ্ণা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করতে প্রচোদিত করতে লাগলেন। ধার্তরাষ্ট্রগণ ছল করে দ্যূত ক্রীড়ায় জিতেছে বুঝেও তাদের অন্যায় ক্ষমা করে যুধিষ্ঠির অনুদ্যূতের সর্ত পালন করতে চান, অন্যায়ের প্রতিকার চেষ্টা না করে ত্রয়োদশ বর্ষ রাজ্যহীন অবস্থায় কাটিয়ে দিতে চান, সেই মনোবৃত্তির নিন্দা করে বললেন যে ধর্মশাস্ত্র মতে সর্বদা সকলকে ক্ষমা করা উচিত নয়, সর্বদা সকলের উপর বীরত্ব প্রকাশ করাও উচিত নয়, উপযুক্ত পাত্রে ক্ষমা ও উপযুক্ত অবস্থায় বীরত্ব প্রকাশ করা কর্তব্য, দুর্যোধনাদি প্রথম থেকে যে ব্যবহার পাণ্ডবদের সঙ্গে করে এসেছে, সেই কথা স্মরণ করে তাদের ছল করে ত্রয়োদশ বর্ষ পাণ্ডবগণের রাজ্য অধিকার কখনও ক্ষমার যোগ্য নয়। যুধিষ্ঠির বললেন যে সত্য সম্পূর্ণভাবে পালন করাই তিনি ধর্ম মনে করেন, তাই তিনি করবেন। ভীম দ্রৌপদীর যুক্তির সমর্থন করে কথা বলেন। যুধিষ্ঠির তাকে বুঝান যে কৌরব পক্ষে অনেক মহাবীর আছে, শুধু ভীম ও অর্জুন তাঁদের সঙ্গে পেরে উঠবেন না; কৃষ্ণকে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলা হয়েছে যে তিনি অনুদ্যূতের সর্ত পালন করবেন, এখন তাদের আবার সাহায্যার্থ ডাকতে পারেন না। বনবাসের ত্রয়োদশ মাস পূর্ণ হলে ভীম বললেন এক এক মাসকে এক এক বর্ষের প্রতীক ধরে আমাদের ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস হয়েছে মনে করে রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করা যেতে পারে। যুধিষ্ঠির তাঁকে কাল পর্যায় সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

১৫. বনপর্ব : অর্জুনের ইন্দ্রলোকে গমন

এই সময়, বনে পাণ্ডবগণের ত্রয়োদশ মাস দ্বৈতবনে কাটলে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এসে অকস্মাৎ উপস্থিত হলেন, এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভূরিশ্রবা এবং আরো বহু শ্রেষ্ঠ বীর ধার্তরাষ্ট্রদের পক্ষে আছে, অর্জুন শ্রেষ্ঠতর অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত না করে তাদের জয় করতে পারবে না ; তোমাকে প্রতিস্মৃতিবিদ্যা শিখিয়ে দিচ্ছি, তুমি এই বিদ্যা আয়ত্ত করে অর্জুনকে শিখিয়ে দাও, তারপরে তাকে ইন্দ্রলোকে শ্রেষ্ঠ অস্ত্রের জন্য ও অস্ত্রশিক্ষার জন্য প্রেরণ কর ; তাছাড়া এক বনে বহুদিন একাদিক্রমে স্থিতি করা ঠিক নয়, তোমরা অন্য এক বনে গিয়ে এখন বাস আরম্ভ কর। ব্যাসের কথা শুনে পাণ্ডবগণ অনুচরদের নিয়ে দ্বৈতবন ছেড়ে সরস্বতী নদীর তীরে মরুভূমির নিকটস্থ কাম্যক বনে গিয়ে স্থিতি করলেন। সেখানে যুধিষ্ঠির কয়েকদিন অভ্যাস করে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা আয়ত্ত করে অর্জুনকে তা শিখিয়ে দিলেন, তার পরে ব্যাসের নির্দেশ অনুসারে তাকে ইন্দ্রলোকে গিয়ে শ্রেষ্ঠতর অস্ত্র সংগ্রহ করতে ও শ্রেষ্ঠতর অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে আসতে উপদেশ দিলেন।

ইন্দ্রলোক হিমালয়ের উত্তরে ও উত্তর পশ্চিমে আর্যদের পূর্বনিবাস ; অর্জুন সেখানে যেতে হিমবান্ (হিমালয়) গন্ধমাদন ও ইন্দ্রকীল পর্বত পার হয়ে যান। (৩৭।৪১-৪২)। পুরাণ মতে হিমবানের একদিকে কিম্পুরুষবর্ষ বা কিন্নরদের দেশ, কিন্নরদেশের অংশ এখন সিমলা হতে কিছু দূরে উত্তর প্রদেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে চিনি উপত্যকায় বিরাজিত আছে।[১] তার উত্তরে হরিবর্ষ, তিব্বতের মালভূমি। তার উত্তর পশ্চিমে ইলাবৃত বর্ষ, মধ্য এশিয়ায় আর্য নিবাস ছিল, যেখানে সমরখন্দ, বোখারা ইত্যাদি এখন অবস্থিত মনে হয় সেটাই ইন্দ্রলোক ; সেখানকার আর্য অধিপতি ইন্দ্র নামে পরিচিত হতেন। সেখান থেকে আর্যদের এক শাখা ভারতে আসেন। ভারতে এসে আর্যদের কথিত ভাষা কিছু পরিবর্তিত হয়েছিল ; মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত মূল আর্যভাষাকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা বলা হয়েছে। সেখানে অস্ত্রশিক্ষার জন্য বা অন্য কোন কাজের জন্য গেলে সেখানকার

১। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "মণিমহেশের" তৃতীয় সন্দর্ভ, কিন্নরদেশ, দ্রষ্টব্য। রাহুল সংকৃত্যায়নের "কিন্নর দেশে" গ্রন্থেও কিন্নর দেশের ভৌগোলিক অবস্থান বর্ণিত আছে।

ভাষা জানা প্রয়োজন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেশ হতে দেশান্তরে ভ্রমণ করতেন, তাঁর মধ্য এশিয়ার ভাষা জানা ছিল, সেই ভাষার জ্ঞানই প্রতিস্মৃতি বিদ্যা। যুধিষ্ঠির ভাষা শীঘ্র আয়ত্ত করতে পারতেন, যথা হস্তিনাপুরে থাকাকালে তিনি ম্লেচ্ছ ভাষা শিখেছিলেন, যা তাঁর ভ্রাতৃগণ শেখে নাই। এই জন্যই সম্ভবতঃ ব্যাস অর্জুনকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা নিজে না শিখিযে যুধিষ্ঠিরকে শিখিয়ে চলে গেলেন, যুধিষ্ঠিরের নিকট হতে অর্জুনও শিখে নিলেন, দুজনে সেই ভাষার কথা বললে শীঘ্র আয়ত্ত করা সম্ভব। এই বিদ্যা শিখে অর্জুন ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণার নিকট হতে বিদায় নিয়ে উত্তরে যাত্রা আরম্ভ করলেন।

পথে কিরাতদলপতি একজনের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়; হিমালয় অঞ্চলে কিরাতদের বাস ছিল, রাজা ভগদত্তের সৈন্যদলের মধ্যে কিরাতবাহিনী ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। অর্জুন একটি বরাহ লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করে সেটিকে পাতিত করেন, অন্যদিক থেকে কিরাতদলপতি লোকজনসহ এসেছিলেন, তিনিও বরাহটি লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করেন। বরাহটি কার শিকার হ'ল, কে পাবে, তা নিয়ে অর্জুন ও কিরাত নেতার মধ্যে বিবাদ বাধে, দুজনেই বলেন, আমি আগে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েছি। এইভাবে কথা কাটাকাটি থেকে তাদের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল; অর্জুন মনে করেছিলেন যে সহজেই তিনি কিরাত নেতার উপর জয়লাভ করবেন, কিন্তু কিরাত নেতা অর্জুনের সব বাণ যেন সহজেই কেটে দিলেন, তাঁর ক্ষিপ্রকারিতা ও ধনুর্বিদ্যাপটুতা দেখে অর্জুন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। অর্জুন যত বাণ ছোঁড়েন, সবই কিরাত নেতা কেটে ফেলেন। অর্জুনও কিরাতনেতা নিক্ষিপ্ত সব বাণ অর্দ্ধপথেই কেটে দেন। এইভাবে অর্জুনের বাণ ফুরিয়ে গেল, তখন অর্জুন বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করলেন, কিন্তু বাহুযুদ্ধেও কিরাতনেতা পটু, বহুক্ষণ চেষ্টার পরে অর্জুন বিপন্ন হয়ে পরাজয় স্বীকার করলেন। কিরাতনেতা অর্জুনের অস্ত্রশিক্ষা ও বাহুযুদ্ধ কৌশল দেখে প্রীত হয়েছিলেন, তিনি অর্জুনকে আশ্বাস দিয়ে বন্ধুভাবে গ্রহণ করলেন, এবং অর্জুনকে কিরাতদের ধনুর্বিদ্যা কৌশল শিখিয়ে দিলেন। কিরাতগণ প্রাক্-আর্য সভ্যতার ধারক বাহকদের মত পশুপতি শিবের উপাসক ও ধনুর্বিদ্যায় কুশল ছিল, কথিত আছে যে শিব তাঁর শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ্যা দিয়ে যজ্ঞকারী আর্যদের বিব্রত করেছিলেন। অর্জুন ইলাবৃতবর্ষে অস্ত্রশিক্ষার জন্য যাবেন জেনে কিরাতনেতা তাঁর যাত্রার সুবিধা করে দিলেন। কিরাত দেশের মধ্য দিয়ে সার্থবাহদল তাদের দ্রব্যসম্ভার নিয়ে ইলাবৃত বর্ষ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যাতায়াত

করত, কিরাতনেতা একটি ইলাবৃতবর্ষগামী সার্থবাহ দলের নেতার সঙ্গে অর্জুনের পরিচয় করে দিলেন। তাকে অভিবাদন জানিয়ে অর্জুন সার্থবাহদলের সঙ্গে ইলাবৃতবর্ষ বা ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হলেন।

ইলাবৃতবর্ষে তখন আর্যদের সমৃদ্ধির যুগ, অর্জুন সেখানকার রাজার সভায় গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন এবং আগমনের উদ্দেশ্য জানালেন, বললেন যে তিনি ইন্দ্ররাজের সেনানীদের সঙ্গে কাজ করে উন্নত যুদ্ধ কৌশল ও অস্ত্রচালনা শিখতে চান। ইন্দ্র ভারতের কুরুবংশের গৌরবের কথা জানতেন. অর্জুনকে কুরুরাজবংশের পুত্র জেনে তাকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন, এবং তার প্রার্থনা মত সেনানীদের মধ্যে তাকে স্থান দিলেন; বললেন, তুমি এখানকার অস্ত্রবিদ্যা পাঁচ বৎসর অভ্যাস করে আয়ত্ত কর, তারপরে গুরুদক্ষিণা দিয়ে দেশে ফিরতে পারবে। অর্জুন ইন্দ্রলোকের দক্ষ সেনানীদের নিকট হতে নূতন কৌশল যা দেখলেন তা শিখে নিলেন ও তাদের সঙ্গে অস্ত্রচালনা অভ্যাস করে যেতে লাগলেন। সেই সঙ্গে গন্ধর্ব চিত্রসেনের সাহায্যে ইন্দ্রলোকের নৃত্যগীত আয়ত্ত করতে লাগলেন ও পঞ্চবর্ষে বেশ পটুতা লাভ করলেন। অস্ত্রশিক্ষা শেষ হলে ইন্দ্রের নির্দেশে নিবাত-কবচ নামক অসুরদের বিরুদ্ধে অভিযান করে সেই ইন্দ্রলোকের বিঘ্নকারী অসুরদের প্রায় ধ্বংস করে ফেললেন। তারপরে অর্জুন দেশে ফিরবার অনুমতি পেলেন। ইন্দ্রলোকের কিছু কিছু বিশিষ্ট অস্ত্র তিনি ইন্দ্রের অনুমতিতে সঙ্গে নিয়ে আবার সার্থবাহ দলের সঙ্গে দেশে ফিরলেন। এই মধ্য এশিয়ার আর্য নিবাস ইন্দ্রলোক ও দেবলোক স্বর্গ সম্পূর্ণ পৃথক, মধ্য এশিয়ার সত্যই অসুর আর্যনিবাস ছিল, দেবলোক স্বর্গ কল্পনা বা সত্য তা কেউ বলতে পারে না।

১৩. বনপর্ব—পাণ্ডবগণের তীর্থযাত্রা

কাম্যক বন থেকে অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার জন্য যাত্রা করে গেলে যুধিষ্ঠিরাদি চার ভ্রাতা ও কৃষ্ণার আর সেখানে থাকতে ইচ্ছা হল না। তাঁরা স্থির করলেন অন্য কোথাও গিয়ে অর্জুনের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করবেন, বা তীর্থভ্রমণ করে চিত্ত বিনোদন করবেন। এই সময় তাঁরা লোমশ নামক একজন বহুতীর্থাভিজ্ঞ ঋষির সাক্ষাৎ পান। লোমশ ঋষি কাম্যক বনে আসেন ও যুধিষ্ঠিরাদি তাঁকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করেন। যুধিষ্ঠিরাদি তীর্থভ্রমণ করতে চান জেনে ঋষি বললেন, আমি যদিও সব তীর্থ ঘুরেছি তোমাদের পথ প্রদর্শক হয়ে আর একবার যেতে পারি। তিনি

প্রথম উপদেশ দিলেন, মহারাজ, ভ্রমণ করত হলে লঘুভার হতে হবে। বহু ব্রাহ্মণ পাণ্ডবগণের পাচক ও পরিচারকবৃন্দসহ বনে বাসের সুযোগ নিয়ে সেখানে এসে ভোজনের জন্য তাদের উপর নির্ভরশীল হয়েছিল। যুধিষ্ঠির আদেশ দিলেন, ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ যারা আমাদের আশ্রয় করেছেন, যারা পথশ্রম, ক্ষুৎপিপাসা, শীতাতপ ইত্যাদি কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না, যারা নানারকম মাংস ও মিষ্টান্ন ভোজের অভিলাষী, তারা সকলে ফিরে যান. তারা হস্তিনাপুরে গিয়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বা পাঞ্চাল নগরে গিয়ে রাজা দ্রুপদের আশ্রয় নিতে পারেন। সেই আদেশ মত অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ফিরে গেল, অল্প কয়েকজন তীর্থযাত্রার কষ্ট সহ্য করতে পারবে বলে রয়ে গেল। ইন্দ্রসেনাদি সারথি, রথ, অশ্ব, পাচক ও পরিচারকগণকে এবং দ্রৌপদীর ধাত্রী দাসীদের যুধিষ্ঠির সঙ্গে নিলেন; সকলে ভিন্ন ভিন্ন রথে উঠলে যাত্রা সুরু করা হল, স্থানে স্থানে যাত্রা বন্ধ করে নিত্য কর্ম, ভোজন ও শয়নের ব্যবস্থা করা হত। যুধিষ্ঠিরাদি লোমশ ঋষির নির্দেশ মত প্রথমে নৈমিষারণ্য পার হয়ে গোমতী নদীর তীরে তীর্থস্নান ও দেবপিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পন করেন। পরে কন্যাতীর্থ, অশ্বতীর্থ, গোতীর্থ হয়ে কালকোটি ও বিষপ্রস্থ নামক পর্বতে উঠে সেখানে একদিন কাটালেন। তারপর বাহুদা নদীতে স্নান করে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে স্নান ও তর্পণ করলেন। সেখান থেকে যাত্রা করে গয় রাজর্ষির পুণ্যভূমিতে গিয়ে গয়শির পর্বত, মহানদীর বেতসলতা শোভিত নির্ঝর-ধারা ও পবিত্রকূট পর্বত দেখলেন। সেখান থেকে গিয়ে ব্রহ্মসর নামক সরোবরের তীরে তাঁরা কিছুকালের জন্য বাস করলেন, সেখানে অগস্ত্য ঋষি দেহত্যাগ করেছিলেন— লোমশ ঋষির উপদেশ মত যুধিষ্ঠির সেখানে চাতুর্মাস্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন, তাই চার মাস সেখানে থাকতে হ'ল। সেখান থেকে তাঁরা গেলেন মণিমতী নগরে অগস্ত্যের আশ্রমে, মণিমতী পুরী ইল্বল-বাতাপি নামক অসুরদ্বয়ের অধীন ছিল, সেখানে অগস্ত্য ঋষি বাতাপি নামক অসুরকে নিধন করে ইল্বলের নিকট হতে বহু ধনরত্ন আদায় করেছিলেন। সেখানে যুধিষ্ঠিরাদি লোমশ ঋষির নিকট অগস্ত্য-লোপামুদ্রার কাহিনী শুনলেন। সেখান থেকে তীর্থযাত্রীগণ ভাগীরথী তীরে গেলেন এবং ভাগীরথীতে অবগাহন স্নান করে তৃপ্তি পেলেন। সেখানে লোমশ ঋষি বহু কাহিনী শোনালেন—যথা অগস্ত্যের সমুদ্র পান, সগর রাজার পুত্রগণের কপিল মুনির শাপে ভস্ম হওয়া, সগরপৌত্র অংশুমান কর্তৃক যজ্ঞীয় অশ্বের উদ্ধার এবং অংশুমান পৌত্র ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গাবতরন সাধন ও ভাগীরথীর প্রবাহ কপিল-

মুনির আশ্রমের নিকট দিয়ে নিয়ে গিয়ে ভস্মসাৎকৃত সগর পুত্রগণের সদ্‌গতি প্রাপ্তিকরণ।

গঙ্গানদী হতে যাত্রা করে যাত্রীদল হেমকূট পর্বত পার হয়ে কৌশিকী নদীর তীরে পৌছলেন। সেখানে রাজা লোমপাদের রাজ্য ছিল, লোমপাদ কিভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিয়ে তাকে দিয়ে যজ্ঞ করিয়ে অনাবৃষ্টি শুষ্ক দেশে ধারাবর্ষণ আনলেন, সেই কাহিনী লোমশ ঋষি সবিস্তারে বললেন। সেখান থেকে ধীরে ধীরে তীর্থযাত্রীদল গঙ্গাসাগর সঙ্গমে গিয়ে স্নান করলেন। তারপর সমুদ্রের তীর ধরে অগ্রসর হয়ে কলিঙ্গ দেশে বৈতরণী নদীর তীরে এলেন। সেই নদীতে যুধিষ্ঠির আবার স্নান ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পন করলেন, সাগরতীরে পৌছে সমুদ্রেও অবগাহন স্নান করলেন। তারপর সকলে মহেন্দ্র পর্বতে গেলেন। মহেন্দ্র পর্বত মহানদী ও গোদাবরী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী পূর্বঘাট পর্বতমালার অংশ; জনশ্রুতিমতে মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরামের জীবনের শেষভাগ কেটেছিল। সেখানে একরাত্রি বাস করে আরো দক্ষিণে সমুদ্র উপকুল ঘেঁষে চলে গোদাবরী সমুদ্র সঙ্গমে পৌছে সকলে স্নান করলেন। গোদাবরী নদী পার হয়ে যুধিষ্ঠিরাদি দ্রাবিড় রাজ্যের মধ্য দিয়ে সমুদ্রকূলের কাছ দিয়ে যেতে যেতে বহু সাগর তীর্থ দেখলেন, অবশেষে শূর্পারক তীর্থে উপস্থিত হলেন। সেখানে সমুদ্রের এক বাহু অতিক্রম করে তাঁরা একটি সুন্দর অরণ্য শোভিত দ্বীপে গেলেন, সেখানে অনেক যজ্ঞবেদী দেখলেন, লোক প্রবাদ মতে দেবগণ সেখানে যজ্ঞ করেছিলেন। শূর্পারক তীর্থে ফিরে সেখান থেকে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করে পথে অনেক তীর্থ দেখে তাঁরা অবশেষে প্রভাস তীর্থে উপনীত হলেন।

প্রভাসে যুধিষ্ঠিরাদি এসেছেন জেনে বলরাম, কৃষ্ণ, সাত্যকি প্রভৃতি বৃষ্ণিগণ এসে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বলরাম বললেন, বনবাসে যুধিষ্ঠিরাদির ক্লেশ ও হস্তিনাপুরে দুর্যোধনাদির সমৃদ্ধি দেখে লোকের মনে হতে পারে যে ধর্মপথে চললেই যে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়, সে ধারণা ভুল। সাত্যকি বলেন, যুধিষ্ঠিরাদির ক্লেশের কথা বলে মৌখিক সহানুভূতি না দেখিয়ে আমরা অভিযান করে পাণ্ডবদের রাজ্য উদ্ধার করে দিতে পারি, যুধিষ্ঠির যদি তার বনবাস অজ্ঞাত-বাসের পণ/পূর্ণ করতে চান, তাহলে অভিমন্যুকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ্যভার দিতে পারি, সেই এখন রাজ্যভার নেবার উপযুক্ত হয়েছে; ধর্মরাজ তার পণ পূর্ণ করলে অভিমন্যু তাঁকে রাজ্য ছেড়ে দেবে। কৃষ্ণ বললেন, রাজ্য উদ্ধার করতে

পাণ্ডবগণই সমর্থ, তা যখন পণের সর্ত পালন না করে তাঁরা করতে চান না, তখন আমাদের এখন কিছু করণীয় নাই, সময় পালন হয়ে গেলে যদি ধার্তরাষ্ট্রগণ রাজ্য ফিরিয়ে না দেয়, তবে আমরা প্রয়োজনমত পাণ্ডবদের সাহায্য করব। যুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণই ঠিক কথা বলেছেন ; সাত্যকিকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, সময় পালন করে আমরা তোমার সাহায্য নেব। বৃষ্ণিগণ বিদায় নিয়ে গেলে যুধিষ্ঠীরাদি প্রভাস তীর্থে স্নান তর্পণ করে সেখান থেকে বিদর্ভ রাজ্য স্থিত পয়োষ্ণী নদী তীর্থে গেলেন। সেখানে নৃগ রাজা সোমযজ্ঞ করে ইন্দ্রকে তৃপ্ত করেছিলেন, এই জনশ্রুতি আছে। পয়োষ্ণী নদীতে স্নান করে যুধিষ্ঠীরাদি আবার যাত্রা করে বৈদূর্য পর্বত ও নর্মদা নদী দেখ্‌লেন। লোমশ ঋষি বল্‌লেন, এখানে শর্য্যাতি রাজার রাজ্য ছিল, তাঁর কন্যা সুকন্যাকে ভৃগুবংশীয় চ্যবন ঋষি বিবাহ করেন, বৃদ্ধ চ্যবনঋষি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ভেষজের গুণে যৌবন প্রাপ্ত হ'ন, এবং ইন্দ্রের রোষ অগ্রাহ্য করে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে যজ্ঞে সোমরসের ভাগী করে দেন। সেখান থেকে তীর্থযাত্রীগণ পুষ্কর তীর্থে যান, পুষ্কর সরোবরের পারস্থিত আর্চীক পর্বতের তিনটি শৃঙ্গ ও তিনটি প্রস্রবণ দেখলেন, সেগুলি পরিক্রমা করে তাঁরা পুষ্করতীর্থে স্নান করলেন। সেখান থেকে সকলে যমুনা নদীর তীরে গেলেন, মান্ধাতা রাজা ও সোমক রাজা যমুনা তীরে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন কালে যজ্ঞ করেছিলেন, সেই স্থান লোমশ ঋষি দেখিয়ে দিলেন, এবং সকলকে মান্ধাতার উপাখ্যান শোনালেন, সোমক রাজার কাহিনীও শোনালেন, যিনি ঋত্বিকের কথায় একমাত্র পুত্র জন্তুকে যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিলেন। সেখানে ছয় রাত্রি বাস করে তীর্থ যাত্রীদল যমুনা তীরস্থ প্লক্ষাবতরণ তীর্থে যান, সেই তীর্থকে স্বর্গের দ্বার বলা হত ; সেখানে পাণ্ডব ভ্রাতাগণ কৃষ্ণা সহ স্নান করে পূত হলেন।

তারপর সরস্বতী নদী যেখানে মরুস্থলে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, সেখানে লোমশ ঋষি সবাইকে নিয়ে গেলেন, সে স্থানের নাম বিনশন। সেখান থেকে বিপাশা ও বিতস্তা নদীদ্বয় পার হয়ে যমুনার দুটি উপনদী—জলা ও উপজলা—দেখিয়ে লোমশ ঋষি বললেন যে এখানে শিবি রাজার রাজ্য ছিল, শিবিরাজ উশীনর যজ্ঞ করে ইন্দ্র সম হয়ে উঠেছিলেন ; ইন্দ্র শ্যেন হয়ে ও অগ্নি কপোত হয়ে উশীনর রাজার আশ্রিত বাৎসল্যের পরীক্ষা করেন, কপোতকে বাঁচাতে উশীনর নিজদেহমাংস দিয়ে কপোতের সমান ভার না করতে পেরে নিজেই তুলাদণ্ডে উঠে পড়লেন, তখন ইন্দ্র অগ্নি আত্ম প্রকাশ করে তাঁর প্রশংসা করল, কিন্তু ফলে উশীনর স্বর্গে গেলেন, অর্থাৎ প্রাণত্যাগ করলেন।

তারপরে যুধিষ্ঠিরাদিকে নিয়ে লোমশ ঋষি হিমালয়ের পথে অগ্রসর হলেন। গঙ্গাদ্বারে এসে যুধিষ্ঠির লোমশের উপদেশমত গঙ্গাস্তব করলেন, তারপর দুর্গম পথে যেতে হবে জেনে যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, তুমি কৃষ্ণাকে ও আর সকলকে নিয়ে এখানেই অপেক্ষা কর, নকুল ও আমি লোমশ ঋষিসহ গন্ধমাদন কৈলাস ইত্যাদি দেখে আসি। ভীম সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন না, কৃষ্ণাও বললেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন, আমি পদব্রজে পর্বত আরোহণ করতে পারব। সেই সময় পুলিন্দাধিপতি রাজা সুবাহু গজ ও অশ্বারোহী কিরাত ও পুলিন্দ সেনা নিয়ে উপস্থিত হলেন, যুধিষ্ঠির ভীমাদির পরিচয় জেনে তাদের সাদর অভ্যর্থনা করলেন। সেই দিন ও রাত্রি তাঁরা রাজা সুবাহুর আতিথ্য গ্রহণ করলেন, তারপরে নিজেদের সব অশ্ব, রথ, সারথি, পাচক, অনুচর, ধাত্রী ও দাসী, গাভী ও গোরক্ষীদের সুবাহু রাজার কাছে ন্যস্ত করে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণা, ধৌম্য ও লোমশ ঋষি দুচারজন ব্রাহ্মণসহ পদব্রজে হিমালয়ের পথে যাত্রা আরম্ভ করলেন।

পর্বত আরোহণ করতে আরম্ভ করবার সময় যুধিষ্ঠির বললেন, অর্জুনকে অনেকদিন না দেখে আমাদের সবারই মন খারাপ আছে, তাকে শীঘ্র দেখতে পাবো আশা করে আমরা ইন্দ্রলোকের দ্বারভূত গন্ধমাদন পর্বতে উঠতে যাচ্ছি; পর্বতে উঠবার সময় খুব সতর্ক হয়ে উঠতে হবে, সংযত ভাবে চারদিকে দৃষ্টি রেখে না উঠলে এখানে বিপদ হতে পারে; গন্ধমাদন পর্বতে বদরী বিশাল ও নরনারায়ণাশ্রম অবস্থিত,[১] এবং সেখানে গন্ধর্ব-রাক্ষস সেবিত কুবেরের সুন্দর পদ্ম সরোবর আছে। বীরগণ অসিচর্ম ধনুর্বাণ সজ্জিত হয়ে যাত্রা আরম্ভ করলেন, এবং সুন্দর বৃক্ষলতা ঝর্ণা মৃগপক্ষী দেখে তারা আনন্দিত মনে অগ্রসর হতে লাগলেন। এইভাবে তাঁরা কিন্নর গন্ধর্ব অধ্যুষিত গন্ধমাদন পর্বতে পৌছালেন। কিন্তু গন্ধমাদন পর্বতে উঠতে আরম্ভ করেই তাঁরা তীব্র শীতল বাতাস পেলেন, তা অল্পকাল মধ্যে ঝঞ্ঝাবাতে পরিণত হল, বৃক্ষের শাখা ভেঙ্গে পড়তে থাকলো, বাতাসে ধূলি কাঁকর উড়িয়ে সকলকে অতিষ্ঠ করে তুললো। ভাল করে পথ দেখতে না পেয়ে এবং ঝড়ের তাড়নায় বিব্রত বোধ করে যাত্রীগণ

১। যাত্রার বিবরণ হতে দেখা যাবে যে গন্ধমাদন পর্বতের পথে বদরী–বিশাল, গন্ধমাদন পর্বতে নয়।

পথ পার্বস্থ বড় বড় বৃক্ষের কাণ্ড আঁকড়ে ধরে নিজেদের সাম্‌লে রাখ্‌বার চেষ্টা করলেন, ভীম কৃষ্ণাকে এক হাতে জড়িয়ে অন্য হাতে একটি বৃক্ষের কাণ্ড আশ্রয় করলেন। ঝড় কমে আস্‌লে জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল, মধ্যে মধ্যে শিলাবর্ষণও হ'ল, সকলে ভিজে গেলেন। জলের ধারা পথে প্রবাহ সৃষ্টি করে যাত্রীদের আরো বিপন্ন করে তুল্‌ল। অবশেষে বর্ষণ শেষ হ'ল, জলের প্রবাহ তার কিছু পরে বন্ধ হ'ল, সূর্য আবার দেখা গেল। তখন যাত্রীদল আবার চলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু সেই অবস্থায় এক ক্রোশ অগ্রসর হলে কৃষ্ণা মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে গেলেন। নকুল তা প্রথমে দেখে গিয়ে কৃষ্ণাকে ধরলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে ডেকে কৃষ্ণার অবস্থা জানালেন। তখন ধৌম্য এসে শান্তিমন্ত্র জপ করলেন, পাণ্ডবগণ কৃষ্ণার দেহে হাত বুলিয়ে মুখে বাতাস করে তার চেতনা ফিরিয়ে আন্‌লেন। জ্ঞান হলে মৃগচর্ম বিছিয়ে তাকে শুতে দিয়ে বিশ্রাম করতে বলা হ'ল। যুধিষ্ঠির বললেন, ক্রমে পার্বত্য পথ আরো কঠিন হবে, তুষারাবৃত দেশ ও আসবে, কৃষ্ণা কেমন করে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলবে? ভীম বললেন, প্রয়োজনমত আমি তাকে বহন করে নিতে পারি, কিন্তু অন্য কাউকে যদি বহন করতে হয়, তা হলে আমার পুত্র ঘটোৎকচকে সংবাদ দিতে পারি, যে কয়েকজন বলবান রাক্ষস অনুচর নিয়ে এসে আমাদের সাহায্য করতে পারবে, কৃষ্ণাকে বা প্রয়োজনমত অন্যদের বহন করতে পারবে। ঘটোৎকচকে সংবাদ দেওয়াই স্থির করে সহদেবকে সংবাদ দিতে প্রেরণ করা হ'ল; সহদেব পুলিন্দ রাজ্যে গিয়ে রথ নিয়ে ঘটোৎকচের অরণ্য রাজ্যে গিয়ে সংবাদ দিলেন, ঘটোৎকচ কয়েকজন বলবান রাক্ষস অনুচর নিয়ে সুবাহুর রাজ্যে রথটি রেখে উপরে উঠে এলেন। ইতিমধ্যে বাকী যাত্রীদল কয়েকটি কাছাকাছি গুহা খুঁজে নিয়ে তাতে আশ্রয় নিলেন। যদিও বৈশম্পায়নের মহাভারতে সে কথা নাই, তবু অনুমান করা যায় যে যুধিষ্ঠির যখন একটি অনুষ্ঠান করে ভীম ও হিড়িম্বার বৈধ মিলনের পথ করে দিয়েছিলেন, তখন পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচকে উপেক্ষা করেন নাই, তাদের রাজভবনে এনে ঘটোৎকচকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, না করলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্বেই ঘটোৎকচ আর্যযুদ্ধ বিদ্যায় শিক্ষিত অতিরথ রূপে গণিত হবে কি করে? রথাতিরথ-সংখ্যান অনুপর্বে ঘটোৎকচকে ভীম অতিরথ বলে বর্ণনা করেছেন। জৈমিনির আশ্বমেধিক পর্বে হিড়িম্বাকে ভীমের গৃহে স্থিত এবং

ঘটোৎকচের পুত্র মেঘবর্ণকে যুধিষ্ঠিরের এক সেনানী ও সভাসদরূপে স্বীকৃত দেখা যায়। সেইভাবে সম্পর্ক না রাখ্‌লে ঘটোৎকচ সর্বদা পাণ্ডবগণকে নানা-ভাবে সাহায্য করতে আস্‌বে কেন, পাণ্ডবগণই বা সাহায্য দাবী করবেন কোন মুখে ?

ঘটোৎকচ আস্‌লে কুশল বিনিময়াদির পরে ভীম বললেন, তোমার মাতা দ্রৌপদী ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, দুর্গম পার্বত্য পথে উঠ্‌তে পারছেন না, তাকে বহন করে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল। ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে স্কন্ধে তুলে নিয়ে সঙ্গে চল্‌তে লাগ্‌লো। রাক্ষস অনুচরেরা সঙ্গে চল্‌লো, যাত্রীদের মধ্যে যে অবসন্ন হয়ে পড়ে, তাকেই তারা স্কন্ধে তুলে নিয়ে বহন করতে লাগ্‌লো। পথ যখন আরো দুর্গম হয়ে এল, তখন লোমশ ঋষি ও ভীম ছাড়া সকলকেই বাহকদের স্কন্ধে আরোহণ করতে হ'ল। এইভাবে অগ্রসর হয়ে যাত্রীদল বদরী-বিশাল দেখ্‌তে গেলেন ও বদরীবিশাল স্থিত নরনারায়ণাশ্রমের কাছে থেমে সকলে বাহকদের স্কন্ধ থেকে নেমে চারদিকে তাকিয়ে দেখ্‌লেন। নরনারায়ণাশ্রমের ঋষিগণ পাণ্ডবদের পরিচয় জেনে তাদের অভ্যর্থনা করে নিলেন, পাণ্ডবগণও তাদের প্রতি যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। সেখান থেকে ঘটোৎকচ ও তার রাক্ষস অনুচরগণ বিদায় নিয়ে গেল। পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণা, লোমশ ঋষি ও ধৌম্য পুরোহিতসহ কিছুকাল সেই আশ্রমেই আনন্দে কাটালেন্। দিনে তারা চারদিকে ঘুরে ফিরে দৃশ্য দেখে ফলমূল সংগ্রহ করে নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করতেন। বর্ণনা থেকে মনে হয় যে বদরী হ'ল গন্ধমাদন পর্বতমালার একটি শৃঙ্গ। লোমশ ঋষি পাণ্ডবগণের সঙ্গে আরো কিছুকাল রয়ে গেলেন।

১৭· জটাসুর বধ ও যক্ষযুদ্ধ

নরনারায়ণাশ্রমে বাসকালে একজন লোক ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে শাস্ত্র আলোচনা করে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টা করে ; সে ছিল জটা নামক এক অসুর, তার উদ্দেশ্য ভাল ছিল না। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ জানলেই লোককে আদর সম্বর্ধনা করতেন, জীবনে বহু অলস ব্রাহ্মণ পোষণ করেছেন। তিনি জটাসুরকে ব্রাহ্মণ মনে করে তাকে অতিথিরূপে তাঁদের সঙ্গেই সেই আশ্রমে রাখলেন। সে মধ্যে মধ্যে কৌতূহল ভরে পাণ্ডবগণের অস্ত্র-শস্ত্র পরীক্ষা করে দেখ্‌তো। একদিন যখন ভীম

মৃগয়ায় গিয়েছেন এবং লোমশ, ধৌম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ স্নান করতে গিয়েছেন, তখন সহসা জটাসুর পাণ্ডবগণের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দ্রৌপদীকে ও তিন পাণ্ডব ভ্রাতাকে ধরে আশ্রমের থেকে চলে যেতে চেষ্টা করল। সহদেব আপনাকে মুক্ত করে আপনার খড়্গ অসুরের কবল থেকে কেড়ে নিলেন—এবং ভীমসেনের উদ্দেশ্যে চীৎকার করতে করতে অসুরের প্রতি তাঁর খড়্গ উদ্যত করলেন, তবে দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃদ্বয়কে বাঁচিয়ে আঘাত করবার সুযোগ পেলেন না। যুধিষ্ঠির অসুরকে অধর্ম পথ নেবার জন্য, বিশ্বাস ভঙ্গ করবার জন্য, ভর্ৎসনা করতে তাকে সবলে জড়িয়ে ধরলেন, যাতে সে বিশেষ অগ্রসর হতে না পারে। এর মধ্যে ভীম এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, দুষ্ট অসুর, তুই যখন আমাদের অস্ত্রে হাত দিয়ে পরীক্ষা করতিস্, তখনি আমার সন্দেহ হয় যে তুই কখনো ব্রাহ্মণ নস্, আজ কৃষ্ণার অঙ্গে হাত দিয়েছিস্, তোর আর রক্ষা নাই। ভীমকে দেখে বিপদ বুঝে জটাসুর যুধিষ্ঠির, নকুল ও দ্রৌপদীকে ছেড়ে দিয়ে মল্লযুদ্ধের জন্য উদ্যত হল। ভীম ও জটাসুর পরস্পরকে মুষ্টি দিয়ে আঘাত ও বাহুর চাপে পীড়ন করতে লাগলো, পরস্পরের প্রতি বৃক্ষের শাখা ভেঙ্গে ছুঁড়ে দিল, প্রস্তর কুড়িয়ে নিক্ষেপ করল। তারপরে সুযোগ পেয়ে ভীম জটাসুরের গ্রীবায় বজ্র-তুল্য মুষ্টি প্রহার করলেন, ফলে অসুর মাথা ঘুরে অবশ হয়ে পড়ল। তখন ভীম তাকে বাহুদ্বয় মধ্যে নিষ্পেষিত করলেন, তারপরে উপরে তুলে ঘুরিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। তার ফলে জটাসুরের মৃত্যু হল।

জটাসুরের নিধনের পরে পাণ্ডবগণ বদরিকায় নরনারায়ণাশ্রমে কিছুকাল থাকলেন। যুধিষ্ঠির একদিন বললেন, অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার জন্য যে গেছে, তারপরে চার বৎসর পুরো কেটে গিয়েছে, অর্জুন বলেছিল যে পাঁচ বৎসর অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করে ফিরে আসবে, তার প্রতীক্ষায় আমরা এই পর্বতাঞ্চলে বাকী সময় কাটিয়ে দিই। কিছুকাল সেই আশ্রমে কাটাবার পরে তাঁরা উত্তরমুখে যাত্রা আরম্ভ করলেন, সপ্তদশ দিবসে রাজর্ষি বৃষপর্বার আশ্রমে উপস্থিত হলেন, সেখানে সপ্তাহকাল বিশ্রাম নিলেন। তারপরে সেখানে তাঁদের সঙ্গী লোমশ ও ধৌম্য ভিন্ন অন্য বিপ্রগণকে সেই আশ্রমে রেখে, এবং নিজেদের সঙ্গে যে মণিরত্নাদি ছিল, সেই আশ্রমের ঋষির নিকট গচ্ছিত রেখে, পাণ্ডবগণ কৃষ্ণা, লোমশ ও ধৌম্য সহ আরো অগ্রসর হয়ে চললেন, তাঁদের পথ আরো দুর্গম হয়ে এল, কিন্তু দুর্গম পর্বতে চলা তাঁদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, সাবধানে সকলেই এগিয়ে চললেন। চতুর্থ দিনে

তাঁরা কৈলাস পর্বত কিছু দূর থেকে দেখলেন, এই কৈলাস মানস সরোবরের সন্নিহিত কৈলাস নয়, হিমালয়-গন্ধমাদনের এক শিখর। তারপর মাল্যবান পর্বত অতিক্রম করে তাঁরা গন্ধমাদন পর্বতে আরোহণ করতে আরম্ভ করলেন। সেখানে সুন্দর পুষ্প শোভিত বৃক্ষমালা ও নানা পার্বত্য সুন্দর দৃশ্য দেখে তাঁরা মোহিত হলেন। কয়েকদিন আরোহণের পরে তাঁরা আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে পৌঁছে গেলেন, রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাঁকে প্রণাম করে সেই আশ্রমে স্থিতি করলেন। রাজর্ষি বললেন, এই পর্বতের উপর দিকে গন্ধর্ব-অপ্সরা-কিন্নরগণ বাস করে, তাদের গান বাজনা এই আশ্রম থেকেই শোনা যায়, কুবেরের প্রাসাদ ও তাঁর যক্ষরক্ষ সেনাদল আরো উপরে এই পর্বতেই বাস করে, যক্ষ বা রক্ষ সেনাদল মানুষ দেখলে আক্রমণ করতে পারে, তাই আশ্রমে থেকে গন্ধর্ব কিন্নরদের গীতবাদ্য শোনা ভাল, উপরে উঠে তাদের নিকটে যেতে চেষ্টা করবেন না, এখানে থেকেই অর্জুনের প্রতীক্ষা করুন।

পাণ্ডবেরা সেখানেই বাস করতে লাগলেন, খাদ্যের জন্য সেখানে প্রধানত ফলমূল আহরণ করতেন। একদিন সেখানে অদ্ভুত সুগন্ধি পাঁচরঙ্গা ফুলরাশি বাতাসে উড়ে এসে পড়ল, দ্রৌপদী তা দেখে ভীমকে বললেন, আমরা যদি এই পর্বতের আরো উপরে উঠতে পারি, তাহলে এই ফুলের বৃক্ষ বা গুল্ম এবং আরো কত সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাব। তার উত্তরে ভীম বললেন, উপরে উঠলে বিপদের সম্ভাবনা আছে শুনেছি, আমি প্রথমে নিজে উঠে দেখি, তারপরে সম্ভব হলে তোমাকে নিয়ে যাব। ভীম যুধিষ্ঠিরকে না জানিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পর্বতের উপরে উঠতে লাগলেন। বহু উচ্চে উঠে ভীম সম্মুখে প্রাচীরবেষ্টিত সুন্দর উদ্যান ও তার মধ্যে অবস্থিত রত্নখচিত প্রাসাদ দেখতে পেলেন, উদ্যানের মধ্যে সেই পাঁচরঙ্গা ফুলের গাছও দেখতে পেলেন। ভীম কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলেন, তারপর শঙ্খধ্বনি ও জ্যাঘোষ শব্দ করলেন। শব্দ শুনে বহু যক্ষরক্ষ সৈন্য এসে বলল, এটি কুবেরের প্রাসাদ ও উদ্যান, এখানে মানুষের আসবার অধিকার নাই, বলে তারা ভীমকে আক্রমণ করল, কিন্তু ভীমের অস্ত্রে অনেকে হত ও অনেকে আহত হ'ল, তাদের হতাবশিষ্ট দল চীৎকার করতে করতে ফিরে গেল। তখন মণিমান্ নামে এক কুবের সেনানী এসে ভীমকে আক্রমণ করলো, কিন্তু ভীমের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে যুদ্ধ করে মণিমানও নিহত হ'ল। কুবের বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে রথে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে এলেন। ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব,

ধৌম্য, পর্বতের উপরিভাগ হতে নানা শব্দ ও চীৎকার শুনে ভীমকে দেখ্‌তে না পেয়ে সেই শব্দ লক্ষ্য করে অগ্রসর হলেন, এবং ভীমকে রক্তাক্ত দেহে অস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় দেখে ও বহু মৃত যক্ষ রাক্ষসের দেহ দেখে যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, তুমি এটা বেশী দুঃসাহসের কাজ করেছ, আমার প্রিয় কামনা করলে এমন সাহসের কাজ আর কোর না। কুবের রথে সজ্জিত হয়ে উপস্থিত হলে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব নিজেদের পরিচয় জানিয়ে কুবেরকে প্রণাম জানিয়ে যুক্তহস্তে দাড়িয়ে রইলেন। ভীম প্রণাম না করেই স্পর্ধাভরে দাঁড়িয়ে রইলেন। কুবের বললেন, হে যুধিষ্ঠির, দেশকাল বুঝে ধর্মযুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণ পরাক্রম প্রদর্শন ক'রে ইহলোকে যশ ও পরলোকে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়, ভীম দেশকাল বিবেচনা না করে বীর্যপ্রকাশ করে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে, তুমি তাকে সংযত করে রেখো। তারপরে ভীমের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কৃষ্ণার ইচ্ছা অনুযায়ী পর্বতের উর্দ্ধ দেশে এসে যক্ষরক্ষ সৈন্যদের ও মণিমান্ নামক আমার সেনানীকে বধ করেছ, তা দুঃসাহসের কাজ হয়েছে বটে, কিন্তু মণিমান্ মানুষের হাতে মৃত্যু হবে সেই অভিশাপ গ্রস্ত ছিল, তুমি সেই জন্য মণিমান্‌কে মারতে পেরেছ, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। ভীম তখন নিজের অস্ত্রশস্ত্র সংবৃত করে কুবেরকে প্রণাম জানালেন। কুবের বললেন, তোমরা রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে থেকে অর্জুনের প্রতীক্ষা কর, আমার আদেশে যক্ষরক্ষ সৈন্যগণ তোমাদের বিপদ হতে রক্ষা করবে। যুধিষ্ঠিরাদি তখন আনন্দিত মনে আশ্রমে ফিরে গেলেন, কুবেরর মৃত সৈন্যদের দেহের সৎকার করবার আদেশ দিয়ে নিজ প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

পাণ্ডবগণ আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে ফিরে যমনিয়মাদি ব্রতপালন করতে লাগলেন, ফলমূলাদি আহরণ করে ও চারিদিকের শোভন দৃশ্য দেখে আনন্দে কাল কাটাতে লাগলেন। একদিন বহু গন্ধর্ব এসে তাঁদের গন্ধমাদন পর্বতের শিখরে নিয়ে গেল, কুবের নির্মিত নানা উদ্যান, সরোবর, বিশ্রাম গৃহ তাদের দেখালো, কুবেরের উদ্যানের মধ্য দিয়ে তাদের বিচরণ করতে দিল; তাঁরা পরম প্রীতিভরে নিকটে প্রাকৃতিক ও কুবের নির্মিত সুন্দর দৃশ্য ও দূরের হিমরাজি আবৃত উচ্চ পর্বতশিখর দেখে পরম আনন্দ লাভ করলেন। তারপরে তাঁরা আশ্রমে ফিরে এলেন। এইভাবে থাক্‌তে থাক্‌তে অর্জুনের আগমন কাল এসে গেল, অর্জুন পঞ্চবর্ষ ইন্দ্রলোকে কাটিয়ে ইন্দ্রের আদেশে নিবাতকবচ অসুরদের ধ্বংস করে গন্ধমাদনে এসে ভ্রাতাদের সঙ্গে ও কৃষ্ণার সঙ্গে মিলিত হলেন।

১৮· বনপর্ব—অর্জুনের প্রত্যাবর্তন, ভীমের অজগর হতে মুক্তি

অর্জুন গন্ধমাদনে এসে ভ্রাতৃগণের, কৃষ্ণার. ও পুরোহিতের কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা পেয়ে এ.ং নিজে সকলকে প্রণাম, অভিবাদনাদি করে সেদিন বিশ্রাম নিলেন। পরদিন তিনি সংক্ষেপে তাঁর প্রবাস জীবনের বর্ণনা দিলেন. বললেন যাত্রাকালে কিভাবে একজন কিরাতনেতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে হার স্বীকার করে তার কাছ থেকে উন্নততর বাণ ক্ষেপণ প্রণালী শিখ্‌লেন, কিভাবে সার্থবাহগণের সঙ্গে গন্ধমাদন হতে পার্বত্য পথে ইলাবৃতবর্ষে বা ইন্দ্রলোকে মধ্য এশিয়াস্থ আর্য নিবাসে পৌঁছে সেখানকার ইন্দ্র নামে পরিচিত রাজার নিকট পরিচয় দিলেন, কিভাবে তাঁর প্রসাদ লাভ করে সেনানীদল মধ্যে থেকে উন্নত অস্ত্রশিক্ষা লাভ করলেন ও ইন্দ্রের উপদেশে গন্ধর্ব চিত্রসেনের সাহায্যে ইন্দ্রলোকস্থ নৃত্য গীত আয়ত্ত করলেন, কি ভাবে ইন্দ্রের অনুজ্ঞায় ইন্দ্রের অস্ত্রসজ্জিত রথে গিয়ে নিবাতকবচ নামক অসুরদলকে ধ্বংস করলেন. কি ভাবে উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র, বরুণাস্ত্র (জলক্ষেপণাস্ত্র), বায়ব্যাস্ত্র ইত্যাদি লাভ করে ইন্দ্রের অনুমতি নিয়ে পুনঃ সার্থবাহদের সঙ্গে ফিরে এলেন। তাঁর বিশেষ অস্ত্রগুলি দেখালেন, সেগুলির প্রয়োগ দেখাতে গিয়ে তাঁর মনে হ'ল যে বৃথা প্রয়োগে অস্ত্রের শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, তাই প্রয়োগ না দেখিয়ে তার কারণ বলে আবার অস্ত্রগুলি যথাযথ ভাবে রক্ষা করলেন।

অর্জুনের সঙ্গে পাণ্ডবভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণা প্রায় চার বৎসর মহা আনন্দে কুবের আলয়ের নিম্নস্থিত গন্ধমাদন পর্বতের আশ্রমে কাটিয়ে দিলেন। তাঁদের বনবাস-কালের মোট দশ বৎসর পূর্ণ হলে ভীম একদিন অর্জুন, নকুল ও সহদেবের সঙ্গে কথা বলে নিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, এখানে আমরা সুখে আছি, এখানকার জীবনে অভ্যস্ত হয়েছি, এখানে আমরা জীবনের শেষ পর্যন্ত কাটাতে পারি, কিন্তু তাহলে রাজা হিসাবে আপনার কীর্তি ও যশের লাঘব হবে; এখন আমরা ধীরে ধীরে কুরুরাজ্যের নিকট যে বন, তাতে ফিরে যাই, সেখানে দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ করে এক বৎসর দূরে কোথাও অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে তারপর কৃষ্ণ, সাত্যকি প্রভৃতি আমাদের হিতকামীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের রাজ্য উদ্ধার করব। যুধিষ্ঠির এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তখন পাণ্ডবগণ কুবের-আলয় প্রদক্ষিণ করে তাদের সাহায্যকারী যক্ষরক্ষদের অভিবাদন করে আর্ষ্টিষেণের অনুমতি নিয়ে

সেখান থেকে সমতলদেশে ফিরবার পথ ধরলেন। নানা সুন্দর দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে কৈলাস পর্বতের পাশ কাটিয়ে তাঁরা বৃষপর্বার আশ্রমে ফিরলেন। সেখানে একদিন বিশ্রাম করে সেখানে ন্যস্ত ধনরত্নাদি নিয়ে ও বিপ্রদের সঙ্গে নিয়ে আবার যাত্রা আরম্ভ করে তাঁরা বদরিকায় নরনারায়ণাশ্রমে পৌঁছে সেখানে একমাস কাটালেন। সেখান থেকে নাম্‌তে আরম্ভ করে সুবাহুর রাজ্যে কয়েক-দিনের মধ্যে পৌঁছে গেলেন। সুবাহু রাজা তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা করলেন, তাঁরা সুবাহুকে প্রতি—অভিনন্দন করে তাঁদের রথ-অশ্ব-পরিজনদের রক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ জানালেন। সেখানে একরাত্রি বাস করে তাঁদের রথ,অশ্ব, ইন্দ্র-সেনাদি সারথি, পরিচারকবৃন্দ, পৌরোগববৃন্দ (যারা পটগৃহ বা তাঁবুর সরঞ্জাম নিযে আগে আগে চলে), পাচকগণ ও কৃষ্ণার ধাত্রীও দাসীদের নিয়ে যমুনা নদী যেখানে পর্বতের থেকে নেমে এসেছে সেখানে গেলেন। সেখান থেকে বিশাখযূপ নামক এক বনে গেলেন, সেই বন চৈত্ররথ বনের মত সুন্দর। সেখানে তাঁরা প্রায এক বৎসর কাটিয়ে দিলেন। তার মধ্যে একদিন ভীম শিকার করতে বেরিয়ে আকস্মিক ভাবে একটি বৃহৎ অজগরের কুণ্ডলীভূত হয়ে নিজেকে মুক্ত করতে পারছিলেন না, তাঁর বিলম্ব দেখে তিনি যেদিকে গিয়েছিলেন, সেইদিকে যুধিষ্ঠির অনুচরগণসহ অগ্রসর হয়ে ভীমের অবস্থা দেখে তাঁকে অজগরের কুণ্ডল হতে মুক্ত করলেন। তাঁদের বনবাসের একাদশ বর্ষ পূর্ণ হ'ল, তাঁরা স্থির করলেন যে দ্বাদশ বর্ষ দ্বৈতবনে গিয়ে কাটাবেন, এবং দ্বৈতবনে ফিরে দ্বৈতবনের সরোবরতীরে আবার তাঁরা তাঁদের আবাস গড়ে তুললেন।

১৯· বনপর্ব—ঘোষ যাত্রা

পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে ফিরে এসে বাস আরম্ভ করলে চরমুখে দুর্যোধন সে সংবাদ পেলেন। কর্ণ দুঃশাসনাদিকে সে সংবাদ জানালে তারা দুর্যোধনকে পরামর্শ দিলেন, পাণ্ডবগণ একাদশ বৎসরের উপর বনে থেকে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আছেন, তাদের মনঃকষ্ট বাড়াতে আমরা কুরুস্ত্রীগণকে সুসজ্জিত সু-অলঙ্কৃতবেশে নিয়ে দ্বৈতবনের সরোবরের কাছে গিয়ে জলক্রীড়াদি করি, পাণ্ডবগণ আমাদের ঐশ্বর্য দেখে ক্লিষ্ট হবেন সন্দেহ নাই। দুর্যোধনের সেই পরামর্শ মনঃপূত হয়, ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতি লাভ করতে দুর্যোধন তাঁকে বুঝান যে দ্বৈতবনে কৌরবদের

গোসম্ভ আছে, তা গণনা করে নবজাত গোবৎসদের দেহে কৌরবদের স্বামিত্বের চিহ্ন এঁকে দিতে হবে, সে কাজ দ্বৈতবনের সরোবরকূলে করলেই সুবিধা হবে। ধৃতরাষ্ট্র সম্মতি দিলেন। তখন কর্ণ ও শকুনিকে নিয়ে দুর্যোধন, দুঃশাসন, ও আরো কয়েকজন ধৃতরাষ্ট্রপুত্র তাদের স্ত্রীগণকে উত্তম ভাবে সজ্জিত অলংকৃত করে বৃহৎ সৈন্যদল সাজিয়ে দ্বৈতবনে গিয়ে সরোবরের এক গব্যূতি বা দুই মাইল দূরে তাদের পটবাস স্থাপন করলেন। দুর্যোধনের অধ্যক্ষতায় বৃষ ও গাভী গণনা এবং গোবৎস 'চিহ্নিত করা হ'ল। তারপরে নৃত্যগীতকুশল গোপ ও গোপকন্যাগণ ধার্তরাষ্ট্রদের নৃত্যগীত দেখিয়ে তাদের মনোরঞ্জন করল, এবং কৌরবস্ত্রীদের কাছ থেকে যথাযোগ্য উপহার পেল।' তারপরে ধার্তরাষ্ট্রগণ বনে মৃগ বরাহ শিকার করলেন, এবং অনুচরদের আদেশ দিলেন, দ্বৈতবনের সরোবরের এক পারে পটমণ্ডপ তুলে দাও, সেখানে গিয়ে আমরা সস্ত্রীক জলকেলি করব। সেই সরোবরের একটি পার হতে সামান্য দূরে পাণ্ডবদের বাসের জন্য নির্মিত কুটির-গুলি ছিল। যখন কৌরব অনুচরগণ এক পারে পটমণ্ডপ তুলতে এল, তখন গন্ধর্বগণ সেই সরোবরে জলক্রীডা করছিল। গন্ধর্বগণ কৌরব অনুচরদের পট-মণ্ডপ তুল্‌তে বাধা দিল, বল্‌ল যে কুবের ভবন থেকে গন্ধর্বগণ সস্ত্রীক এই সরোবরে জলকেলি করতে এসেছে, এখন আর কারো এখানে জলকেলি করা চলবে না। অনুচরগণ দুর্যোধনকে সেকথা জানালে দুর্যোধন সেনানীদের ডেকে সৈন্য নিয়ে গন্ধর্বদের দূর করে দিতে আদেশ দিলেন। সেনানীগণ সৈন্য নিয়ে এসে গন্ধর্বদের বল্‌ল, কৌরবরাজ দুর্যোধন এখানে মহিষীদের নিয়ে জলক্রীডা করতে চান, সঙ্গে বহু সৈন্য আছে, তোমরা এখন এই সরোবর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও। গন্ধর্বনেতাগণ বল্‌ল, আমরা দেবযোনি সম্ভূত, দুর্যোধন আমাদের আদেশ দেয় কেমন করে? আমাদের আক্রমণ করলে তোমরাই বিপন্ন হবে। দুর্যোধন তখন আক্রমণ করবার আদেশ দিলেন, গন্ধর্বগণও তাদের নেতা চিত্র-সেনের আদেশ পেয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হ'ল। গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে অনেক কৌরবসেনা নিহত হ'ল, অনেকে পলায়ন করল। কর্ণ পরাঙ্‌মুখ না হয়ে তীব্র যুদ্ধ করে অনেক গন্ধর্বসেনা বিনাশ করলেন, তখন চিত্রসেন স্বয়ং কর্ণের সম্মুখীন হলেন, চিত্রসেন ও অন্য গন্ধর্বরথীদের আক্রমণে কর্ণের রথ ভেঙ্গে গেল, অশ্ব-সারথি মারা পড়্‌লো, কর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে বিকর্ণের রথে উঠে যুদ্ধভূমি হতে পশ্চাদ্‌পদ্‌ হতে বাধ্য হলেন। দুর্যোধন যথাসাধ্য যুদ্ধ করে পরাজিত

হ'লেন, ও বন্দী হলেন, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও ধার্তরাষ্ট্রস্ত্রীগণকে বন্দী করে নিয়ে গন্ধর্বগণ জয়ধ্বনি করে নিজেদের পথে চল্‌লো।

দুর্যোধনের কয়েকজন সেনানী যুধিষ্ঠিরের নিকট সংবাদ দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করল। যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবকে বল্‌লেন, তোমরা শীঘ্র রথ অস্ত্র সজ্জিত করে নিয়ে গিয়ে দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতিকে ও কুরুস্ত্রীদের উদ্ধার কর। যদি পারো, মিষ্টবাক্যে কার্য উদ্ধার করবে, তা না পারলে যুদ্ধই করবে। ভীম বললেন, দুর্যোধনাদি আমাদের ঐশ্বর্য ও বল দেখিয়ে সন্তপ্ত করতে চেষ্টা করেছিল, গন্ধর্বদের কাছ থেকে তার উপযুক্ত ফল পেয়েছে, গন্ধর্বগণ আমাদের কাজ করে দিয়েছে, আমরা কেন আর তাদের বিরুদ্ধতা করব? যুধিষ্ঠির বললেন, জ্ঞাতিদের মধ্যে কলহ-শত্রুতা থাকলেও বাইরের শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের মিলিত হতে হয়, বিশেষতঃ কুলস্ত্রীদের অপমান থেকে রক্ষা করা কর্তব্য। তখন ভীমার্জুনাদি তাদের রথ সাজিয়ে নিয়ে অগ্রসর হলেন, গন্ধর্বদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমরা দুর্যোধন-দুঃশাসনাদিকে ও কুরুস্ত্রীগণকে মুক্ত করে দাও, বিশেষতঃ পরস্ত্রী হরণ মহা অপরাধ, তোমরা স্বেচ্ছায় মুক্ত করে না দিলে আমাদের বাধ্য হয়ে বল প্রয়োগ করতে হবে। গন্ধর্ব রথীগণ বল্‌লো, আমরা আমাদের রাজা চিত্রসেনের আদেশই শুধু পালন করি, আর কারো আদেশে আমরা কাজ করি না। পাণ্ডবগণ তখন যুদ্ধ আরম্ভ করলেন, পলায়মান কৌরবসেনা এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিল। গন্ধর্ব সেনাগণ বন্দীদের নিয়ে চলে যাচ্ছিল, তারা যুদ্ধের জন্য ফিরে দাঁড়াল। যুদ্ধ ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠ্‌লো, অনেক গন্ধর্বসেনা নিহত হল, স্বয়ং চিত্রসেন অর্জুন সহ যুদ্ধে বিব্রত হয়ে পড়লেন; তখন তিনি উচ্চস্বরে অর্জুনকে ডেকে বল্‌লেন, অর্জুন, আমি গন্ধর্ব চিত্রসেন, ইন্দ্রলোকে আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল স্মরণ কর; ধার্তরাষ্ট্রগণ তোমাদের অপমানিত করতে দ্বৈতবনে এসেছে জেনে আমি তাদের শাস্তি দিয়েছি। অর্জুন তখন যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিয়ে বললেন, বন্দীদের মুক্ত করে দিন। চিত্রসেন বল্‌লেন, দুর্যোধন পাপাচারী, সে আপনাদের অনেক লাঞ্ছনা করেছে, সেকি মুক্তির যোগ্য? চলুন যুধিষ্ঠিরের কাছে, তিনি যা বলেন তাই হবে। যুধিষ্ঠিরের কাছে গেলে তিনি বন্দীদের মুক্তি দিতে অনুরোধ করলেন, সেই সঙ্গে চিত্রসেন ও গন্ধর্বদের প্রশংসা করে বল্‌লেন তোমরা যে সমর্থ হয়েও দুর্যোধন ও তার ভ্রাতাদের বধ কর নাই, তা ভাল করেছ, এরা দুর্বৃত্ত হতে পারে, কিন্তু কুলস্ত্রীগণ সহ এরা বন্দী থাকলে কুলের অখ্যাতি হবে, এদের ছেড়ে দাও, তোমাদের কাম্য যদি কিছু থাকে,

আমরা দিতে পারি, তা বলো। চিত্রসেন তখন বন্দীদের মুক্তি দিলেন, প্রতিদানে কিছু প্রার্থনা না করে চলে গেলেন। তারপর যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে বললেন, এমন হঠকারিতার কাজ আর কোর না, গৃহে ফিরে যাও, যা ঘটে গেল তার জন্য মনে দুঃখ রেখো না। দুর্যোধন অভিবাদন করে বিদায় নিলেন, সঙ্গে দুঃশাসনাদি ভ্রাতৃগণ ও কুরুস্ত্রীগণ চলে গেল।

কিছুদূর গিয়ে দুর্যোধন আত্মগ্লানিভরে বসে পড়লেন, বললেন—যে জ্ঞাতি শত্রুদের মর্মপীড়া দিতে এসেছিলাম, তাদের কৃপায় জীবন নিয়ে রাজধানীতে ফিরতে পারবো না; দুঃশাসন, তুমি গিয়ে হস্তিনাপুরে আমার স্থলে রাজা হও, আমি এখানেই প্রায়োপবেশন করে প্রাণত্যাগ করব। দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি দুর্যোধনকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করলেন, দুঃশাসন তার পায়ে ধরলেন, কর্ণ বললেন, পাণ্ডবগণ তোমার সাম্রাজ্য মধ্যে বাস করছে, সম্রাটের বিপদ হলে প্রজার কর্তব্য সম্রাটকে বিপদ মুক্ত করা; পাণ্ডবগণ তাই করেছে, তার জন্য এত লজ্জাবোধ কেন? কিন্তু দুর্যোধন নিজের ক্ষোভে অভিভূত হয়ে রইলেন। রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, কারা যেন বলছে—তোমার ভয় নাই, যুদ্ধে কর্ণ অর্জুনকে বধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে, ভীষ্ম দ্রোণ কৃপও পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ ত্যাগ করে তোমার পক্ষেই যুদ্ধ করবে এবং পাণ্ডবগণ পরাজিত হবে। বোধহয়, দুর্যোধনের আকাঙ্ক্ষাই স্বপ্নে রূপ নিয়েছিল। যা হোক, পরদিন কর্ণ দুঃশাসনাদি দুর্যোধনকে প্রায়োপবেশনের সংকল্প ত্যাগ করতে বললে দুর্যোধন সহজেই সম্মত হয়ে গেলেন, এবং সকলকে নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরলেন। হস্তিনাপুরে ভীষ্ম ঘোষযাত্রার ঘটনার কথা শুনে দুর্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে মিত্রতা করে তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিতে বললেন। দুর্যোধন উপেক্ষার হাসি হেসে কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন। তারপর নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রে যথেষ্ট দান করে ব্রাহ্মণদের খুশী করতে লাগলেন, সামন্ত ও মিত্র রাজাদের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করে বন্ধুভাবে সংবাদ ও উপহার বিনিময় করে তাদের সপক্ষে রাখবার প্রয়াস করতে লাগলেন। সে প্রয়াস অনেকটা সফল হয়েছিল, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সম্ভাবনা যখন দেখা দিল, অনেক রাজন্য তখন দুইপক্ষের দাবীর ন্যায়-অন্যায় বিচার না করে বিনা দ্বিধায় দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করে।

২০. বনপর্ব : জয়দ্রথের দ্রৌপদী হরণ ও নিগ্রহ

একদিন পাণ্ডবগণ সকলে মৃগয়া করতে গিয়েছেন, আশ্রমে পুরোহিত ধৌম্য ও দ্রৌপদী আছেন। দ্রৌপদী আশ্রম গৃহের সম্মুখস্থ একটি কদম গাছের শাখা টেনে ধরে ফুল তুলছেন, এমন সময় রাজা জয়দ্রথ একটি ক্ষুদ্র বাহিনী সহ আশ্রমটির কাছে এসে পড়লেন, তিনি এক স্বয়ংবর সভা থেকে গৃহাভিমুখে যেতে বনের পথ ধরে চলেছিলেন। অপূর্ব সুন্দরী একটি নারী আশ্রম গৃহের বাইরে পুষ্পিত বৃক্ষশাখা টেনে ধরে ফুল তুলছে দেখে সেই বাহিনীস্থ সকলের দৃষ্টি তার দিকে আকৃষ্ট হ'ল। জয়দ্রথ তার সহচর কোটিকাস্যকে বললেন, এই রমণী দেবী না মানবী, কার কন্যা, কার স্ত্রী তা জেনে এসো, আমি পারলে একে আমার সঙ্গে আমার রাজধানীতে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করতে চাই। কোটিকাস্য দ্রৌপদীর নিকট গিয়ে বললো, আমি শিবি বংশের সুরথ রাজার পুত্র কোটিকাস্য, এই যে বাহিনী দেখছো, ওটি জয়দ্রথ রাজার বাহিনী, বাহিনীতে জয়দ্রথ রাজা ছাড়া তার ভ্রাতৃগণ ও সামন্ত রাজগণ আছেন। তারা জানতে চান, তুমি কার কন্যা, কার স্ত্রী ; অপূর্ব সুন্দরী মানবী হ'য়ে এই বনে কেন একা রয়েছ। দ্রৌপদী বৃক্ষের শাখা ছেড়ে দিয়ে আশ্রমগৃহে প্রবেশ করে রেশমের উত্তরীয় ধারণ করে উত্তর দিলেন, আমি দ্রুপদ রাজার কন্যা, পঞ্চপাণ্ডব আমার পতি, তারা মৃগয়ায় গিয়েছেন, অল্পক্ষণ পরেই ফিরবেন ; তুমি প্রতীক্ষা কর, আশ্রমে ফিরে পাণ্ডবগণ অতিথির যোগ্য অভ্যর্থনা দিয়ে তোমাদের সকলকে প্রীত করবেন। কোটিকাস্য জয়দ্রথের কাছে ফিরে গিয়ে জয়দ্রথের কাছে জানালো, এই নারী যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের প্রিয় মহিষী, এর সঙ্গে স্বজনের মত সাক্ষাৎ মাত্র করে সৌবীর অভিমুখে যাত্রা করুন। জয়দ্রথের মনে তখন দুষ্টবুদ্ধি এসেছে, বললো যে এই নারীকে দেখে মনে হচ্ছে এই নারীই সুন্দরী এর তুলনায় সব নারী বানরীর মত। এই বলে জয়দ্রথ আশ্রমে প্রবেশ করে দ্রৌপদীর কাছে গিয়ে তার ও তার স্বামীদের বার্তা জিজ্ঞাসা করলেন ; দ্রৌপদী বললেন, তারা সকলেই কুশলে আছেন, মৃগয়া থেকে আর অল্পকালের মধ্যেই ফিরবেন, ইতিমধ্যে আমার আতিথ্য গ্রহণ কর, তোমাকে মৃগমাংসের প্রাতরাশ পরিবেশন করতে বলি। তোমার সিন্ধু-সৌবীর রাজ্যের কুশল তো? জয়দ্রথ বললেন, তুমি রাজ্যভ্রষ্ট পতিদের সঙ্গে দুঃখে কেন বনে বাস করছ? আমার রথে উঠে এসো, আমার

মহিষী হয়ে সুখে সিন্ধু-সৌবীর দেশে রাজপ্রাসাদে বাস করবে। দ্রৌপদী বললেন, এই প্রস্তাব করতে তোমার লজ্জা হ'ল না? আমি কি অবলা অরক্ষিতা যে তোমার বশ হব? ভীম অর্জুনের ক্রোধ হতে ইন্দ্রসহায় হলেও তুমি রক্ষা পাবে না। এই কথায় জয়দ্রথের মনের পরিবর্তন হ'ল না বুঝে দ্রৌপদী নানা কথা বলে সময় কাটাতে চেষ্টা করলেন, যাতে পাণ্ডবগণ এসে পড়েন। কিন্তু জয়দ্রথ তাতে না ভুলে দ্রৌপদীর উত্তরীয় ধরে টান দিলেন। দ্রৌপদী জোরে ধাক্কা দিয়ে জয়দ্রথকে ফেলে দিলেন। কিন্তু জয়দ্রথ উঠে দ্রৌপদীকে হাত ধরে টানতে লাগ্‌লেন, জয়দ্রথের অনুচরগণ রাজার সাহায্যার্থ এগিয়ে এলো। তা দেখে দ্রৌপদী পুরোহিত ধৌম্যকে ডাক দিয়ে অবস্থার প্রতি সচেতন করে জয়দ্রথের রথে উঠলেন, রথ চলতে আরম্ভ করলো। ধৌম্য পিছনে পিছনে দৌড়ে পরস্ত্রী-হরণের জন্য জয়দ্রথকে ভৎর্সনা করতে থাকলো।

এর অল্পক্ষণ পরে পাণ্ডবগণ মৃগয়া থেকে ফিরে এলেন, নিজ নিজ রথে মৃগয়ায় গিয়েছিলেন নিজ নিজ রথেই ফিরলেন। এসে দেখলেন যে দ্রৌপদীর প্রিয় দাসী আশ্রম গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। যুধিষ্ঠিরের সারথি ইন্দ্রসেন তার কাছে গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সে উত্তর দিল, জয়দ্রথ বাহিনী নিয়ে এসে দ্রৌপদীকে জোর করে তার রথে উঠিয়ে নিয়ে গেছে; একটি পথ দেখিয়ে বললো,—এই পথ দিয়ে গেছে, এখনো সম্ভভাঙ্গা শাখা প্রশাখা এই পথের দুপাশে দেখা যাচ্ছে, পাণ্ডবগণ রথ নিয়ে সেপথে শীঘ্র গেলে তাকে ধরতে পারবেন। শুনে যুধিষ্ঠির তখনি সেই পথে দ্রুত রথ চালাবার আদেশ দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে দূরে জয়দ্রথ বাহিনীর উৎক্ষিপ্ত ধূলি আকাশে দেখা গেল, আর একটু অগ্রসর হতেই জয়দ্রথের বাহিনী পাণ্ডবগণের দৃষ্টি পথে এসে গেল। ভীম অর্জুন উচ্চকণ্ঠে জয়দ্রথকে ডেকে তাকে তিরস্কার করে তাকে থামতে বললেন, কিন্তু জয়দ্রথ বাধাদান করা স্থির করে সঙ্গী রথী ও সৈন্যদের ফিরে পাণ্ডবদের সম্মুখীন হতে বললেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই জয়দ্রথের বাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে গেল। কোটিকাস্য ভীমের হাতে মারা পডলো, তার পিতা সুরথ রণহস্তী হতে নকুলের উপর আক্রমণ করলে নকুল খড়্গাঘাতে হস্তীর শুণ্ড ও দন্ত ছিন্ন করলেন, হস্তীটি ঘুরে গিয়ে বেদনার জ্বালায় স্বপক্ষের সৈন্য দলিত করল। অর্জুনের অস্ত্রে বহু সিন্ধু-সৌবীর দেশীয় রথী মারা পডলেন। যুধিষ্ঠিরও সৌবীর রথীদের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের অনেককে মারলেন, এক শ্রেষ্ঠ বীর তাঁর রথের অশ্বচতুষ্টয় নিধন করলে

তিনি তার বুকে নারাচ বাণ মেরে নিধন করে সহদেবের রথে উঠে পড়লেন। সহদেবও গজারোহী বীরদের কয়েকজনকে শেষ করেছিলেন। যুদ্ধের গতি দেখে জয়দ্রথ কৃষ্ণাকে তার রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে রথ দ্রুত চালিয়ে পালাবার চেষ্টা করল। কৃষ্ণাকে যুধিষ্ঠির সহদেবের রথে তুলে নিলেন। ভীম অবশিষ্ট রথী ও সৈন্য বধ করছিলেন, অর্জুন বললেন এই নিরীহদের মেরে কি হবে, জয়দ্রথ পালিয়ে যাচ্ছে, তাকে অনুসরণ করে শাস্তি দিই চলুন। ভীম তখন যুধিষ্ঠিরকে ডেকে বললেন, আপনি নকুল সহদেব দ্রৌপদীকে আশ্রমে নিয়ে যান, আমরা জয়দ্রথের অনুসরণ করে যাচ্ছি। যুধিষ্ঠির বলে দিলেন, দুঃশলা ও গান্ধারীর কথা মনে করে তাকে বধ কোর না, বলে তিনি দ্রৌপদীকে নিয়ে নকুল সহদেবসহ আশ্রমে ফিরলেন। ভীম ও অর্জুন দ্রুত রথ চালিয়ে জয়দ্রথের অনুসরণ করলেন, বহুদূর থেকে লক্ষ্য করে বাণ মেরে অর্জুন অপূর্ব পটুত্বের পরিচয় দিয়ে জয়দ্রথের অশ্বচতুষ্টয়কে মেরে ফেললেন। একটু অগ্রসর হয়ে তাঁরা দেখলেন যে জয়দ্রথ রথ থেকে নেমে দৌড়ে পালাচ্ছে, ভীমও তাঁর রথ থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে জয়দ্রথকে ধরে ফেললেন, মুষ্টি আঘাতে ও পদাঘাতে জয়দ্রথকে অজ্ঞান করে দিলেন। বিসংজ্ঞ হয়ে গেলেও ভীম তাকে প্রহার করে চলেছেন দেখে অর্জুন বললেন, রাজার নির্দেশ মনে রাখবেন, ওকে মেরে ফেলবেন না। ভীম বললেন, রাজা দয়ালু, তুমিও বালস্বভাববশে তার কথার পুনরাবৃত্তি করছ, আমি আর কি করি; বলে প্রহার বন্ধ করে অর্ধচন্দ্র বাণ নিয়ে জয়দ্রথের কেশ স্থানে স্থানে মুণ্ডন করে দিয়ে তাকে বেঁধে রথে তুলে নিলেন। ভীম ও অর্জুন তাকে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থিত করলেন। যুধিষ্ঠির জয়দ্রথের অবস্থা দেখে হেসে বললেন, ওকে বন্ধনমুক্ত করে দাও। ভীম বললেন, ওকে দ্রৌপদীর কাছে হাত জোড় করে বলতে হবে যে আমি পাণ্ডবগণের দাস হয়েছি। শুনে যুধিষ্ঠির ভীমকে মিষ্টমুখে বললেন, আমাকে যদি মান্য কর তবে আমার কথায় ওকে মুক্ত ক'রে দাও। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা বুঝে বললেন, ওর কেশ স্থানে স্থানে মুণ্ডিত করে ওর দেহে পরাজয় চিহ্নিত করে দিয়েছ, রাজার দাস ও হয়েছে, ওকে বন্ধন-মুক্ত করে দাও। মুক্ত হয়ে বিহ্বলভাবে জয়দ্রথ রাজাকে প্রণাম করল, রাজা তাকে বললেন, তুমি অদাস হয়ে তোমার রথ অশ্ব নিয়ে চলে যাও, কিন্তু ধর্মে তোমার মতি হোক, পরের স্ত্রী হরণের মত ঘৃণ্য কাজ আর কোরো না। তারপর জয়দ্রথ অবশিষ্ট বল নিয়ে চলে গেল।

জয়দ্রথ নিজের দুর্দশায় কাতর হয়ে প্রতিশোধের জন্য গঙ্গাদ্বারে গিয়ে এক শ্রেষ্ঠ অস্ত্রশিক্ষকের নিকট কিছুদিন ধরে অস্ত্রশিক্ষা নিল, তার সংকল্প ছিল যে অস্ত্র চাতুর্যে পাণ্ডবগণকেও অতিক্রম করে যাবে। কিছুকাল শিক্ষার পরে অস্ত্রগুরু তাকে বললেন, তুমি যতটা উৎকর্ষ লাভ করতে সক্ষম, তা করেছ। অর্জুনের সমকক্ষ তুমি কখনও হতে পারবে না, তবে অন্য পাণ্ডবগণকে মধ্যে মধ্যে যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ করতে পারবে। তখন জয়দ্রথ গুরুর নিকট হতে বিদায় নিয়ে যথাযোগ্য দক্ষিণা দিয়ে দেশে ফিরলেন।

পাণ্ডবগণ দ্বাদশবর্ষ বনবাসের যে অল্পকাল বাকী ছিল, তা নির্বিঘ্নে দ্বৈতবনে কাটিয়ে দিলেন, ত্রয়োদশ বর্ষ আরম্ভ হবার প্রাক্‌কালে তাদের সঙ্গে যে ব্রাহ্মণদল তখনও ছিল, যুধিষ্ঠির তাদের বললেন, এবার আমাদের অজ্ঞাতবাস আরম্ভ হবে, আপনারা সকলে নিজ নিজ বাসে ফিরে যান, ত্রয়োদশ বর্ষে আমরা কোথায় আছি তা যদি দুর্যোধন বা কর্ণ বা শকুনি জান্‌তে পারে, তাহলে আমাদের আবার দ্বাদশ বর্ষ বনে কাটাতে হবে; তাই আমরা গুপ্তভাবে ছদ্মবেশে বাস করব, আপনারা সঙ্গে থাক্‌লে তা সম্ভব হবে না। ভীম বললেন, রাজা ধর্মপথে তাঁর সময় পালন করছেন, আমরাও কোন দুঃসাহসের কাজ করে রাজাকে সময় পালন থেকে ভ্রষ্ট করি নাই, সময়ের বাকী অংশও রাজা ধর্ম অবলম্বন করে পালন করবেন, আমরাও তাই চাই। শুনে রাজা খুসী হলেন, যুধিষ্ঠিরের প্রসাদভিক্ষু বিপ্রগণ অভিবাদন জানিয়ে স্ব স্ব গ্রামে বা নগরে চলে গেল। দ্বৈতবনে যে যতিদের আশ্রম ছিল, তারা অবশ্য রয়ে গেল। যুধিষ্ঠির তখন ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্যকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সরোবর তীরস্থ কুটিরসমূহ থেকে দূরে নির্জন বনে গিয়ে অজ্ঞাতবাস কোথায় কিভাবে করা যেতে পারে তার পরামর্শে প্রবৃত্ত হলেন।

২১. বিরাট পর্ব—অজ্ঞাত বাস—সময় পালন

এক ক্রোশ দূরে ঘন বনের মধ্যে গিয়ে একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে সেখানে উপবেশন করে পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদী অজ্ঞাত বাস সম্বন্ধে পরামর্শ আরম্ভ করলেন। যুধিষ্ঠির প্রথমে অর্জুনকে প্রশ্ন করলেন, কোন দেশে গিয়ে অজ্ঞাত বাস করা সঙ্গত। অর্জুন পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য ইত্যাদি কয়েকটি দেশের নাম দিলেন, যুধিষ্ঠির বললেন, মৎস্যরাজ বৃদ্ধ, ধার্মিক, পাণ্ডবগণের প্রতি অনুরক্ত, সেখানে

অজ্ঞাতবাস করা সঙ্গত হবে। তারপরে চিন্তা করে যুধিষ্ঠির বল্লেন যে তিনি বিরাট রাজের সভাসদ ও অক্ষক্রীড়ার সহচর ব্রাহ্মণ রূপে আশ্রয় নেবেন, নাম নেবেন কঙ্ক। ভীম বললেন, তিনি বল্লব নাম নিয়ে বিরাট রাজার মহানস বা রন্ধনশালায় অধ্যক্ষতার কাজ করবেন। অর্জুন বললেন, দুই হাতে বহু জ্যাঘাত চিহ্ন ঢাকতে তিনি নারীবেশ ধারণ করে বলয় ও কুণ্ডল পরবেন, বৃহন্নলা নামক ক্লীব বলে নিজের পরিচয় দিয়ে গীতবাদ্যের শিক্ষকতা করবেন। নকুল বললেন, তিনি গ্রন্থিক নাম নিয়ে অশ্বযূথের রক্ষকদের কর্তা হবেন, সহদেব বললেন, তিনি তন্তিপাল নাম নিয়ে বিরাটরাজের গোযূথের প্রধান রক্ষক হবেন। কৃষ্ণা বললেন, তিনি বিরাটরাজ মহিষী সুদেষ্ণার সৈরিন্ধ্রী, অর্থাৎ কেশবন্ধন ও প্রসাধন নিপুণা পরিচারিকা হবেন।

এইভাবে নিজেদের মধ্যে স্থির করে নিয়ে পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনের সরোবর কূলে তাঁদের আশ্রমে ফিরে এসে ইন্দ্রসেন ও অন্যান্য সারথিদের তাঁদের রথ অশ্ব নিয়ে দ্বারকায় গিয়ে থাকতে আদেশ দিলেন, ধৌম্যকে বল্লেন, আপনি অগ্নিহোত্রের সরঞ্জাম নিয়ে দ্রুপদরাজার গৃহে আশ্রয় নিন; পৌরোগব ও পাচকগণ পটগৃহ ও মহানসের দ্রব্যসম্ভার নিয়ে, গোরক্ষীগণ গাভী নিয়ে দ্রুপদরাজের আশ্রমে গিয়ে থাকবে, দ্রৌপদীর ধাত্রী ও দাসীগণ পুরোহিত ধৌম্যের সঙ্গে দ্রুপদরাজ গৃহে গিয়ে আশ্রয় নেবে। ধৌম্য যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করে তাতে আহুতি দিয়ে পাণ্ডবগণের কুশল, সমৃদ্ধি ও বিজয় প্রার্থনা করলেন, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ সেই যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করলেন; যুধিষ্ঠির নির্দেশ দিলেন, পাণ্ডবগণের সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করলে তারা বলবে যে পাণ্ডবগণ দ্বৈতবন থেকে তাদের ছেড়ে চলে গেছেন, কোথায় গেছেন তা কেউ জানে না। তারপর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ সে স্থান হতে চলে গেলেন। তারা চলে গেলে পরে ইন্দ্রসেনাদি রথ অশ্ব নিয়ে দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করল; পুরোহিত ধৌম্য দাস, দাসী, পৌরোগব, পাচক, গাভী ও নানা সরঞ্জাম শকটে নিয়ে পাঞ্চালরাজ গৃহের দিকে চললেন।

পাণ্ডবগণ প্রথমে যমুনা নদীর দিকে চল্লেন, তারা সকলেই নিজ নিজ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিয়েছিলেন। যাত্রা পথে মৃগয়া করে ভোজ্য সংগ্রহ করেছেন, কখন পাহাড়ের উপর রাত্রিবাস করেছেন, কখনও বনের মধ্যে নিরাপদ স্থান দেখে সেখানে বাস করেছেন। যমুনা নদী পার হয়ে পাঞ্চাল রাজ্যের দক্ষিণ ও দশার্ণ-রাজ্যের উত্তর দিয়ে চলে, শূরসেন রাজ্যের মধ্য দিয়ে গিয়ে, মৎস্য দেশের বনে

উপনীত হলেন, কেহ প্রশ্ন করলে বললেন, আমরা মৎস্য দেশের শিকারী। মৎস্য-দেশের বন হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যখন দূরে বিরাট রাজধানীর প্রাচীর ও মধ্যে কর্ষিত ক্ষেত্র দেখা গেল, তখন কৃষ্ণা বললেন, এখানে বিশ্রাম করা যাক, বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। যুধিষ্ঠির বললেন, বন ও নগর সন্নিহিত কৃষিক্ষেত্রের মধ্যস্থলে থাকা নিরাপদ নয়, নানা লোকে দেখে নানা প্রশ্ন করতে পারে, অর্জুন তুমি কৃষ্ণাকে কাঁধে তুলে নাও, বিরাট নগরে পৌঁছে আমরা বিশ্রাম নেব। অর্জুন কৃষ্ণাকে বহন করে নিয়ে নগর প্রাচীরের বহির্দেশ পর্যন্ত এসে তাকে নামিয়ে দিলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের এইভাবে সব অস্ত্র নিয়ে নগরে যাওয়া ঠিক নয়, অর্জুনের গাণ্ডীব ধনু, আমাদের স্বর্ণখচিত কোদণ্ড, কোষ ইত্যাদি দেখে লোকে চিনে ফেলতে পারে। অর্জুন বললেন, ওই টিলার উপরে খুব উঁচু ঘনশাখা বিশিষ্ট শমীবৃক্ষ দেখা যাচ্ছে, স্থানটিও নির্জন মনে হচ্ছে, ওখানে উঠে অস্ত্রশস্ত্র বেঁধে শমীবৃক্ষের উঁচু শাখায় বেঁধে পাতা দিয়ে ঢেকে আবার বেঁধে রাখা যায়, যাতে বৃষ্টির জল গিয়ে অস্ত্রে না লাগে। যুধিষ্ঠির সেই প্রস্তাব অনুমোদন করলে সকলে টিলার উপর উঠে শমীবৃক্ষতলে এসে অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে ধনুর সমস্ত জ্যামুক্ত করে নিয়ে কোদণ্ড, তূণ, কোষবদ্ধ অসি, নারাচ ইত্যাদি এক সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করে বাঁধলেন, প্রায় এক মানুষের সমান উঁচু একটি বস্তা হল। যুধিষ্ঠিরের কথামত নকুল বস্তাটি নিয়ে বৃক্ষের উঁচু শাখায় উঠে সেখানে বাঁধলেন, পাতা দিয়ে ঢেকে যেদিক যেদিক থেকে বৃষ্টির জল লাগতে পারে মনে হল, সেই সেই দিকে ঘন করে পত্রের আবরণ দিয়ে আবার বাঁধা হল। তারপর সেখান থেকে নগর অভিমুখে যেতে মেষ-পালকদের সঙ্গে দেখা হতে তারা বললেন, আমাদের মৃত মাতার দেহ শমীবৃক্ষে বেঁধে দিয়েছি, এটি আমাদের কুলপ্রথা।

নগরে প্রবেশ করে কোথায়ও তাঁরা রাত্রিটা গুপ্তভাবে থাকলেন, পরদিন বেশ পরিবর্তন করে একে একে পঞ্চ ভ্রাতা বিরাট রাজের কাছে গিয়ে নিজেদের পূর্ব নির্দিষ্ট কর্মের উপযুক্ত প্রকাশ করে কর্ম প্রার্থী হলেন, বিরাটরাজও তাদের সঙ্গে কথা বলে খুশী হয়ে তাদের ঈপ্সিত পদে তাদের নিয়োগ করলেন। কৃষ্ণা সাধারণ বেশ পরে প্রাসাদের সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করে রাণী সুদেষ্ণার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, রাণী তাকে ডেকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কৃষ্ণা বললেন, আমি সৈরিন্ধ্রী, কেশ সংস্কার, গন্ধদ্রব্যে প্রসাধন প্রস্তুত ও মাল্য রচনায় দক্ষতা লাভ করেছি, একসময়ে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামার সেবা করেছি, পরে দ্রুপদকুমারীর সেবা করেছি,

আমাকে তারা মালিনী বলে ডাকতেন, এখানে অনুরূপ কর্মের সন্ধানে এসেছি। রাণী বললেন, তোমাকে আমি আমার সৈরিন্ধ্রীরূপে নিয়োগ করতে পারি, কিন্তু তোমার মুখে ও সর্বাঙ্গে এত রূপলাবণ্য, ভয় হয় যে রাজা আমাকে ভুলে তোমাকে নিয়ে থাকতে চাইবেন। কৃষ্ণা বললেন, আমার পাঁচজন বলবান্ যুবক গন্ধর্বস্বামী আছেন, তারা আমাকে রক্ষা করেন, আমিও তাদের ছাড়া অন্য পুরুষের চিন্তা করি না। তারা এখন দুঃখে পড়েছেন, তাই আমার কর্মসন্ধানে ফেরা, কিন্তু তারা দুরবস্থার মধ্যেও সর্বদা আমার দিকে দৃষ্টি রাখেন। আমাকে ধর্ম থেকে কেউ বিচলিত করতে পারবে না ; আপনি নির্ভয়ে আমাকে সৈরিন্ধ্রী করে রাখতে পারেন, তবে আমি কারো উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করি না এবং কারো পদ-প্রক্ষালন করি না। রাণী সুদেষ্ণা কৃষ্ণার সর্ত মেনে নিয়ে তাকে সৈরিন্ধ্রী পদে নিয়োগ করলেন।

যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে রাজ সভাসদরূপে রাজা বিরাটের প্রীতি অর্জন করলেন। ভীম বল্লব নামে মহানসের অধ্যক্ষতা কর্মে খুব দক্ষতা দেখালেন, তার বল ও বাহুযুদ্ধে অভিজ্ঞতার কথা জেনে রাজা তাকে মল্লক্রীড়ায় যোগ দিতে বলেন, শারদ উৎসবে রাজ অনুরোধে মল্লক্রীড়ায় বিরাট রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মল্লবীর জীমূতকে পরাজিত করলেন। অর্জুন বৃহন্নলা নামে নারী বেশ ধারণ করে রাজকন্যা উত্তরা ও তার সখীদের নৃত্যগীত পারদর্শিনী করে তুললেন, মধ্যে মধ্যে রাজা বা রাণীর আমন্ত্রনে নিজেও নৃত্যগীত করে সকলকে তৃপ্ত করতেন। নকুল গ্রন্থিক নামে অশ্বচর্যায় দক্ষতা দেখিয়ে রাজার অশ্বযূথের উন্নতি করলেন, সহদেব তন্তিপাল নামে রাজ্যের গোযূথ রক্ষণে ও চিকিৎসায় কৃতিত্ব দেখালেন। এইভাবে অজ্ঞাতবাসের দশমাস নির্বিঘ্নে কেটে গেল। বিরাট রাজার জন্য কৃষ্ণা চন্দন বাটা ইত্যাদি দিয়ে গন্ধলেপন প্রস্তুত করে দিতেন. কিন্তু বিরাটরাজ কখনও কৃষ্ণার দিকে কুদৃষ্টি দেন নাই। রাণীর ভ্রাতা কীচক হঠাৎ একদিন কৃষ্ণাকে দেখে বিপদ বাধালেন।

২২. বিরাট পর্ব—কীচক বধ

রাণী সুদেষ্ণার ভ্রাতা কীচক ছিলেন বিরাট রাজার সেনাপতি, তিনি মহাবল সম্পন্ন এবং যুদ্ধবিদ্যায় কৌশলী ছিলেন ; বিরাট রাজের প্রতিবেশী ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা তার কাছে কয়েকবার পরাজিত হয়েছিলেন। পররাষ্ট্রের ভূমি ও ধনরত্ন লাভ উদ্দেশ্য নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ হ'ত ; সেকালে বৃষ

ও গাভী শ্রেষ্ঠ ধন বলে পরিগণিত হ'ত, এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র আক্রমণ করে গো-যূথ হরণও যুদ্ধের একটি উদ্দেশ্য ছিল; বিরাট বা মৎস্য রাজ্য গোযূথসমৃদ্ধ ছিল, সুশর্মা গোযূথ হরণের চেষ্টাতেই বিরাটরাজ্য কয়েকবার আক্রমণ করে কীচকের কাছে পরাজিত হ'ন। কীচকের বল ও যুদ্ধনিপুণতার জন্য বিরাটরাজও তাকে সমীহ করে চলতেন। হঠাৎ একদিন সুদেষ্ণার কাছে অপূর্ব সুন্দরী কৃষ্ণাকে দেখে কীচক সুদেষ্ণার কাছ থেকে তার পরিচয় জেনে অর্থাৎ দশমাস পূর্বে সেই নারী সৈরিন্ধ্রীরূপে নিযুক্ত হয়েছে, এই কথা জেনে নিজেই একসময় তার কাছে গিয়ে বললেন, তোমার অপরূপ রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছে, তুমি সামান্য পরিচারিকা বৃত্তি ছেড়ে আমার প্রাসাদে এসে সুখভোগ কর, আমার পূর্ব প্রণয়িণীগণ তোমার দাসী হয়ে থাকবে, আমিও তোমার আজ্ঞাবহ হব। কৃষ্ণা বললেন, আমি পরস্ত্রী, সৎপুরুষ কখনো পরস্ত্রীকে স্ববশে আন্‌তে চান না, পাপাত্মা পুরুষ তা ক'রে বিপদে পড়ে। কীচক তবু নির্বন্ধ প্রকাশ করায় কৃষ্ণা বললেন, পাঁচজন বলবান গন্ধর্ব স্বামী গুপ্ত থেকে সর্বদা আমাকে রক্ষা করেন, আমার প্রতি অসদাচরণ করলে তারা তোমাকে বধ করবে।

কীচক তখন তার বোন সুদেষ্ণাকে বল্‌লেন, তোমার সৈরিন্ধ্রীকে আমার অনুকূল করে দাও। সুদেষ্ণা বল্‌লেন, তুমি কোন পর্ব উপলক্ষে উত্তম সুরা ও অন্ন প্রস্তুত করে আমাকে আমন্ত্রণ কর, আমি আমার জন্য সুরা আন্‌তে সৈরিন্ধ্রীকে পাঠিয়ে দেব, সেখানে নির্জনে মিষ্ট অনুনয় করলে সৈরীন্ধ্রী তোমার প্রতি অনুকূল হতে পারে। কীচক শীঘ্রই এক পর্বদিনে স্বগৃহে প্রচুর খাদ্য ও সুরা প্রস্তুত করিয়ে সুদেষ্ণাকে আমন্ত্রন জানাল। সুদেষ্ণা সৈরিন্ধ্রীকে বল্‌লেন, তুমি কীচকের বাস-গৃহ থেকে আমার জন্য উৎকৃষ্ট সুরা নিয়ে এস, সে উৎকৃষ্ট সুরা ও খাদ্য প্রস্তুত করিযে আমাকে আমন্ত্রণ করেছে। কৃষ্ণা বল্‌লেন, কীচক আমার কাছে লজ্জাকর এক প্রস্তাব করেছিল, আমি তার গৃহে যেতে চাই না, দয়া করে অন্য কোন পরিচারিকাকে সুরা আন্‌তে বলুন। সুদেষ্ণা বল্‌লেন, আমি তোমাকে আমার জন্য সুরা আন্‌তে পাঠিয়েছি জানলে কীচক তোমার উপর কোন অত্যাচার করবে না, এই স্বর্ণপাত্রে সুরা নিয়ে এস। কৃষ্ণা মনে মনে প্রার্থনা করলেন, আমি যদি পতিদের ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তা না করে থাকি, তাহলে কীচক যেন আমাকে তার বশ করতে না পারে। এই প্রার্থনা করতে করতে কৃষ্ণা স্বর্ণপাত্র নিয়ে সুরা আনতে গেলেন। কীচক তাকে দেখে আনন্দিত হয়ে বল্‌ল, তোমার

জন্য অনেক স্বর্ণ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়ে রেখেছি, আমার কামনা পূর্ণ কর। কৃষ্ণা বললেন, রাণী সুদেষ্ণা আমাকে তার জন্য উৎকৃষ্ট সুরা নিয়ে যেতে বলেছেন। কীচক বল্‌ল, সুরা আমি আর কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি. বলে কৃষ্ণার দক্ষিণ পাণি হাত দিয়ে ধরে তাকে মিষ্ট কথা বলতে লাগ্‌ল। কৃষ্ণা তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কীচককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে দ্রুতপদে রাজসভায় উপস্থিত হ'লেন। কীচক উঠে দৌড়ে গিয়ে রাজার সম্মুখেই কৃষ্ণাকে চুল ধরে টেনে মাটিতে ফেলে পদাঘাত কর্‌ল। সেখানে দৈবক্রমে ভীমসেনও উপস্থিত ছিলেন. তাকে আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে কীচকের উপরে ঝাপিয়ে পড়তে উদ্যত দেখে যুধিষ্ঠির অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী ঘর্ষণে শব্দ করে ভীমকে সাবধান করে দিলেন। কৃষ্ণা সাশ্রুকণ্ঠে বল্‌লেন, যারা সর্বদা শরণার্থীকে নির্ভয় আশ্রয় দিত, তারা আজ কোথায়? তাদের প্রিয়া স্ত্রীকে দুষ্টলোক পদাঘাত করে দেখেও তারা নিশ্চেষ্ট কেন? রাজা বিরাটই বা কেমন ধর্মপালক, তার সামনে নির্দোষী নারীকে পদাঘাত করা হ'ল দেখেও তিনি কেন প্রতিকার করেন না? বিরাটরাজ বললেন, তোমার ও কীচকের মধ্যে পূর্বে কি ঘটেছে, তা না জেনে বিচার করব কি করে? যুধিষ্ঠির বল্‌লেন, সৈরিন্ধ্রী, তুমি রাণী সুদেষ্ণার কাছে যাও, তোমার গন্ধর্ব পতিরা নিশ্চয় মনে করছেন যে এখনও অন্যায়কারীকে শাস্তি দেবার সময় আসে নাই; উপযুক্ত সময়ে তারা অন্যায়কারীকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। কৃষ্ণা বল্‌লেন, যারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অক্ষক্রীড়ামত্ততার কারণে অসম্মান-ভাজন হয়েছেন, সেই হৃদয়বান কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের জন্যই আমি ধর্মচারিণী আছি, এই বলে সুদেষ্ণার কাছে চলে গেলেন। তার অশ্রুপূর্ণ মুখ দেখে সুদেষ্ণা প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে? কৃষ্ণা বললেন, রাজসভায় সকলের সম্মুখে কীচক আমাকে পদাঘাত করেছে, কিন্তু কেউ প্রতিকার করে নাই। সুদেষ্ণা বললেন, কীচক তোমাকে অপমান করেছে, তার শাস্তি দেব। কৃষ্ণা বললেন, আমার গন্ধর্ব পতিরাই তাকে শাস্তি দেবেন।

সেদিন রাত্রে ভীম যখন মহানসের কাজ সেরে নিদ্রামগ্ন, কৃষ্ণা গিয়ে তাকে জাগিয়ে দিলেন। ভীম জেগে উঠে কৃষ্ণাকে দেখে বল্‌লেন, কেন এমন করে এখানে এখন এসেছ খুলে বল। আমি যা প্রতিকার করতে পারি, করব। তোমার কথা বলে শীঘ্র চলে যাও, তোমাকে এখানে যেন কেউ না দেখে। কৃষ্ণা বল্‌লেন, তুমি তো দেখলে, রাজসভায় আশ্রয় নিয়েও আমি কীচকের পদাঘাত

থেকে বাঁচতে পারি নি। কীচক আমাকে কামনা করছে, বিরাটরাজ যাতে আমার প্রতি আকৃষ্ট না হন, সেই উদ্দেশ্যে সুদেষ্ণা কীচকের কামনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন; মিষ্ট কথায় আমাকে বশ করতে না পেরে কীচক বল প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেছে, মনে হয় যে রাজা বিরাটও তাকে ভয় করেন। এভাবে আমার উপর যদি বল প্রকাশ করতে থাকে তবে আমার মৃত্যু ছাড়া কোন পথ থাকবে না। স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে রক্ষা করা, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম আর্তকে উদ্ধার করা; জয়দ্রথের হাত থেকে আমাকে যেমন উদ্ধার করেছিলে, তেমন কীচকের হাত থেকেও বাঁচাও।

ভীম চিন্তা করে বললেন, বিরাটরাজ একটি নৃত্যশালা তৈয়ার করে দিয়েছেন, দিনের বেলা সেখানে নৃত্য-গীত শিক্ষা হয়, রাত্রে শূন্য থাকে. সেখানে বিশ্রামের জন্য একটি পালঙ্কও আছে। তুমি কীচককে বল সেখানে তোমার সঙ্গে সন্ধ্যার পরে মিলিত হতে যেন আসে, সেখানে তোমার পরিবর্তে আমি পালঙ্কে শুয়ে থাকব, কামনার পাত্রী বলে আমাকে আলিঙ্গন করতে আসলে আমি কীচকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে তাকে মেরে ফেলব। সেই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে কৃষ্ণা তাঁর নিজের শয়নাগারে ফিরে গেলেন।

পরদিন প্রাতে কীচক কৃষ্ণার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, দেখলে তো. আমার কাছ থেকে রাজাও তোমাকে রক্ষা করতে পারে না; আমি সেনাপতি হলেও আমিই প্রকৃতপক্ষে এই দেশের রাজা, তুমি আমার কাছে আসলে সুখ ও প্রতিপত্তি লাভ করবে, আমি তোমাকে পৃথক আবাসগৃহ ও শত দাসী দেব, এবং যত চাও রত্ন অলঙ্কার বেশভূষা দেব। কৃষ্ণা বললেন, তুমি আমাকে যদি চাও তাহলে রাজা যে নৃত্যশালা নির্মাণ করে দিয়েছেন, যেখানে দিনে মেয়েরা নৃত্যগীত শেখে, রাত্রে শূন্য থাকে, সেখানে সন্ধ্যার কিছু পরে তুমি একলা আসলে আমাকে পাবে, এইভাবে আসলে আমার দুর্দান্ত গন্ধর্ব পতিরা জানতে পারবে না। কৃষ্ণার কথা শুনে কীচক আনন্দিত হয়ে সেইভাবে সঙ্কেতগৃহে আসতে সম্মত হ'ল ও কৃষ্ণা সেকথা এক সময় ভীমকে জানিয়ে দিলেন। দিন শেষে কীচক গন্ধ মাল্য অনুলেপন দিয়ে প্রসাধন করে সন্ধ্যার কিছু পরে নৃত্যশালায় একা গেল, ভীম তার পূর্বেই এসে পালঙ্কে শুয়েছিলেন, তাকে অন্ধকারে কৃষ্ণা মনে করে কীচক অগ্রসর হতে হতে বলল, তোমার জন্য দাসীপূর্ণ পৃথক গৃহের ব্যবস্থা করেছি। কাছে আসলে তার স্বপ্নভঙ্গ হ'ল, ভীম উঠে তাকে পরস্ত্রীর উপর লোভ করবার

শাস্তি এবার পেতে হবে, বলে তাকে আক্রমণ করলেন। কীচকও খুব বলশালী পুরুষ ছিল, দুজনের মধ্যে অন্ধকারে বহুক্ষণ মল্ল-যুদ্ধ হ'ল। তারপর ভীমের অধিক বল হেতু কীচক ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ল, তখন ভীম তাকে উঠিয়ে ঘুরিয়ে জোরে ফেলে দিলেন, এবং পতিত অবস্থায় আরো প্রহার দিয়ে বধ করলেন। তারপরে কৃষ্ণাকে ডেকে বাতি জ্বালিয়ে দেখালেন যে কীচক মৃত পড়ে আছে। দেখিয়ে ভীম চলে গেলেন। নৃত্যশালার রক্ষীগণ গৃহের মধ্যে ঝটাপট শব্দ শুনে জেগে উঠেছিল, ঘরে আলো দেখে তারা নৃত্যশালায় এসে দেখ্‌ল যে কীচকের মৃতদেহ পড়ে আছে, কৃষ্ণা পালাবার চেষ্টা না করে বললেন, এই দেখ, সেনাপতি আমার ধর্ম নষ্ট করতে চেষ্টা করে আমার গন্ধর্ব স্বামীদের হাতে হত হয়েছে।

রক্ষীগণ কীচকের ভ্রাতাদের সংবাদ দিল। তারা যখন এল, তখনও কৃষ্ণা নৃত্যশালায় একটি স্তম্ভ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তারা দেখে বল্‌ল, এই নারীর জন্য কীচক এইভাবে নিহত হয়েছে, একেও বেঁধে নিয়ে কীচকের সঙ্গে দাহ করব। তারা রাজা বিরাটের কাছে কৃষ্ণার জন্য কীচকের নিধন সংবাদ জানিয়ে বল্‌ল, কীচকের দেহের সঙ্গে এই নারীকেও দাহ করতে চাই, এই নারীই কীচকের মৃত্যুর কারণ। বিরাট রাজ কীচকভ্রাতা ও তার অনুচরদের বীর্য জান্‌তেন, তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে সাহস করলেন না। কীচকের ভ্রাতাগণ ও অনুচরগণ উপকীচক নামে পরিচিত ছিল, তারা কীচকের দেহ শ্মশানে নেবার সময় কৃষ্ণাকেও বেঁধে নিয়ে চল্‌ল। কৃষ্ণা চীৎকার করে উঠ্‌লেন, হে আমার গন্ধর্ব পতিগণ, তোমরা কোথায় আছ, বিপদে আমাকে রক্ষা কর। সে চীৎকার শুনে ভীম চীৎকার করে উত্তর দিলেন, আমি তোমার কথা শুনেছি, ভয় নেই। তিনি তোরণের দিকে না গিয়ে নগর প্রাকারের নিকটস্থ এক বৃক্ষে আরোহণ করে প্রাকারের উপরে উঠলেন, সেখান থেকে বাইরের দিকের এক বৃক্ষে উঠে নেমে দ্রুত শ্মশান অভিমুখে চল্‌লেন, পথে একটি অর্দ্ধ শুষ্ক বৃক্ষ দেখে তার কাণ্ড ভেঙ্গে নিয়ে স্কন্ধে সেটিকে নিয়ে অগ্রসর হ'লেন। তাকে দেখে উপকীচকগণ ভয় পেয়ে বলে উঠল, ওই সৈরিন্ধ্রীর এক ভয়ানক গন্ধর্ব পতি আস্‌ছে, বলে তারা পালাতে গেল। ভীম এসে কৃষ্ণাকে বন্ধনমুক্ত করে উপকীচকদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের অনেককে বৃক্ষ কাণ্ডের আঘাতে বধ করলেন। কৃষ্ণাকে বল্‌লেন, আমি প্রাচীর লঙ্ঘন করে মহানসে ফিরে যাচ্ছি, তুমি তোরণ দ্বারপথে ফিরে রাণী

সুদেষ্ণার কাছে চলে যাও। কৃষ্ণা গৃহে ফিরে অঙ্গ প্রক্ষালন করে বেশ পরিবর্তন করে রাণীর সঙ্গে দেখা করলেন।

বিরাটরাজ সৈরিন্ধ্রীর গন্ধর্ব পতিদের হস্তে কীচক ও উপকীচক বধ বৃত্তান্ত জেনে রাণীকে বললেন, তোমার সৈরিন্ধ্রী তার অপরূপ রূপে পুরুষের কামনা জাগায়, কিন্তু তার গন্ধর্ব পতিগণ ভয়ানক; সৈরিন্ধ্রী এখানে থাকলে আরো কোন বিশিষ্ট পুরুষ তার কাছে কামনা জানিয়ে গন্ধর্বদের শিকার হতে পারে, অতএব ওকে বিদায় করে দাও। রাণী সুদেষ্ণা রাজার আদেশ কৃষ্ণাকে জানালে কৃষ্ণা বললেন, আমাকে আর ত্রয়োদশ দিন মাত্র সময় দিন, তারপরে আমার গন্ধর্বপতিগণ বিপদমুক্ত হয়ে প্রকাশ্যে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। সুদেষ্ণা রাজাকে জানিয়ে সৈরিন্ধ্রীর অনুরোধমত তাকে রেখে দিলেন।

২৩. বিরাট পর্ব—গোহরণ অনুপর্ব

অজ্ঞাতবাসের বৎসর আরম্ভ হ'তেই দুর্যোধন নানা রাজ্যে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ চর পাঠিয়ে পাণ্ডবগণের সন্ধান আরম্ভ করেছিলেন। অজ্ঞাতবাসের কাল যখন প্রায় শেষ হয়ে এল, চর সব ফিরে এসে জানালো যে পাণ্ডবগণের সন্ধান কোথায়ও পাওয়া গেল না। দুর্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, ভীষ্ম, দুঃশাসন আরো সন্ধানের কথা বললেন। তার পরে ত্রিগর্তপতি সুশর্মা বললেন যে বিরাট রাজ্যের সেনাপতি কীচক তার পরাক্রান্ত ভ্রাতৃগোষ্ঠি ও সৈন্য নিয়ে কয়েকবার ত্রিগর্তরাজ্য আক্রমণ করে পশুধন বহু লুণ্ঠন করেছে, সুশর্মা মহাবল কীচকের সঙ্গে পেরে ওঠেন নাই, এখন শোনা যাচ্ছে যে গন্ধর্বদের হস্তে কীচক ও তার ভ্রাতৃগণ নিহত হয়েছে, অতএব বিরাট রাজ্য আক্রমণ করে পশুধনরত্ন লুণ্ঠন করা যেতে পারে। বিরাট রাজ্য গোযূথের জন্য বিখ্যাত ছিল; সুশর্মা প্রস্তাব করলেন যে ত্রিগর্তবাহিনী ও কৌরববাহিনী দুদিক থেকে বিরাট রাজ্য আক্রমণ করে গোধন লুণ্ঠন করে নিজ নিজ রাজ্যভুক্ত করবে। কর্ণ সেই প্রস্তাব সমর্থন করে বললেন, পাণ্ডবগণ সম্ভবতঃ হিংস্র পশুর হস্তে প্রাণ দিয়েছে, না দিয়ে থাকলেও তারা হীনবল, প্রকাশিত হয়েই বা কি করতে পারবে; সুশর্মার প্রস্তাব গ্রহণ করলে ত্রিগর্ত রাজ্য যেমন লুণ্ঠিত সম্পদ ফিরে পাবে, তেমন কৌরব রাজ্যেরও সমৃদ্ধি হবে। দুর্যোধনাদি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, পাণ্ডবগণের আরো অনুসন্ধানের আদেশ আর হ'ল না; স্থির হ'ল

যে আগামী কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর দিন স্থশর্মা তার বাহিনী নিয়ে বিরাট রাজধানীর দক্ষিণে স্থিত গোশালা হতে রক্ষীদের বিতাড়িত করে বহু সহস্র বৃষ ও গাভী হরণ করবে, তাদের প্রতিরোধ করতে বিরাট রাজার সৈন্যদল দক্ষিণে যাবে, সেই স্থযোগ নিয়ে তারপর দিন কৃষ্ণা অষ্টমীতে কৌরববাহিনী বিরাট রাজধানীর উত্তরে স্থিত গোশালা হতে রক্ষীদের তাড়িয়ে দিয়ে বহু সহস্র গোধন হরণ করবে।

সেই পরামর্শমত কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে স্থশর্মা তার সৈন্যবল নিয়ে বিরাট রাজধানীর দক্ষিণ গোশালার রক্ষীদলের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের বিপর্যস্ত করে বহু সহস্র গোধন ত্রিগর্ত রাজ্য অভিমুখে নিযে যেতে আরম্ভ করল। পরাজিত গোরক্ষীগণ দ্রুত রাজধানীতে গিয়ে রাজার কাছে অবস্থা নিবেদন করল। বিরাট রাজ তাঁর ভ্রাতা শতানীক সহ রথ অশ্ব সেনাদল সাজিয়ে দক্ষিণ দিকে দ্রুত অভিযান আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর শেষ হ'যে গিয়েছিল, বিরাট রাজ যখন শত্রুর প্রতিরোধে যেতে উদ্যত হয়েছেন, তখন যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব পৃথক্ পৃথক্ তার কাছে নিবেদন করল যে তারাও রথী রূপে বিরাট রাজের সহায়তা করবে। বিরাট রাজ তাদের প্রত্যেককে রথ, বর্ম, কবচ, অস্ত্রাদি দিতে আদেশ দিয়ে তাঁর বল নিয়ে যাত্রা করলেন। যুধিষ্ঠিরাদি বর্ম অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর পশ্চাতে গেলেন। বিরাট রাজ ত্রিগর্ত-সেনার সম্মুখীন হযে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন, কিন্তু স্থশর্মার সঙ্গে বিরাট, শতানীক ইত্যাদি কেহ পেরে উঠ্‌লেন না; বিরাট রাজ বন্দী হলেন। ইতিমধ্যে পাণ্ডবগণ এসে পড়লেন, ভীম স্থশর্মাকে আক্রমণ করে তাকে তীব্র যুদ্ধে বিপর্যস্ত করলেন, সেই স্থযোগে বিরাট রাজ স্থশর্মার রথ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেমে গিয়ে আবার যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ভীম স্থশর্মাকে পরাজিত করে বন্দী করে যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে গেলেন, স্থশর্মা সমস্ত গোধন ফিরিয়ে দেওয়া স্বীকার করলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। গোযুথ আবার বিরাট রাজার গোশালায় ফিরে এল।

পরদিন প্রভাতে বিরাট তার রথী ও সৈন্যরথ নিয়ে রাজধানীতে ফিরবার পূর্বেই কৌরব বাহিনী বিরাট রাজের উত্তর গোশালার রক্ষীদলকে আক্রমণে পর্যুদস্ত করে ষাট হাজার বৃষ ও গাভী হস্তগত করে হস্তিনাপুর অভিমুখে যেতে উদ্যত হল। বিতাড়িত গোষ্ঠরক্ষীগণ রাজধানীতে এসে রাজকুমার উত্তরের নিকট সেই সংবাদ দিয়ে বলল, রাজা আপনাকে তার অবর্তমানে রাজ্যের ও ধনের রক্ষাকর্তা বলে থাকেন, আপনি শীঘ্র এসে উত্তর গোশালার গোধন রক্ষা করুন। রাজকুমার

উত্তর বললেন, রাজা প্রায় সব রথী আর সৈন্য সুশর্মার প্রতিরোধ করতে দক্ষিণে নিয়ে গেছেন, তাছাড়া আমার দক্ষ সারথি কিছুদিন আগে এক যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আমি একজন দক্ষ সারথি পেলে কৌরবদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিতে পারতাম, দক্ষ সারথির অভাবে কি করি? বৃহন্নলারূপে স্থিত অর্জুন সৈরিন্ধ্রী রূপধারিণী কৃষ্ণাকে চুপে চুপে বললেন, তুমি রাজকুমারকে বলতে পার যে বৃহন্নলা দক্ষ সারথি, পূর্বে অর্জুনের সারথ্যও করেছে, সে রাজকুমারের সারথি হয়ে যেতে প্রস্তুত আছে। সৈরিন্ধ্রী সেকথা রাজকুমারকে জানালে রাজকুমার বললেন, আমি নিজে বৃহন্নলাকে বল্‌তে পারব না, সৈরিন্ধ্রী বল্‌ল, আপনার বোন উত্তরা তাকে বলবে, উত্তরার অনুরোধ বৃহন্নলা রক্ষা করবে। উত্তরার অনুরোধে বৃহন্নলা রাজকুমার উত্তরের সারথ্য গ্রহণ করে সারথির উপযুক্ত বর্ম কবচ ধারণ করে নিল। রাজকুমার বৃহন্নলাকে সারথি নিয়ে গোধন উদ্ধারার্থ যাত্রা করলেন।

অর্জুন উত্তরের রথ প্রথমে নগর প্রাকারের বাইরে শমীবৃক্ষের নিকটে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে কৌরব বাহিনী দেখা গেল। কৌরব বাহিনীর বিশালত্ব দেখে সেই বাহিনী দ্রোণ, কর্ণ, ভীষ্ম, কৃপ, দুর্যোধন, দুঃশাসন ইত্যাদি রথীদের দ্বারা রক্ষিত জেনে রাজকুমার ভয়গ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি অর্জুনকে বললেন, অল্পসংখ্যক গোপরক্ষী ও সৈন্য নিয়ে আমার একাকী কৌরব সৈন্য আক্রমণ করা বুদ্ধির কাজ হবে না, বরং ফিরে যাই। অর্জুন বললেন, আপনি রাজপ্রাসাদে স্ত্রী-পুরুষ সকলের সম্মুখে গর্বভরে বলেছেন যে আপনি কৌরবদের কাছ থেকে গোধন উদ্ধার করে আন্‌বেন, তার চেষ্টা না করেই ফিরলে সকলে উপহাস করবে; সৈরিন্ধ্রীও আমার সারথ্যের প্রশংসা করেছে, সারথ্য না দেখিয়ে আমি ফিরব না। ভয় না করে অগ্রসর হয়ে কৌরবসেনার সম্মুখীন হ'ন। উত্তর তাতে আশ্বস্ত না হয়ে রথ থেকে নেমে পালাতে চেষ্টা করল। অর্জুন তার পিছে পিছে গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন, বললেন যে তোমার এত ভয় হয়েছে, তবে আমি রথীরূপে যুদ্ধ করছি, তুমি অশ্বের বল্গা ধরে আমার কথামত রথ চালিত কর। এই বলে অর্জুন নিজের পরিচয় দিলেন, পঞ্চপাণ্ডব ও কৃষ্ণার বিরাট রাজগৃহে অজ্ঞাতবাসের কথা জানিয়ে দিলেন। উত্তরের সন্দেহভঞ্জন করতে তার নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললেন, তোমার এই ধনুক আমার টান সইবে না, তুমি ওই শমীবৃক্ষে উঠে ওই যে বস্তা দেখা যায়, ওটিকে নামিয়ে আন। উত্তর বল্‌ল, শমীবৃক্ষে শুনেছি একটি শব বাঁধা আছে। অর্জুন বল্‌লেন, শব নেই, শব থাক্‌লে তোমাকে উঠ্‌তে

কেন বল্‌ব? ওই বস্তাতে আমাদের উত্তম অস্ত্ররাজি রক্ষিত আছে। তখন উত্তর শমীবৃক্ষে উঠে বস্তাটি নামালেন, বস্তা খুললেই দেখা গেল তার মধ্যে আছে কয়েকটি উজ্জ্বল ধনুকের কোদণ্ড, বহু বাণভরা তূনীর ও কয়েকটি কোষবদ্ধ অসি, এবং আরো নানা অস্ত্র। অর্জুন সেগুলির মধ্য হতে নিজের গাণ্ডীব ধনু দেখিয়ে তাতে জ্যারোপণ করে নিলেন, তীক্ষ্ণ বাণপূর্ণ কয়েকটি তূনীর ও দীর্ঘ খড়্গ নিলেন, বাকী ধনুক, অসি কোনটি কোন পাণ্ডব-ভ্রাতার, তাও উত্তরকে বলে দিলেন। অর্জুনের পরিচয় পেয়ে ও অস্ত্রাদি দেখে উত্তর খুব খুশী হয়ে বল্‌ল, আমি দক্ষ সারথি, আমার অশ্বগুলিও শীঘ্রগামী ও বীর্যবান্‌। অর্জুন রথে অস্ত্রশস্ত্রাদি নিয়ে উঠে কৌরবগণ অভিমুখে রথ চালাতে বললেন, এবং গাণ্ডীব ধনুকে টঙ্কার দিলেন ও শঙ্খ বাজালেন।

অর্জুনের গাণ্ডীবের টঙ্কার শুনে কৌরবগণ বুঝ্‌ল যে স্বয়ং অর্জুন যুদ্ধার্থ এসেছেন। দ্রোণ কৌরবদের সতর্ক করে দিলেন, বল্‌লেন অর্জুন অসাধারণ বীর ও ক্ষিপ্রযোধী, তা মনে রেখে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। কর্ণ অর্জুনের প্রশংসায় ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আচার্য দ্রোণ অর্জুনের পক্ষপাতী, কিন্তু আমি অর্জুনকে পরাজিত করতে পারব। তাতে কৃপ ও অশ্বত্থামা কর্ণকে কিছু কথা শোনালেন, তার পরে ভীষ্ম ও দুর্যোধন তাদের বিবাদ মিটিয়ে দিলেন। দুর্যোধন বল্‌লেন, অর্জুন যদি এসে থাকে, তবে তো ভাল কথা, অজ্ঞাতবাসের কালের মধ্যে প্রকাশ হেতু পাণ্ডবদের আবার দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনবাস স্বীকার করতে হবে। তাতে ভীষ্ম বল্‌লেন, বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ষমান ব্যবহৃত হয়, দ্যূতের পণে বনবাস কাল চান্দ্র বৎসর দিয়ে পরিমিত হয়—ত্রয়োদশ চান্দ্র বৎসর ত্রয়োদশ সৌর বৎসরের থেকে পাঁচ মাস বারো দিন কম, পাণ্ডবগণের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের ত্রয়োদশ বৎসর চান্দ্র বৎসর হিসাবে পূর্ণ হয়ে আরো কয়েকদিন কেটে গেছে, পাণ্ডবগণ তাদের সময় পালন করেছে, পুনঃ বনবাসের প্রশ্ন উঠে না। এখন আমাদের কর্তব্য নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। অর্জুন আসাতে যুদ্ধে জয় সহজ হবে না, এদিকে আমরা দুর্যোধন রাজাকে ও আহৃত গোধন রক্ষা করতে চাই, তাই আমার প্রস্তাব এই যে দুর্যোধন আমাদের সৈন্যের চতুর্থাংশ নিয়ে হস্তিনাপুরের দিকে যাত্রা করুক, তার পশ্চাতে আর এক চতুর্থাংশ সৈন্য হৃত গোযূথ হস্তিনাপুরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাক, বাকী অর্দ্ধাংশ সৈন্য নিয়ে আমরা অর্জুনের প্রতিরোধ করি ও তাকে আটকে রাখি। সেই পরিকল্পনা সকলের মনঃপূত হল, এবং কৌরব বাহিনী

সেইভাবে ভাগ করে হস্তিনাপুরের দিকে দুর্যোধন চতুর্থাংশ সৈন্য নিয়ে চললেন, তার পিছনে গোযূথ তাড়িয়ে সৈন্যদলের চতুর্থাংশ চল্‌ল ; দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, ভীষ্ম প্রভৃতি বাকী সৈন্য নিয়ে অর্জুনের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু অর্জুন কৌরবদের পরিকল্পনা বুঝে উত্তরকে বললেন, তুমি মূল কৌরব বাহিনীর সম্মুখে না গিয়ে একপাশ দিয়ে খুব দ্রুত উত্তরে এগিয়ে চল, সামনে দুর্যোধন যাচ্ছে, তার পিছনে গোযূথ ; তুমি রথ দুর্যোধন ও গোযূথের মধ্যে নিয়ে চল। উত্তর তাই করলেন, সেখানে পৌঁছে অর্জুন শঙ্খধ্বনি করে ও ধনুকের টঙ্কার শব্দে গোযূথকে ব্যাকুল করে দিলেন, তারা ঘুরে গিয়ে উর্দ্ধপুচ্ছে তাদের পরিচিত গোশালার দিকে এমন ছুট দিল যে কৌরব সৈন্যদল তাদের রুখ্‌তে পারল না। অর্জুনের আক্রমনে দুর্যোধন বিপন্ন হবেন ভয় করে কর্ণ দুর্যোধনের রক্ষার্থ অগ্রসর হয়ে গেলেন, অর্জুনের সঙ্গে বাণযুদ্ধে আহত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামাও অর্জুনের সম্মুখীন হয়ে আহত হয়ে ফিরতে বাধ্য হলেন, ভীষ্মও অর্জুনের শরে ব্যথিত হয়ে ধ্বজদণ্ড ধরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন, তার সারথি তার রথ সরিয়ে নিয়ে গেল। দুর্যোধন দুঃশাসনও অর্জুনের বাণের মুখে থাকতে না পেরে সরে গেলেন। তখন অর্জুন সম্মোহনী অস্ত্র ব্যবহার করলেন, বোধহয় গন্ধক চূর্ণ ও বন্যধূপ চূর্ণের বিস্ফোরণে জাত ধূম বায়ব্যাস্ত্রে সকলের রথের দিকে ছড়িয়ে দিলেন, ফলে কৌরব রথীগণ, সম্ভবতঃ ভীষ্ম বাদে, সবাই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। অর্জুনের আদেশে উত্তর গিয়ে ভীষ্ম ভিন্ন আর সব রথীদের পরিচ্ছদ হতে মহার্ঘ বস্ত্রখণ্ড কেটে আন্‌ল, উত্তরা অনুরোধ করেছিল তা আন্‌তে, তা দিয়ে তার পুতুলের সজ্জা হবে।

রথীগণ কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করে দেখ্‌লেন যে অর্জুন নিশ্চেষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন। দুর্যোধন বলে উঠ্‌লেন, আপনারা অর্জুনকে এমন ভাবে আহত করুন যাতে সে ফিরতে না পারে। ভীষ্ম বল্‌লেন, তোমরা এতক্ষণ সংজ্ঞাহীন ছিলে, অর্জুন ইচ্ছে করলেই সকল রথীকে বধ করতে পারত, তা সে করে নাই, সে ধর্মযুদ্ধই করে। এখন অবশিষ্ট সৈন্য রথ নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে চল, গোযূথ পুনঃ সংগ্রহের কোন আশা নাই। কৌরব রথীগণ তখন প্রত্যাবর্তনের সঙ্কেতধ্বনি করল। অর্জুন শঙ্খ বাজিয়ে জয় হ'ল জানিয়ে উত্তরকে বল্‌লেন, রথ আবার শমী বৃক্ষের নিকট নিয়ে চল। সেখানে গিয়ে অর্জুনের নির্দেশমত অর্জুনের গাণ্ডীব, অসি ও অন্যান্য অস্ত্র উত্তর পুনঃ অন্য পাণ্ডবদের অস্ত্রসহ বস্তায় বেঁধে শমী

বৃক্ষে ঝুলিয়ে দিল। অর্জুন উত্তরকে বললেন, আমার ও অন্য পাণ্ডবগণের ও কৃষ্ণার পরিচয় এখন তোমার পিতাকে বা অন্য কাউকে জানিও না, আমরা সময় স্থির করে তাঁর কাছে পরিচয় দেব। তুমি গোপরক্ষী পাঠিয়ে গোযূথ উদ্ধারের সংবাদ জানিয়ে দাও, আমরা বিশ্রাম করে শেষ বেলায় রাজপ্রাসাদে যাব।

এদিকে বিরাট রাজ ভীমের সাহায্যে সুশর্মাকে পরাজিত করে নগরে এসে যখন জয় ঘোষণা করতে বলেন, তখনি শুনলেন যে উত্তর গোগৃহ হতে গোযূথ হরণের জন্য কৌরববাহিনী এসেছে, উত্তর বৃহন্নলাকে সারথি করে নিয়ে তাদের সম্মুখীন হতে গেছে। শুনে বিরাট রাজ উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর রথী ও সৈন্যদের আদেশ দিলেন, তোমাদের মধ্যে যারা বিশেষ আহত হও নাই, তারা এখনই উত্তর গোগৃহে রাজকুমার উত্তরের সাহায্য করতে যাও। আর কুমারের কি অবস্থা তা দূত মুখে সত্বর জানাবে। কঙ্কবেশী যুধিষ্ঠির বললেন, বৃহন্নলা যখন সঙ্গে গেছে, তখন রাজকুমারের জন্য কোন চিন্তা নাই। তার কিছু কাল পরে উত্তরের প্রেরিত গোপরক্ষীগণ এসে সংবাদ দিল যে কৌরববাহিনী কর্তৃক হৃত গোধন উদ্ধার হয়েছে, এবং কৌরব বাহিনী পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে ; রাজকুমার ও বৃহন্নলা বিশ্রাম করে পরে এসে সাক্ষাৎ করবে। বিরাটরাজ উৎফুল্ল হয়ে কুমার উত্তরের সাড়ম্বর অভ্যর্থনার আদেশ দিলেন ; কঙ্ক বললেন, আমি তো বলেছি যে বৃহন্নলা যখন সঙ্গে গেছে, তখন কুমারের জন্য কোন ভয় নাই। বিরাটরাজ আনন্দিত মনে কঙ্কের সঙ্গে পাশা খেলতে প্রবৃত্ত হলেন, খেলতে খেলতে বললেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ কর্ণ ইত্যাদি মহারথদের আমার পুত্র একা পরাজিত করেছে। কঙ্ক বললেন, বৃহন্নলা সঙ্গে ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছে। বার বার বৃহন্নলার কথা বলে তার পুত্রের মহিমা খর্ব করায় রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে পাশা হাতে কঙ্কের মুখের উপর জোরে আঘাত করলেন, ফলে কঙ্কের নাক হতে রক্ত পড়তে লাগল। কঙ্ক হাতে সে রক্ত ধারণ করে সৈরিন্ধ্রীর দিকে তাকালেন, সৈরিন্ধ্রী তার ইঙ্গিত বুঝে একটি জলপূর্ণ পাত্র এনে ধরলেন, কঙ্ক তার মধ্যে রক্ত ফেলে হাত ধুয়ে মুখ নাক ও ধুয়ে নিলেন। অর্জুন একবার বলেছিলেন যে বিনা যুদ্ধে যদি কেহ যুধিষ্ঠিরকে এমন আঘাত করে সে তার রক্ত মাটিতে পড়ে, তাহলে আঘাতকারীকে বধ করবেন। সেইজন্য যুধিষ্ঠিরের এই সতর্কতা। তারপরে দ্বারপাল এসে জানাল যে কুমার উত্তর ও বৃহন্নলা দর্শনপ্রার্থী। রাজা বললেন, তাদের এখানে আনো। যুধিষ্ঠির দ্বারপালের কানে কানে বলে দিলেন, প্রথমে কুমার উত্তরকে আসতে দাও, বৃহন্নলাকে

পরে আসতে দেবে, তার বিশেষ কারণ আছে। দ্বারপাল তাই প্রথমে উত্তরকে রাজার নিকট যেতে দিল। রাজকুমার রাজসভায় এসে প্রথমে পিতাকে প্রণাম করল, পরে কঙ্ককে প্রণাম করে তার নাকে রক্ত দেখে প্রশ্ন করল, এর এমন অবস্থা কে করল। রাজা বললেন, আমি তোমার জয়ে আনন্দ প্রকাশ করছিলাম, কিন্তু এই বিপ্র বার বার বৃহন্নলার কথা বলে তোমার জয়গৌরব লাঘব করতে চেষ্টা করেছে, তাই আমি ক্রুদ্ধ হয়ে পাশা দিয়ে ওকে আঘাত করেছি। রাজকুমার বলল, মহারাজ এটি অত্যন্ত অন্যায় কর্ম হয়েছে, বিপ্রের অভিশাপে আমাদের সমূহ বিপদ হবে। রাজা তখন যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমি পূর্বেই আপনাকে ক্ষমা করেছি, আমার মনে ক্রোধ নেই, আমি জানি যে বলবান প্রভু মধ্যে মধ্যে আচরণে ধৈর্য রাখতে পারেন না। কিন্তু আমার রক্ত ভূমিতে পড়লে আপনার ঘোর অকল্যাণ হত, তাই আমি তা পড়তে দিই নাই। ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠিরের নাক হতে রক্ত পড়া বন্ধ হ'ল, তখন তিনি দ্বারপালকে ইঙ্গিত করলেন, এবার বৃহন্নলাকে আসতে দাও। বৃহন্নলা এসে রাজা ও কঙ্ককে অভিবাদন করলেন। তখন রাজা উত্তরকে প্রশংসার স্বরে বললেন, কেমন করে একাকী দ্রোণ, কর্ণ, ভীষ্ম ইত্যাদি মহারথদের বিমুখ করে গোধন উদ্ধার করলে? কুমার বলল যুদ্ধ জয়ের গৌরব আমার প্রাপ্য নয়। বিশাল কৌরব বাহিনী দেখে আমার ভয় হয়েছিল, এক দেবকুমার এসে আমাকে অভয় দিযে স্বয়ং যুদ্ধভার গ্রহণ করলেন ও হৃত গোধন অপূর্ব কৌশলে উদ্ধার করলেন; যে কৌরব রথী তার সম্মুখীন হল, তাকেই অনায়াসে পরাজিত করলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, সেই দেবকুমার এখন কোথায়? রাজকুমার বলল, তিনি কাল কি পরশু এসে দেখা দেবেন। তারপর বিরাট রাজের অনুমতি নিয়ে বৃহন্নলা আহৃত বস্ত্র খণ্ড সমূহ উত্তরাকে দিয়ে দিলেন। পরে পঞ্চ পাণ্ডব একত্র মিলিত হযে উত্তরের সঙ্গে পরামর্শ করে বিরাট রাজার সম্মুখে পরিচয় দান পদ্ধতি স্থির করলেন।

২৪. বিরাট পর্ব—বৈবাহিক অনুপর্ব

উত্তর গোগ্রহের যুদ্ধের পরে মধ্যে একদিন বাদ দিয়ে তৃতীয় দিনে প্রাতে পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণা স্নান করে শুক্ল বসন ও নানা আভরণ ধারণ করে বিরাট রাজ-সভায় গেলেন, সেখানে গিয়ে যুধিষ্ঠির সিংহাসনে বসলেন, অন্য পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণা

তাঁর দুদিকে বসলেন। রাজা বিরাট সভাগৃহে এসে তাঁদের সেইভাবে বসে থাকতে দেখে বিস্ময় ও ক্রোধভরে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, কঙ্ক, তোমাকে সভাসদ্ ও দ্যূতক্রীড়ার সঙ্গী হিসাবে নিয়োগ করেছিলাম, তুমি আমার সিংহাসনে কেন বসেছ? অর্জুন দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, ইনি স্বয়ং ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, ইনি ইন্দ্রের সিংহাসনের অর্দ্ধভাগেও বসতে পারেন। বিরাট রাজ জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি যদি যুধিষ্ঠির, তবে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী কোথায়? অর্জুন বললেন, এই মহাকায় পুরুষ, যিনি আপনার মহানসে বল্লব নাম নিয়ে অধ্যক্ষতা করেছেন, ও রাজকুলের স্ত্রী-কন্যাদের ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর সঙ্গে খেলা দেখিয়েছেন, ইনি ভীমসেন, এর হাতেই কীচক প্রাণ দিয়েছে। এই যে দুই রূপবান পুরুষ, এর মধ্যে যিনি আপনার অশ্বপাল হয়েছিলেন, ইনি নকুল, আর যিনি আপনার গোপগণের অধ্যক্ষতা করেছেন, ইনি সহদেব। এই যে পদ্মপলাশের মত চক্ষুষ্মতী মৃদুহাসিনী রূপবতী নারী, ইনি দ্রৌপদী, আর আমি অর্জুন—যুধিষ্ঠির ও ভীমের অনুজ এবং নকুল ও সহদেবের অগ্রজ। আমরা সকলে আপনার রাজ্যে সুখে অজ্ঞাতবাস কাল যাপন করেছি।

তারপর কুমার উত্তর অর্জুনকে দেখিয়ে বলল, এই সেই দেবকুমার, যিনি উত্তর গোগ্রহের যুদ্ধে কৌরবগণকে বিপর্যস্ত করে গোধন উদ্ধার করেন।

বিরাটরাজ বললেন, আমি বৃহন্নলার পরিচয় না জেনে যুধিষ্ঠিরের কাছে অপরাধ করেছি, সেই অপরাধ ক্ষালনের জন্য, এবং উপকারী পাণ্ডবগণকে প্রীত করবার জন্য, কুমারী উত্তরাকে অর্জুনের হস্তে সম্প্রদান করি, উত্তর, তুমি কি বল? কুমার উত্তর বলল, পাণ্ডবগণ পূজ্য, তাদের যেভাবে মনস্থ করেছেন, সেইভাবে সম্মানিত করুন। রাজা বিরাট তখন ভীমের বাহুবলে সুশর্মার পরাজয় ও পাণ্ডবদের সাহায্যে দক্ষিণ গোগ্রহ যুদ্ধে জয়ের কথা বলে এবং অর্জুনের বীরত্বের প্রশংসা করে, যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আপনার ব্যবহারে আমার কিছুমাত্র গ্লানি হয় নাই। তারপর বিরাটরাজ পাণ্ডবগণকে একে একে আলিঙ্গন করে মস্তক আঘ্রাণ করলেন; আবার যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আমার সৌভাগ্য যে আপনারা আমার গৃহে অজ্ঞাতবাস সুসম্পন্ন করেছেন। আমার রাজ্যে আপনার অবাধ অধিকার আছে মনে করবেন। আমার কন্যা উত্তরাকে অর্জুন স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন, তিনি তার উপযুক্ত ভর্তা। যুধিষ্ঠির তা শুনে অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুন বললেন, আমি উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে

গ্রহণ করছি। বিরাটরাজ প্রশ্ন করলেন, স্ত্রীরূপে কেন নয়? অর্জুন বললেন, আমি আপনার অন্তঃপুরে শুদ্ধভাবে এক বৎসর বাস করে আপনার যৌবনপ্রাপ্তা কন্যাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিয়েছি, সে আমার সঙ্গে বিনা সঙ্কোচে পিতা ও আচার্যের মত ব্যবহার করেছে। তাকে এখন স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলে লোকে আমার দুর্নাম করবে, পুত্রবধূ রূপে নিলে আমার শুদ্ধ চরিত্রে কেহ সন্দেহ করবে না। আমার যুবক পুত্র অভিমন্যু মহাবীর, বাসুদেবের ভাগিনেয় ও প্রিয় শিষ্য, সে সব দিক দিয়ে উত্তরার উপযুক্ত ভর্তা। বিরাটরাজ বললেন, আপনার কথা আপনার মত ধর্মনিষ্ঠ বীরের উপযুক্ত হয়েছে। আপনার পুত্রের সঙ্গে উত্তরার বিবাহ দিন, আপনার সঙ্গে এই সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরে আমি ধন্য। যুধিষ্ঠিরও অভিমন্যু উত্তরার বিবাহ অনুমোদন করলেন।

তারপর বিরাটরাজ ও যুধিষ্ঠির বাসুদেবের নিকট ও সকল মিত্ররাজদের নিকট সংবাদ পাঠালেন। অর্জুন কৃষ্ণের নিকট পৃথক দূত পাঠিয়ে বিবাহার্থ অভিমন্যুকে, ও সুভদ্রা এবং বৃষ্ণিবীরদের বিবাহ উৎসবে আনতে অনুরোধ করলেন। যথা সময়ে কৃষ্ণ অভিমন্যু, সুভদ্রা ও বহু বৃষ্ণিবীরকে নিয়ে এলেন, ইন্দ্রসেন ও অন্যান্য সারথি পাণ্ডবদের রথ অশ্ব নিয়ে এল। দ্রুপদরাজ ও তাঁর পুত্রগণ দ্রৌপদী পুত্রগণকে নিয়ে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে এলেন। মহাসমারোহে অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হ'ল। তারপরে পাণ্ডবগণ বিরাট রাজ্যের মধ্যে উপপ্লব্যে তাঁদের অস্থায়ী নিবাস গড়ে নিলেন।

২৫. উদ্যোগ পর্ব—রাজ্য উদ্ধারের মন্ত্রণা ও সেনা সংগ্রহ

অভিমন্যু উত্তরার বিবাহ উৎসব শেষ হলে বিরাট রাজের রাজসভায় পাণ্ডবগণ, বলরাম, কৃষ্ণ, সাত্যকি, দ্রুপদরাজ, বিরাটরাজ ইত্যাদি সমবেত হয়ে পাণ্ডবগণের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে আরম্ভ করলেন। সকলে কৃষ্ণের দিকে তাকালে কৃষ্ণ বললেন, আপনারা জানেন যে যুধিষ্ঠির শকুনির কাছে কপট দ্যূতে পরাজিত হয়ে রাজ্যভ্রষ্ট ও বনবাসী হন, দ্যূতের কপটতা বুঝেও পাণ্ডবগণ দ্যূতের সর্ত পালন করেছেন, এখন তাঁরা নিজ রাজ্যভাগ ফেরত চান; কিভাবে তাঁরা নিজ রাজ্যভাগ ফিরে পাবেন, অথচ দুর্যোধনাদিরও অমঙ্গল ঘটবে না, আপনারা তার উপায় চিন্তা করুন। পাণ্ডবগণ সুহৃদদের সাহায্যে যুদ্ধ করে রাজ্য উদ্ধার করতে

পারেন, কিন্তু শান্তির পথে তা সম্ভব হ'লেই ভাল হয়। দুর্যোধন এখন সর্তমত পাণ্ডবদের রাজ্যভাগ ফেরত দেবেন কিনা, তা না জেনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত নয়। আমার মতে প্রথমে দূত পাঠিয়ে দুর্যোধনের ইচ্ছা জানা প্রয়োজন, তাকে ন্যায়ের পথে চল্‌তে প্রচোদিত করা তার সুহৃদদের কর্তব্য।

বলরাম বল্‌লেন যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় অকৌশলী হয়েও দ্যূতকুশল শকুনির সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, এটি তার অবিবেচনার পরিচয়। দুর্যোধন শকুনিকে তার প্রতিনিধি করে জিতেছিল, তার দোষ কি? এই কথা মনে রেখে নম্রভাবে কথা বল্‌তে হবে, দূতকে এই উপদেশ দিয়ে কৌরব সভায় পাঠানো কর্তব্য। সামের পথে রাজ্যপ্রাপ্তি শ্রেয়ঃ।

যুধিষ্ঠির ইচ্ছা করে শকুনির সঙ্গে পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হ'ন নাই, তার সঙ্গে পাশা খেল্‌তে একরকম বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর অবিবেচনা হয়েছিল ভ্রাতৃগণকে, নিজেকে ও দ্রৌপদীকে পণ রাখাতে—দ্রৌপদীর কথা দ্যূতসভাতেই ভীম বলেছিলেন। সাত্যকি বলরামের কথায় উষ্মাপ্রকাশ করে বল্‌লেন যে যুধিষ্ঠিরের শকুনির সঙ্গে খেলাতে কোন অন্যায় হয় নাই, দ্যূত খেলায় কপটতা হচ্ছে বুঝেও তিনি পণের সর্ত সম্পূর্ণ পালন করেছেন, এখন তিনি ন্যায় মতে তাঁর রাজ্যভাগ প্রত্যর্পণের দাবী করবেন, তা ক'র্‌তে নম্রতা প্রকাশ কেন করবেন?

দ্রুপদরাজ বল্‌লেন, সাত্যকি ঠিক কথা বলেছেন, যুধিষ্ঠির ন্যায়মত তার দাবী জানাবেন। আমার সঙ্গে অভিজ্ঞ পুরোহিত আছে, তাকে দূত করে পাঠানো যায়, তাকে বলে দিতে হবে যে পাণ্ডবগণ অক্ষদ্যূতের পণ বহু ক্লেশ সয়েও সম্পূর্ণ পালন করেছে, এখন তারা তাদের রাজ্যভাগ ফেরত পেতে ন্যায়মতে অধিকারী, তা ফেরত দিয়ে যেন দুর্যোধন ধর্ম পালন করেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে দুর্যোধন এতকাল সম্পূর্ণ মহারাজ্য ভোগ করে পাণ্ডবগণের ভাগ সহজে ফেরত দেবে না, যুদ্ধের জন্য বল সংগ্রহ করবে, সুতরাং আমাদেরও মিত্র রাজগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে বার্ত্তা পাঠাতে হবে।

কৃষ্ণ দ্রুপদরাজকে বল্‌লেন, আপনার পুরোহিতকে উপদেশ দিয়ে দিন যাতে পাণ্ডবগণের দাবী শান্তভাবে জানায়, এবং দুই পক্ষের মধ্যে সৌভ্রাত্র্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলে। তাতে দুর্যোধন যদি সামের পথে চলে, তবে তাতে সকলেরই হিত হবে। আর যদি সামের পথে পাণ্ডবদের রাজ্যভাগ পাওয়া সম্ভব

না হয়, তবে অন্য মিত্র রাজগণকে সংবাদ দিয়ে আমাকে সংবাদ দেবেন। আমরা অভিমন্যুর বিবাহে এখানে এসেছিলাম, এখন ফিরে যাব।

তারপর সভাভঙ্গ হ'ল, কৃষ্ণ বলরাম অন্যান্য যাদব নায়কদের নিয়ে দ্বারকায় ফিরে গেলেন। পাণ্ডবগণ বিরাট রাজের রাজধানীর সন্নিকটে উপপ্লব্য নামক স্থানে নিজেদের অস্থায়ী বসতি স্থির করে নিলেন। দ্রুপদরাজ তাঁর পুরোহিতকে দূত নিযুক্ত করে ধৃতরাষ্ট্র সভায় পাঠিয়ে দিলেন, উপদেশ দিয়ে দিলেন যে আপনি ন্যায়ধর্ম যুক্ত কথা বলে পাণ্ডবগণের দাবীর যুক্তিযুক্ততা বুঝিয়ে বলবেন, এবং পাণ্ডবগণ পণের সর্ত পালন করতে কত ক্লেশ সহ্য করেছে, সে কথা বলে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির মনে সহানুভূতি উদ্রেক করবার চেষ্টা করবেন, শান্তির পথে সকলেরই কল্যাণ হবে তা বুঝিয়ে বলবেন। দূত প্রেরণ করে দ্রুপদরাজ ও বিরাটরাজ মিত্র রাজগণের নিকট যুধিষ্ঠিরের রাজ্য-উদ্ধারের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করে বিশ্বস্ত লোক পাঠালেন। পাণ্ডবগণ বল সংগ্রহ করছেন চরমুখে জেনে দুর্যোধনও বল সংগ্রহ ব্যাপারে বিপুল উদ্যম করতে আরম্ভ করলেন। অর্জুন ও দুর্যোধন উভয়েই একই দিনে দ্বারকায় পৌঁছে কৃষ্ণের সাহায্য চাইলেন। কৃষ্ণ বললেন, আমি কোন পক্ষেই যুদ্ধ করব না, নিরস্ত্র থেকে যেটুকু সম্ভব, সেটুকু সাহায্য করতে পারি। সেভাবে কৃষ্ণকে স্বপক্ষে নিতে দুর্যোধন কোন উৎসাহ দেখালেন না।[১] কিন্তু অর্জুন সাদরে তাঁকে বরণ করে নিলেন, এবং দুর্যোধন চলে গেলে তাঁকে সারথি হতে অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণও তাতে সম্মতিদান করলেন। দুর্যোধন বলরামের নিকটও গেলেন, কিন্তু বলরাম বললেন, আমি কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যেতে পারি না, তুমি স্ববীর্যে

১। উদ্যোগপর্বে ৭ অধ্যায়ে আছে যে দুর্যোধন ও অর্জুন একই দিনে কৃষ্ণের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় উপস্থিত হলে কৃষ্ণ একদিকে অযুধ্যমান নিজে, অন্যদিকে তাঁর শিক্ষিত সেনাদল, এই দুটির মধ্যে বেছে নিতে বলায় অর্জুন অযুধ্যমান কৃষ্ণকে বেছে নিলেন, দুর্যোধন কৃষ্ণের শিক্ষিত সেনাদল পেয়ে খুসী হ'লেন। এই বৃত্তান্তে সন্দেহ আসে এই কারণে যে পরে বলরাম বলেছেন, আমি কৃষ্ণকে বলেছিলাম, পাণ্ডবদের যেমন সাহায্য করছ, দুর্যোধনকেও তেমন সাহায্য কর, কিন্তু সে তা শুনল না (উদ্যোগ, ১৫৭/২৯-৩০)। কৃষ্ণের শিক্ষিত সেনাদল দুর্যোধনকে দিলে বলরাম সেকথা কেন বলবেন? কৃষ্ণই বা দুর্যোধনকে অন্যায়কারী জেনে তাকে নিজের সেনাদল কেন দেবেন?

জয়লাভের চেষ্টা কর। তারপর কৃতবর্মার কাছে গেলে কৃতবর্মা দুর্যোধনের পক্ষে নিজ সৈন্য বল নিয়ে যোগ দিতে রাজী হয়ে গেলেন। অপর পক্ষে অর্জুনের ভক্ত সাত্যকি নিজ বল নিয়ে পাণ্ডবদের পক্ষে যোগ দিলেন। কৃষ্ণ ও সাত্যকি অর্জুনের সঙ্গে উপপ্লব্যে এলেন। কৃতবর্মা তার সৈন্যদল হস্তিনাপুরে নিয়ে গেলেন।

মদ্ররাজ শল্য তাঁর বিরাট সেনাদল নিয়ে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দেওয়ার ইচ্ছায় যাত্রা আরম্ভ করেন। দুর্যোধনের নির্দেশ মত তাঁর কর্মচারীগণ শল্য ও তার বাহিনীর আগমনপথে পটমণ্ডপ স্থাপন, কূপখনন, খাদ্য সংগ্রহ ইত্যাদি করে শল্য কাছে আসতেই তাঁকে ও তাঁর সৈন্যদলকে অভ্যর্থনা করে বিশ্রাম ও ভোজনের সুন্দর আয়োজন করে দিল, দুর্যোধন নিকটে গোপনভাবে রইলেন। অভ্যর্থনায় প্রীত হয়ে কর্মচারীদের পাণ্ডবপক্ষের লোক মনে করে শল্য বল্লেন, এই সুন্দর ব্যবস্থা কোন্ পুরুষের নায়কত্বে হয়েছে, তাকে উপস্থিত কর, তাকে আমি পুরস্কৃত করব, যুধিষ্ঠির তাতে অসন্তুষ্ট হবেন না। তখন দুর্যোধন শল্যের নিকট উপস্থিত হয়ে বল্লেন, আপনি যদি আমার কৃত আয়োজনে প্রীত হয়ে থাকেন, তবে আমার পক্ষে যোগ দিন। শল্য প্রার্থিত পুরস্কার দেবার কথা বলেছিলেন, দুর্যোধনের কথায় তার পক্ষে যোগ দেওয়াতে তাঁর সত্যপালন হবে মনে করে দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিতে স্বীকার করলেন। তারপর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কি অবস্থায় তিনি দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছেন, তা জানালেন। যুধিষ্ঠির বল্লেন, আপনি সত্যপালনে বাধ্য মনে করে দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছেন, তাতে আমি আর কি বল্‌ব? তবে অর্জুন কর্ণের দ্বন্দযুদ্ধ উপস্থিত হ'লে অর্জুনের বীর্যের কথা বেশী করে বলবেন। শল্য তা বল্‌তে সম্মত হয়ে চলে গেলেন। পাণ্ডবগণের পক্ষে দ্রুপদরাজ এবং তাঁর পুত্রদ্বয় শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আরো অনেক পাঞ্চাল মহারথ ও সৈন্য নিয়ে এবং বিরাটরাজ তাঁর পুত্রদ্বয় শঙ্খ ও উত্তরকে নিয়ে এবং মৎস্য সৈন্যদল নিয়ে যোগ দিলেন। সাত্যকি তাঁর সেনাদল নিয়ে এলেন; তা ছাড়া চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু (শিশুপাল পুত্র) এবং জরাসন্ধ পুত্র জয়ৎসেন ও সহদেব তাদের সৈন্যদল নিয়ে যোগ দিলেন, দক্ষিণ দেশ হতে পাণ্ড্যরাজ তাঁর সৈন্যদল নিয়ে যোগ দিলেন। পার্বতীয় মহীবীরগণও পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিলেন। পাণ্ডবদের মোট সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য হ'ল। ধার্তরাষ্ট্রদের পক্ষে কৃতবর্মা ও শল্য তাদের সৈন্যদল সহ রইলেন, তাছাড়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত এক অক্ষৌহিণী চীন ও কিরাত সৈন্য নিয়ে যোগ দিলেন; ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ছাড়া মহাবীর

ভূরিশ্রবা, সিন্ধুসৌবীরের অধিপতি জয়দ্রথ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, মাহীষ্মতীরাজ নীল এবং ত্রিগর্তরাজ ও তাঁর ভ্রাতৃগণ তাদের সৈন্য নিয়ে ধার্তরাষ্ট্রদের পক্ষে যোগ দিলেন।[১] ধার্তরাষ্ট্রদের পক্ষে মোট একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য হ'ল। প্রতি অক্ষৌহিনীতে ২১,৮৭০ রথ, ২১৮৭০ রণহস্তী, ৬৫৬১০ অশ্বারোহী ও ১০৯৩৫০ পদাতিক সৈন্য, এই বিবরণ পাওয়া যায় (আদিপর্ব, ২/১৯-২৭)। এই হিসাব ঠিক হলে দুই পক্ষে যোদ্ধাই প্রায় চল্লিশ লক্ষ হয়, তার উপর সারথি, মাহুত, অশ্ব ও রথের পরিচর্যাকারী ইত্যাদি ধরলে আরো বহু লক্ষ লোক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল বলতে হয়। এত অধিক সংখ্যক লোক প্রাচীন ভারতে একটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তা সম্ভব মনে হয় না। উপরি লিখিত সংখ্যার দশমাংশ নিলে সংখ্যা বিশ্বাসযোগ্য হয়।

২৬ উদ্যোগ পর্ব—দ্রুপদ পুরোহিত ও সঞ্জয়ের দৌত্য

দ্রুপদরাজের পুরোহিত কৌরব-সভায় এসে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যার্দ্ধ দ্যূতের পণের সর্ত অনুসারে প্রত্যর্পণের দাবী জানালেন। তিনি বল্‌লেন, যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় কপট কৌশল অবলম্বিত হচ্ছে বুঝেও অনুদ্যূতের পণের সর্ত সম্পূর্ণভাবে পালন করেছেন; যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতাদের ও দ্রৌপদীকে বনে বহু কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, অজ্ঞাত বাস কালেও তাঁরা বহু দুঃখ ভোগ করেছেন; কিন্তু পাণ্ডবগণ তাঁদের রাজ্যার্দ্ধ ফিরে পেলে অপমানের শোধ তুল্‌বার যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা ভুলে যাবেন। পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রদের মধ্যে যাতে প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ থাকে, আপনারা তার উপায় করুন। সামের পথ অবলম্বন না করলে কুরুকুলের ধ্বংস হবে, তা কারোই বাঞ্ছিত হতে পারে না। এখানে উপস্থিত ভীষ্ম দ্রোণাদি সুহৃদ্‌জন কুলের হিত কোন্ পথে হবে, তা বুঝতে পারেন; দুর্যোধন বা আর কেহ যদি বিরূপ ভাব অবলম্বন করে, তবে তাঁরা তাকে বুঝিয়ে সামের পথে এনে উভয় পক্ষের কল্যাণ করুন। ধার্তরাষ্ট্রগণ যদি মনে করেন যে তাঁরা একাদশ

১। উদ্যোগপর্বের ১৯।২৫ শ্লোকে কেকয় রাজবংশের পঞ্চভ্রাতাকে ধার্তরাষ্ট্র পক্ষে আগত বলা হয়েছে, কিন্তু রথাতিরথ-সংখ্যান কালে ভীষ্ম পঞ্চ কেকয়—কাশিক, নীল, সূর্য দত্ত, শঙ্খ ও মদিরাশ্বকে পাণ্ডবপক্ষে গণনা করেছেন (উদ্যোগ—১৭১।১৪-১৫)। বোধ হয় ১৯।২৫ শ্লোকে "কেকয়াঃ" স্থলে "ত্রিগর্তাঃ" হবে।

অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করেছেন, পাণ্ডবগণ সাত অক্ষৌহিণী মাত্র পেয়েছেন; অতএব যুদ্ধে ধার্তরাষ্ট্রগণ জয়লাভ করবেন, তবে তাঁরা যেন ভীম, অর্জুন, সাত্যকি প্রভৃতির বীর্য ও কৃষ্ণের বুদ্ধি স্মরণ করেন।

ভীষ্ম দূতের কথা শুনে বললেন, আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথা সত্য, তবে আপনার বচন বড় তীক্ষ্ণ। কর্ণ ভীষ্মকে তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠ্‌লেন, পাণ্ডবেরা যদি তাদের পণের সর্ত সম্পূর্ণরূপে পালন করে রাজ্য ফেরত চাইত, তবে দুর্যোধন রাজ্য ফেরত দিতে দ্বিধা করতেন না, কিন্তু পাণ্ডবগণ সর্ত সম্পূর্ণ পালন না করে বল সংগ্রহ ক'রে তার ভয় দেখিয়ে রাজ্য প্রত্যর্পণ দাবী করছে, দুর্যোধন সেই দাবী কখনও মেনে নেবেন না। কর্ণের মনে সম্ভবতঃ ছিল যে অনুদ্যূতের কাল হতে সৌর বৎসরের মানে ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হয় নাই। সে কথা উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধকালে দুর্যোধন তুলেছিলেন, ভীষ্ম তার উত্তরে বলেছিলেন যে দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞ বা সত্রের বেলায় যেমন, দ্যূতের পণের সর্তমত নির্বাসনের কালের ব্যাপারেও তেমন, চান্দ্র বৎসরের মান চলিত আছে, চান্দ্র বৎসরের মান মত উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধ দিবসের পূর্বেই অনুদ্যূতের সময় হতে ত্রয়োদশ বর্ষ গত হয়ে গেছে। সেই উত্তর কর্ণের না জান্‌বার কথা নয়, তাই কর্ণের কথায় ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করতে আরম্ভ করলেন। ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও কর্ণের বিবাদ থামিয়ে দূতকে বল্‌লেন, আপনার বার্তা আমরা শুনেছি, আপনি বিশ্রাম করে ফিরে যান, আমরা আমাদের দূতের মুখে উত্তর পাঠাবো।

কিছুদিন পরে সঞ্জয় ধার্তরাষ্ট্রদের দূত হিসাবে উপপ্লব্যে এলেন। তিনি এসে কুশলবার্তা বিনিময় করে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের উপদেশ মত যুধিষ্ঠিরের ধর্মপ্রবণতার প্রশংসা করে বল্‌লেন যে রাজ্য উদ্ধারের জন্য যুধিষ্ঠির যদি যুদ্ধের পথ নেন তাহলে তাঁকে বহু স্বজন ও জ্ঞাতি বধের পাপে লিপ্ত হতে হবে, তার থেকে যাদব রাজ্যে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবন ধারণ করাও তাঁর পক্ষে শ্রেয়ঃ হবে। অর্থাৎ দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভাগ ফিরিয়ে দেবেন না, কিন্তু তিনি যুদ্ধে জ্ঞাতিবধও চান না; যুধিষ্ঠিরের মত ধর্মাত্মা যেন যুদ্ধে জ্ঞাতিবধের পাপ হ'তে বিরত থাকেন। সঞ্জয়ের ভাষণ শুনে যুধিষ্ঠির বল্‌লেন, আমি যদি পণের সর্তমত আমার রাজ্যভাগ ফিরে পাই, তাহলে আমি যুদ্ধ করে জ্ঞাতিবধ করতে চাইব কেন? অধর্ম করে আমি স্বর্গরাজ্যও চাই না। কিন্তু দুর্যোধন পণের সর্ত পালন না করে আমাদের রাজ্য ভোগ করতে থাকবেন, আর আমরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে থাকব সেই

উপদেশ দেবেন, তাই বা কেমন ধর্ম ? ক্ষত্রিয়ের ধর্ম স্বরাজ্য রক্ষার জন্য বা উদ্ধারের জন্য জীবন পণ করে যুদ্ধ করা, আমরা তা না করে যদি নিশ্চেষ্ট থাকি, তাহলে কি স্বধর্ম ত্যাগরূপ অপরাধ হবে না ? আমরা চাই যে দুর্যোধন আমাদের রাজ্য-ভাগ ফিরিয়ে দিয়ে নিজের রাজ্য ভাগ সুখে ভোগ করতে থাকুন, তাহলে যুদ্ধ বা জাতিবধের প্রশ্নই উঠবে না, দুই পক্ষের মধ্যে প্রীতির ভাব আবার প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে সর্বধর্মবিদ্ কৃষ্ণ আছেন, তাঁর মতে কোন্ পথে ধর্ম, কোন্ পথে অধর্ম হবে তা শোনা যাক।

কৃষ্ণ বল্‌লেন, সঞ্জয়, তুমি সকল বর্ণের ধর্ম জান, তুমি কেন বল্‌ছ যে পাণ্ডবগণ যদি নিজ রাজ্য ভাগ উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করে, তাহলে তাদের অধর্ম হবে ?। আমি কৌরব পাণ্ডব উভয় পক্ষের শ্রীবৃদ্ধি দেখ্‌তে চাই, লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে কুরুকুল ও বহু ক্ষত্রিয় ধ্বংস হয়ে যাক্ তা কখনো চাই না। সামের পথে কার্যোদ্ধার করবার চেষ্টা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সামের পথে কার্যোদ্ধার না হলে অন্যায় সহ্য করেও যুদ্ধের পথ হতে নিবৃত্ত থাকা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। যে গোপনে বা লোকের সাক্ষাতে অন্য লোকের ধন হরণ করে, তাকে চোর বলা হয়, তাকে বলপ্রয়োগ করে শাসন করাই ধর্ম। তেমন যদি একজন লোক অপর কোন লোকের সম্পদ বা রাজ্য অন্যায় করে নিজের আয়ত্তে রাখে, বা বলপ্রয়োগে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করে, তখন তার প্রতিকার করতে ন্যায্য অধিকারীর বলপ্রয়োগ বা যুদ্ধ করতে হবে, তাই ধর্ম পথ। তুমি এখন যুধিষ্ঠিরকে ধর্মের কথা বলতে এসেছ, কিন্তু যুধিষ্ঠির কখনও ধর্মপথ হতে বিচ্যুত হন নাই; অপর পক্ষে দ্যূত সভায় কৃষ্ণার উপর অধর্ম আচরণ করা হ'ল, তখনতো ধর্মের কথা তুমি দুর্যোধন দুঃশাসনকে বল নাই, একমাত্র বিদুর কৃষ্ণার সপক্ষে কিছু কথা বলেছিলেন, তখন যদি ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের অধর্ম হতে নিবারণ করতেন, তা হলে সকলেরই মঙ্গল হত। ভীষ্মও তাঁর সম্মুখে কুলবধূর অপমান উপেক্ষা করেছিলেন। তারপর কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন যখন দ্রৌপদী, ভীম, অর্জুনকে অপমানের কথা বলে, তখনও তুমি বা কৌরবসভায় আর কেহ ধর্মের কথা বল নাই। আমি নিজেই শীঘ্র কৌরবসভায় উপস্থিত হয়ে কোনটি ধর্মের পথ, কোনটি অধর্ম, সে বিষয়ে কথা বলে সন্ধির চেষ্টা করব। যদি ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পুত্রগণ সে উপদেশ গ্রহণ করে, তবেই তাদের ও পাণ্ডবদের মঙ্গল হবে। তারা যদি আমার কথা উপেক্ষা করে নিজেদের বলের স্পর্দ্ধায় অধর্ম ক'রে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভাগ নিজ অধিকারে রাখ্‌তে চায়, তবে গদাহস্তে ভীম ও

গাণ্ডীবহস্তে অর্জুন তাদের সমস্ত দর্প দূর করে দেবে। যুদ্ধে জ্ঞাতিবধ করা অধর্ম হবে, সেই কথার ছলে পাণ্ডবদের যুদ্ধ হতে বিরত করা যাবে না। সর্তপালন করে পাণ্ডবদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করলেই যুদ্ধভয় দূর হবে।

কৃষ্ণের কথার শেষে যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, তুমি ফিরে গিয়ে কুরুবৃদ্ধদের ও গুরুদের আমার প্রণাম জানাবে, সমবয়স্কদের আমার অভিনন্দন ও কনিষ্ঠদের আমার আশীর্বাদ জানাবে, কিন্তু বল্‌বে যে আমার ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য পণের সর্তমত আমাকে ফেরত না দিলে যুদ্ধ ছাড়া অন্য পথ আমাদের নাই। ধর্মপথে থেকে ধার্তরাষ্ট্রগণ কুলক্ষয়ের ভয় দূর করুন।

তারপরে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে ফিরে গেল। ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য তাঁর পক্ষীয় লোকেরা সঞ্জয়ের মুখে প্রেরিত বার্তার উত্তরের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন। সঞ্জয় হস্তিনাপুরে পৌছে দেখেন যে ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় সকলে সমবেত হয়েছে। সঞ্জয় রথ হতে একেবারেই রাজসভায় উপস্থিত হলেন, এবং যুধিষ্ঠিরের প্রেরিত কুশলবার্তা জানিয়ে কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের উত্তর বিস্তৃতভাবে বল্‌লেন। ধৃতরাষ্ট্র দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণ কি বললেন, অর্জুন কি বল্‌ল, ইত্যাদি; তাই সঞ্জয়কে তাদের বক্তব্যের কথা বার বার বল্‌তে হল। তারপরে ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করলেন, পাণ্ডবদের পক্ষে কোন কোন বীর সমবেত হয়েছেন। সঞ্জয় পাণ্ডব পক্ষে সমাগত বীরদের নাম করলেন; তাদের নাম ও বীরত্বের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র পরাজয় আশঙ্কা করে কিছু বিলাপ করে পুত্র দুর্যোধনকে সামের পথ নিতে বল্‌লেন। তাতে দুর্যোধন উত্তর দিলেন, আপনি ভয় কেন করছেন? বনবাস কালের আরম্ভেই যখন ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ বনে পাণ্ডবদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও অন্যান্য বৃষ্ণিবীরগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, কেকয় রাজভ্রাতাগণ ইত্যাদি মিলিত হয়েছিল, এবং কৃষ্ণ আমাদের উপর সদ্য আক্রমণ করবার কথা বলেছিলেন, সে কথা আমি চরমুখে জেনে ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপকে বলেছিলাম, এখন অধিকাংশ রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি সহানুভূতিশীল আছে, বৃষ্ণি ও পাঞ্চালগণ যদি আমাদের উপর আক্রমণ করে, তবে তাদের ঠেকানো সহজ হবে না; আমাদের পক্ষে কি বিনীত হয়ে সন্ধি করা কর্তব্য? তখন ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ও অশ্বত্থামা আমাকে বলেন, তারা আক্রমণ করলে আমাদের পরাজিত করতে পারবে না, অতএব তুমি ভয় কোরো না। এখন রাজাদের মধ্যে বেশীর ভাগ আমাদের পক্ষে এসেছেন। ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-কর্ণ-অশ্বত্থামা আমাদের সহায় আছেন, অতএব এখন পাণ্ডবদের আক্রমণের ফল সম্বন্ধে

ভয় কেন করছেন? রাজ্য আমি প্রত্যর্পণ করব না, যদি পাণ্ডবগণ যুদ্ধ করে তবে যুদ্ধেই তাদের সম্মুখীন হ'ব।

দুর্যোধনের এই কথার কোন উত্তর ভীষ্ম বা দ্রোণ বা কৃপ দেন নাই। তাই মনে হয় যে মহাযুদ্ধে কুল ধ্বংস ও ক্ষত্রিয়ক্ষয়ের জন্য তাঁদের অনেকটা দায়িত্ব আছে।

কৃষ্ণ নিজেই সন্ধির সপক্ষে কথা বলতে হস্তিনাপুরে আসবেন জেনে কি ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হবে তার আলোচনা হল। ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের অবস্থানের জন্য সবরকম উপকরণে সজ্জিত সুন্দর গৃহ প্রস্তুত করতে, ও কৃষ্ণকে উপহার দেবার জন্য মণি, বস্ত্র, রথ, অশ্ব, হস্তী ও কর্মকুশল ভৃত্য এবং তরুণী দাসী সংগ্রহ করে রাখতে বললেন। বিদুর বললেন, এই সব দিয়ে কৃষ্ণকে ভুলাতে পারবেন না, তাঁকে প্রথামত পাদ্য, অর্ঘ্য, গো, মধুপর্ক ও আসন দিয়ে সম্বর্ধনা করুন এবং তাঁর ঈপ্সিত কার্য করুন, সামের পথ অবলম্বন করুন, তাতেই কৃষ্ণ সুখী হবেন। দুর্যোধন বললেন, কৃষ্ণ সম্মানার্হ বটে, কিন্তু আমি যুধিষ্ঠিরের রাজ্যভাগ ছেড়ে দেব না। যুদ্ধই হবে; বেশী সম্মান দেখালে কৃষ্ণ মনে করবেন যে আমরা ভয় পেয়েছি। ভীষ্ম বললেন, যেভাবে অভ্যাগত সজ্জনকে অভ্যর্থনা করে, তা অন্ততঃ করতে হবে। বিদুর সেখান থেকে বিদায় নিলে দুর্যোধন বললেন, আমার মনে একটি পরিকল্পনা এসেছে, কৃষ্ণই পাণ্ডবদের বল ও বুদ্ধিদাতা; আমরা যদি তাকে বন্দী করে রাখি, তবে পাণ্ডবেরা সহজেই আমাদের বশে আসবে। শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, কৃষ্ণ দূত হয়ে আসছেন, তাছাড়া তিনি আমাদের সম্বন্ধী; তাকে বন্দী করার কথা মনে এনো না, তা অতিশয় অধর্ম হবে।

২৭. উদ্যোগ পর্ব—কৃষ্ণের দৌত্য

সঞ্জয় বিদায় নিয়ে গেলে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে কিছু আলোচনা করলেন। যুধিষ্ঠিরের মনে রাজ্য ফিরে পেয়ে আগে যেমন বহু বৎসর ইচ্ছামত যজ্ঞ, দান ও প্রজার হিতের জন্য পূর্ত কর্ম, অর্থাৎ কূপ, পুকুর, রাস্তাঘাট প্রস্তুত করেছেন, তাই করবার ইচ্ছা; অপর দিকে যুদ্ধ হলে জ্ঞাতি ও গুরু বধ করতে হবে, সেই জন্য দ্বিধা, তা কৃষ্ণের নিকট প্রকাশ করলেন। কৃষ্ণ বললেন যে আমি আপনাদের ধর্মতঃ প্রাপ্য রাজ্যের দাবী ছেড়ে না দিয়ে শান্তি স্থাপন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব, তা যদি না করতে পারি, তবে আপনার স্বধর্ম পালন—যুদ্ধ করতেই হবে;

তাতে জ্ঞাতিবধ বা গুরুবধ হবে মনে করে দ্বিধা করবেন না। দ্যূত সভায় দুঃশাসন, দুর্যোধন ও কর্ণ কৃষ্ণাকে যেভাবে অপমানিত করেছে, তাতে তারা বধ্য ; এবং ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি তা নিবারণ করবার কোন চেষ্টা না করায় তাঁরাও বধ্য হয়েছেন তা মনে রাখবেন। ভীম বললেন, শান্তি স্থাপন করতে তুমি প্রাণপণ চেষ্টা করবে ; কুরুকুলের ধ্বংস নিবারণ করতে যদি আমাদের দুর্যোধনের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়, তাও ভাল। কৃষ্ণ তাকে বললেন, আপনার মুখে কি শুনছি ? আপনি দুর্যোধন দুঃশাসনকে বধের জন্য উন্মুখ ছিলেন শুনেছি, আপনি প্রকৃতিস্থ হ'ন, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম বিস্মৃত হবেন না ; আমি শান্তির পথে ধার্তরাষ্ট্রদের আন্‌তে চেষ্টা করব, কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তবে যুদ্ধ করতে হবে, যুদ্ধ হ'লে আপনার ও অর্জুনের উপর প্রধান ভার পড়বে, তার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হ'ন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের মত মনের দ্বিধা প্রকাশ করে বল্‌লেন, তুমি উভয় পক্ষের সুহৃৎ ও সম্বন্ধী, তুমি চেষ্টা করলে দুর্যোধন প্রভৃতিকে সামের পথে আনতে পারো। কৃষ্ণ বল্‌লেন, কর্মের ফল পুরুষকার ও দৈব এই উভয়ের উপর নির্ভর করে ; পুরুষকার দিয়ে যতটা সম্ভব, দুর্যোধনাদিকে সামের পথে আন্‌তে ততটা চেষ্টা করব। নকুলও কৃষ্ণকে সন্ধির চেষ্টা করতে বললেন ; শুধু সহদেব বললেন, যুদ্ধ হলে ভালই হয় ; না হলে দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ আমাদের উপর, বিশেষতঃ দ্রৌপদীর উপর, যে অপমানের ভার চাপিয়েছে, তার শোধ তুলব কেমন করে ? সাত্যকি সহদেবের কথা সমর্থন করলেন। দ্রৌপদী বল্‌লেন, সহদেবই ঠিক কথা বলেছেন ; আমার অন্য পতিদের, বিশেষ করে ভীমের কথা শুনে মর্মাহত হয়েছি। দুঃশাসন আমাকে চুলে ধরে সভায় টেনে নিয়ে গেছে, দুর্যোধন ও কর্ণ আমাকে অপমানকর কথা বলেছে, যুদ্ধ না হলে তার শোধ আমরা কি করে নেব ? অবশ্য তারা যদি সসম্মানে আমাদের প্রাপ্য রাজ্যভাগ ফিরিয়ে দেয় তো অন্য কথা ; কিন্তু তার জন্য তাদের মিষ্ট কথায় তোষামোদ করা উচিত হবে না। মনের দুঃখে দ্রৌপদীর চোখের থেকে জল পড়তে লাগল। কৃষ্ণ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লেন, ধার্তরাষ্ট্রগণ আমার হিতকর বাণী যদি গ্রাহ্য না করে, তবে যুদ্ধই হবে, তুমি শান্ত হও।

যুধিষ্ঠির বল্‌লেন, তুমি যে শত্রুসভায় গিয়ে তাদের মতবিরুদ্ধ কথা বলবে, তাতে তোমার বিপদ হতে পারে, আমার সেই শঙ্কা হ'চ্ছে। কৃষ্ণ বল্‌লেন, আমার জন্য ভাববেন না। আমি আমার রথ অস্ত্র সজ্জিত করে নিয়ে যাব, আমার অস্ত্রপূর্ণ রথের সামনে যে শত্রুভাবে আসবে, সেই বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।

তাছাড়া আমি নিজের রক্ষার দিকে চোখ রাখ্‌ব এবং সাত্যকিকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তার পরে কৃষ্ণ প্রস্তুত হয়ে তাঁর সজ্জিত রথে সাত্যকিকে নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করলেন, সঙ্গে অন্য রথে অনুচরগণ পটমণ্ডপের উপকরণ ও আহার্য ইত্যাদি নিয়ে চল্‌ল। পথে বৃকস্থল গ্রামে রাত্রিতে বিশ্রাম করে দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরের নিকটে পৌঁছে গেলেন। সেখান থেকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ এবং ধৃতরাষ্ট্রের কয়েকজন পুত্র কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করে হস্তিনাপুরে নিয়ে গেলেন। হস্তিনাপুরে পৌঁছে কৃষ্ণ প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে গেলেন, সেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৃষ্ণকে গো, মধুপর্ক, পাদ্য, আসন ইত্যাদি দিয়ে সম্মান করলেন। কৃষ্ণ সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করে কিছুক্ষণ সৌজন্যময় কথা বলে, কিছু হাস্য পরিহাস করে, বিদুরের গৃহে গেলেন, সেখান আতিথ্য গ্রহণ করে বিদুরকে নিজের আগমনের কারণ বল্‌লেন, কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কুন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। পাণ্ডবগণের বনবাস কালে কুন্তী বিদুরের গৃহেই ছিলেন। কুন্তীর প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ তাকে পাণ্ডবগণের ও দ্রৌপদীর কুশল সংবাদ দিলেন; বল্‌লেন—আপনার পুত্রগণ দুঃখকষ্ট জয় ক'রে বীরের মত দিন কাটাচ্ছেন, তারা ক্ষুদ্র সুখ চান না, তারা শ্রেষ্ঠ ভোগসুখ লাভ করতে বা মহাক্লেশ সহ্য করতে প্রস্তুত রয়েছেন—অর্থাৎ তারা রাজ্যসুখ জয় করে নিতে বা সেই উদ্দেশ্যে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত হয়েছেন — আপনি দেখ্‌বেন তারা সিদ্ধকাম হয়ে এসে আপনাকে প্রণাম করবে।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে কৃষ্ণ দুর্যোধনের গৃহে গেলেন, সেখানে দুর্যোধনের সঙ্গে দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি ছিলেন। তারা আসন থেকে উঠে কৃষ্ণকে অভিনন্দন করলেন, কিছু কথার পরে দুর্যোধন কৃষ্ণকে সায়মাশ—সন্ধ্যাকালীন আহার—গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ করলেন। কৃষ্ণ বললেন, আমি দূত হয়ে এসেছি, দূত সফল হলে সম্মান ও ভোজন গ্রহণ করে। দুর্যোধন বল্‌লেন, আমার সঙ্গে আপনার কোন বিরোধ নাই, আপনার দৌত্য সফল হোক বা না হোক, আমার সঙ্গে সায়মাশ গ্রহণে আপত্তি কেন? কৃষ্ণ বল্‌লেন, লোকে সম্প্রীতি থাক্‌লে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, আমি এখন পাণ্ডবদের দূত, তাদের সঙ্গে তো আপনার সম্প্রীতি নাই, আর অনশন পীড়িত হলে ভোজনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে, আমি অনশন পীড়িত হই নাই।

সেখান থেকে কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে ফিরলেন; সেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি এসে বল্‌লেন, আপনার জন্য সব প্রয়োজনীয় সম্ভার পূর্ণ গৃহ সজ্জিত করে রাখা

হয়েছে, সেখানে এসে বিশ্রাম করুন। কৃষ্ণ বললেন, আমার জন্য গৃহ সজ্জিত রেখেই আপনারা আমার সম্মান করেছেন, কিন্তু বিদুরের গৃহে বিশ্রাম করাই আমার কাম্য, আপনারা ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। বিদুরের গৃহেই কৃষ্ণ ভোজন ও বিশ্রাম করলেন।

পরদিন ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভা সজ্জিত করে কৃষ্ণকে সংবাদ দিতে দুর্যোধন ও শকুনি এলেন। কৃষ্ণ নিজের রথে বিদুরকে নিয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে গেলেন, দুর্যোধন ও শকুনি তাদের অনুসরণ করলেন। সাত্যকি তাদের পরে গেলেন। সভায় গিয়ে কুশলবার্তা বিনিময়ের পরে কৃষ্ণ উঠে ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করে বললেন, যাতে পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্ট্রগণের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, এবং কুরুকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমি এসেছি। আপনি তো সবই জানেন—পাণ্ডবগণ অনুদ্যূতে পরাজিত হয়ে দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস স্বীকার করে নিল, এবং অজ্ঞাত বাসকালে প্রকাশ হয়ে পড়লে পুনঃ দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের সর্তও স্বীকার করে নিল, এবং তা কষ্ট ক'রে পূরণ করল এই বিশ্বাসে, যে সর্ত পূরণ করলে তারা তাদের রাজ্য ফিরে পাবে। তারা দ্যূতের পণের তাদের পালনীয় সর্ত সম্পূর্ণ পালন করেছে, এখন ধর্মতঃ আপনারা আপনাদের পালনীয় সর্ত পূরণ করুন, তাদের রাজ্য প্রত্যর্পণ করুন। পাণ্ডবগণ আপনাকে পিতৃবৎ মনে করে, তারা বিশ্বাস করেছে যে আপনি থাকতে তাদের রাজ্য ফিরে পেতে কোন বাধা হবে না। তাদের সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করবেন না, আপনার দুর্বিনীত পুত্রকে শাসন করে তাকে ধর্মপথে চলতে বাধ্য করুন, আমি ভীম অর্জুনকে প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা থেকে নিবৃত্ত করব। এই যে উভয়পক্ষে ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বর্গ সমবেত হয়েছে, এরা পরস্পরকে সংহার না করে শান্তির উৎসবে একসঙ্গে পানাহার করে স্বদেশে ফিরে যাক। ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ যদি বন্ধুভাবে থাকে, তাদের রাজ্যদ্বয় যুক্তভাবে সমগ্র ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হতে পারবে। হে মহারাজ, আপনি চেষ্টা করে সমবেত রাজন্যগণকে মৃত্যুপণ হতে রক্ষা করুন, কুরুপাঞ্চাল কুলের ধ্বংস নিবারণ করুন, সমগ্র উত্তর ভারতকে এক হয়ে সমৃদ্ধ হতে সুযোগ দিন।

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমি রাজ্যের ভার দুর্যোধনের হস্তে ছেড়ে দিয়েছি, আপনি তাকে বলুন।

কৃষ্ণ তখন দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বললেন, হে রাজন্, আপনি মহৎ কুরুকুলে জাত, আপনার নিকট মহৎ ব্যবহারের আশা করি। আপ

লোকের পরামর্শে পাণ্ডবগণের রাজ্যভাগ ধর্ম অতিক্রম করে নিজ অধিকারে রাখতে ইচ্ছা করেছেন, ভেবেছেন যে ভীষ্ম, দ্রোণ কর্ণ আপনাকে জয়ী করবে, কিন্তু ভীম, অর্জুনের বীর্য স্মরণ করুন। তাদের সঙ্গে বন্ধুভাবে বাস করলে আপনি বহুকাল আপনার নিজ রাজ্যভাগ ভোগ করতে পারবেন, কুরুকুলের ও সমবেত রাজগণের ধ্বংস নিবারণ করতে পারবেন। ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের সেবা লোকে করে থাকে, কিন্তু ধর্মের প্রতিকূল ভাবে অর্থ ও কামের ভোগ করলে শেষ পর্যন্ত দুঃখ ও মৃত্যু আসে। আপনি বুদ্ধিমান, শান্তভাবে একটু ভেবে দেখলেই আমার কথা যে যুক্তিযুক্ত, তা বুঝতে পারবেন। পাণ্ডবগণ তাদের রাজ্যভাগ ফিরে পেতে ধর্মতঃ অধিকারী হয়েছে, তা ফিরিয়ে দিন। আর আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে যুক্ত মহারাজ্যে ধৃতরাষ্ট্র মহারাজরূপে উপদেষ্টা হয়ে থাকুন, যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ বলে রাজা হবেন ও আপনাকে যুবরাজ করবেন।[১]

দুর্যোধন উত্তর দিলেন, আমি বিশ্বাস করি যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রমুখ আমার পক্ষে সমবেত বীরগণকে পাণ্ডবগণ কখনও জয় করতে পারবে না। পিতার হস্তে যখন রাজ্যভার ছিল, তখন স্নেহের মোহে হোক, ভয়ে হোক, অর্দ্ধরাজ্য পাণ্ডবদের দান করেছিলেন। রাজ্য এখন আমার, আমি কোন মোহে কোন ভয়ে আবার অর্দ্ধরাজ্য ছেড়ে দেব না। সম্পূর্ণ মহারাজ্য যুধিষ্ঠিরের হস্তে দেওয়া দূরে থাক, যেটুকু ভূমিতে সূচীবিদ্ধ করা যায়, সেটুকু ভূমিও ছেড়ে দেব না।

ভীষ্ম, দ্রোণ দুর্যোধনকে কিছু তিরস্কার, কিছু উপদেশ দিলেন, ফলে দুর্যোধন সভা ছেড়ে উঠে গেলেন। দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি সেই সঙ্গে উঠে গেল। ভীষ্ম বললেন, দুর্যোধন ক্রোধ লোভের বশ, তার অনুবর্তী কয়েকজন বীর পেয়েছে, মনে হয় যে তার দোষে ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস হবে। শুনে কৃষ্ণ বললেন, শুধু দুর্যোধনের দোষ নয়, আমি কুরুবৃদ্ধদেরও দোষী মনে করি। তাঁরা যদি বোঝেন যে দুর্যোধন সমগ্র কুরুকুলকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তারা মিলিত হয়ে দুর্যোধনকে দমন কেন করেন না? কংস যখন যাদবকুলকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি কয়েকজন যাদব বৃদ্ধের অনুরোধে মাতুল কংসকে বধ করে যাদবকুল রক্ষা করি। কুরুবৃদ্ধগণ ও সেরূপভাবে কুরুকুল রক্ষা করতে পারেন।

১। উদ্যোগপর্ব ১২৪/৬০

কৃষ্ণের কথা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বললেন, তুমি গান্ধারীকে রাজসভায় ডেকে আন, এবং দুর্যোধনকে সভায় ফিরে আসতে বল। গান্ধারীর কথা শুনে দুর্যোধনের মন ফিরতে পারে। গান্ধারী সভায় এসে দুর্যোধনকে ধর্মপথে চলে পাণ্ডবগণের রাজ্যভাগ ফিরিয়ে দিয়ে কুলকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু দুর্যোধন কোন উত্তর না দিয়ে আবার চলে গেলেন। এবং দুঃশাসন, কর্ণ শকুনির সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃষ্ণকে বন্দী করবার পরামর্শ করতে লাগলেন। সাত্যকি পূর্ব হতেই সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন, তিনি তাদের মন্ত্রণা বুঝে সভায় এসে সেকথা প্রকাশ করলেন। শুনে কৃষ্ণ হেসে বললেন, হে মহারাজ, আপনার পুত্রগণ আমাকে বন্দী করবার মন্ত্রণা করছে, চেষ্টা করে দেখুক, তাহলে আমিই তাদের বন্দী করে যুধিষ্ঠিরের নিকট সমর্পণ করব। দূত হয়ে এসে সেরূপ চেষ্টার কথা আমি মনে আনতাম না কিন্তু আমাকে বন্দী করার চেষ্টা করলে তার ফল তারা পাবে। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে পুনঃ সভায় ডেকে আনিয়ে কৃষ্ণকে বন্দী করবার মন্ত্রণার জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করলেন, ইতিমধ্যে কৃষ্ণ সাত্যকি ও কৃতবর্মার হাত ধরে সভার বাইরে এসে নিজের অস্ত্রসজ্জিত রথে উঠলেন; কৃতবর্মা দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করতে হস্তিনাপুরে এলেও তিনি যাদববীর, যাদব সাত্যকি তাকে ডেকেছিলেন যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে প্রয়োজন হলে সাহায্য করতে, তিনি সেই ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।

বিদুরের গৃহে ফিরে এসে কৃষ্ণ কুন্তীকে জানালেন যে সন্ধির চেষ্টা ব্যর্থ হল, যুদ্ধ করেই পাণ্ডবগণকে স্বীয় রাজ্য উদ্ধার করতে হবে। কুন্তী বললেন, যুধিষ্ঠিরকে বলবে, তোমার বীর্যবান ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম, এখন ক্ষত্রধর্ম পালন কর, অর্জুনকে বলবে, তার জন্মের পূর্বে আমরা ইন্দ্রসম বীর্যবান পুত্রের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম, অর্জুন সেইমত বীর্যবান হয়েছে, এখন সেই বীর্য পূর্ণভাবে যেন প্রয়োগ করে; ভীম চিরকালই মন্যুমান, আমি জানি যে সে প্রাণপণে যুদ্ধ করে যাবে। পরে তোমার মঙ্গল হোক, বলে তিনি কৃষ্ণকে বিদায় দিলেন।

কৃষ্ণ পথ হতে কর্ণকে আমন্ত্রণ করে নিজ রথে উঠিয়ে নিলেন; হস্তিনাপুরের বাইরে এসে বললেন, আপনি সূতপুত্র নন, আপনি কুন্তীর কানীন পুত্র, শাস্ত্রমতে কানীন পুত্র তার মাতার বিবাহকারী পুরুষের পুত্র বলে গণ্য হয়। সে হিসাবে আপনি পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, আপনি পাণ্ডবপক্ষে এসে যোগ দিন, আপনাকে যুধিষ্ঠিরাদি জ্যেষ্ঠরূপে রাজপদ দেবে। আপনার বীর্যের উপর নির্ভর করে দুর্যোধন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে চলেছে, আপনাকে সহায় না পেলে সে নিবৃত্ত হবে, ফলে

ক্ষত্রিয়কুল-ধ্বংসী যুদ্ধ নিবারিত হবে। কিন্তু কর্ণ কৃষ্ণের প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। কর্ণ বললেন, কুন্তী আমাকে জন্মের পরেই ত্যাগ করেছেন, সূত অধিরথ আমাকে পালন করেছে, সূতবংশে আমি বিবাহ করেছি, পুত্র পৌত্র হয়েছে ; আর দুর্যোধন আমাকে অর্জুনের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী জেনে আমাকে অঙ্গরাজ্যে বহু বৎসর পূর্বে অভিষিক্ত করেছে, আসন্ন যুদ্ধে আমার উপর নির্ভর করছে, আমি তার বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারি না। কিন্তু আপনি পাণ্ডবদের কাছে আমার জন্মকথা বলবেন না ; ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জানলে রাজ্য আমাকে দেবে, আমি আবার দুর্যোধনকেই দেব ; তার থেকে যুধিষ্ঠিরই রাজ্যভাগ পেয়ে ভোগ করুক। আপনি তাদের পক্ষে আছেন, তাদেরই জয় হবে, তা জেনেও আমি দুর্যোধনকে ছেড়ে যাব না। কৃষ্ণ তখন কর্ণকে আলিঙ্গন করে নামিয়ে দিলেন। পরে দ্রুতবেগে রথ চালিয়ে উপপ্লব্যে ফিরলেন। উপপ্লব্যে ফিরে যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে তাঁর দৌত্যের বিবরণ জানালেন, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন, এবং কুন্তীর বার্তা তাদের জানিয়ে দিলেন। যুধিষ্ঠির সব কথা শুনে বললেন, পিতামহ ভীষ্ম, গুরু দ্রোণ ইত্যাদির সঙ্গে মৃত্যুপণ করে যুদ্ধে করতে হবে ? কৃষ্ণ বললেন, আপনারা দ্যূতের পণের সর্ত সম্পূর্ণ পালন করে রাজ্য ফিরে পেতে অধিকারী হয়েছেন, সে অধিকার আপনাদের ক্ষত্রধর্ম অনুসারে আদায় করে নিতে হবে। যুধিষ্ঠির আবার বললেন, গুরু ও জ্ঞাতি বধ করে আমাদের রাজ্যলাভ কি ধর্মসঙ্গত হবে ? অর্জুন উত্তর দিলেন, কৃষ্ণ ও কুন্তী ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করতে বলছেন, ফল যাই হোক যুদ্ধই আমাদের করতে হবে, তাঁরা কখনও আমাদের অধর্ম করতে বলবেন না। কৃষ্ণ অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি ঠিক বলেছ।

২৮. উদ্যোগপর্ব—সৈন্য সমাবেশ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি

কর্ণকে কৃষ্ণ রথে তুলে হস্তিনাপুরের বাইরে এসে যে প্রস্তাব করেছিলেন, কর্ণ তা প্রত্যাখ্যান করলে পরে তাদের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধের স্থান কাল নিয়ে কথা হয়েছিল। কর্ণ বলেন, কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র স্থান, সেখানে মৃত্যু হলে লোকে স্বর্গে যায় বলে বিশ্বাস আছে, যুদ্ধ যাতে কুরুক্ষেত্রেই হয়, আপনি তার ব্যবস্থা করবেন। কৃষ্ণ বলেন, আপনি ফিরে গিয়ে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপকে বলবেন যে এই মাসটি চমৎকার, শীত গ্রীষ্মের আতিশয্য নাই, এখন তৃণ ও জ্বালানি কাঠ সহজেই সংগ্রহ করা যায়, ওষধি ও বনস্পতিসমূহ এখন সতেজ, বহুজাতীয় বৃক্ষ এখন ফলবান,

জল নির্মল ও সুস্বাদ, এবং মক্ষিকার উপদ্রব কম, সাতদিন পরে ইন্দ্র-দৈবত নক্ষত্রে অমাবস্যা, সেদিন থেকে সমর সম্ভার সংগ্রহ করে অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ করা বাঞ্ছনীয়। সেদিন ছিল চান্দ্র কার্তিক মা‌সের কৃষ্ণা সপ্তমী বা অষ্টমী, যুদ্ধ আরম্ভ অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে, সেদিন মঘা নক্ষত্রে চন্দ্র ছিল।[১] ভীষ্মের পতন হয় পৌষ মাসের কৃষ্ণা অষ্টমীতে, দুর্যোধনের মৃত্যু হয় পৌষমাসে অমাবস্যার রাত্রে।

কৃষ্ণ উপপ্লব্যে ফিরে এসে সন্ধি প্রস্তাবের ব্যর্থতা জানিয়ে পাণ্ডবদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। সাত অক্ষৌহিণীর নায়ক স্থির হল দ্রুপদরাজ, বিরাটরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, চেকিতান, সাত্যকি ও ভীমসেন।[২] পরে নায়ক কিছু পরিবর্তন করে স্থির হ'ল দ্রুপদরাজ, বিরাটরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু (চেদিরাজ) ও সহদেব (জরাসন্ধপুত্র, মগধরাজ)।[৩] সপ্ত নায়কের উপরে কে সেনাপতি হবে, সে বিষয়ে কিছু মতভেদ হ'ল; সহদেব নাম করলেন বিরাটরাজের, নকুল নাম করলেন দ্রুপদরাজের, অর্জুন নাম করলেন ধৃষ্টদ্যুম্নের, এবং ভীমসেন নাম করলেন শিখণ্ডীর। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে নির্বাচনের ভার দিলে কৃষ্ণ সব বীরদের প্রশংসা করলেন, প্রধান সেনাপতি কাকে করা হবে তা বল্‌লেন না। যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও কৃষ্ণের অধিনায়কত্বে সকলে কাজ করেছে, তাই প্রধান সেনাপতি নিয়োগের তেমন প্রয়োজন ছিল না। তবে ভীষ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কালে শিখণ্ডী নায়কত্ব করেছে, দ্রোণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন নায়কত্ব করেছে, সেকথা কৃষ্ণ আশ্বমেধিক পর্বে বলেছেন।[৪]

তারপর দ্রৌপদী ও অন্যান্য পাণ্ডবস্ত্রীগণের উপপ্লব্যে বসবাসের ব্যবস্থা করে, তাদের রক্ষার জন্য প্রাকার তুলে ও ছোট একটি সৈন্যদল নিযুক্ত করে পাণ্ডব বাহিনী কুরুক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করলেন। মৎস্য রাজ্য ছিল বর্তমান ঢোলপুরের পশ্চিমে, ও তার রাজধানী বিরাট, বর্তমানে বৈরাট নামে পরিচিত গ্রাম, জয়পুরের চল্লিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত, কুরুক্ষেত্র বিরাট থেকে ন্যূনাধিক

১। ভীষ্ম পর্ব, ১৭।২ ও নীলকণ্ঠের টিকার প্রথমাংশ।

২। উদ্যোগপর্ব, ১৫১।৪-৫

৩। উদ্যোগপর্ব, ১৫৭।১০-১২

৪। আশ্বমেধিক, ৬০।৯,১৫

একশত পঞ্চাশ (১৫০) মাইল উত্তরে। কয়েকদিন চলে কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে রথীগণ সকলে শঙ্খধ্বনি করে আনন্দ প্রকাশ করলেন। কিছু বিশ্রাম নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের দক্ষিণ ভাগে হিরণ্বতী নদীর তীরে শিবির স্থাপনের উপযুক্ত ভূমি নির্বাচন করলেন, তাদের নির্দেশে শিল্পীগণ সকল রাজা ও নায়কের জন্য উপযুক্ত ভবন ও সাধারণ সৈন্য বা ভটদের আবাস স্থান প্রস্তুত করল ; অশ্ব, হস্তী, রথ ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত আশ্রয় প্রস্তুত হ'ল, এবং যথেষ্ট শিল্পী, ভিষক্ বা চিকিৎসক ইত্যাদির জন্যও স্থান নির্দিষ্ট হ'ল। কৃষ্ণের নির্দেশে শিবিরের চারদিকে পরিখা কেটে হিরণ্বতী নদীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল, কয়েকটি সেতু করে রক্ষার ব্যবস্থা হ'ল। যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও ভোজন দ্রব্য ও অন্যান্য সমরসম্ভার সংগ্রহ করা হল।

কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবগণ শিবির স্থাপন আরম্ভ করেছেন, চরমুখে জেনে দুর্যোধনও কুরুক্ষেত্রে সত্বর গিয়ে শিবির সংস্থাপনের আদেশ দিলেন। তিনি এগারো জন অক্ষৌহিণী নেতা স্থির করে দিলেন—দ্রোণ, কৃপ, মদ্ররাজ শল্য, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কাম্বোজ রাজ সুদক্ষিণ, অন্ধককুলের যাদব নায়ক কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, শকুনি ও বাহ্লীক রাজ। সর্বসেনাপতি ভীষ্মকে নিয়োগ করে তাঁর অভিষেক করলেন। তারপরে বাহিনী কুরুক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করল। হস্তিনাপুর থেকে কুরুক্ষেত্র অনুমান ৬০।৭০ মাইল। সে পথ অতিক্রম করে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের উত্তর ভাগে দুর্যোধন ও কর্ণ কৌরব শিবির স্থাপনের স্থান নির্বাচন করে একাদশ অক্ষৌহিণীর উপযুক্ত স্থান অনুমান করে সীমানা নির্দেশ করে দিলেন। পরে শিল্পীগণ নির্দেশমত রাজা ও নায়কদের ভবন, ভট বা সৈন্যদের আবাস, হস্তী-অশ্ব-রথের জন্য আশ্রয় স্থান, ইত্যাদি সব নির্মাণ করলেন। যথেষ্ট অস্ত্র ও অন্য সমর সম্ভার ও খাদ্য সংগ্রহ করা হ'ল। কৌরব শিবির বিস্তারে প্রায় হস্তিনাপুরের মত হ'ল। দুই শিবিরের মধ্যে কয়েক ক্রোশ স্থান রাখা হল, ব্যূহ সংস্থাপন ও যুদ্ধের জন্য।

দুপক্ষের শিবির প্রস্তুত, তার মধ্যে রথী ও সৈন্যগণ অধিষ্ঠিত, এই সময় অকস্মাৎ একদিন কয়েকজন বৃষ্ণিবীরকে সঙ্গে নিয়ে বলরাম উপস্থিত হলেন। যথারীতি অভ্যর্থিত হয়ে বসে তিনি বললেন, ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে, আমি অন্যের অসাক্ষাতে কৃষ্ণকে অনেকবার বলেছিলাম, তুমি যেমন পাণ্ডবদের সাহায্য করছ, তেমন ধার্তরাষ্ট্রদের সাহায্য কর, উভয় পক্ষের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ আছে, তা কৃষ্ণ

শুনল না ; কৃষ্ণের সাহায্যপ্রাপ্ত পাণ্ডবদের জয় নিশ্চিত, আমি নিকটে থেকে কৌরবদের ধ্বংস দেখতে চাই না; অতএব আমি সরস্বতী নদীর সব তীর্থে ভ্রমণ করতে যাচ্ছি। এই বলে তিনি সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেলেন।

তারপরে শকুনি পুত্র উলূক ধার্তরাষ্ট্রদের দূত হয়ে এসে পাণ্ডবদের বীরত্বে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বলল, কাল থেকে যুদ্ধ আরম্ভ হবে, তোমাদের যদি কিছু মাত্র বীর্য থাকে, কাল থেকে তা প্রকাশ করে দেখিয়ো। তার কথার ধরণে বিরক্ত হয়ে পাণ্ডবগণ তীক্ষ্ণ ভাষায় উত্তর দিলেন, তবে পরদিন থেকে যুদ্ধ আরম্ভ হবে তা স্বীকার করে নিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কোন পক্ষ আকস্মিক আক্রমণ করে জয়লাভের চেষ্টা করে নাই—এক অশ্বত্থামার যুদ্ধশেষে সুপ্ত পাণ্ডব-পাঞ্চাল বীর ও সৈন্যদের রাত্রিতে এসে অতর্কিত ভাবে হত্যা করা ছাড়া সমগ্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অনেকটা মধ্য যুগে ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে যেমন tournament (টুর্নামেণ্ট) বা রঙ্গভূমিতে নীতিগত যুদ্ধ হত তার মত মনে হয়। দেশ, কাল, নিয়ম সব স্থির করে নিয়ে তবে যুদ্ধ হল, কোন পক্ষ যাতে আকস্মিক আক্রমণের সুবিধা না পায়। তাই যদি হ'ল, তবে জরাসন্ধ-ভীমের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মত দুর্যোধন-ভীমের দ্বন্দ্ব যুদ্ধেই রাজ্য প্রত্যর্পণ করা না করা নির্দ্ধারিত হবে, তা কেন স্থির হ'ল না?

যুদ্ধারম্ভের পূর্বদিন দুর্যোধনের অনুরোধে ভীষ্ম দুই পক্ষের রথী ও অতিরথদের নাম ও গুণের কথা বললেন। তার মধ্যে কর্ণকে অর্দ্ধরথ বলায় কর্ণ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে দুর্যোধনকে বললেন, লোকে বলে বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য, কিন্তু ভীষ্ম অতিবৃদ্ধ হয়ে বালকের মত হয়ে গেছেন, তিনি আমাকে অযথা অপমান শুধু এখন নয়, অনেক সময়ই করে থাকেন। তাঁকে আপনি প্রধান সেনাপতি করেছেন, কিন্তু আমি তাঁর নেতৃত্বে, তিনি বেঁচে থাকতে, যুদ্ধ করব না। তাঁর পতন হলে আমার বীর্য আপনাকে দেখাব।

যুদ্ধের প্রথম দিনে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে কৌরবপক্ষ থেকে যুযুৎসু যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে এসে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেয়।

২৯ ভীষ্মপর্ব : দশদিন যুদ্ধশেষে ভীষ্মের পতন

উলূক প্রমুখাৎ প্রেরিত বার্তামত পরদিন থেকে যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। মহাভারত কাহিনী মতে অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধের প্রথম দশদিন কৌরব পক্ষে ভীষ্মের সেনাপতিত্বে

যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু ভীষ্মের সেনাপতিত্বকালে যুদ্ধের মধ্যে এক ভীষ্ম ভিন্ন কোন বিশিষ্ট বীর বা রথী নিহত হয় নাই। দ্রোণের সেনাপতিত্বে পাঁচদিন যুদ্ধেই যুদ্ধে সমাগত রাজা ও রথীদের অধিকাংশ নিহত হয়। কর্ণ ভীষ্মকে অতিবৃদ্ধ বলে উল্লেখ করেছিলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে ভীষ্মের বয়স ১৫০ বৎসরের কম হবে না।[১] কাবেরীর দেশের মাতার রক্তগুণে ১৫০ বৎসর বয়সেও তিনি যুদ্ধক্ষম ছিলেন, তবে যৌবনকালের মত বীর্য তখন তাঁর থাকা সম্ভব নয়। তৃতীয় খণ্ডে ভীষ্মপর্বের আলোচনা করতে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে, যে ভীষ্মের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ বোধহয় চারদিন মাত্র চলেছিল, তাই সত্য মনে হয়। যা হোক, দশদিন চলেছিল ধরে নিয়েই কাহিনী বলতে হবে।

ভীষ্মপর্বের প্রথম অধ্যায়ে যুদ্ধের জন্য কৃত নিয়মের উল্লেখ আছে—যথা পদাতিক সৈন্যের সঙ্গে পদাতিক, অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে অশ্বারোহী যুদ্ধ করবে। মোট যোদ্ধাসংখ্যার পুরো অর্দ্ধভাগ পদাতিক সৈন্য ছিল, কিন্তু দুইদিকের পদাতিক বাহিনীর মধ্যে কোন যুদ্ধ বর্ণিত হয় নাই। অপর পক্ষে ভীষ্ম যে প্রতিদিন দশ সহস্র পাণ্ডব পাঞ্চাল সেনা নিধনের ব্রত নিয়েছিলেন, সে ব্রতপালনে অধিকাংশ পদাতিক সেনা বধ করেছিলেন সন্দেহ নাই। সেরূপ পঞ্চম দিবসের যুদ্ধে অর্জুন পঁচিশ হাজার মহারথ নিধন করলেন বলা হয়েছে (৭৩,৭৩ শ্লোক), কিন্তু তারা কখনও সকলে মহারথ নয়, অধিকাংশই পদাতিক সৈন্য সন্দেহ নাই। ভীমের কথা বলা হয়েছে যে দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে তিনি কলিঙ্গরাজ, কলিঙ্গ রাজপুত্র ও সমস্ত কলিঙ্গবাহিনীকে বিনষ্ট করলেন; বাহিনীর অধিকাংশ পদাতিক সৈন্য সন্দেহ নাই (৫৪।১২১ শ্লোক)। যোদ্ধাদের দশভাগের তিনভাগ অশ্বারোহী বলা হয়েছে; রথী যত, গজারোহী যোদ্ধাও তত সংখ্যক, কিন্তু অশ্বারোহী যোদ্ধা তার তিনগুণ; কিন্তু দুদিকের অশ্বারোহী বাহিনীর পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ কোথাও বর্ণিত হয়

১। দেবব্রত বা ভীষ্মকে শান্তনু যুবরাজ করবার চার বৎসর পরে সত্যবতীকে দেখেন (আদির ১০০।৪১-৪৫), সত্যবতীর প্রথমপুত্র চিত্রাঙ্গদ পিতার মৃত্যুকালে প্রাপ্ত বয়স্ক ছিল, রাজা হয়ে তিনি চার বৎসর পরে গন্ধর্ব সহ যুদ্ধে মৃত হয়; দ্বিতীয় পুত্র বিচিত্রবীর্য তখনও অপ্রাপ্ত যৌবন ছিল, অনুমান অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে দুটি কাশী কন্যা বিবাহ করে সাত বৎসর পরে গত হয়, তার দুই বৎসর পরে পাণ্ডুর জন্ম, পাণ্ডুর পুত্র অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে চৌষট্টি বৎসর বয়স্ক ছিলেন।

নাই। যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে অধিকাংশই রথীদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বা সঙ্কুল যুদ্ধ, মধ্যে মধ্যে গজারোহী যোদ্ধা সহ রথীযোদ্ধার যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। প্রাচীনকালে যুদ্ধে পদাতিক বাহিনী ও অশ্বারোহী যোদ্ধাগণ কি শুধু রথী ও গজারোহী যোদ্ধার হস্তে মৃত্যুবরণ করতে যুদ্ধক্ষেত্রে আসতো?

ভীষ্মের সেনাপতিত্বে যুদ্ধের প্রথম দিনে বিরাট রাজকুমার উত্তর শল্যের হস্তে নিহত হয়। সেদিন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের নিকট অভিযোগ করলেন, ভীষ্ম নির্মমভাবে পাণ্ডব-পাঞ্চাল সৈন্য শেষ করছেন, ভীম যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন কিন্তু ভীষ্মকে ঠেকাতে পারছেন না, তোমার সখা অর্জুন মধ্যস্থভাবে মৃদু যুদ্ধ করে চলেছে, সে এরকম করবে জানলে আমি যুদ্ধে মত দিতাম না। কৃষ্ণ অর্জুনকে তখন কিছু না বলে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আপনি চিন্তিত হবেন না, আপনার পক্ষে আমি আছি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী, বার্ষ্ণেয় বীর সাত্যকি প্রায় অর্জুনের মত যুদ্ধপটু, বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আছেন দ্রোণ বধের জন্য দীক্ষিত, অপরাজিত শিখণ্ডী ভীষ্মবধের জন্য উন্মুখ আছেন, তাছাড়া মহাবীর অভিমন্যু, ঘটোৎকচ এবং আরো বহু রথী আপনার পক্ষে আছে। যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে নেতৃত্ব নিয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে বললেন। ভীম প্রথম থেকেই প্রাণপণ যুদ্ধ করছিলেন, তাকে কিছু বলারও প্রয়োজন ছিল না। অর্জুন নিজেকে উপেক্ষিত মনে করে বা অন্য কোন কারণে দ্বিতীয় দিন তীব্রতর যুদ্ধ করলেন, মধ্যাহ্ন পর্যন্ত শুধু ভীষ্মকে ঠেকিয়ে রাখলেন তা নয়, কৌরব পক্ষের বহু সৈন্য শেষ করে দিলেন। তার বীরত্ব দেখে দুর্যোধন এসে ভীষ্মের নিকট অভিযোগ করলেন, আপনি ও দ্রোণ স্নেহবশতঃ অর্জুনকে মর্মঘাতী শর মারছেন না, কর্ণ থাকলে অর্জুনের অস্ত্রচাতুর্যের যথার্থ উত্তর দিতে পারত, কিন্তু আপনি তাকে অসম্মান করে যুদ্ধবিরত করেছেন, এখন অর্জুনকে দমন করবার উপায় করুন। ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে তীব্রতর যুদ্ধ আরম্ভ করলেন, শেষপর্যন্ত ভীষ্ম ও অর্জুন সমযুদ্ধ করলেন, কেউ কাউকে মর্মঘাতী বাণ মারতে পারলেন না। সেদিন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণের মধ্যেও তীব্র যুদ্ধ হ'ল, এবং ভীম তীব্র যুদ্ধ করে কলিঙ্গ রাজপুত্র, কলিঙ্গরাজ ও কলিঙ্গ বাহিনী শেষ করে দিলেন। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ ফল পাণ্ডবদের পক্ষে গেল। তৃতীয় দিনের যুদ্ধে দুই পক্ষের বীরগণ তীব্র যুদ্ধ করলেন, দুর্যোধন ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে বুকে বাণবিদ্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাতে কৌরব পক্ষ কিছু বিচলিত হয়ে পড়ল, চৈতন্য লাভ করে দুর্যোধন ভীষ্মকে আগের দিনের মত পাণ্ডবদের স্নেহভরে মর্মঘাতী আঘাত না করার অভিযোগ করলেন।

ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের নিরাপত্তা তুচ্ছ করে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের সবদিকে বাণ প্রহার করতে লাগলেন, তাতে পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনী বিচলিত হলে অর্জুন ও সাত্যকি যোদ্ধাদের ফিরে যথাসাধ্য যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়ে নিজেরাও ভীষ্মের দ্রোণের অস্ত্রের প্রতিরোধ করতে লাগলেন ; অর্জুন পর পর কয়েকবার ভীষ্মের ধনুকের জ্যা কেটে দিলেন। সেদিনের যুদ্ধ বিবৃতিতে মহাভারতের কাহিনীতে চক্রহস্তে কৃষ্ণ ভীষ্মবধের জন্য ছুটে গেলেন, ভীষ্ম তাকে জগৎপতি বলে আবাহন করলেন, এই কথা আছে, কিন্তু তা দ্বিতীয় স্তরের কবির রচনা মনে হয়, কারণ স্বর্গলোক হতে কৃষ্ণের হস্তে চক্র আসবার ইঙ্গিত ও কৃষ্ণকে জগৎপতি রূপে চিত্রিত করা হয়েছে, তদ্ভিন্ন সেদিন অর্জুন মর্মঘাতী বাণ মারবার চেষ্টা না করলেও ভীষ্মের প্রতিযুদ্ধ সুষ্ঠুভাবেই করছিলেন। সেদিনও পাণ্ডবপক্ষই জয়লাভ করিলেন। চতুর্থ দিনের যুদ্ধেও ভীষ্ম ও অর্জুন সমযুদ্ধ করলেন, ভীষ্ম বহু গজসৈন্য বধ করে ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধে বিপন্ন হ'লে ঘটোৎকচ এসে ভগদত্তের প্রসিদ্ধ রণহস্তীকে ব্যথিত ও বিত্রস্ত করলেন, দ্রোণ প্রভৃতি এসে ভগদত্তকে রক্ষা করলেন। পঞ্চম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম প্রথমে পাণ্ডবসৈন্য বিধ্বস্ত করেন, কিন্তু পরে অর্জুন তীব্র যুদ্ধ করে পঁচিশ হাজার কৌরবসৈন্য নিধন করেন। কিন্তু সেদিন অর্জুন অশ্বত্থামাকে বিপদগ্রস্ত করে দয়া করে ছেড়ে দিলেন। যুদ্ধ বিবরণে দেখা যায় যে অর্জুন যথেষ্ট যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু যখন দ্রোণ বা কৃপ বা অশ্বত্থামা বা কৃতবর্মা বিপন্ন হয়েছে, তখন তাদের দয়া করে ছেড়ে দিয়েছেন, ভীষ্মকে পিতামহ বলে ভক্তি করতেন, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর অশ্ব কেটে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে মর্মভেদী অস্ত্রে পীড়িত করেন নাই। ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধে ভীম ও ধৃষ্টদ্যুম্নের যুদ্ধের সাফল্যের জন্য যুধিষ্ঠির তাদের প্রশংসা করেন। সপ্তম দিনে সঙ্কুল যুদ্ধে কৌরববাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়, পরে দ্রোণের হস্তে বিরাট রাজপুত্র শঙ্খের মৃত্যু হয়, এবং ভগদত্ত ঘটোৎকচকে পরাজিত করে চতুর্থ দিনের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন। অষ্টম দিনের যুদ্ধফল পাণ্ডবদের পক্ষে যায়, বহু দ্বৈরথ যুদ্ধের বর্ণনা আছে, তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অষ্টম দিনের শেষে দুর্যোধন ভীষ্মকে সেনাপতিত্ব কর্ণের হাতে তুলে দিতে বলেন, দুর্যোধনের মনে ছিল যে ভীষ্ম ইচ্ছা করে পাণ্ডবগণকে নিপাত করছেন না। ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে আরো তীব্র যুদ্ধ, নিজের প্রাণের মায়া সম্পূর্ণ ছেড়ে যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা করলেন। তাই নবম দিনের যুদ্ধ কৌরবদের পক্ষে আশাপ্রদ হল, সেই দিন অর্জুন ভীষ্মের সমান তালে তীব্র যুদ্ধ করে ভীষ্মকে ব্যথিত করবার চেষ্টা না

করায় কৃষ্ণ প্রতোদ বা চাবুক হাতে নিয়েই ভীষ্মের দিকে ছুটে গেলেন। অর্জুন তাঁর পিছনে গিয়ে তীব্রতর যুদ্ধ করবার প্রতিজ্ঞা করে তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌লেন। সেদিন যুদ্ধশেষে পাণ্ডবদের পরামর্শ সভায় অর্জুন বল্‌লেন, বাল্যকালে যাঁর ক্রোড়ে উঠে গাত্র ধূলি ধূসরিত করে দিয়েছি, পিতা বলে যাঁকে ডেকেছি, তাঁকে এখন কেমন করে বধ করব? কৃষ্ণ বৃহস্পতি নীতি উদ্ধৃত করে বল্‌লেন, গুণী গুরুবৃদ্ধও যদি আততায়ী হয়ে আক্রমণ করে, তাকে বধ করাই ধর্ম।[১] যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করে কৃষ্ণ বল্‌লেন, অর্জুন যদি নিতান্তই ভীষ্মকে বধ করতে না চায়, তবে কালকের যুদ্ধে আমাকে বরণ করুন, আমি ভীষ্মকে বধ করে আপনার রাজ্য লাভের পথ করে দেব। যুধিষ্ঠির বল্‌লেন, তোমাকে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট করতে চাই না। আলোচনার পরে অবশেষে স্থির হ'ল যে পরদিন অর্জুন সব শ্রেষ্ঠ কৌরববীরদের বাধা দিয়ে ভীষ্মের সাহায্যে যেতে দেবেন না, শিখণ্ডী ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে নিধন করবে। পরদিন সেই ভাবেই যুদ্ধ হ'ল। অর্জুন শ্রেষ্ঠ কৌরববীরদের যুদ্ধে ব্যাপৃত করে রাখ্‌লেন, নিরঙ্কুশ অবসর পেয়ে শিখণ্ডী তীব্র যুদ্ধ করে অবশেষে ভীষ্মকে পাতিত করলেন।

অর্জুনই শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে ভীষ্মকে পিছন থেকে বাণ মেরে পাতিত করেছিলেন, সেরূপ কথাও মহাভারতে আছে। শিখণ্ডী নারী হয়ে জন্মে পুরুষ হয়ে গিয়েছিলেন, তাই তাকে ভীষ্ম অস্ত্রাঘাত করলেন না, তাকে দেখে যুদ্ধ হতে বিরত হলেন, সেই সুযোগে অর্জুন ভীষ্মকে বধ করলেন, এই কাহিনী গ্রাহ্য নয়। তাতে শিখণ্ডীর বীর্য এবং অর্জুনের মনুষ্যত্ব এই উভয়কেই তুচ্ছ করা হয়েছে। শিখণ্ডীকে মহাভারতে বহুস্থলে "অপরাজিত" বলা হয়েছে, কিন্তু এই কাহিনীতে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হয়েছে যে তাঁর বীর্য এতটা নয় যে তিনি বাণ মেরে ভীষ্মের বর্ম ভেদ করে তাঁকে আমূল বিদ্ধ করতে পারেন। অর্জুন যদি সম্মুখ যুদ্ধে তাঁর প্রতি একদা স্নেহশীল পিতামহকে মর্মঘাতী বাণ মারতে না চেয়ে থাকেন, তবে তিনি কি কারো পশ্চাতে লুকিয়ে তেমন বাণ মারবেন? ভীষ্মকে যেমন, দ্রোণকেও তেমন, অর্জুন বাঁচিয়ে যুদ্ধ করেছেন, দ্রোণপর্বে অর্জুন জোর গলায় বলেছেন যে গুরু দ্রোণকে আমি কখনও বধ করব না। ভীষ্ম সম্বন্ধে তিনি কি অন্য ভাব নিয়ে থাকতে পারেন?

১। ভীষ্ম ১০৭।১০১—"জ্যায়ংসমপি চেদ্‌বৃদ্ধং গুণৈরপি সমন্বিতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদ্‌ঘাতকমাত্মনঃ॥"

মহাভারতে যুদ্ধ কাহিনী বহু পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু যে সব গাথা থেকে মহাভারত কাহিনী রচিত হয়েছিল, তাও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। ভীষ্মপর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে, দশদিন যুদ্ধ চলবার পর সঞ্জয় অকস্মাৎ যুদ্ধক্ষেত্র হতে হস্তিনাপুরে এসে ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন যে কৌরব পিতামহ ভীষ্ম যুদ্ধে শিখণ্ডীর হস্তে নিপাতিত হয়েছেন। সে কথা আরো কয়েকবার আছে, যথা দ্রোণপর্বে ১।১[1] শ্লোক—"হতং দেবব্রতং শ্রুত্বা পাঞ্চাল্যেন শিখণ্ডিনা" (পাঞ্চাল শিখণ্ডীর দ্বারা দেবব্রত হত হয়েছেন শুনে—), কর্ণপর্বে ২।১২ শ্লোকে—"তং হতং যজ্ঞসেনস্য পুত্রেণেহ শিখণ্ডিনা। পাণ্ডবৈরভিগুপ্তেন শ্রুত্বা মে ব্যথিতং মনঃ॥" [সেই তেজস্বী বীর) পাণ্ডবগণের দ্বারা রক্ষিত দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডীর দ্বারা হত হয়েছে শুনে আমার মনে ব্যথা হয়েছে], কর্ণপর্বে ৯।৩৭ শ্লোক—"ভীষ্মমপ্রতিযুধ্যন্তং শিখণ্ডী সায়কোত্তমৈঃ। পাতয়ামাস সমরে সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্॥" (সর্ব-শস্ত্র-ধারীদের শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে প্রতিযুদ্ধ না করা অবস্থায় শিখণ্ডী যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বাণসমূহ দিয়ে পাতিত করেছিল—এখানে শিখণ্ডীকে দেখে ভীষ্ম তার সঙ্গে প্রতিযুদ্ধ করেন নাই, সেকথা থাকলেও অর্জুনের বাণ নিক্ষেপের কথা নাই), শল্যপর্বে ২৩০[2]।-৩১[2] শ্লোকে—"ভীষ্মশ্চ নিহতো যত্র লোকনাথ প্রতাপবান্। শিখণ্ডিনং সমাসাদ্য মৃগেন্দ্র ইব জম্বুকম্" (যেখানে বহুলোকের আশ্রয়স্থান প্রতাপশালী ভীষ্ম শিখণ্ডীর সম্মুখীন হয়ে নিহত হয়েছেন, যেন সিংহ শৃগালের হস্তে নিহত হয়েছে)। এইরূপ শ্লোক আরও অনেক আছে। অতএব শিখণ্ডীর অস্ত্রেই ভীষ্মের পতন হয়, অর্জুনের অস্ত্রে নয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না।

ভীষ্মের পতনে পাণ্ডবগণ উৎফুল্ল হলেন, ধার্তরাষ্ট্রগণ দুঃখিত হলেন। তখনই অবহার বা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে প্রধান রথীগণ ভীষ্মকে শেষ দেখা দেখতে গেলেন। ভীষ্ম অর্জুনকে শুভাশিষ দিলেন, দুর্যোধনকে বললেন তাঁর মৃত্যুতেই যেন যুদ্ধ শেষ হয়, কর্ণকে বললেন যে তিনি কর্ণের বীর্যের কথা জানেন, কিন্তু তার পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ হেতু তাকে দমাতে চেয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ভীষ্মের মৃত্যু হ'ল; দেহে যদি এমনভাবে শরবিদ্ধ হয় যে দেহ ভূমি স্পর্শ করে না, তবে বেশীক্ষণ বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

১। ভীষ্ম ১০৭।১০৫

৩০. দ্রোণ পর্ব : প্রথম তিন দিনের যুদ্ধ—অভিমন্যু বধ

ভীষ্মের সেনাপতিত্বে দশ দিনের যুদ্ধ শেষে কৌরব পক্ষে নয় অক্ষৌহিণী, এবং পাণ্ডবপক্ষে পাঁচ অক্ষৌহিণী সৈন্য অবশিষ্ট রইল, ভীষ্মের পতনের পরে দুর্যোধন দ্রোণকে সেনাপতি পদে বৃত করলেন। দ্রোণের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ পাঁচদিন চলেছিল, কর্ণ ভীষ্মের সেনাপতিত্ব কালে যুদ্ধে যোগ দেন নাই, তিনি এবার যুদ্ধ আরম্ভ করলেন; যুদ্ধ দুই পক্ষ থেকেই তীব্রতর হ'ল; ফলে এই পাঁচদিনের মধ্যে উভয় পক্ষের বহু শ্রেষ্ঠ রথী ও রাজা নিহত হল।

দুর্যোধন প্রথমেই দ্রোণকে অনুরোধ করেন, যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে আমার কাছে এনে দিন। দ্রোণ প্রশ্ন করলেন, তোমার কি অভিপ্রায়? দুর্যোধন বললেন, বন্দী করে আনলে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আবার দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভ করে রাজ্যে অধিকার লাভ করব, তাতে আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না। দ্রোণ বল্‌লেন, অর্জুন কর্তৃক যুধিষ্ঠির যদি রক্ষিত না থাকে, তবে তাকে জীবিত ধরে আন্‌ব। সে কথা চরমুখে যুধিষ্ঠির জান্‌তে পেরে অর্জুনকে জানিয়ে প্রতিকার করতে বললেন। অর্জুন বল্‌লেন আমি আচার্য দ্রোণকে বধ করব না, কিন্তু আপনাকে প্রাণপণে রক্ষা করব।

প্রথম দিনের যুদ্ধে—যুদ্ধারম্ভ হতে একাদশ দিনের যুদ্ধে—দ্বৈরথ যুদ্ধ কয়েকটি হ'ল। সঙ্কুল যুদ্ধও হ'ল। উল্লেখযোগ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় অভিমন্যু সহ পৌরবের, অভিমন্যু পৌরবের রথের অশ্ব বধ করে অসিচর্ম হাতে নিয়ে পৌরবের রথের উপর লাফিয়ে উঠে তার কেশ দৃঢভাবে ধরে বধ করতে উদ্যত হয়, পৌরবের দুর্দশা দেখে জয়দ্রথ দ্রুত এসে রথ হতে নেমে অসি চর্ম হস্তে অভিমন্যুকে আক্রমণ করে। তাকে দেখে অভিমন্যু নেমে পড়ে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। জয়দ্রথের অসি অভিমন্যুর চর্মের, অর্থাৎ ঢালের অন্তঃস্থিত ধাতুস্তরে লেগে ভেঙ্গে গেল। ইতিমধ্যে শল্য প্রভৃতি আরো অনেক কৌরব রথী এসে অভিমন্যুকে ঘিরে ফেল্‌ল, জয়দ্রথ তার রথে আশ্রয় নিল। শল্য অভিমন্যুকে লক্ষ্য করে একটি লোহার শক্তি (বর্শার মত ক্ষেপণাস্ত্র) নিক্ষেপ করলেন। অভিমন্যু সেটিকে ধরে ফেলে সেটি ছুঁড়ে দিয়ে শল্যের সারথিকে বধ করল। শল্য তখন তার গদা নিয়ে অবতীর্ণ হলেন, অভিমন্যুও গদা হাতে নিল, এর মধ্যে গদা হস্তে ভীম এসে অভিমন্যুকে নিবৃত্ত করে শল্যের সঙ্গে গদাযুদ্ধ আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ গদাযুদ্ধের পরে দুজনেই পড়ে গেলেন, শল্যকে অচেতন দেখে কৃতবর্মা এসে

তাকে নিজ রথে তুলে নিলেন, ভীম নিজেই উঠে গদা হস্তে বিচরণ করতে লাগলেন।

দিনের শেষভাগে দ্রোণ পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনী আক্রমণ করে ব্যাঘ্রদত্ত ও সিংহসেন নামে দুই পাঞ্চালবীরকে বধ করলেন, পাণ্ডব-পাঞ্চাল বাহিনী ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যুধিষ্ঠিরকে বিপদগ্রস্থ করল, ইতিমধ্যে কোলাহল শুনে অর্জুন এসে পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনীকে আবার গৃহবদ্ধ করে দ্রোণের সম্মুখীন হযে তীব্র যুদ্ধে তাকে বিমুখ করলেন ফলে তাঁর যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত ধরে নেবার উদ্দেশ্য সফল হ'ল না। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে এল এবং অবহার ঘোষিত হল।

শিবিরে ফিরবার পরে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে ধরে আনতে পারা গেল না কেন প্রশ্ন করলে দ্রোণ বললেন, আমি পূর্বেই বলেছি যে অর্জুন কাছে থাকলে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করে আনা যাবে না, তুমি অর্জুনকে যুদ্ধের কেন্দ্র থেকে দূরে ব্যাপৃত করে রাখবার উপায় কর, তাহলে যুধিষ্ঠিরকে আমি বন্দী করে আনতে পারব। সেকথা শুনে ত্রিগর্তাধিপতি সুশর্মা নিজের থেকেই তাঁর পঞ্চভ্রাতা সত্যরথ, সত্যধর্মা, সত্যব্রত, সত্যেষু ও সত্যকর্মা এবং আরো অনেক রথীকে ডেকে নিয়ে একসঙ্গে শপথ করলেন যে তাঁরা অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রের একদেশে তাদের সঙ্গে আমরণ যুদ্ধের জন্য আহ্বান করবেন, তাঁদের একজনও শেষ থাকতে যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত হবেন না। একসঙ্গে শপথ নেওয়ায় তাঁরা সংশপ্তক নামে পরিচিত হলেন, তাঁদের মুখপাত্র সুশর্মা অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষিণ ভাগে তাঁদের সঙ্গে মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করতে আহ্বান জানালেন। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, এভাবে আমরণ যুদ্ধের জন্য আহূত হলে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না, অতএব আমি সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি, আপনাকে রক্ষা করবার ভার পাঞ্চাল মহারথ সত্যজিতের উপর দিয়ে যাচ্ছি, অন্য রথীগণও প্রযোজনমত তাকে সাহায্য করবে। যুধিষ্ঠির অনুমতি দিলেন। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষিণ ভাগে সুশর্মা প্রমুখ সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন, তারা প্রাণ তুচ্ছ করে যুদ্ধ করতে থাকল, এবং তাদের অনেকে অর্জুনের অস্ত্রে নিহত হলেও বাকী রথীগণ যুদ্ধ করেই চলল। ইতিমধ্যে দ্রোণ কৌরববীরদের নিয়ে পাণ্ডব-পাঞ্চাল বাহিনীর উপর আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন, সত্যজিৎ বহুক্ষণ যুদ্ধ করে নিহত হ'ল; ধৃষ্টদ্যুম্ন এসে পলায়মান রথী ও অন্য যোদ্ধাদের তিরস্কার করে সংহত করলেন; ভীম, সাত্যকি, ঘটোৎকচ এসে ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে যোগ দিয়ে কৌরববাহিনী

বিপর্যস্ত করে দিলেন, বহু পদাতি, রথী ও গজযোধীকে বিনষ্ট করলেন। তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুররাজ ভগদত্ত তাঁর বর্মাবৃত শিক্ষিত রণহস্তীতে আরোহণ করে পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনীকে আক্রমণ করলেন, সেই গজরাজের বিক্রমে ও ভগদত্তের অস্ত্রে পাণ্ডব পাঞ্চালগণ বিত্রস্ত হ'লেন। ভীম তাঁর ভীষণ গদা প্রহারে গজরাজকে দমন করবার চেষ্টা করে নিজেই বিপন্ন হয়ে অনেক কষ্টে রক্ষা পেলেন। সৈন্যদলের আর্ত চীৎকার ও ভগদত্তের হস্তীর বৃংহিতধ্বনি শুনে অর্জুন সংশপ্তকদলের কয়েকজন অবশিষ্ট ছিল, তাদের ছেড়ে ভগদত্তের অভিমুখে চল্‌লেন, বহুক্ষণ যুদ্ধ করে অবশেষে ক্ষুরপ্র বাণ দিয়ে গজরাজের বর্ম দেহচ্যুত করে তাকে মর্মে তীক্ষ্ণ বাণাঘাত করে মেরে ফেললেন, ভগদত্তকে বক্ষস্থলে শক্তির আঘাতে বধ করলেন। তার পরে কিছুক্ষণ এলোমেলো যুদ্ধের পরে অবহার ঘোষণা হ'ল। অর্জুন এসে পড়ায় সেদিনও দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে পারলেন না।

শিবিরে ফিরে দুর্যোধন দ্রোণকে বল্‌লেন, আপনি সুযোগ পেয়েও যুধিষ্ঠিরকে আজ বন্দী করে আন্‌লেন না। দ্রোণ বললেন, সুযোগ কখন পেলাম? প্রথমে ভীম, সাত্যকি প্রভৃতি এসে, পরে অর্জুন ফিরে এসে পাণ্ডব-পাঞ্চাল বাহিনীকে অভেদ্য করে তুল্‌ল। তুমি কাল আবার নূতন সংশপ্তক দল দিয়ে অর্জুনকে দূরে নেবার বন্দোবস্ত কর, কাল আমি যুধিষ্ঠিরকে ধরতে না পারলেও পাণ্ডবপক্ষের এক শ্রেষ্ঠ বীরকে বধ করব। সেই কথামত সুশর্মা পুনরায় একটি নূতন সংশপ্তকদল গঠন করে অর্জুনকে আগের দিনের মত যুদ্ধের জন্য আহ্বান করলেন। অর্জুন তাই দ্রোণ সৈনাপত্যের তৃতীয় দিন, যুদ্ধারম্ভের ত্রয়োদশ দিন, দূরে সারাদিন কঠিন সংগ্রামে ব্যাপৃত রইলেন। দ্রোণ সেদিন চক্রব্যূহ রচনা করলেন—পরস্পর শৃঙ্খলিত শকটশ্রেণী দিয়ে বিশাল একটি চক্রের মত করে সজ্জিত করে শকট প্রাচীরের অন্তরালে থেকে কৌরবরথীগণ চক্ররক্ষা ও পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনীর উপর বাণ বর্ষণ করবে; চক্রের একটিমাত্র দ্বার রাখা হ'ল, সেখানে দ্রোণের নেতৃত্বে অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, শকুনি, শল্য, ভূরিশ্রবা এবং কয়েকজন ধৃতরাষ্ট্র পুত্র ব্যূহবদ্ধ হয়ে দ্বার রক্ষা করবে, তাদের পশ্চাতে সৈন্যসহ দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, কৃপ ও লক্ষ্মণ প্রমুখ বহু তরুণ বয়স্ক কুমার যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকবে। প্রাতে যুদ্ধ আরম্ভ হলে ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি মহাবীরগণ ব্যূহদ্বার ভেদ করে অগ্রসর হবার চেষ্টা ক'রে দ্রোণ ও তাঁর সঙ্গীয় রথীদের বাণ ও অস্ত্রবর্ষণে বিমুখ হলেন। কোন পাণ্ডব-পাঞ্চাল বীরই যখন ব্যূহভেদ করতে পারলেন না, তখন যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে

ব্যূহভেদ করতে অনুমতি দিলেন। অভিমন্যু বলল, আমি ব্যূহদ্বার ভেদ করে ভিতরে যেতে পারব কিন্তু একাকী ভিতরে গিয়ে বিপন্ন হলে ফিরতে বোধহয় পারব না। ভীম বললেন, তুমি যদি ব্যূহদ্বার ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করতে পার, তাহলে আমি, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি তোমার কৃত ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করে তোমাকে সাহায্য করব। অভিমন্যু তখন ব্যূহদ্বারে অবস্থিত দ্রোণ প্রমুখ রথীদের উপর অবিরত তীরবৃষ্টি করে তাদের মধ্য দিয়ে পথ করে রথ নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। কিন্তু ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যখন অভিমন্যুকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করলেন, তখন জয়দ্রথ সেই ছিদ্র বন্ধ করে দিলেন, জয়দ্রথ দ্রোণ ও ব্যূহদ্বারে উপস্থিত অন্যান্য কৌরব রথীদের বাধা কাটিয়ে তাদের ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব হল না। ফলে অভিমন্যুকে কৌরব বীর সমাকুল চক্রব্যূহের মধ্যে একাকী যুদ্ধ করে যেতে হল। অভিমন্যু প্রবেশ করেই তার সম্মুখে স্থিত বহু সাধারণ রথী ও পদাতিক সৈন্য ধ্বংস করল। দুর্যোধন বাধা দিতে গিয়ে বিপন্ন হলেন, তখন কর্ণ, কৃতবর্মা, কৃপ, অশ্বত্থামা, শল্য প্রভৃতি অগ্রসর হয়ে অভিমন্যুকে যুদ্ধে ব্যাপৃত করে দুর্যোধনকে অপসরণের সুযোগ করে দিলেন। কর্ণের তীব্র বাণবর্ষণে অভিমন্যু বিচলিত না হয়ে ঘন বাণ বর্ষণে কর্ণকেই বিপর্যস্ত করে তুলল, ফলে কর্ণও পিছনে সরে গেলেন। শল্য অভিমন্যুর বাণাঘাতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে তার সারথি তাকে নিয়ে সরে গেল। দুঃশাসন স্পর্দ্ধা সহকারে অভিমন্যুর দিকে অগ্রসর হয়ে দারুণ বাণাঘাত সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গেল। কর্ণ আবার এগিয়ে এসে অভিমন্যুকে স্ববশে আনতে চেষ্টা করলে নিজেই অস্ত্রপ্রহারে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন, তার সারথি তাকে নিয়ে গেল। শল্যপুত্র রুক্মরথ ও তার সঙ্গী বহু রাজপুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসে প্রাণ দিল; দুর্যোধন পুত্র লক্ষণও অভিমন্যুর হস্তে নিহত হল। অভিমন্যুর এই অসাধারণ বীরত্ব দেখে দুর্যোধন শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তখন দ্রোণের পরামর্শে যুগপৎ ছয়জন রথী—দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা ও কোশলরাজ বৃহদ্বল—অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। অভিমন্যু যথাসাধ্য প্রতিযুদ্ধ করে তাদের মধ্যে বৃহদ্বলকে নিহত করল, বাকী রথীগণ তার রথের অশ্ব বধ করলেন, ধনুকের জ্যা বার বার কেটে দিলেন; জ্যা ফুরিয়ে যাওয়াতে অভিমন্যু অসিচর্ম হস্তে নেমে এল, কিন্তু দ্রোণ তার মুষ্টিতে বাণাঘাত করে অসি হস্তচ্যুত করে দিলেন, কর্ণ তার চর্ম কেটে দিলেন। অভিমন্যু রথ থেকে চক্র তুলে নিল, কিন্তু তা নিক্ষেপ করবার পূর্বেই সেটিও কাটা গেল।

অভিমন্যু তার শেষ অস্ত্র গদা হাতে নিল, তা দেখে গদাযুদ্ধ কুশল দুঃশাসন পুত্র গদাহস্তে এগিয়ে এল, অন্য রথীরা দাঁড়িয়ে অভিমন্যু ও দুঃশাসন পুত্রের গদাযুদ্ধ দেখতে থাকল। কিছুক্ষণ পরে গদাঘাতে দুজনেই পড়ে গেল, ক্লান্ত অভিমন্যু উঠে দাঁড়াবার পূর্বেই দুঃশাসন পুত্র উঠে তার মস্তকে গদাঘাত করল, অভিমন্যু পড়ে গিয়ে আর উঠল না। এইভাবে অভিমন্যু নিহত হ'লে কৌরবগণ জয়ধ্বনি করে অবহার ঘোষণা করল।

অর্জুনকে সংশপ্তক বড় একটি দল যুদ্ধে ব্যাপৃত রেখেছিল, তার মধ্যে এক সুশর্মা ছাড়া সকলকে বধ করে অর্জুন সন্ধ্যায় শিবিরে ফিরে অভিমন্যুর নিধন বার্তা শুনলেন ; জয়দ্রথ কর্তৃক ব্যুহদ্বার অবরোধের কথা শুনে তাকেই অভিমন্যুর মৃত্যুর জন্য প্রধানতঃ দায়ী মনে করে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, জয়দ্রথ যদি রাজ যুধিষ্ঠির বা পুরুষোত্তম কৃষ্ণের শরণ না নেয়, তবে কাল সূর্যাস্তের পূর্বেই তাকে বধ করবেন, না করতে পারলে পুত্রের চিতায় জীবন বিসর্জন করবেন। সেই প্রতিজ্ঞার কথা কৌরব শিবিরে পৌঁছে গেলে জয়দ্রথ মৃত্যু এড়াতে নিজদেশে ফিরে যেতে চাইলেন, কিন্তু দ্রোণ তাকে অভয় দিয়ে বললেন, তোমার রক্ষার জন্য এমন ব্যবস্থা করব যে অর্জুন সূর্যাস্তের মধ্যে তোমার কাছে পৌঁছাতেই পারবে না। চিন্তা ও পরামর্শ করে তিনি একটি পরিকল্পনা করে ফেললেন— সম্মুখে দুর্মর্ষণের নেতৃত্বে পনর শত শিক্ষিত গজারোহী যোদ্ধা থাকবে, তার পিছনে দুঃশাসন ও বিকর্ণ তাদের রথে উপযুক্ত বল সঙ্গে নিয়ে ব্যুহদ্বারের সম্মুখে থাকবে, চক্রশকট ব্যুহের দ্বারে স্বয়ং দ্রোণ যথেষ্ট বল নিয়ে থাকবেন, তার পশ্চাতে কৃতবর্মা তার যাদববাহ নিয়ে থাকবে, তার পশ্চাতে কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ও জলসন্ধ থাকবে তাদের সৈন্য নিয়ে, তারপরে প্রধান কৌরববাহিনী নিয়ে দুর্যোধন থাকবে, তারও তিন গব্যূতি বা ছয় মাইল পশ্চাতে নিজ বাহিনী সজ্জিত করে জয়দ্রথ থাকবে, তার সামনে ছয় জন মহারথ থাকবে অর্জুনকে আটকাতে—কর্ণ, সৌমদত্তি (ভূরিশ্রবা), শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ ও কর্ণপুত্র বৃষসেন। এই পরিকল্পনার কথা শুনে কৌরবগণ আশ্বস্ত হ'ল, জয়দ্রথও আর স্বদেশে ফিরবার কথা তুললেন না।

৩১. দ্রোণ পর্ব—চতুর্থ দিনের যুদ্ধ—জয়দ্রথ বধ

এইভাবে জয়দ্রথকে রক্ষা করবার যে পরিকল্পনা, তা তৃতীয় দিনের সন্ধ্যার মধ্যেই পাণ্ডবগণ জানতে পারলেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, তুমি ভাবী

ও বিনষ্ট হতে আরম্ভ হল।[১] দ্রোণ বহু চেষ্টা করে ধৃষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ করে তার রথের অশ্ব বধ করতে পারলেন, তখন সাত্যকি এসে দ্রোণকে যুদ্ধে ব্যাপৃত করে নানা অস্ত্রে বিপন্ন করলেন।[২] এইরূপভাবে যুদ্ধ চলতে থাকল। কৃষ্ণ ও অর্জুন দুর্যোধন পরাজিত হয়ে সরে গেলে আরও অগ্রসর হয়ে ছয় মহারথী রক্ষিত জয়দ্রথকে দেখতে পেলেন, অর্জুন গাণ্ডীবের টঙ্কার ধ্বনি করলেন, কৃষ্ণ জোরে তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজালেন। তখন আটজন রথীর সঙ্গে যুগপৎ অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হল—ভূরিশ্রবা, শল, কর্ণ, বৃষসেন, জয়দ্রথ, কৃপ, মদ্ররাজ শল্য ও অশ্বত্থামা। যুধিষ্ঠির বহুদূরে নিনাদিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি শুনে অর্জুনকে বিপন্ন মনে করে সাত্যকিকে বললেন, তুমি ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করে অর্জুনের সাহায্যে শীঘ্র যাও। সাত্যকি বললেন, আপনাকে রক্ষা করবার ভার অর্জুন আমার উপর দিয়ে গেছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, এখানে আরও অনেক বীর আছেন—ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ঘটোৎকচ প্রভৃতি, তারা আমাকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন। যুধিষ্ঠিরের মনে তখন দ্রোণের হস্তে বন্দী হবার ভয় বিশেষ ছিল না, কৌরবদের শ্রেষ্ঠ বহু রথী জয়দ্রথের রক্ষার্থ ব্যূহের অভ্যন্তরে বহু দূর ছিলেন, যারা দ্রোণের সঙ্গে ছিল তাদের উচ্চ মানের যোদ্ধা মনে হয়নি, তাদের বেশ কয়েকজন পাণ্ডব পাঞ্চাল বীরদের হস্তে নিহত হয়েছিল, পাণ্ডব-পাঞ্চাল পক্ষীয় কয়েকজনও নিহত হয়েছিল। কৌরব পক্ষের নিহত বীরদের মধ্যে রাক্ষস বীর অলম্বুষ উল্লেখযোগ্য, ভীষ্ম তাকে মহারথ বলে বর্ণনা করেছিলেন, সে ঘটোৎকচের হস্তে নিহত হয়।[৩] সাত্যকির অনুরোধে যুধিষ্ঠির সাত্যকির রথ প্রতিদিন যে পরিমাণ অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত করা হত, তার পাঁচগুণ অধিক অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত করে দিতে আদেশ দিলেন ও উৎকৃষ্ট মদ্য দিলেন। মদ্য পান করে নূতন সজ্জিত রথে সাত্যকি অর্জুনের সাহায্যার্থ ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করলেন। ব্যূহের মুখে দ্রোণের সঙ্গে অল্পকাল শর-যুদ্ধ করে সাত্যকিও অর্জুনের মত শকট ব্যূহ ভেঙ্গে ভিতরে চলে গেলেন। তারপর কৃতবর্মার সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ করে তাকে অস্ত্রাঘাতে অজ্ঞান করে দিয়ে যুধামন্যু ও উত্তমৌজাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তারপর ভূরিশ্রবার সঙ্গে সাত্যকি

১। দ্রোণ ৯৫ অঃ

২। দ্রোণ ৯৮ অঃ

৩। দ্রোণ পর্ব, ১০৯ অঃ

যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পরস্পরের রথের অশ্ব বধ করে ভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে অসি চর্ম যোগে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে লাগলেন, উভয়েরই চর্ম ভেঙ্গে যাওয়ায় মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করলেন; ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে বশে এনে অসি দিয়ে তার শিরশ্ছেদ করতে উদ্যত হলে অর্জুনরথস্থ কৃষ্ণ দেখতে পেয়ে অর্জুনকে বললেন, সাত্যকি বিপন্ন, তাকে রক্ষা কর, অর্জুন ক্ষুরপ্র বাণ দিয়ে ভূরিশ্রবার দক্ষিণ হস্ত কেটে দিলেন। ভূরিশ্রবা অর্জুনকে ডেকে বললেন, আমি যখন আর একজনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, তুমি কেন তার মধ্যে আমার হাত কেটে দিয়ে অধর্ম যুদ্ধ করলে? অর্জুন বললেন, আমার পক্ষীয় বীরকে বাঁচাতে আমি তোমার হাত কেটে দিয়েছি, তাতে অধর্ম কেন হবে? সাত্যকি বিপদমুক্ত হয়ে নিজের অসি দ্বারা কৃষ্ণ, অর্জুন প্রভৃতির নিষেধ সত্বেও ভূমিতে নিশ্চেষ্ট ভাবে উপবিষ্ট ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ করলেন। ইতিমধ্যে বহুক্ষণ অর্জুনের বা কৃষ্ণের ধনুকের টঙ্কার বা শঙ্খনাদ না শুনে যুধিষ্ঠির ভীমকে অর্জুনের সাহায্যার্থ পাঠিয়ে দিলেন, বললেন যে ধৃষ্টদ্যুম্ন, ঘটোৎকচ প্রভৃতিই তাঁকে রক্ষা করতে পারবে। ভীম ব্যূহমুখে দ্রোণের সম্মুখীন হয়ে বললেন, আমি শত্রু, অর্জুনের মত দয়ালু নই, ব'লে দ্রোণের সারথি ও রথের অশ্ব নিধন করে রথখানি উল্টে দিলেন, দ্রোণ কোনমতে নিজেকে বাঁচিয়ে অন্য রথে যখন উঠলেন, তখন ভীম বহুদূরে অগ্রসর হয়ে গেছেন। ভীমের সম্মুখে প'ড়ে যে রথী বা গজসৈন্য বা অশ্বারোহী বাধা দিতে চেষ্টা করল, তাকেই ভীম বধ করলেন, তারপর কর্ণের নিকটস্থ হয়ে কর্ণের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। কর্ণ প্রথমে দুই তিনবার ভীমসহ যুদ্ধে বিরথ হয়ে অন্য রথে উঠে প্রস্তুত হয়ে ফিরলেন, অবশেষে ভীমকে বিরথ করে দিলেন, ভীমের সারথি অশোকের রথে উঠে নিজেকে রক্ষা করে। কর্ণ প্রথমে যখন কয়েকবার ভীমের নিকট পরাজিত হন, তখন দুর্যোধন কর্ণের সাহায্য করতে কয়েকজন ক'রে নিজের ভ্রাতা প্রেরণ করেন, তারা সকলেই ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে বিনষ্ট হয়। এইভাবে সেদিনের যুদ্ধে ত্রিশ জনের অধিক ধৃতরাষ্ট্র পুত্র নিহত হয়।

ভীম বিরথ হয়ে মৃত হস্তী ও ভগ্ন রথের স্তূপের মধ্যে আশ্রয় নেন। তার অবস্থা দেখে অর্জুন অগ্রসর হয়ে কর্ণের প্রতি বাণ বর্ষণ আরম্ভ করেন। কর্ণ কয়েকবার ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়েছিলেন, তিনি তখন অর্জুনের সম্মুখীন না হয়ে নিরাপদ স্থানে চলে গেলেন। ভীম উত্তমৌজার রথে গিয়ে উঠলেন। এইভাবে সাত্যকির হস্তে ভূরিশ্রবার মৃত্যু হওয়ায় এবং ভীমসহ যুদ্ধে শ্রান্তিবশতঃ

কর্ণ পশ্চাদপসরণ করায় অর্জুনের ভার কিছুটা লাঘব হ'ল, আরো তিনি সাত্যকি ভীম যুধামন্যু ও উত্তমৌজা এই চারজন বীরের সাহায্য পেলেন। তাদের সাহায্যে সব বাধা চূর্ণ করে জয়দ্রথের রথের সম্মুখীন হয়ে তার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধ করে সূর্যাস্তের পূর্বেই তাকে বধ করলেন। জয়দ্রথ বধের পরেও কৃপ ও অশ্বত্থামা অর্জুনকে আক্রমণ করেন; অর্জুন তাদের সঙ্গে মৃদুযুদ্ধ করা সত্ত্বেও কৃপ অর্জুনের বাণে মূর্চ্ছিত হয়ে যান, তার সারথি তাকে নিয়ে সরে যায়। মাতুলের অবস্থা দেখে অশ্বত্থামাও তখন যুদ্ধ আর না করে সরে যায়। কৃপের মূর্চ্ছা দেখে অর্জুন দুঃখ প্রকাশ করেন, দেখা যায় যে অভিমন্যুর মৃত্যুর পরে তীব্র যুদ্ধ করা সত্ত্বেও গুরুর প্রতি মোহ অর্জুন কাটিয়ে উঠতে পারেন নাই। কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মাকে আয়ত্তে পেয়েও অর্জুন বধ না করে ছেড়ে দিয়েছেন, তার ফলে যুদ্ধশেষে হতাবশিষ্ট পাণ্ডব-পাঞ্চাল বীরগণ রাত্রিতে অতর্কিতভাবে তাদের হস্তে নিহত হয়েছিল। কৃপ, অশ্বত্থামা অপসৃত হবার পরেও কিছুক্ষণ দুই পক্ষের বীরদের মধ্যে যুদ্ধ চলল, তবে বিশৃঙ্খল ভাবে। সন্ধ্যা হলে কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, ভাগ্যক্রমে তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পেরেছ। অর্জুন বললেন, তোমার সাহায্য পেয়েই তা সম্ভব হয়েছে। তখন অর্জুন, কৃষ্ণ, সাত্যকি, ভীম ইত্যাদি ফিরে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে সব সংবাদ জানালেন। যুধিষ্ঠির জয়দ্রথবধের সংবাদ পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন। যুধিষ্ঠির সাত্যকি ও ভীমকে পর পর অর্জুনের সাহায্যে পাঠিয়ে বিচক্ষণ সেনাপতির উপযুক্ত কাজ করেছিলেন, তাদের সাহায্য পেয়ে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা পূরণের কার্য সহজ হয়ে এসেছিল। না হলে হয়ত কৃষ্ণের পরিকল্পনা মত কৃষ্ণের নিজের অস্ত্রধারণ করে অর্জুনের পথের বাধা দূর করে দিতে হত।

৩২. দ্রোণ পর্ব—রাত্রি যুদ্ধ ও পঞ্চম দিনের যুদ্ধ—ঘটোৎকচ বধ ও দ্রোণ বধ

জয়দ্রথের মৃত্যুর পরে দুর্যোধন দুঃখিত মনে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, জয়দ্রথ অর্জুনের হস্তে নিহত হয়েছে, তাছাড়া আমাদের পক্ষের ভূরিশ্রবা, অলম্বুষ, জলসন্ধ ইত্যাদি মহাবীরও মৃত্যুবরণ করেছে। আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহবশতঃ শুধু অর্জুনকে নয়, সাত্যকিকেও ভীমকেও ব্যূহদ্বার

অতিক্রম করে যেতে দিলেন, ফলে আমাদের বহু রথী ও সৈন্য নিহত হ'ল, এবং আপনার জয়দ্রথ রক্ষার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ল। যারা আমার যথার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী নয়, তাদের উপর নির্ভর করে এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে আমি ভুল করেছি। একমাত্র কর্ণ সর্বদা আমার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করেছে। তার সাহায্য নিয়ে যারা আমার জন্য প্রাণ বিসর্জন করেছে, তাদের ঋণ শোধ করতে বা যুদ্ধ জয় করতে আমি এখন যাই। দ্রোণ দুর্যোধনের কথা শুনে বললেন, তুমি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করছ। আমি স্বেচ্ছায় অর্জুন বা সাত্যকি বা ভীমকে পথ দিই নাই, আমার পঁচাশী বৎসর বয়স হয়েছে, আমার তুলনায় তারা যুবক, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ব্যূহ ভেঙ্গে এগিয়ে গেছে, আমি নিবারণ করতে পারি নাই। এখন যদি যুদ্ধ করতে চাও, তবে ঘোষণা করে দাও যে আজ অবহার হবে না, সারারাত্রি যুদ্ধ চলবে। দুর্যোধন তাই ঘোষণা করে দিলেন। ফলে যুদ্ধারম্ভে যে নিয়ম হয়েছিল, সন্ধ্যাকালে সারা রাত্রির জন্য অবহার বা যুদ্ধ বিরতি হবে, সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হ'ল। দ্রোণের সেনাপতিত্বে যুদ্ধের চতুর্থ দিন, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্দশ দিন, প্রায় সারারাত্রি যুদ্ধ চলল। দুর্যোধনের ঘোষণা শুনে পাণ্ডব-পাঞ্চালগণ পুনঃ যুদ্ধের জন্য ব্যূহবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত হ'ল।

রাত্রি যুদ্ধের তিনটি ভাগ করা যায়, প্রথমে গোধূলির আলোকে যুদ্ধ, দ্বিতীয় দীপ জ্বেলে যুদ্ধ, তৃতীয় অর্জুনের ঘোষণা মত দুই দণ্ড বিশ্রাম নিয়ে কৃষ্ণা দ্বাদশীর ম্লান চন্দ্রালোকে ও ঊষার আলোকে যুদ্ধ। প্রথমে দুর্যোধন তীব্রবেগে পাণ্ডব বাহিনীর উপর আক্রমণ করে বেশ কিছু সৈন্য ধ্বংস করলেন, তারপর যুধিষ্ঠির তীব্র প্রতি-আক্রমণ করে দুর্যোধনকে বিসংজ্ঞ করে দিলেন। কৌরব সেনার মধ্যে কোলাহল উঠল, রাজা নিহত হয়েছেন। শুনে দ্রোণ দুর্যোধনের সাহায্যার্থ অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে দুর্যোধন সংজ্ঞা লাভ করে আবার যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ভীম, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থ এগিয়ে এলেন। তীব্র যুদ্ধে উভয় পক্ষেই বহু রথী ও সৈন্য নিহত হ'ল। ভূরিশ্রবার পিতা সোমদত্ত পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সাত্যকিকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু সাত্যকির হস্তে পরাজিত ও নিহত হলেন। সোমদত্তের পিতা বৃদ্ধ বাহ্লীক-রাজ ভীমের অস্ত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। ভীমের হস্তে আরো কয়েকজন ধৃতরাষ্ট্র তনয় প্রাণ দিলেন। যুধিষ্ঠিরও সেই রাত্রিতে যথেষ্ট বীর্য প্রদর্শন করলেন; একবার দ্রোণের সম্মুখীন হয়ে তাঁর নিক্ষিপ্ত সব অস্ত্র নষ্ট করে দিলেন, দ্রোণের

ব্রহ্মাস্ত্র পর্যন্ত স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা প্রতিহত করলেন। তারপর কৃষ্ণের কথায় সরে গেলেন। দ্রোণ তখন পাঞ্চাল সেনার উপর আক্রমণ চালালেন ; কিন্তু অর্জুন ও ভীম পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনীর দুই পার্শ্ব রক্ষা করে দ্রোণের ও দুর্যোধনের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিলেন। কর্ণ অগ্রসর হয়ে অর্জুনের সম্মুখীন হলে অর্জুন কর্ণের সারথি ও রথের অশ্ব বধ করে কর্ণের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন, কর্ণ কৃপাচার্যের রথে উঠে চলে গেলেন। এইভাবে রাত্রি যুদ্ধের প্রথম ভাগের যুদ্ধ পাণ্ডব পক্ষের অনুকূল হ'ল।

তারপরে দুই পক্ষেই দীপ ও মশাল জ্বালিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র কিছুটা আলোকিত করা হল। পদাতিক সৈন্যগণকে মশালবাহী করা হল, রথে ও গজপৃষ্ঠে দীপ জ্বালান হ'ল। দীপ প্রজ্বালনের পরেও প্রথমে পাণ্ডব পাঞ্চালদের জয় হ'ল ; সাত্যকি, অর্জুন, ভীমের হস্তে কিছু কিছু কৌরব রথী নিহত হ'ল, ধৃষ্টদ্যুম্নও দ্রোণের সম্মুখীন হয়ে তাঁর অস্ত্র কেটে দিয়ে তাঁর পাঞ্চালসেনা ধ্বংস বন্ধ করতে সমর্থ হ'ন। যুদ্ধের গতি দেখে দুর্যোধন আবার দ্রোণ ও কর্ণকে তীব্র যুদ্ধ করে শত্রু বিনাশ করতে বলেন, দুর্যোধন দীপ জ্বালার পরে একবার ভীমের হস্তে, একবার সাত্যকির হস্তে বিপর্যস্ত হয়ে উগ্র হয়ে উঠেছিলেন। তখন মৃত্যু তুচ্ছ করে দ্রোণ ও কর্ণ যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। কর্ণ পাণ্ডব পাঞ্চাল বাহিনী ধ্বংস করছেন দেখে যুধিষ্ঠির অর্জুনকে ডেকে বললেন, শীঘ্র কর্ণকে নিবারণ কর। অর্জুন কর্ণের দিকে রথ নিতে বললেন, কিন্তু কৃষ্ণ বললেন, এখন ঘটোৎকচ কর্ণের সম্মুখীন হোক, ঘটোৎকচও কর্ণের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, কৃষ্ণ বোধ হয় সমস্ত দিন যুদ্ধ ক্লান্ত অর্জুনকে বিশ্রাম দিতে চেয়েছিলেন। ঘটোৎকচ উৎফুল্ল ভাবেই কর্ণের সম্মুখীন হ'ল এবং অনেকক্ষণ সুকৌশলে যুদ্ধ করে কর্ণকে এতটা বিপর্যস্ত করল যে কৌরবগণ কর্ণের নিরাপত্তার জন্য ত্রাসিত হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু কর্ণ নিজেই প্রাণপণ যুদ্ধ করে ঘটোৎকচকে ঠেকিয়ে রাখলেন এবং শেষে একটি বিশিষ্ট তীক্ষ্ণ বাণ মেরে ঘটোৎকচকে পাতিত করলেন। ঘটোৎকচের পতনে পাণ্ডব পাঞ্চালগণ অত্যন্ত শোকার্ত হলেন, যুধিষ্ঠির বলে উঠ্‌লেন, ঘটোৎকচ আমাদের প্রিয় পুত্র ও প্রায় অভিমন্যুর মত অতিরথ ছিল, হিমালয়ে তীর্থভ্রমণ কালে যে আমাদের অনেক সাহায্য করেছিল, কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে সে যখন বিপন্ন হয়, তখন অন্য কোন মহারথ এসে কেন কর্ণকে যুদ্ধে ব্যাপৃত করে ঘটোৎকচকে অবসর দিল না? অভিমন্যু বধের বিবরণ শুনে অর্জুন জয়দ্রথকে

পুত্রের মৃত্যুর কারণ মনে করে তাকে বধ করল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অভিমন্যুর মৃত্যুর জন্য দ্রোণ ও কর্ণেরই দায়িত্ব বেশী, অর্জুন তো গুরু দ্রোণকে বধ করবে না, কর্ণকে তো বধ করতে পারতো। আমি নিজে আজ কর্ণবধ করব। বলে যুধিষ্ঠির কর্ণের অভিমুখে রথ চালিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ তাঁর নিকটস্থ হয়ে অনুনয় করে বললেন, আপনি আর কয়েকদিনের মধ্যেই যুদ্ধজয়ী হয়ে রাজ্য পাবেন, অর্জুনই কর্ণকে মারবে, আপনি এখন কর্ণের অভিমুখে না গিয়ে দুর্যোধন বা তার ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। যুধিষ্ঠির তখন নিবৃত্ত হলেন। ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নকে বললেন, আপনি দ্রোণকে বধের জন্য দীক্ষিত, যুদ্ধক্লান্ত দ্রোণকে এখন বধ করুন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের দিকে অগ্রসর হলেন, আরো কয়েকজন রথী ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে চলল, দ্রোণের পার্শ্বেও হতাবশিষ্ট কৌরববীরগণ পার্শ্বরক্ষী হয়ে এল। কিন্তু তখন সকলেই ক্লান্ত ও নিদ্রালু বুঝে অর্জুন উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, তোমরা যে যেখানে আছ, দুই দণ্ড বিশ্রাম করে বা ঘুমিয়ে নাও, দুইদণ্ড পরে চাঁদ উঠ্‌লে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হবে। উভয় পক্ষের যোদ্ধাগণ ঘোষণাটিতে খুশী হয়ে বিশ্রাম করে নিল।

কৃষ্ণা দ্বাদশীর ক্ষীণ চন্দ্র দিগন্ত অতিক্রম করে কিছু উপরে উঠ্‌লে যখন একটু আলো হ'ল, তখন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে দুর্যোধন দ্রোণের নিকট গিয়ে বলেন, অর্জুন আপনার প্রিয় শিষ্য বলে তাকে আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন, তাই আমি শকুনি ও কর্ণকে নিয়ে কৌরববাহিনীর অর্দ্ধভাগ নিয়ে অর্জুনের সম্মুখীন হয়ে তাকে বিনাশ করব, আপনি অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ সৈন্য নিয়ে পাঞ্চালদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। দ্রোণ তা করতে অনুমতি দিলেন, দুর্যোধনের সন্দেহের জন্য অসন্তুষ্টি প্রকাশও করলেন। কৌরববাহিনী দুইভাগ হয়ে ব্যূহবদ্ধ হ'ল, একদিকে দুর্যোধন-কর্ণ-শকুনির নেতৃত্বে, অন্যদিকে দ্রোণের নেতৃত্বে। কৃষ্ণ ও ভীমের উপদেশ মত অর্জুন দ্রোণের বাহিনী ডানদিকে রেখে ও কর্ণ-দুর্যোধনের বাহিনী বামদিকে রেখে এগিয়ে গিয়ে পিছন দিক থেকে কর্ণ দুর্যোধনের বাহিনী আক্রমণ করে বহু রথী ও সৈন্য নিধন করলেন, অন্যদিকে দ্রোণের সম্মুখে আগত দ্রুপদরাজ ও বিরাটরাজের সঙ্গে দ্রোণ কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে উভয়কেই যমলোকে প্রেরণ করলেন; দ্রুপদরাজ, বিরাটরাজ উভয়েই বৃদ্ধ; সারাদিন এবং রাত্রির তিন প্রহর অবিশ্রাম যুদ্ধ করে তাঁদের যে ক্লান্তি আসে, তা দুই দণ্ডে দূর হয় না, দ্রোণও বৃদ্ধ বটে, তবে দ্রোণের ক্ষিপ্রতর অস্ত্রচালনার উত্তর তাঁরা দিতে পারলেন না।

ইতিমধ্যে সূর্যোদয় হ'ল; দুইপক্ষের সকল যোধী যুদ্ধ থামিয়ে কিছুক্ষণ সূর্যস্তব

করলেন। তারপরে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হল। ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নকে পিতৃবধের প্রতিশোধ নিতে বলে নিজেও কৌরববাহিনী আক্রমণ করলেন, কৌরববাহিনীর দুটি ভাগ আর পৃথক রইল না, সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। ভীম কর্ণের সম্মুখীন হয়ে কর্ণকে বিব্রত করেন, শেষে কর্ণের বাণে তার অশ্বগুলি নিহত হওয়ায় নকুলের রথে উঠে গেলেন। দ্রোণ অর্জুনের সম্মুখীন হলেন, বহুক্ষণ তাঁরা পরস্পরের অস্ত্র নিবারণ করলেন, কেউ জিতলেন না, অর্জুন গুরুকে মর্মে আঘাত করতে নিবৃত্ত থাকলেন। সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধে দুর্যোধনকে পরাজিত দেখে কর্ণ দুর্যোধনের সাহায্যার্থ এগিয়ে এলেন, তা দেখে ভীম এসে আবার কর্ণকে যুদ্ধে ব্যাপৃত করলেন, কর্ণ ভীমের সারথিকে নিধন করলেন, ভীম গদার আঘাতে কর্ণের সারথিকে মেরে কর্ণের রথের একটি চাকাও ভেঙ্গে দিলেন। এইভাবে বহুক্ষণ সঙ্কুল যুদ্ধ চল্‌ল। অবশেষে ভীম, অর্জুন ও সহদেব অর্জুনকে ডেকে বললেন, তুমি অন্যসব রথীকে নিবারণ করে ধৃষ্টদ্যুম্নকে দ্রোণের সঙ্গে নিরঙ্কুশ যুদ্ধের অবকাশ দাও। অর্জুন তাই করলেন। দ্রোণও বৃদ্ধ এবং ক্লান্ত[১], তাঁর রথে অস্ত্র সঞ্চয়ও ফুরিয়ে এসেছিল।[২] দুর্যোধনের বিলাপ ও অনুযোগ শুনে রাত্রি যুদ্ধের আদেশ দিয়ে তিনি নিজেকেও বিপন্ন করেছেন, তা পূর্বে বুঝ্‌তে পারেন নাই। তিনি মনে বুঝ্‌লেন যে তাঁর কাল শেষ হয়েছে। তবু শেষ বীর্য উদ্দীপ্ত করে দুইবার ধৃষ্টদ্যুম্নের আক্রমণ প্রতিহত করলেন, তৃতীয়বার আর পারলেন না। মৃত্যু আসন্ন জেনে তিনি উপবিষ্ট হয়ে যোগস্থ হ'লেন বা হতে চেষ্টা করলেন, সেই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁর রথে উঠে তাঁর শিরশ্ছেদ করলেন। দ্রোণের মৃত্যুতে ভীম আনন্দ প্রকাশ করে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাধুবাদ দিলেন ও আলিঙ্গন করলেন। ন্যস্তশস্ত্র অবস্থায় গুরুর শিরশ্ছেদ করায় অর্জুন অসন্তুষ্ট হযে ধৃষ্টদ্যুম্নের কিছু নিন্দা করলেন। সাত্যকি নিজে অনুরূপ অবস্থায় ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ করেছেন, সেকথা ভুলে ধৃষ্টদ্যুম্নের নিন্দা সমর্থন করলেন। বিবাদ বেশীদূর যাতে না যায়, সেই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ দুইপক্ষকে শান্ত করে দিলেন। দ্রোণের মৃত্যুতে কৌরবসেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে লাগ্‌ল।

দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা দ্রোণের মৃত্যুর সময় দ্রোণের নিকটে ছিলেন না। কৃপের মুখে কি অবস্থায় দ্রোণকে বধ করা হয়েছে শুনে বললেন, যে তিনি একাই

১। আশ্বমেধিক পর্ব, ৯০।১০

২। দ্রোণ পর্ব, ১৯১.৯

ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও পাণ্ডবগণকে বধ করবেন। তিনি ছত্রভঙ্গ কৌরব সেনা পুনরায় ব্যূহবদ্ধ করে অগ্রসর হলেন, তা দেখে পাণ্ডব পাঞ্চালগণও পুনরায় ব্যূহবদ্ধ হলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা অস্ত্রচাতুর্য বেশী দেখাতে পারলেন না, নকুল তার সম্মুখীন হয়ে মণ্ডলাকারে ঘুরে ঘুরে তার অগ্রগতি বন্ধ করে দিলেন,[১] তাকে পরাজিত করতে না পেরে অশ্বত্থামা ফিরে গেলেন। অশ্বত্থামা কর্তৃক নারায়ণাস্ত্র ক্ষেপণের কথা প্রমাণ মহাভারতে আছে—যে অস্ত্র জ্বালা সৃষ্টি ক'রে সশস্ত্র যোদ্ধাকে পীড়িত করে, কিন্তু নিরস্ত্রকে কোন বাধা দেয় না, কিন্তু সেরূপ অস্ত্র তিন সহস্র বৎসর পূর্বে ছিল তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। নারায়ণাস্ত্র বিফল হ'লে অশ্বত্থামা তীব্র যুদ্ধ করে একে একে ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও ভীমকে পরাজিত করেন, সে কথাও ব্রাহ্মণ মহিমা বাড়াতে পরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নাই।

দ্রোণের পতনের দিনে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঞ্চদশ দিবসে, মধ্যাহ্নেই অবহার ঘোষিত হ'ল।

৩৩. কর্ণপর্ব—কৃষ্ণের ধর্ম ব্যাখ্যা, দুঃশাসন বধ ও কর্ণ বধ

দ্রোণের মৃত্যুর পর দুর্যোধন কৌরবপক্ষে কর্ণকে সেনাপতি করলেন। কর্ণ দুই-দিন তীব্র যুদ্ধ ক'রে অর্জুনের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে নিহত হ'ন। যুদ্ধের এই দুই দিনও দুর্যোধন সংশপ্তক দল গঠন করে দিনের প্রথমার্দ্ধে অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রের কেন্দ্র হ'তে দূরে রাখ্‌বার চেষ্টা করেছেন, উদ্দেশ্য যে কর্ণ সহজেই পাণ্ডব-পাঞ্চাল সেনা ও রথী বিনাশ করতে পারবেন। কিন্তু ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি রথীদের বীরত্বের ফলে তা সম্ভব হয় নাই। প্রথম দিন অর্জুন যখন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন কুলুতাধিপতি ক্ষেমধূর্তি রণহস্তীতে আরোহণ করে এসে পাণ্ডব-পাঞ্চাল বাহিনী ত্রাসিত করে দেন, তখন ভীমও একটি রণহস্তীতে আরোহণ করে ক্ষেমধূর্ত্তির সম্মুখীন হন ও বহুক্ষণ ব্যাপী তীব্রযুদ্ধে তাকে বধ করেন। তারপর অশ্বত্থামা ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন, অনেকক্ষণ সমান যুদ্ধ করে ভীম ও অশ্বত্থামা উভয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়েন, তাঁদের সারথিরা তাদের পিছনে নিয়ে যায়। তখন গিরিব্রজের রাজা দণ্ডধার পাণ্ডব-পাঞ্চালবাহিনী বিদ্রাবিত করেন, উপস্থিত পাণ্ডব-পাঞ্চালগণ তার প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হন। সৈন্যদের আর্ত কোলাহল

১। আদিপর্ব, ১।২০২

শুনে অর্জুন এসে তীব্র যুদ্ধে দণ্ডধারকে নিধন করেন, দণ্ডধারের ভ্রাতা দণ্ড ও অর্জুনকে আক্রমণ করে প্রাণ হারান। অর্জুন সংশপ্তকদের শেষ করতে ফিরে যান। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্যোধন বিরথ ও বিপন্ন হ'লে কর্ণ এসে তাকে রক্ষা করেন। সাত্যকি কর্ণকে যুদ্ধে ব্যাপৃত করেন। দুর্যোধন নূতন রথে উঠে ফিরে এলেন, ইতিমধ্যে অর্জুন সংশপ্তক বাহিনী শেষ করে এসে পড়েন, দুর্যোধনের রথের অশ্ব ও সারথি নিধন করেন, তার সাহায্যে অশ্বত্থামা এলে অশ্বত্থামার রথের অশ্ব বধ করে তার ধনুকের জ্যা বার বার কেটে তাকে বিপর্যস্ত করে দিলেন। অর্জুন মূল যুদ্ধক্ষেত্রে আসার পূর্বে অশ্বত্থামা সেদিন বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্যরাজ প্রবীরকে বধ করেন, কিন্তু অর্জুন তাঁর দর্প চূর্ণ করে দিলেন; কৃপ, কৃতবর্মা ও দুঃশাসনকে বাণে বাণে বিক্ষত করে দিলেন। কর্ণ তখন সাত্যকিকে ছেড়ে অর্জুনকে নিবারণ করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সাত্যকি অর্জুন ও অন্যান্য পাণ্ডব পাঞ্চাল রথীদের তীব্র যুদ্ধে কৌরব বাহিনী পিছু হঠ্‌তে বাধ্য হ'ল। ইতিমধ্যে সূর্যাস্ত হলে অবহার ঘোষণা হ'ল, পাণ্ডব পাঞ্চালগণ জয়ধ্বনি করে তাঁদের শিবিরে ফিরলেন।

পরদিন যুদ্ধের পূর্বে কর্ণ শল্যকে নিজের সারথি করে নিতে চাইলেন, দুর্যোধনকে বল্‌লেন, সারথির গুণে অনেক সময় রথী জয়লাভ করে; আমার রথ, অশ্ব,ধনুক অর্জুনের রথ, অশ্ব, ধনুকের থেকে নিকৃষ্ট নয়, আমার বীর্য অর্জুনের থেকে বেশী, কিন্তু অর্জুন যেমন উৎকৃষ্ট সারথি কৃষ্ণকে পেয়েছে, আমার তেমন সারথি নাই, শল্য আমার সারথি হলে আমিও কৃষ্ণের সমকক্ষ সারথি পেয়ে যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাতে পারব। দুর্যোধন মদ্ররাজ শল্যকে কর্ণের সারথি হতে অনুরোধ করলে শল্য নিজেকে অপমানিত মনে করে বল্‌লেন, আমি কর্ণের থেকে রথী হিসাবে কম নই, আমি কেন তার সারথি হব? আপনি আমাকে অপমান করছেন, আমি আপনার পক্ষ ছেড়ে চলে যাব। দুর্যোধন তাকে বোঝালেন, আপনাকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়, কর্ণকে আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ রথীও বলি নাই; কৃষ্ণ রথী শ্রেষ্ঠ হযে ও অর্জুনের সারথি হয়ে তার যুদ্ধে পটুতা বাড়িয়ে দিয়েছেন, আপনি কৃষ্ণের মত বা তার থেকে শ্রেষ্ঠ সারথি, আপনি কর্ণের সারথি হয়ে তার যুদ্ধ-ক্ষমতা বাড়িয়ে দিন। তখন শল্য কর্ণের সারথি হতে সম্মত হলেন, কিন্তু বলে নিলেন যে কর্ণের বা কৌরবপক্ষের উপকারের জন্য মধ্যে মধ্যে আমি কর্ণকে অপ্রিয় কথা বল্‌তে পারি, তাতে কর্ণ বা আপনি রাগ করতে পারবেন না। শল্যের সে কথা কর্ণ ও দুর্যোধন মেনে নিলেন। শল্য কর্ণের,

সারথ্যের ভার নিয়ে তা সুচারুভাবে করেছিলেন সন্দেহ নাই। মহাভারতের বর্তমান রূপে শল্যের সারথ্যের আরম্ভকালে কর্ণ ও শল্যের যে দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদের কথা আছে, তা পরের কালের কবির প্রক্ষেপ।

পরদিন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সপ্তদশ দিন—ঘোরতর যুদ্ধ হ'ল। সেদিনও দিনের প্রথম ভাগে সংশপ্তক বাহিনী অর্জুনকে মূল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে নিয়ে ব্যাপৃত রাখে, আবার অশ্বত্থামা মধ্যে মধ্যে এসে অর্জুনকে আক্রমণ করে; সেদিন অর্জুন প্রথম হতেই তীব্র যুদ্ধ করেন, তবে অশ্বত্থামাকে বার বার বিমুখ করতে এবং সংশপ্তক বাহিনীর মধ্যে এক সুশর্মা ছাড়া বাকী সকলকে বধ করতে তাঁর যথেষ্ট সময় লাগে ও পরিশ্রম হয়। এদিকে কর্ণ যোগ্যতর সারথি পেয়ে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। সঙ্কুল যুদ্ধে কর্ণ ভানুদেব, সেনাবিন্দু প্রভৃতি পাঁচজন পাঞ্চালবীরকে বধ করেন, আবার ভীমসেনের অস্ত্রে কর্ণপুত্র ভানুসেন নিহত হয়। পাণ্ডব পাঞ্চাল সেনা বিচলিত করে কর্ণ যুধিষ্ঠিরের দিকে গেলেন, তার পার্শ্বরক্ষী দুই পাঞ্চালবীরকে বধ করলেন, এবং সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি যুধিষ্ঠিরের সাহায্যে এসে কর্ণকে যুদ্ধে ব্যাপৃত করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও বাণে বাণে যুধিষ্ঠিরের দেহ হতে চর্ম বিচ্যুত করে তাঁকে ক্ষত বিক্ষত করে দিলেন, তার পশ্চাদ্ধাবন করে শুনিয়ে দিলেন, আপনি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের মত বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞ নিয়ে থাকেন, আপনি কেন ক্ষত্রিয়বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন। তারপরে কর্ণ আবার পাণ্ডব-পাঞ্চাল বাহিনী ধ্বংসের দিকে মন দিলেন। যুধিষ্ঠির শ্রুতকীর্তির রথে বসে কর্ণের বীরত্ব দেখ্‌লেন এবং নিজের বাহিনীর রথী ও সৈন্যদের যথাসাধ্য যুদ্ধ করতে উৎসাহ দিতে লাগ্‌লেন।

অন্যদিকে ভীম কৌরববাহিনী বিনাশ করছিলেন। কর্ণ শল্যকে তাঁর রথ ভীমের অভিমুখে নিয়ে যেতে বল্‌লেন। ভীম কর্ণের যুদ্ধে উভয়েই কিছু বাণাহত হলেন, তারপরে ভীমের একটি দৃঢ় নিক্ষিপ্ত বাণ কর্ণের পার্শ্ব ভেদ করায় তিনি অচেতন হয়ে পড়্‌লেন, শল্য তাঁর রথ দূরে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে কর্ণ সংজ্ঞালাভ করে ফিরে এসে পুনঃ ভীমকে আক্রমণ করে তাঁকে বিরথ করে দিলেন। রথ হতে গদাহস্তে নেমে প'ড়ে ভীম কৌরব বাহিনীর কিছু অশ্বারোহী সৈন্য গদাঘাতে বধ করলেন, সেই সৈন্যদের শকুনি ভীমকে বাহনহীন দেখে তাকে আক্রমণ করতে পাঠিয়েছিলেন। তারপর আর একটি অস্ত্রসজ্জিত রথে আরোহণ করে পুনঃ কর্ণের অভিমুখে চল্‌লেন। নিকটে এসে দেখেন যে যুধিষ্ঠির নূতন

একটি রথে এসে কর্ণকে আক্রমণ করতে গিয়ে হতসারথি হয়ে বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। তখন ভীম অবিরল ধারায় বাণ নিক্ষেপ করে কর্ণকে বিব্রত করলেন, কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে ছেড়ে ভীমের দিকে রথ ফিরিয়ে তাকে আক্রমণ করতে বাধ্য হলেন। অবসর পেয়ে যুধিষ্ঠির রণক্ষেত্র ছেড়ে একেবারে শিবিরে চলে গেলেন, সেখানে গিয়ে দেহে লগ্ন বাণ ও শল্য তুলে অঞ্জন প্রলেপ লাগিয়ে শয়ন করলেন। ভীম কর্ণের যুদ্ধ দেখে সাত্যকি এসে ভীমের পার্শ্বরক্ষী হয়ে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। কর্ণের সাহায্যেও কৌরব রথী আসল। এইভাবে সঙ্কুল যুদ্ধ চলতে লাগ্‌ল।

ইতিমধ্যে অর্জুন সংশপ্তক যুদ্ধ শেষ করে মূল যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। তাকে ভীম জানালেন যে যুধিষ্ঠির কর্ণের বাণে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে শিবিরে গিয়েছেন, বেঁচে আছেন কিনা সন্দেহ। অর্জুন বল্‌লেন, আপনি গিয়ে দেখে আসুন। ভীম বল্‌লেন, তুমি যাও, আমি এখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গেলে লোকে বল্‌তে পারে যে আমি কর্ণের ভয়ে চলে গিয়েছি। অর্জুন ও কৃষ্ণ শিবিরে গেলেন, যুধিষ্ঠিরকে শিবিরে শয়ান দেখে অর্জুন তাকে প্রণাম করলেন। যুধিষ্ঠির মনে করলেন, কৃষ্ণ অর্জুন কর্ণবধের পরে তাঁকে সংবাদ জানাতে এসেছেন, তিনি প্রথমেই তাদের কর্ণবধের জন্য প্রশংসা করলেন। অর্জুন বল্‌লেন, কর্ণ-বধ এখনও হয় নাই, আমি সংশপ্তক গণের সঙ্গে যুদ্ধ সেরে মূল যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েই ভীমের কাছে সংবাদ পেলাম যে আপনি কর্ণশরে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, তাই আপনি কেমন আছেন দেখ্‌তে এলাম। কর্ণবধ হয়ে গেছে এই আশ্বাস ভঙ্গ হওয়ায় যুধিষ্ঠির অকস্মাৎ ক্রোধাভিভূত হয়ে পড়লেন, অর্জুনকে বল্‌লেন, ভীরু, তোমার গাণ্ডীব কৃষ্ণকে দাও, তুমি কৃষ্ণের সারথি হয়ে যাও, কৃষ্ণই কর্ণবধ করবে। অর্জুনও ক্রুদ্ধ হয়ে কোষ থেকে অসি নিষ্কাশিত করলেন, কৃষ্ণ বলে উঠ্‌লেন, অর্জুন এখানে তোমার শত্রু কে আছে যে অসি হাতে নিলে? অর্জুন বল্‌লেন, আমার শপথ আছে, আমাকে যে বল্‌বে তোমার গাণ্ডীব অন্যকে দিয়ে দাও, তাকে বধ করব; ধর্মরাজ তোমার সামনেই আমাকে সে কথা বলেছেন। কৃষ্ণ বল্‌লেন, তাই বলে তুমি তোমার শপথ রক্ষা করতে তোমার পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করবে? অকারণে প্রাণী বধ না করা হ'ল ধর্ম, বরং অসত্য বল্‌বে বা সত্যভঙ্গ করবে, কিন্তু অকারণ প্রাণী বধ করবে না। কোন বিশেষ অবস্থায় পড়লে ধর্মপথ কি, তা নিয়ে লোকের বুদ্ধিভ্রংশ হয়; অনেকে বলে যে শ্রুতিতে বা শাস্ত্রেই ধর্ম পথের নির্দেশ আছে,

কিন্তু সব অবস্থার কথা তো শাস্ত্রে থাকতে পারে না, বিচার না করে যে শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে চলে তার প্রায়শঃ ধর্মহানি হয়। আমি তোমাকে ধর্মপথ নির্ণয়ের মানদণ্ড বলে দিই—যা ধারণ করে, তাই ধর্ম, ধর্ম প্রজাকে ধারণ বা রক্ষা করে, যে পথে প্রজা বা মানুষের রক্ষা হয়, সেটাই ধর্মপথ। শাস্ত্রে বলে সত্য রক্ষা ধর্ম, শাস্ত্র বলে প্রাণী বধ না করা ধর্ম, শাস্ত্র বলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃবৎ পূজনীয় গুরু, গুরু যদি আততায়ী হয়ে তোমাকে বধোদ্যত হয়, শুধু তখন সে বধ্য হয়, অন্যথা গুরু বধ মহাপাপ। এখন ধর্মপথ নির্ণয়ের মানদণ্ডে বিচার করে দেখ—তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তোমাকে বধ করতে উদ্যত নন, অতএব তাকে বধ করলে সত্যভঙ্গের অপরাধ হতে তোমার অনেক বেশী অপরাধ, ধর্মহানি, হবে, এখানে তোমার সত্যভঙ্গই শ্রেয়ঃ। অর্জুন বললেন, তোমার কথা বুঝেছি, এখন লোকদৃষ্টিতে আমার যাতে সত্যভঙ্গ না হয়, তার উপায় বল। কৃষ্ণ বললেন, সম্মানযোগ্য পূজনীয় ব্যক্তির পক্ষে অপমান মৃত্যুতুল্য, তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সর্বদা "আপনি" করে বল, তাঁকে "তুমি" বলে একটু নিন্দা কর, সেটাই তাকে বধ করার তুল্য হ'বে। অর্জুন তখন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তুমি যুদ্ধকালে সর্বদা অন্যের দ্বারা রক্ষিত হ'চ্ছ এখন যুদ্ধক্ষেত্র হতে দূরে এসে শুয়ে আছ, শত্রুবধ এখনও হয় নাই বলে আমাকে নিন্দা করবার তোমার কোন অধিকার নাই। এক ভীমসেনই আমাকে শত্রুবধ না করায় কথা শোনাতে পারেন, তিনি প্রথম থেকে ক্লান্তিহীনভাবে কঠিন যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। তোমার অবিবেচনার জন্যই আমাদের এত ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে, তুমি জানতে দ্যূতখেলা অধর্ম, দ্যূতে ছলনা হচ্ছে বুঝেও তুমি দ্যূত খেলায় আসক্ত থেকে সব সম্পদ ও মান নষ্ট করেছ। এইভাবে যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করে অর্জুন আবার অসি তুললেন। কৃষ্ণ প্রশ্ন করায় অর্জুন বললেন, গুরুজনকে বধের তুল্য অপমান করে আমি পাপ করেছি, সেই পাপ ক্ষালন করতে আত্মহত্যা করব। কৃষ্ণ বললেন, আত্মহত্যা আরো বেশী পাপ, তাও তুমি জানো না? অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে গুরুনিন্দার পাপক্ষালন কিভাবে ক'রব? কৃষ্ণ উত্তর দি'লেন, সুধীজন বলেন, আত্ম প্রশংসা আত্মহত্যা তুল্য। তুমি আত্মপ্রশংসা কর, তাতে গ্লানি অনুভব করবে, তাতেই তোমার অপরাধক্ষালন হবে। অর্জুন তখন গাণ্ডীব আস্ফালন করে বললেন, আমার তুল্য ধনুর্বিদ কে আছে, আমি বীর্যে ইন্দ্রের তুল্য, ইত্যাদি। আত্ম প্রশংসা করে গ্লানি অনুভব করে মুখ নীচু করে রইলেন। তখন যুধিষ্ঠির বললেন, আমার জন্যই তোমাদের এত দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে, তুমি

ঠিকই বলেছ, তোমরা ভীমকেই রাজা কর, আমি বনে চলে যাব। এই বলে তিনি শয়ন থেকে উঠে পড়লেন। তাকে হাতে ধরে কৃষ্ণ বোঝালেন, অর্জুন নিজের সত্য পালন নিয়ে সমস্যায় পড়েছিল, সেই সমস্যা দূর করতে তাকে বলেছিলাম আপনার নিন্দা করতেও অর্জুন তাই করেছিল, আমাদের সেই অপরাধ ক্ষমা করুন। অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরের পায়ে প্রণত হয়ে তাকে নিন্দা ও অপমান করবার জন্য ক্ষমা চাইলেন। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে তুলে আলিঙ্গন করলেন। কৃষ্ণকে বল্লেন, তোমার বুদ্ধিতেই আমরা আজ বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হলাম, তুমি চিরদিন এইরূপ আমাদের সহায় থেক। অর্জুনকে বল্লেন, অত্যন্ত শারীরিক ব্যথায় আমার মন বিকল ছিল, তাই তুমি যুদ্ধক্লান্ত হয়েও যখন আমাকে দেখ্‌তে এলে, তখন কঠিন কথা বলেছি, আমাকে ক্ষমা করে মনের সব গ্লানি দূর করে তুমি এখন গিয়ে পূর্ণ শক্তিতে কর্ণের সম্মুখীন হও, তোমারই জয় হবে। অর্জুন ও কৃষ্ণ তখন যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে তাঁদের রথে উঠে যাত্রা করলেন।

পথে যেতে যেতে যুধিষ্ঠিরের গঞ্জনাবাক্য শুনে ও নিজের ব্যবহারের জন্য অর্জুনের মনে যে ক্ষোভ ও লজ্জা দিল, তা সম্পূর্ণ দূর করে দিতে কৃষ্ণ অর্জুনের সঙ্গে মিষ্ট আলাপ করলেন এবং তার বীরত্বের প্রশংসা করলেন, এবং তার বীর্যকে উদ্দীপ্ত করতে কর্ণ দ্যূতসভায় পাণ্ডবদের ও কৃষ্ণাকে যেভাবে অপমান করেছিল, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নিতে উত্তেজিত করলেন। এইভাবে কথা বল্‌তে বল্‌তে কৃষ্ণ দ্রুতবেগে রথ চালিয়ে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন।

রণক্ষেত্রে তখন দুই পক্ষের বীরগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করে চলেছে। পাঞ্চাল বীরদের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণের একপুত্র সুষেণ নিহত হল, তা দেখে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষণ তীব্র সমরে পাঞ্চালসেনা বিদ্রাবিত করতে লাগলেন। ভীম বিপর্যয় দেখে অর্জুনের প্রত্যাগমনের আশা তার সারথিকে জানিয়ে যথাসাধ্য যুদ্ধ করে চললেন। এর মধ্যে তাঁর সারথি বলল, অর্জুন এসে গেছেন, ওই তো গাণ্ডীবের টঙ্কার শোনা যাচ্ছে। অর্জুন ও ভীমের রণক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হল, তারপর দুজনে দুদিকে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। দুঃশাসনকে দেখে ভীম তাকে আক্রমণ করলেন, তাকে বাণাহত পাতিত করে রথ থেকে নেমে গিয়ে দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করলেন, তা দেখে কৌরবগণ ত্রাসিত হয়ে গেল। অন্যদিকে কর্ণ ও অর্জুনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হল। কুরুক্ষেত্রে এই সপ্তদশ দিবসের অপরাহ্ন কালীন যুদ্ধের মত যুদ্ধ আর কখনও দেখা যায় নাই—অন্ততঃ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে হয় নাই—একথা যুদ্ধশেষে

শল্য গিয়ে দুর্যোধনের কাছে বলেছিলেন। কর্ণ ও অর্জুন বহুক্ষণ ধরে পরস্পরকে লক্ষ্য করে নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করেন ও বিপক্ষের অস্ত্র কেটে দেন, রথীর নির্দেশমত সারথিদ্বয় রথ চালান। এইভাবে বহুক্ষণ আশ্চর্য যুদ্ধের পরে অর্জুন জয়ের পথে অগ্রসর হ'লেন, কর্ণের বর্ম বাণাঘাতে কর্ণের দেহচ্যুত হয়ে গেল, এবং বুকে দারুণ শল্যের আঘাতে তিনি হতচেতন হয়ে প'ড়ে গেলেন, আর উঠ্‌লেন না। ছিন্নধ্বজ রথ নিয়ে গিয়ে শল্য দুর্যোধনের কাছে যুদ্ধের বর্ণনা দেন—আশ্চর্য সমান সমান যুদ্ধ বহু দণ্ড ধরে চলছিল, মধ্যে মধ্যে কর্ণ প্রবল হ'ন, মধ্যে মধ্যে অর্জুন প্রবল হ'ন, শেষে যেন দৈবের কৃপায় অর্জুন প্রবল হয়ে উঠে আর দমলেন না, কর্ণকে বর্মহীন কবচহীন করে মৃত্যুবাণ হান্‌লেন। শুনে দুর্যোধন কর্ণের জন্য দুঃখ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন কর্ণ বধের কথা যুধিষ্ঠিরকে গিয়ে জানালে যুধিষ্ঠির রণক্ষেত্রে এসে কর্ণের দেহ দেখে তবে সন্তুষ্ট হ'ন্। তারপর সেদিন অবহার ঘোষিত হয়।

৩৪. শল্য পর্ব ও গদা পর্ব—শল্যের ও দুর্যোধনের পতন

অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধে কৌরব পক্ষে শল্য সেনাপতি হলেন। তিনি যথাসাধ্য যুদ্ধ করে মধ্যাহ্নকালে যুধিষ্ঠির ও ভীমের যুক্ত আক্রমণে নিহত হ'ন। তারপর পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ মহোৎসাহে ধার্তরাষ্ট্রগণের অবশিষ্ট রথী ও সেনা শেষ করে আন্‌লেন। ধার্তরাষ্ট্রগণ পক্ষে যখন শুধু কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা, এই তিনজন রথী অবশিষ্ট, তখন তাঁরা দেখলেন যে দুর্যোধনকে দেখা যায় না। দুর্যোধন যুদ্ধের ফল বুঝে সৈন্যদের যুদ্ধ করতে শেষবার উৎসাহ দিয়ে নিজে দ্বৈপায়ন হ্রদে গিয়ে আত্মগোপন করেন। অশ্বত্থামা, কৃপ, কৃতবর্মা দুর্যোধনের সন্ধানে দ্বৈপায়ন হ্রদের কাছে গিয়ে দুর্যোধনকে দেখতে পান, এবং তার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করেন, ইতিমধ্যে পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি সেদিকে আসছেন দেখে তারা কিছুদূরে গিয়ে বৃক্ষের অন্তরালে আত্মগোপন করেন। যুধিষ্ঠিরের আহ্বানে দুর্যোধন হ্রদ থেকে উঠে এসে বললেন, তুমি সমগ্র রাজ্যের ভার গ্রহণ কর, আমার পক্ষে সব বীর প্রায় নিহত হয়েছে, আমার আর রাজ্যে স্পৃহা নাই। যুধিষ্ঠির বললেন, তোমার দান এইভাবে গ্রহণ করব না, আমরা শান্তির জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম, তুমি যুদ্ধের পথ বেছে নিলে, এখন আর শান্তি হয় না, তুমি যুদ্ধ কর। দুর্যোধন বললেন।তোমরা অস্ত্রসজ্জিত রথে এসেছ, আমার

কাছে শুধু আমার গদা আছে, শিরস্ত্রাণ, কবচ কিছু নাই, আমি কেমন করে যুদ্ধ করব? যুধিষ্ঠির বললেন, তোমাকে কবচ ও শিরস্ত্রাণ দিচ্ছি, তা পরে নিয়ে আমাদের একজনের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তাকে পরাজয় করতে পারলেই তোমার জয় হ'ল ধরা হবে। দুর্যোধন শিরস্ত্রাণ, কবচ ধারণ করে গদা ঘুরিয়ে বললেন, তোমাদের যে খুসী এগিয়ে এস, আমার গদাঘাতে তার প্রাণ দিতে হবে। ভীম গদাহস্তে এগিয়ে গেলেন, ভীম দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, আপনি কি বুদ্ধিতে বলেছিলেন, আমাদের একজনের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তাকে পরাজিত করতে পারলেই তোমার জয় হবে? দুর্যোধন যদি ভীম ছাড়া আর কাউকে বেছে নিত, তা হলে আপনাদের এতদিনের যুদ্ধ বৃথা হয়ে যেত।

ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ অনেকক্ষণ চলেছিল; ভীম অধিক বলবান, কিন্তু দুর্যোধন বহুদিন ধরে গদাযুদ্ধের অভ্যাস করেছিলেন, বলরামের নিকট থেকে গদা প্রহার কালে সঠিক পদক্ষেপ পদ্ধতি শিখেছিলেন। কখনও ভীম আহত হয়ে পড়ে যান, কখনও দুর্যোধন আহত হয়ে পড়ে যান। শেষে ভীম গদা উদ্যত করে ছুটে আসছেন দেখে দুর্যোধন লাফিয়ে উঠে প্রহার এড়াতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এড়াতে পারেন না, গদার আঘাত তাঁর উরুর উপর পড়ে ও উরু ভেঙ্গে যায়। ভীম জয়লাভ করে দুর্যোধনের শিরে পদ দিয়ে আঘাত করেন, তাকে যুধিষ্ঠির নিবৃত্ত করেন, বলেন যে পতিত শত্রুকে সেভাবে অপমান করা অধর্ম। জয়লাভ করে পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও কৃষ্ণ চলে গেলেন।

৩৫. সৌপ্তিক পর্ব : সুপ্ত পাণ্ডব-পাঞ্চালবীরের হত্যা

পাণ্ডবগণ হ্রদের নিকট হতে চলে গেলে কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্মা আবার দুর্যোধনের কাছে এলেন। অশ্বত্থামা প্রস্তাব করলেন, রাত্রিতে পাণ্ডব-পাঞ্চালদের শিবিরে আকস্মিক আক্রমণ করে তাদের শেষ করে দেবেন। দুর্যোধন সেই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে রাত্রি যুদ্ধের জন্য অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে বরণ করলেন।

পাণ্ডবগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে পাঞ্চাল রথীদের দুর্যোধনের পতনের কথা জানালেন। যুদ্ধ শেষের ও জয়লাভের আনন্দে পাঞ্চাল রথীগণ, দ্রৌপদেয়গণ, অন্যান্য রথী ও সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করে শিবিরে ফিরে যথেষ্ট পান ভোজন করে নিদ্রায় ও সুরার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে অচেতন হ'ল। কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও যুযুৎসু কৌরব

শিবিরে প্রবেশ করে দেখলেন যে কোন সমর্থ পুরুষ নাই, কুরুস্ত্রীগণ নপুংসক রক্ষীগণ সহ আছে; দুর্যোধনের শিবিরে রত্নসম্ভার দেখে বিজয়ী হিসাবে পাণ্ডবগণ তা নিয়ে নিলেন, যুযুৎসুর উপর কুরুস্ত্রীগণকে হস্তিনাপুরে পৌঁছে দেবার ভার দেওয়া হ'ল। তারপর পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি কৃষ্ণের কথায় কোন শিবিরে না থেকে সেই রাত্রি ওঘবতী নদীর তীরে কাটিয়ে দিলেন, যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে দেখা করে তাদের দুঃখ ও ক্ষোভ দূর করতে চেষ্টা করলেন, তারপর ফিরে গিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কৃষ্ণের যদি মনে হয়ে থাকে যে পাণ্ডব-পাঞ্চাল শিবিরে রাত্রে আকস্মিক আক্রমণ হতে পারে, তবে ধৃষ্টদ্যুম্নাদিকে সাবধান করে দেন নাই কেন, তার কোন কারণ মহাভারত কাহিনীতে নাই। বিকল্পে অনুমান করা যায় যে যুদ্ধে জয়লাভ পূর্ণ হলে পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ ও সাত্যকিসহ হস্তিনাপুরে চলে গিয়েছিলেন, গিয়ে যুধিষ্ঠির শুধু কৃষ্ণকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রাসাদে প্রেরণ করলেন এই কথা জানাতে যে পাণ্ডবগণ এসে প্রাসাদ অধিকার করবেন, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সেখানে আশ্রিত গুরুজন হিসাবে থাকতে পারবেন।

অশ্বত্থামা কৃপ ও কৃতবর্মাকে নিয়ে রাত্রিতে অতর্কিতভাবে নিদ্রিত ও সুরায় অচেতন পাণ্ডব পাঞ্চাল রথী ও সৈন্য আক্রমণ করতে গেলেন; কৃপ এভাবে আক্রমণে প্রথমে সম্মত হ'ন নাই, অবশেষে স্থির হ'ল যে অশ্বত্থামা শিবিরে প্রবেশ করে রথী ও সৈন্যদের বধ করবে, কেহ শিবির থেকে পলায়ন করতে চেষ্টা করলে কৃপ ও কৃতবর্মা শিবিরের বাইরে তাদের বধ করবেন। শিবিরের তিনদিকে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সেই আগুনের আলোতে ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীপুত্রগণ ও আরো অনেককে অশ্বত্থামা বধ করে, যে রথী বা সৈনিক শিবিরের বাইরে যায়, তাকে কৃপ বা কৃতবর্মা বধ করেন, এইভাবে শিবিরস্থ প্রায় সকল রথী ও সৈনিক নিহত হ'ল, কয়েকজন মাত্র পলায়ন করতে সমর্থ হ'ল। এই নিশীথ অভিযান শেষ করে তিন রথী হ্রদের তীরে দুর্যোধনের কাছে সংবাদ দিলেন যে পাণ্ডব-পাঞ্চাল শিবিরে আর কেহ অবশিষ্ট নাই, তা শুনে আনন্দ প্রকাশ করে দুর্যোধন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি শিবির হতে পালাতে পেরেছিল, সে গিয়ে পাণ্ডবদের সংবাদ দিল। পাণ্ডবগণ দ্রুত শিবিরে ফিরে হত্যাকাণ্ড দেখলেন। দ্রৌপদীপুত্রগণকে নিহত দেখে যুধিষ্ঠির নকুলকে উপপ্লব্যে গিয়ে দ্রৌপদীকে নিয়ে আসতে বললেন।

তারপরে ভীম, অর্জুন প্রভৃতি অশ্বত্থামার মণি নিয়ে ফিরে এলেন। দ্রৌপদী উপবাস করে এক ভাবে বসে ছিলেন, যুধিষ্ঠিরের ইঙ্গিতে ভীম মণিটি নিয়ে দ্রৌপদীর নিকট গিয়ে মণিটি দিয়ে বললেন, অশ্বত্থামাকে পরাজিত করে তার সব সম্মান নষ্ট করে তার শিরোমণি আহরণ করে এনেছি, ব্রাহ্মণ বলে তাকে বধ করতে আমরা বিরত হয়েছি। দ্রৌপদী বললেন, গুরুপুত্রকে বধ করা হয় নাই, ভালই হয়েছে; তার সম্মান নষ্ট হয়েছে, পরাজিত হয়ে শিরোমণি হারিয়েছে, তাই যথেষ্ট। তাতেই আমার শান্তি হয়েছে।

৩৬. স্ত্রীপর্ব—স্ত্রীগণের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন : মৃত বীরগণের উদক-ক্রিয়া

যুদ্ধশেষের সংবাদ পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুরুকুলস্ত্রীগণ ও কুন্তী যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ অগ্রসর হয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করেন। পাণ্ডবগণ একে একে অগ্রসর হয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করলেন; ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে বাহুমধ্যে নিষ্পিষ্ট করতে উদ্যত বুঝে কৃষ্ণ ভীমকে সরিয়ে নিলেন, বললেন যে আপনার ও দুর্যোধনের অপরাধেই এই ক্ষত্রিয়নাশক যুদ্ধ হ'ল, এখন ভীমকে বধ করলেও আপনার পুত্রগণ প্রাণ ফিরে পাবে না, আপনি নিজের মনকে শান্ত করুন।

দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, বিরাট ও পাঞ্চালকুলের নারীগণও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। নারীগণ স্বীয় পতি পুত্রের দেহ অনুসন্ধান করে যারা পেলেন, তারা মৃতদেহ আলিঙ্গন করে ক্রন্দন ও বিলাপ করলেন, যারা পেলেন না তারাও অবসন্ন হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের আদেশে সমস্ত মৃতদেহের সৎকার করা হ'ল, এবং মৃতদের উদ্দেশ্যে উদক ক্রিয়া বা জল দান করা হ'ল। কর্ণের উদক ক্রিয়া করবার সময় কুন্তী পাণ্ডবদের কাছে কর্ণের পরিচয় দিলেন ও কর্ণের উদ্দেশ্যে তাদের উদক ক্রিয়া করতে বললেন। না জেনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করার জন্য যুধিষ্ঠির অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে কুন্তী এই সংবাদ যে পূর্বে জানান নাই সে জন্য অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

৩৭. শান্তিপর্ব—যুধিষ্ঠিরের গ্লানিভাব দূরীকরণ ও রাজ্যে অভিষেক

উদক ক্রিয়া সমাপনের পরে গঙ্গাতীরে মৃতদের শ্রাদ্ধ কার্য করা হ'ল। শ্রাদ্ধ কার্য শেষ হয়ে গেলে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে গুরু ও জ্ঞাতিবধের পাপবোধে অত্যন্ত পীড়িত হ'য়ে রাজ্য ভোগ না করে বনে গিয়ে তপস্যা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণা তাঁকে অনেক বুঝালেন, অর্জুন যুদ্ধকালে গুরুভক্তিতে, পিতামহ ও জ্ঞাতিদের প্রতি স্নেহে, অনেক সময় পূর্ণ বিক্রমে যুদ্ধ করেন নাই। তিনিও বললেন যে রাজ্যের কল্যাণার্থে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে বধ করে, তাতে বিচলিত হলে চলে না. কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মনের অশান্তি তাতে দূর হ'ল না। শেষে ব্যাস বললেন, তোমরা রাজ্য জয় করেছ, এখন রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন না করলে তোমার স্বধর্মচ্যুতির অপরাধ হবে, জ্ঞাতিবধের জন্য যে-পাপবোধ, তা দূর করতে অশ্বমেধ যজ্ঞ কর, তাতে মন শুদ্ধ হয়ে যাবে। কৃষ্ণ বললেন, মৃত্যু সবারই হয়, গুরু বা জ্ঞাতির মৃত্যুর জন্য শোক করে কোন ফল নাই; তাছাড়া আপনি ন্যায়ের পথে রাজ্য ফিরে পাবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন, তা যখন হ'ল না, তখন যুদ্ধ না করলে আপনাদের স্বধর্মপালন হ'ত না জ্ঞাতিবধের জন্য দায়িত্ব আপনার সে কথা কেন মনে করছেন? ব্যাস ঠিকই বলেছেন, এখন আপনার কর্তব্য রাজ্যের ভার নিয়ে পতিপুত্রহারা নারীদের জন্য সুব্যবস্থা করা, রাজ্য সুশাসন করা; আর ইচ্ছা করলে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে মন শান্ত করতে পারেন। যুধিষ্ঠির অবশেষে সকলের কথায় মন শান্ত করে অভিষেকের জন্য প্রস্তুত হ'লেন। যথা নিয়মে শোভাযাত্রা করে সকলে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। যুধিষ্ঠিরকে ষোড়শ-বৃষভবাহিত শকটে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। অভিষেক কালে ধৌম্য যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিলে পরে কৃষ্ণ নিজের পাঞ্চজন্য শঙ্খে পূত বারি নিয়ে তা ঢেলে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর অভিষেক করলেন। উপস্থিত প্রজাগণ যুধিষ্ঠিরের অভিষেকে খুব আনন্দ প্রকাশ করল। দুর্যোধনের একজন বন্ধু চার্বাক ব্রাহ্মণবেশে যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞাতিবধ করে রাজ্য লাভ করার জন্য নিন্দা করে বলল, সমস্ত উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের সেই মত। উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ বললেন, আমরা কখনও সে মত প্রকাশ করি নাই, এই বলে তাঁরা সভাগৃহ হতে চার্বাককে বহিষ্কৃত করে দিলেন। যুধিষ্ঠির প্রজাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বললেন,

তাঁরা যেন বৃদ্ধ পুত্রশোকার্ত ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি অসম্মান না দেখান। তারপর যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করলেন, অর্জুনকে রাজ্য রক্ষার ভার দিলেন, বিদুরকে অর্থমন্ত্রী করলেন, সঞ্জয়ের উপর সেনাবাহিনীর হিসাব রক্ষা ও বেতন দানের ভার দিলেন, ধৌম্যকে দেবকার্য সম্পাদনের ভার দিলেন, নকুলকে দেবকর্মের আয়োজক ও পরিদর্শক করলেন, সহদেবকে ভার দিলেন সে রাজার পার্শ্বচর ও রক্ষীর কাজ করবে। অন্যান্য পদে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করলেন; তারপর প্রজাদের বিদায় দিলেন।

প্রজারা বিদায় নিয়ে গেলে যুধিষ্ঠির ভীমকে দুর্যোধনের প্রাসাদ দান করলেন, অর্জুনকে দুঃশাসনের প্রাসাদ দান করলেন, নকুলকে দুর্মর্ষণের গৃহ এবং সহদেবকে দুর্মুখের গৃহ দিলেন। তারপর পতি পুত্রহীন কুরুস্ত্রীদের ও স্বপক্ষীয় দুঃস্থ স্ত্রীগণের যথাযোগ্য আবাসের ও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করলেন। তারপর সভাভঙ্গ হ'ল।

সভাভঙ্গের পরে কৃষ্ণ ও সাত্যকি অর্জুনের গৃহে গেলেন, সেখানে স্নানাহার করে বিশ্রাম নিলেন। যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে একদিন কৃষ্ণ ও অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থ ঘুরে এলেন, ময়দানব কল্পিত ও গঠিত অপূর্ব সভাগৃহ দেখলেন, খাণ্ডবপ্রস্থে যেখানে তাঁরা অরণ্য দগ্ধ করেছিলেন, সেখানে বিস্তীর্ণ জনপদ দেখলেন। তারা সারাদিন নানা কথায় সময় কাটিয়ে ফিরলেন, ফিরে এসে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়ে বিদায় প্রার্থনা করলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, তোমার কাছে আমার ঋণের শেষ নাই, তোমার বুদ্ধিতেই আমাদের রাজ্য উদ্ধার হয়েছে। তোমাকে বিদায় দিতে মন চায় না, কিন্তু তুমি বহুদিন তোমার পিতামাতা জ্ঞাতি মহিষীগণ থেকে দূরে আছ, তোমাকে আর আটকে রাখতে পারি না। সুভদ্রা কৃষ্ণের সঙ্গে পিতৃ-মাতৃ দর্শনে গেলেন, কৃষ্ণ সুভদ্রাকে নিয়ে উত্তরার প্রসবকালের পূর্বেই ফিরবেন স্থির হল। তারপর কৃষ্ণ ও সাত্যকি সুভদ্রাকে নিয়ে দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করলেন, যুধিষ্ঠিরাদি বহুদূর পর্যন্ত তাদের অনুগমন করে সম্মান দেখালেন।[১]

১। শেষ অনুচ্ছেদের অধিকাংশ কথা আশ্বমেধিক পর্বে আছে, কিন্তু কৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রাতেই ভারত-কাহিনীর এই অংশের স্বাভাবিক ছেদ। শান্তিপর্ব ভুক্ত ভীষ্ম কর্তৃক কৃষ্ণের পরমাত্মা ভগবান রূপে স্তব (ভীষ্ম-স্তব-রাজ), ভীষ্ম কর্তৃক শরশয্যায় রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও মোক্ষধর্ম কথন, ও সমগ্র অনুশাসন পর্ব পরের কালের যোজনা হিসাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রথম খণ্ড, ১৭ অনুচ্ছেদ, তৃতীয় খণ্ড, ১৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩৮. আশ্বমেধিক পর্ব—পরিক্ষিতের জন্ম ও অশ্বমেধ যজ্ঞ

কৃষ্ণ হস্তিনাপুর থেকে দ্বারকায় ফিরে এসে তাঁর পিতা বসুদেবের প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে সংক্ষেপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ শোনালেন। প্রথমে তিনি অভিমন্যু বধের কথা বাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু সুভদ্রার অনুরোধে সে বৃত্তান্তও বললেন, আর বললেন যে অভিমন্যুকে কৌরবপক্ষের কোন মহারথ একক পরাজিত করতে পারে নাই, পারতোও না; তারা ছয়জন যুগপৎ আক্রমণ করে অভিমন্যুর রথের অশ্ব নিধন করে, তার ধনুর জ্যা বার বার কেটে দেয়, সব অস্ত্র শেষ হলে অভিমন্যু ক্লান্ত দেহে গদাযুদ্ধে দুঃশাসন পুত্রের হস্তে প্রাণ দেয়। বসুদেব বললেন, আমার বীর দৌহিত্রের জন্য এখানেও ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর। বসুদেবের ইচ্ছামত অভিমন্যুর আত্মার কল্যাণের জন্য শ্রাদ্ধাদি কার্য দ্বারকাতেও অনুষ্ঠিত হল।

এদিকে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংকল্প করে যজ্ঞের ব্যয় ও দক্ষিণার জন্য বিত্ত কোথা হতে সংগ্রহ করা যায় চিন্তা করতে লাগলেন। ভারতের অধিকাংশ রাজা তাদের কোষ শূন্য করে সৈন্যবাহিনী সাজিয়ে নিয়ে একপক্ষে বা অন্যপক্ষে যোগ দিয়েছিল, তাদের মৃত্যুর পরে তাদের পুত্র বা পৌত্রগণ শূন্যকোষ রাজসিংহাসনে বসেছে, তাদের কাছ থেকে কর হিসাবে যজ্ঞের ব্যয় আদায় করার চেষ্টা করা অন্যায় হবে, এই কথা ভেবেই যুধিষ্ঠির কর্তব্য স্থির করতে পারছেন না, এমন কালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস উপস্থিত হলে তাকে যুধিষ্ঠির সমস্যাটির কথা বললেন। ব্যাস বললেন, বিত্ত সংগ্রহের উপায় আমি বলে দিচ্ছি, শূন্যকোষ বালক রাজাদের নিকট হতে কোন কর তোমার নিতে হবে না। বহু বৎসর পূর্বে মরুত্ত নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর রাজধানী ছিল হিমালয় পর্বতশ্রেণীর মধ্যে মুঞ্জবান্ পর্বতে; তিনি একবার সাড়ম্বরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন, যজ্ঞের ও দক্ষিণার জন্য এত বেশী স্বর্ণপাত্র নির্মাণ করেছিলেন যে তার বহু সংখ্যক উদ্বৃত্ত থেকে যায়; কালে সেগুলি ভূপ্রোথিত হয়ে যায়। মুঞ্জবান পর্বতে গিয়ে মরুত্তের যজ্ঞস্থল অনুসন্ধান করে নিয়ে সেখানে খনন করলে বহু স্বর্ণপাত্র পাওয়া যাবে, আমি মনে করি যে তাতেই তোমার যজ্ঞের ব্যয় ও দক্ষিণার কাজ হয়ে যাবে। তবে খনন করে সেগুলি সংগ্রহের পূর্বে রুদ্র ও কুবেরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে বলি দিতে হবে। যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুনকে তাদের মত জিজ্ঞাসা করলে তারা মুঞ্জবান্ পর্বত থেকে মরুত্তের উদ্বৃত্ত স্বর্ণ-সম্ভার সংগ্রহের পক্ষে মত দিলেন।

তারপর শুভদিন স্থির করে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ক'রে যুযুৎসুর উপর রাজ্যভার দয়ে পঞ্চপাণ্ডব অনুচর ও খনকসহ হিমালয় পর্বতমালাস্থিত মুঞ্জবান্ পর্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছে যজ্ঞ করে রুদ্র ও কুবেরের উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করলেন। তারপর মরুত্ত রাজার যজ্ঞস্থল সন্ধান করে নিয়ে সেখানে খনকদের নিযুক্ত করলেন। খনন করে বহু সহস্র স্বর্ণ পাত্র-পাওয়া গেল, বহু উষ্ট্র, বৃষভ ও গর্দভ পৃষ্ঠে সেগুলি বোঝা বেঁধে চাপিয়ে হস্তিনাপুরে আনা হ'ল। যা পাওয়া গেল, তাতে স্বচ্ছলভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যয় নির্বাহ ও প্রচুর দক্ষিণাদান সম্ভব হ'ল, কর আদায় করবার কোন প্রয়োজন রইল না।

পাণ্ডবগণ যে সময় স্বর্ণসম্ভার নিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরলেন, প্রায় তার সমকালে উত্তরার প্রসবকাল আসন্ন জেনে কৃষ্ণ সুভদ্রাকে ও কয়েকজন বৃষ্ণিবীরকে সঙ্গে নিয়ে হস্তিনাপুরে এলেন। প্রসবকাল এলে উত্তরা একটি মৃত বা মৃতপ্রায় পুত্র প্রসব করল, কুন্তী ও সুভদ্রা শিশুর দেহে প্রাণসঞ্চারের জন্য কৃষ্ণের শরণ নিলেন। কৃষ্ণ প্রসব গৃহে গিয়ে শিশুটিকে হাতে নিয়ে তুলে ধরে তার মুখের উপর সজোরে ফুৎকার দিলেন, আরো কি সব করলেন, ফলে শিশুটির শ্বাসক্রিয়া আরম্ভ হল ও শিশুটি কেঁদে উঠল। উত্তরা শিশুটিকে কোলে নিয়ে কৃষ্ণকে প্রণাম করল। কৃষ্ণ শিশুটির নাম দিলেন পরিক্ষিৎ, কারণ কুরুকুল পরিক্ষীণ হয়ে এলে তার জন্ম হল।

তারপর শুভদিনে যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে অশ্ব উৎসর্গ করে এক বৎসর অশ্বসহ পরিক্রমা কালে অশ্ব রক্ষণের ভার অর্জুনের উপর দিলেন। যজ্ঞ একবৎসর অশ্ব পরিক্রমার পরে হবে, তাই কৃষ্ণ অন্য বৃষ্ণিবীরগণ সহ দ্বারকায় ফিরে গেলেন। অর্জুন অশ্বসহ পরিক্রমা আরম্ভ করলেন। যুধিষ্ঠির বলে দিলেন, যজ্ঞাশ্ব যারা আটক করে, সম্ভব হলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে তাদের যজ্ঞে আসতে বলবে ও অশ্বমুক্ত করে দিতে বলবে; তা সম্ভব না হলে মৃদুযুদ্ধ করে প্রতিপক্ষ রাজাকে পরাজিত করবে, নিধন করবে না। কুরুক্ষেত্রে বহু রাজার নিধন হয়ে গেছে, তাই এই নির্দেশ।

অর্জুন অশ্ব অনুসরণ করে প্রথমে ত্রিগর্ত রাজ্যে এলেন; ত্রিগর্ত পাঞ্জাবের লুধিয়ানা, পাতিয়ালা জেলা ও রাজস্থানের উত্তরাংশ নিয়ে স্থিত ছিল। সুশর্মার পুত্র সূর্যবর্মা সেখানে তখন রাজা, অশ্ব আটক করে অর্জুনের হস্তে পিতা সুশর্মার মৃত্যু স্মরণ করে সে মিষ্ট কথায় অশ্ব ছেড়ে দিল না; যুদ্ধে সূর্যবর্মা ও তার ভ্রাতা

কেতুবর্মা সহজেই পরাজিত হল, তবে সুশর্মার এক পৌত্র ধৃতবর্মা তীব্র যুদ্ধে অর্জুনের হস্তে বাণ-প্রহারে একবার গাণ্ডীবধনু অর্জুনের হস্তচ্যুত করে, তার পরে অর্জুন তীব্র যুদ্ধে তাকে পরাজিত করেন। সেই সঙ্গে বেশ কিছু ত্রিগর্ত সেনা নিহত হয়; তারপরে ত্রিগর্তরাজ পরাজয় স্বীকার করে অশ্বমুক্ত করে দেয়, যুধিষ্ঠিরের চক্রবর্তিত্ব স্বীকার করে নেয়।

সেখান থেকে উত্তরে গিয়ে অশ্ব প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হ'ল। এই রাজ্য সম্ভবতঃ বর্তমান হিমাচল প্রদেশের পূর্বাংশ। সেখানে ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্ত রাজ অশ্ব আটক করে, মিষ্ট কথায় কোন কাজ হয় না। তিনদিন অর্জুনের সঙ্গে তীব্র যুদ্ধ করে চতুর্থদিনে সে পরাজয় স্বীকার করে। অর্জুন বললেন, যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞামত আমি রাজাদের বধ করছি না, তুমি যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে আগামী চৈত্র পূর্ণিমায় উপস্থিত হবে।

সেখান থেকে অশ্ব ইচ্ছামত ভ্রমণ করে সিন্ধু সৌবীর দেশে উপস্থিত হ'ল। জয়দ্রথের পুত্র অর্জুনের সসৈন্য আগমন বার্তা পেয়ে অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু জয়দ্রথের সেনানীগণ অশ্ব আটক করে মিষ্ট কথায় ছেড়ে না দিয়ে তীব্র যুদ্ধ করে একবার অর্জুনকে বিসংজ্ঞ করে দেয়। অর্জুন অল্পক্ষণের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করে তীব্র যুদ্ধে সিন্ধু সৌবীর সেনানী ও সৈন্যদের মধ্যে অনেককে বধ করেন, তারপরে তারা পরাজয় স্বীকার করে। দুঃশলা এসে তার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ দেয়, পৌত্রকে কোলে করে নিয়ে আসে। অর্জুন দুঃশলাকে আলিঙ্গন করে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে স্বগৃহে পাঠিয়ে দেন।

তারপর অশ্ব ভ্রমণ করতে করতে মণিপুর রাজ্যে উপস্থিত হয়, এই মণিপুর বর্তমানকালে মণিপুর নামে পরিচিত দেশ নয়, এই মণিপুর গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বারের নিকট অবস্থিত ছিল অনুমান করা যায়। অর্জুন অশ্বরক্ষী হয়ে এসেছেন জেনে বভ্রুবাহন পিতার নিকট বিনীতভাবে অশ্ব নিয়ে উপস্থিত হয়। অর্জুন যুধিষ্ঠিরের উপদেশ ভুলে তাকে তিরস্কার করে বীরের মত ব্যবহার করতে বলেন। বভ্রুবাহন বিমনা হয়ে ফিরে গেলে উলূপী সংবাদ জেনে তাকে বীরের মত যুদ্ধ করতে বলেন। বভ্রুবাহন তখন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়ে এল। অর্জুন ভূমিতে দাঁড়িয়েই রথস্থ বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন, বভ্রুবাহনের রথের ধ্বজদণ্ড পাতিত ও অশ্ব নিহত করলেন, বভ্রুবাহনের প্রতি কয়েকটি নারাচ বা লৌহময় বাণ নিক্ষেপ করলে বভ্রুবাহন তা অর্দ্ধপথেই কেটে দিল। পুত্রের বীরত্ব দেখে খুসী হয়ে অর্জুন তার সঙ্গে মৃদুযুদ্ধ

করছিলেন, সেই সুযোগে বভ্রুবাহন অর্জুনের বুকে একটি তীক্ষ্ণ শর দিয়ে আঘাত করল, ফলে অর্জুন সংজ্ঞা শূন্য হয়ে পড়ে গেলেন। বভ্রুবাহনও দেহের নানাস্থানে আঘাত পেয়েছিল, সেও মূর্চ্ছিত হল। তবে সে চেতনা প্রাপ্ত হয়ে পিতার অবস্থা দেখে তাকে মৃত মনে করে বিলাপ করতে আরম্ভ করল। তখন উলূপী এসে অর্জুনের কবচ খুলে নিয়ে সঞ্জীবনী মণি বুক স্পর্শ করলেন, অর্থাৎ কোন বিশল্যকরণী ভেষজ লাগিয়ে দিলেন, তার ফলে অর্জুন অল্পকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করলেন। সংজ্ঞা লাভ করে তিনি বভ্রুবাহনের বীরত্বের খুব প্রশংসা করে তাকে তার মাকে নিয়ে আগামী চৈত্র পূর্ণিমার হস্তিনাপুরে অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হতে বললেন।

সেখান থেকে অশ্ব মগধরাজ্যে উপস্থিত হ'ল। জরাসন্ধের পৌত্র মেঘসন্ধি অর্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করল। অর্জুন প্রথমে মেঘসন্ধির নিক্ষিপ্ত অস্ত্র কাটতে লাগলেন, মেঘসন্ধিকে বা তার সারথিকে বা রথের অশ্ব লক্ষ্য করে বাণ ছুড়লেন না। মেঘসন্ধি মনে করল যে স্ববীর্যে রক্ষা পাচ্ছে, সে উৎফুল্ল হয়ে অর্জুনকে লক্ষ্য করে তীব্রবেগে বাণ বর্ষণ আরম্ভ করল। তখন অর্জুন মেঘসন্ধির রথের অশ্ব ও সারথিকে বধ করলেন, মেঘসন্ধির ধনুর জ্যা ও কেটে দিলেন। মেঘসন্ধি গদাহস্তে অগ্রসর হল, অর্জুন সেই গদাও নারাচ দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। তারপর তাকে ডেকে বললেন, তুমি যথেষ্ট বীর্য দেখিয়েছ, এবার ক্ষান্ত হও, রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশ স্মরণ করে তোমাকে বধ করি নাই। তুমি যুধিষ্ঠিরের চক্রবর্তিত্ব স্বীকার করে আগামী চৈত্র পূর্ণিমায় তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে হস্তিনাপুর যেও।

তারপরে পথে বঙ্গ ও পুণ্ড্রদেশ হয়ে সেখানে জয়লাভ করে অশ্বের অনুসরণ করে অর্জুন চেদিরাজ্যে উপস্থিত হলেন। শিশুপাল পুত্র শরভ মৃদুযুদ্ধ করে তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিল। সেখান থেকে কাশী, অঙ্গরাজ্য, কিরাতদেশ ও তঙ্গন দেশের মধ্য দিয়ে অশ্বকে অনুসরণ করে চললেন, এইসব দেশে নৃপতিগণ কোন বাধা না দিয়ে অর্জুনকে অভ্যর্থনা করে, অর্জুন তাদের চৈত্র সংক্রান্তিতে অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হতে বলেন। সেখান থেকে অশ্ব দশার্ণ রাজ্যে (পূর্ব মালব, রাজধানী বিদিশা) প্রবেশ করে, দশার্ণরাজ চিত্রাঙ্গদ অশ্ব রুদ্ধ করে, কিন্তু সহজেই পরাজয় স্বীকার করে। সেখান থেকে অশ্বগতি অনুসরণ করে নিষাদ রাজ্যে গেলেন, সেখানে একলব্যের পুত্র অশ্ব রুদ্ধ করে তীব্র যুদ্ধ করে, অবশেষে পরাজয় স্বীকার করে অর্জুনকে উপহার দিয়ে অর্চনা করে। সেখান থেকে সমুদ্র তীর দিয়ে

দক্ষিণে গেলেন, দ্রাবিড়, অন্ধ্র, মাহিতক ও কোলগিরি রাজ্যের মধ্য দিয়ে অশ্ব অনুসরণ করে যান, মধ্যে মধ্যে সামান্য যুদ্ধ করতে হয়, মধ্যে মধ্যে বিনা যুদ্ধে অভ্যর্থিত হন; তারপর সৌরাষ্ট্র দেশে প্রভাস পার হয়ে দ্বারকায় গেলে যাদব কুমারগণ অশ্ব অবরুদ্ধ করে, কিন্তু যাদবনেতাদের আদেশে বিনা যুদ্ধে মুক্ত করে দেয়। অর্জুন বসুদেব ও অন্য যাদব বৃদ্ধদের প্রণাম জানিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হতে আমন্ত্রণ করেন। তারপরে পঞ্চনদ হয়ে গান্ধার যান। সেখানে শকুনির পুত্র তখন রাজা ছিল, তার যোদ্ধাগণ যজ্ঞীয় অশ্ব আটক করে, তাদের মিষ্ট কথা বললে তারা উপেক্ষা করে যুদ্ধ আরম্ভ করে, তাদের অনেককে বধ করলে শকুনি পুত্র স্বয়ং যুদ্ধে আসে। অর্জুন তাকে ডেকে বলেন, যুধিষ্ঠিরের আদেশে আমি কোন রাজাকে বধ করব না, তুমিও নিবৃত্ত হও, যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে প্রীতমনে উপস্থিত হবে। সে কথায় কাণ না দিয়ে শকুনি পুত্র যুদ্ধ আরম্ভ করল, অর্জুন অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার শিরস্ত্রাণ শিরচ্যুত করে দূরে নিক্ষেপ করলেন, তা দেখে শকুনির সেনানীরা অবাক হয়ে বলল, ইচ্ছা করলেই শকুনি পুত্রের শির অর্জুন কেটে দিতে পারতেন। কিন্তু শকুনি পুত্র পরাজয় স্বীকার না ক'রে সেনানীদের পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিল, সম্মুখের সেনানীদের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ চলল, তাদের অনেককে অর্জুন বধ করলেন। তারপরে শকুনি পুত্রের মাতা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে তার পুত্রকে যুদ্ধ হতে নিবারণ করে, অর্জুনকেও মিষ্ট কথা বলে প্রীত করে। অর্জুন শকুনি পুত্রকে বলেন, তোমার অবিমৃশ্যকারিতার জন্য আমার এত বীর সেনানী বধ করতে হয়েছে, যাক এখন যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট মেনে চৈত্র পূর্ণিমায় তার যজ্ঞে উপস্থিত হবে।[১]

সেখান থেকে অশ্ব নিয়ে অর্জুন হস্তিনাপুরে ফিরলেন। মাঘের পূর্ণিমা থেকে যজ্ঞবাট নির্বাচন, যজ্ঞ সম্ভার সংগ্রহ, ইত্যাদি কার্য আরম্ভ হ'ল। আমন্ত্রিত রাজগণের জন্য আবাস প্রস্তুত হ'ল। চৈত্রমাস আরম্ভ হতে কৃষ্ণ, বলরাম, অন্য বৃষ্ণিবীরগণ, ও নানা দেশের রাজা উপস্থিত হতে লাগলেন, তাদের যথাযোগ্য আবাস ও আতিথ্য দেওয়া হ'ল। বভ্রুবাহনও এল, এবং কুন্তী প্রভৃতির যথেষ্ট আদর পেল। যথা নিয়মে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'ল, যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কোন বাধার সৃষ্টি হয় নাই। যজ্ঞশেষে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী অবভৃত স্নান করলেন।

১। গান্ধার তখন শকুনি পুত্রের রাজত্ব ছিল, না নগ্নজিৎ পুত্রের রাজত্ব সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। প্রমাণ মহাভারতে শকুনি পুত্রের কথাই আছে।

তারপর কৃষ্ণ, বলরাম ও বৃষ্ণিবীরগণ দ্বারকায় ফিরে গেলেন, অন্যান্য রাজগণও যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে সম্মানিত হয়ে স্বদেশে ফিরলেন।

৩৯. আশ্রমবাসিক পর্ব—অরণ্য আশ্রমে ধৃতরাষ্ট্রাদি সহ পাণ্ডবগণের মাসাধিক বাস

অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ক'রে যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সাহায্যে নির্বিঘ্নে রাজ্য শাসন করতে থাকলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ছত্রিশ বৎসর এইভাবে তিনি রাজ্য শাসন করেন। ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারীর প্রতি তিনি যথেষ্ট সম্মান দেখাতেন, তাদের জন্য মূল্যবান শয্যা, আসন, বস্ত্র, ভোজ্য ইত্যাদি প্রেরণ করতেন। ধৃতরাষ্ট্র যাতে নিজের জীবন নিরর্থক ও মর্যাদাহীন মনে না করেন, সেইজন্য রাজ্য শাসন সম্পর্কেও ধৃতরাষ্ট্র সহ পরামর্শ করতেন। তাঁর নির্দেশে সকলেই ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সম্মান দিত, ভীম শুধু অন্তরাল থেকে তাদের মধ্যে মধ্যে শোনাতেন যে পাপকর্মকারী দুর্যোধন দুঃশাসনাদি তাঁর বাহুবলে শাস্তি পেয়েছে। পঞ্চদশ বৎসর যুধিষ্ঠির সহ রাজপ্রাসাদে এইভাবে বাস করে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী অরণ্যে গিয়ে তপস্যা করবার ইচ্ছা জানালেন তার পূর্বে নিজ পুত্রগণের এবং দ্রোণ, কর্ণ, ভীষ্ম প্রভৃতির উদ্দেশ্যে দান ও শ্রাদ্ধ করবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ চাইলেন। ভীম বললেন, তাদের শ্রাদ্ধ আমরা যথারীতি সম্পাদন করেছি, বাৎসরিক শ্রাদ্ধাদিও করা হচ্ছে, ধৃতরাষ্ট্রের পৃথক ভাবে বহু দান করে শ্রাদ্ধ করবার কি প্রয়োজন? যুধিষ্ঠির তখন অর্জুনকে বললেন, দুর্যোধন দুঃশাসনাদির কৃত অপমান এখনও ভীমের মর্মে বিঁধে আছে, তার কাছ থেকে অর্থ না নিয়ে তুমি ও আমি আমাদের পৃথক পৃথক কোষ হতে ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনা মত অর্থ দিই। তাতে অর্জুন সম্মত হ'লেন, তাঁদের দুজনের কোষ থেকেই ধৃতরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হ'ল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁর ইচ্ছামত শ্রাদ্ধ কার্যাদি ও বহু দান করলেন। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর অরণ্যে তপস্যা করবার প্রস্তাবে যুধিষ্ঠির প্রথমে আপত্তি তুলেছিলেন, কিন্তু একদিন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এসে বললেন, ওদের অরণ্যে তপস্যা করবার সময় এসেছে, তুমি ওদের যেতে দাও: সময় হলে আমি আমার মাতা সত্যবতীকেও বনে গিয়ে তপস্যা করতে বলেছিলাম, তিনি ধৃতরাষ্ট্র জননী অম্বিকা এবং পাণ্ডু জননী অম্বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে বনে

তপস্যা করতে যান। তারপর যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর বনে তপস্যার জন্য গমনের প্রস্তাবে আর আপত্তি তুললেন না। কিন্তু তাদের সঙ্গে কুন্তীকে বনে গমনে উদ্যোগী দেখে যুধিষ্ঠিরাদি সকলে তীব্র আপত্তি তুললেন, বললেন, মা তুমি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বনে চলে যাবে, তাহলে আমরা যখন বনে ছিলাম, তখন প্রয়োজন হ'লে জ্ঞাতি বধ করেও রাজ্য উদ্ধার করতে এত প্রে ণা ও উত্তেজনা কেন দিয়েছিলে? কুন্তী বললেন, তোমাদের সঙ্গে রাজ্য সুখ ভোগ করব, সে উদ্দেশ্যে আমি রাজ্য উদ্ধারের উপদেশ দিই নাই, তোমাদের প্রাপ্য রাজ্যভাগ উদ্ধার না করলে তোমরা ক্ষাত্র ধর্ম থেকে বিচ্যুত হ'তে তোমাদের অধর্ম হত, তাই সে উপদেশ দিয়েছি। রাজ্য সু‍খ ভোগ কয়েক বৎসর মহারাজ পাণ্ডুর সঙ্গে করেছি, এখন আর রাজ্য সুখ ভোগে স্পৃহা নাই, বনে গিয়ে তপস্যা এবং ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর সেবা ক'রব। কুন্তী এই কথা বলে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সঙ্গে বনে চলে গেলেন, তার পুত্রগণ তাঁকে কোন মতেই নিবৃত্ত করতে পারলেন না। বিদুর ও সঞ্জয় সেই সঙ্গে তাদের পদ হতে অব্যাহতি নিয়ে বনে তপস্যা করতে গেলেন। সকলে গঙ্গায় স্নান করে কুরুক্ষেত্রে রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে গেলেন। শতযূপ কেকয় দেশের অধিপতি ছিলেন, বৃদ্ধ হয়ে পুত্রদের উপর রাজ্যভার দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে আশ্রমে বাস করছিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও তার সঙ্গীদের আশ্রমে অভ্যর্থনা করে নিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ব্যাস ঋষির আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা নিলেন, দীক্ষা নিয়ে শতযূপ রাজর্ষির আশ্রমে বাস করতে লাগলেন। রাজর্ষি তাদের আরণ্যক উপাসনা বিধি সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, সেই উপদেশ অনুসারে সকলে তপস্যা, উপাসনা ও ধ্যান করতে থাকলেন। এক বৎসর পরে যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতৃগণ, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা প্রভৃতিকে ও রক্ষীদল সঙ্গে নিয়ে রাজর্ষি শতযূপের আশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতিকে দেখ্‌তে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূগণ সঙ্গে যেতে চাইলে তাদেরও সঙ্গে নিলেন। তারা রাজর্ষির আশ্রমে গিয়ে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীকে দেখ্‌লেন, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিজেদের পরিচয় দিলেন, কুশল জিজ্ঞাসা করে বিদুরের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। ধৃতরাষ্ট্র বল্‌লেন, বিদুর কঠোর তপস্যা করে বন হতে বনান্তরে ফিরছে, কখনও কখনও তাকে দেখা যায় শুনি। সেই সময়েই যুধিষ্ঠির হঠাৎ দেখ্‌লেন যে ধূলিধূসর নগ্ন দেহ বিদুর দূর হতে আশ্রমে তাদের দেখে আবার চলে যাচ্ছেন। যুধিষ্ঠির একাই বিদুরকে দ্রুত অনুসরণ করলেন, তার মধ্যে দেখ্‌লেন যে বিদুর একটি বৃক্ষকাণ্ড

ধরে তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। যুধিষ্ঠিরের মনে হ'ল যে তাঁর দেহে যেন নূতন তেজ সঞ্চার হ'ল। তার পরেই বিদুর হতপ্রাণ হয়ে পড়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর দেহ সৎকারের উদ্যোগ করতেই ঋষিগণ বললেন, বিদুর যতি হয়েছিলেন, তাঁর দেহ দাহ না করে সমাধি দিতে হবে। তাই করা হ'ল।

একদিন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস সেখানে এসে উপস্থিত হ'লেন। এসে বললেন, আমি যোগবলে তোমাদের একটি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারি। কুরুস্ত্রীগণ বললেন, আমরা যুদ্ধে হত পতিপুত্রদের একবার দেখতে চাই। সন্ধ্যাকালে যখন উজ্জ্বল ছায়াপথ আকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, ব্যাস বললেন, ওই ছায়া পথের দিকে চেয়ে দেখ। সকলে দেখতে পেলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মৃত বীরগণ জ্যোতির্ময় মূর্তিতে ছায়াপথে চলাফেরা করছে। সেই দৃশ্য কিছুক্ষণ পরে মিলিয়ে গেল। ব্যাস কুরুস্ত্রীদের বললেন তোমরা যথাকালে পতিলোকে গিয়ে পতির সান্নিধ্য পাবে।[১]

পাণ্ডবগণ মাসাধিক কাল বনে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির সঙ্গে ছিলেন, রাজ্যভার ছিল যুযুৎসু ও ধৌম্যের উপর। তারপর ব্যাসের নির্দেশে ধৃতরাষ্ট্র তাদের হস্তিনাপুরে ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসন ও প্রজা পালনের দিকে মন দিতে বলেন, যুধিষ্ঠিরাদি তখন বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন। তার দুই বৎসর পরে, অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির বনে গমনের তিন বৎসর পরে, যুধিষ্ঠির সংবাদ পেলেন যে একদিন যজ্ঞের অগ্নি ছড়িয়ে পড়ে দাবানল সৃষ্টি করেছিল, সেই দাবানলে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী পুড়ে মরেছেন। সঞ্জয় কোনমতে রক্ষা পেয়ে গঙ্গাদ্বারের তাপসদের সেই সংবাদ জানিয়ে হিমালয়ে তপস্যা করতে চলে গেছেন। এই দুর্ঘটনা হয় গঙ্গাদ্বারের বনে, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী ও সঞ্জয় তখন শতযূপ রাজর্ষির আশ্রম ছেড়ে গঙ্গাদ্বারে গিয়ে বনে তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন। যুধিষ্ঠির গঙ্গাদ্বারে লোকজন পাঠিয়ে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তীর দগ্ধাবশিষ্ট অস্থি সন্ধান করে পেয়ে তার যথোচিত সৎকার করালেন। নিজে তিনি তাদের কল্যাণের জন্য শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করলেন।

তারপরে আরো অষ্টাদশ বর্ষ যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে রাজ্য শাসন করেন। সেই কালের মধ্যে আর কোন যুদ্ধ বিগ্রহ বা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

১। দ্বিতীয় খণ্ড—১৫ অনুচ্ছেদ, তৃতীয় খণ্ড—২০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪০. মৌসল পর্ব—প্রভাসে যাদব বীরদের মৃত্যু, দ্বারকা হ'তে যাত্রাপথে যাদব স্ত্রী হরণ

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ছত্রিশ বৎসর কেটে গেলে যুধিষ্ঠির নানা অমঙ্গল চিহ্ন দেখে দুর্ভাবনায় পড়লেন। দ্বারকার যাদব কুলদের মধ্যে বিবাদ চলছে সে সংবাদ পেয়ে আরো উদ্বিগ্ন হ'লেন। একদিন কৃষ্ণের সারথি দারুক রথ নিয়ে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হ'ল, সংবাদ জানাল যে প্রভাসে প্রথামত বার্ষিক যজ্ঞ ও উৎসব করতে গিয়ে বৃষ্ণি সাত্বত অন্ধক ভোজ বংশীয় পুরুষগণ দুই দলে ভাগ হয়ে প্রথমে অস্ত্র দিয়ে, অস্ত্র ফুরালে এরকাগুচ্ছ তুলে নিয়ে দণ্ডরূপে ব্যবহার করে পরস্পরকে আঘাত করে বধ করেছে, শুধু কৃষ্ণ, বভ্রু ও দারুক বেঁচে থাকে, তাদের মধ্যে বভ্রুও পরে একটি বাণাঘাতে হত হয়; বলরাম বিবাদের আরম্ভে প্রভাস ত্যাগ করে যান, কৃষ্ণ বলেছেন যে তার প্রয়াণের সময় হয়েছে, দ্বারকাপুরী শীঘ্রই জলমগ্ন হয়ে যাবে, অর্জুন যেন সত্বর দ্বারকায় গিয়ে বৃদ্ধ, স্ত্রী, শিশুগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে। শুনে অর্জুন কাল বিলম্ব না করে দারুকের সঙ্গে দ্বারকা অভিমুখে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন যে কৃষ্ণও দেহত্যাগ করেছেন, শুনলেন যে তিনি দ্বারকার বাইরে একটি বৃক্ষতলে বসে যোগে প্রাণত্যাগ করতে উদ্যত ছিলেন, সেই সময় একটি ব্যাধ দূর থেকে তাঁকে দেখে একটি মৃগ মনে করে বিষাক্ত বাণ ম'রে, তা কৃষ্ণের বাম পদমূলে বিদ্ধ হয়, ব্যাধ এসে কৃষ্ণকে বাণ বিদ্ধ দেখে ক্ষমা প্রার্থনা করে, কৃষ্ণ তাকে অভয় দিয়ে যোগে প্রাণ উৎসর্গ করেন; এবং বলরাম অর্ণবপোতে দ্বারকা ছেড়ে চলে গেছেন। অর্জুন দ্বারকাপুরীর মধ্যে গিয়ে বসুদেবকে প্রণাম করেন, বসুদেব যা জানতেন তা শোনেন—কৃষ্ণ প্রচারিত নীতিমূলক জীবনবাদী বৈদিক যজ্ঞ-বিরোধী পঞ্চরাত্র বা ভাগবত ধর্মের ধারক হয় বৃষ্ণি সাত্বতবংশের লোকেরা; ভোজ অন্ধক কুলের লোকেরা বৈদিক ধর্মেরই ধারক থাকে; কৃষ্ণদ্বৈপায়ন একদিন এসে কৃষ্ণকে নূতন ধর্ম প্রচার বন্ধ করতে অনুরোধ করেন, কৃষ্ণ সে অনুরোধ রাখতে সম্মত না হলে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অভিশাপ দেন যে মুসলের আঘাতে যাদবকুলের ধ্বংস হয়ে যাবে, তাবপর প্রভাসের উৎসব কালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন উত্তেজনা দেবার ফলে ভোজ-অন্ধক নায়কগণ একদিকে ও বৃষ্ণি সাত্বত নায়কগণ একদিকে তর্ক আরম্ভ করে ক্রমে পরস্পরকে এরকাগুচ্ছ তুলে মুসলের মত ব্যবহার করে পরস্পরকে বধ

করেছে। কৃষ্ণ তাঁকে এই সংবাদ জানিয়ে বলে যে তিনি আর এরপরে দ্বারকাপুরীর মধ্যে থাকতে পারবেন না, দ্বারকা শীঘ্রই জলমগ্ন হবে, অর্জুনকে সংবাদ দেওয়া হচ্ছে সে এসে বৃদ্ধ স্ত্রী শিশুদের অন্যত্র নিয়ে যাবে। অর্জুন যাদবদের সমিতি গৃহে অবশিষ্ট বৃদ্ধ, নারী, শিশুদের সমবেত করিয়ে জানালেন যে দ্বারকা শীঘ্রই জলমগ্ন হবে, সাতদিনের মধ্যে তারা যেন দ্বারকা ছেড়ে যে যেমন বাহন পায়—উষ্ট্র, রথ, শকট—তাতে দ্বারকা ছেড়ে দূরে গমন করতে প্রস্তুত হয়। অর্জুন কৃষ্ণের দেহের সৎকার করলেন, বসুদেবও বার্দ্ধক্যে ও শোকে প্রাণত্যাগ করলেন, অর্জুন তার দেহ সৎকারও করলেন; তারপর দারুককে নিয়ে প্রভাসে গিয়ে মৃত ভোজ অন্ধক বৃষ্ণি সাত্বত পুরুষদের দেহ সৎকার করলেন ও তাদের উদ্দেশ্যে উদক ক্রিয়া করলেন। সপ্তম দিবসে তিনি দ্বারকাবাসী বৃদ্ধ, স্ত্রী, শিশুদের নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করলেন, রথ, বৃষভবাহিত শকট, উষ্ট্র, গর্দভ ইত্যাদি নানাবিধ বাহনে দ্বারকাবাসীগণ দীর্ঘ সারি বেঁধে চল্‌ল। দ্বারকার বাহির হতেই অর্জুন দেখ্‌লেন যে দ্বারকা পুরীর অধিকাংশ সমুদ্র প্লাবিত হয়ে গেল।

পঞ্চনদের মধ্য দিয়ে অভিযাত্রীদল যখন যায়, গ্রামবাসী আভীর ও দস্যুগণ বহু সুন্দরী নারী, সঙ্গে শুধু একজন বৃদ্ধ রথী—অর্জুন, এবং কয়েকজন গোপরক্ষী, বৃদ্ধ ও শিশু দেখে অকস্মাৎ আক্রমণ করে নারীহরণ করা সাব্যস্ত কর্‌ল। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বহু সহস্র আভীর লগুড় হস্তে অকস্মাৎ এসে অভিযাত্রীদল হতে নারীদের টেনে নিতে আরম্ভ কর্‌ল। অর্জুন সচকিত হয়ে ডেকে বললেন, অধার্মিক তোরা নিবৃত্ত হ', না হলে আমার বাণে তোদের মৃত্যু হবে। কিন্তু আভীরগণ যে বাণীতে ভ্রূক্ষেপ কর্‌ল না। অর্জুন গাণ্ডীবে জ্যা রোপণ করতে গিয়ে দেখেন, যে পূর্বের মত স্বচ্ছন্দে গাণ্ডীব ব্যবহার করতে পারছেন না, তিনি আভীর ও দস্যুদের লক্ষ্য করে অনেক বাণ মারলেন, কিন্তু কিছু কিছু আভীর বাণাঘাতে পড়ে গেলেও অন্যেরা নিবৃত্ত হ'ল না, তাছাড়া অর্জুন দেখ্‌লেন, অনেক যাদব নারী বিনা বাধা দানে আভীরদের সঙ্গে যাচ্ছে, আভীরদের সঙ্গে নারীগণ মিশ্রিত হওয়ায় নারীহত্যার ভয়ে অর্জুন বাণ প্রহারে বিরত হ'লেন, বহু নারীকে নিয়ে আভীর ও দস্যুগণ চলে গেল।

অবশিষ্ট নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের নিয়ে অর্জুন অগ্রসর হলেন। মার্তিকাবতে কৃতবর্মার পুত্রের নেতৃত্বে ভোজবংশীয় বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের আবাস স্থির করে দিলেন। আরো অগ্রসর হয়ে সরস্বতী নদীর তীরে এক জনপদে সাত্যকির পুত্র

এবং সাত্যকির জ্ঞাতি বৃদ্ধ ও নারীদের বাসস্থান স্থির করে দিলেন। তারপর ইন্দ্রপ্রস্থে এসে বৃষ্ণি সাত্বত কুলের শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের কৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রের নায়কত্বে সেখানে নিবাস স্থির করে দিলেন। কিছু ভোজ বংশীয় লোকও তাদের সঙ্গে রইল। ইন্দ্রপ্রস্থে এসে কৃষ্ণের মহিষীদের মধ্যে রুক্মিণী, জাম্ববতী রোহিণী ও নাগ্নজিতী সত্যা অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করলেন, সত্যভামা তপস্যার জন্য বনে চলে গেলেন। অক্রুরের স্ত্রীগণও বনে গিয়ে তপস্যা করা স্থির করল।

অর্জুন হস্তিনাপুরে ফিরে যুধিষ্ঠির ও অন্য ভ্রাতা ও স্ত্রীগণকে সব বৃত্তান্ত জানালেন। সে বৃত্তান্ত শুনে, কৃষ্ণের তিরোধান ও যাদবকুলের প্রভাসে ধ্বংসের কথা জেনে, যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদেরও কর্ম শেষ হয়েছে, আমরাও এবার রাজ্যত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব। ভীম, অর্জুন সে কথার অনুমোদন করলেন। তখন যুধিষ্ঠির বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন, ও পরিক্ষিৎকে হস্তিনাপুরে রাজপদে অভিষেক করলেন। যুযুৎসুকে বললেন, তুমি হস্তিনাপুরে পরিক্ষিৎকে ও ইন্দ্রপ্রস্থে বজ্রকে রক্ষা করবে; সুভদ্রাকে বললেন, বজ্র ও পরিক্ষিৎ রাজ্যশাসন ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয় নাই, তুমি প্রাসাদে থেকে সৎপথে তাদের চালনা করবে, তা না করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে তোমার অধর্ম হবে। তারপর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ প্রব্রজ্যা গ্রহণের আয়োজন করতে লাগলেন।

৪১. মহাপ্রস্থানিক পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্ব

পাণ্ডবগণের প্রব্রজ্যা হিমালয়ে যাত্রাশেষ

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি অনুষ্ঠান করে তাদের আহবনীয় অগ্নি বা হোমের অগ্নি, এবং গার্হপত্য অগ্নি অর্থাৎ প্রতিদিন রন্ধনার্থ অগ্নি জলে বিসর্জন দিলেন, তারপরে সকলে মূল্যবান রাজবেশ ও আভরণ পরিত্যাগ ক'রে বল্কলবাস ধারণ করলেন, দ্রৌপদীও তাই করলেন, পঞ্চ পাণ্ডব ও দ্রৌপদীকে সেইভাবে হস্তিনাপুর থেকে যেতে দেখে প্রজাগণ দুঃখ প্রকাশ করল, কিন্তু তারা পাণ্ডবগণকে সংকল্প মুক্ত করতে কোন চেষ্টা করল না। বহুদূর পর্যন্ত তারা পাণ্ডবদের অনুগমন করে পরে স্ব-স্ব গৃহে ফিরল।

পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ হস্তিনাপুর থেকে নির্গত হয়ে প্রথমে পূর্বদিকে চললেন, বহুদূর চলে তারা লৌহিত্য সাগরের কূলে উপস্থিত হলেন। লৌহিত্য সাগর ব্রহ্মপুত্র নদের মোহনা, তিনসহস্র বৎসর পূর্বে সেই মোহনা আরো অনেক উত্তরে

ছিল। সেখান থেকে সমুদ্রতীর দিয়ে তাঁরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চল্‌লেন। অনেকদূর গিয়ে তাঁরা পশ্চিম দিকে যাত্রা সুরু করে সৌরাষ্ট্রে উপনীত হলেন, সমুদ্র গর্ভগত দ্বারকা পুরীর কাছ দিয়ে তাঁরা উত্তর অভিমুখে যাত্রা করে হিমালয় পর্বতে পৌছে গেলেন। হিমালয়ের পাদদেশে অনুচ্চ পর্বতসমূহ পার হয়ে তাঁরা উচ্চ পর্বতশ্রেণী দেখ্‌তে পেলেন ও উচ্চে আরোহণ সুরু করলেন।[১] চলতে চল্‌তে

১। বনপর্বে আছে যে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বদরিকায় নর-নারায়ণাশ্রম থেকে পর্বত আরোহণ করে সপ্তদশ দিবসে বৃষপর্বার আশ্রমে পৌছেছিলেন, সেখান থেকে আরো কিছুদিন দুর্গম পথে উঠে গন্ধমাদন পর্বতে আষ্টি´ষেণের আশ্রমে আসেন, গন্ধমাদন পর্বতের এক পার্শ্বে কুবেরের প্রাসাদ অলকাপুরী। তারপর গন্ধমাদন ছেড়ে যাবার সময় যুধিষ্ঠির বলে যান যে রাজ্য উদ্ধার করে কর্মশেষ করে শেষ জীবনে তপস্যার জন্য আবার গন্ধমাদনে আসবেন (বন ১৭৬।২০)। মহাপ্রস্থানে কালে বোধহয় সেখানেই গিয়েছিলেন, কিন্তু মহাভারতে তার উল্লেখ নাই।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "হিমালয়ের পথে পথে" গ্রন্থে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণের কিংবদন্তী জড়িত "স্বর্গারোহণী"র কথা আছে। বদরিনাথের মন্দিরের পিছন দিয়ে "নীলকণ্ঠ" নামক পর্বত-শিখর অর্দ্ধ-পরিক্রমা করে "শতোপন্থ" হ্রদের পথ—পথে আছে দুইটি হিমবাহের সঙ্গম, তার একটি ভাগীরথীর উৎস ও আর একটি অলকানন্দার উৎস, দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত উপত্যকার নাম "অলকাপুরী"। হিমবাহ সঙ্গম পার হয়ে শিরদাঁড়া পথ, খুব সরু একপদী পথ, তার দুধারে পাহাড়ের ঢাল বহুদূর নীচে নেমে গেছে, মধ্যে মধ্যে প্রস্তরস্তূপ পথটিকে আরো দুর্গম করেছে, সে পথে অনেক যাত্রী নীচে পড়ে হারিয়ে যায়; সেইরূপ পথে বহুদূর উঠে ১৪,১০০ ফুট উঁচুতে শতোপন্থ হ্রদ, তার কাছে আরো দুটি হ্রদ বা কুণ্ড আছে, সেখান থেকে সম্মুখে দেখা যায় উচ্চ তুষারাবৃত পর্বত শ্রেণী, তার একটি শিখরের অঙ্গে তুষার সোপান উঠেছে, পর্বতের শিখর হ'তে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বরফের স্তূপ স্তরে স্তরে নেমে এসে সোপান রাজির মত দেখ্‌তে হয়েছে, তারই নাম স্বর্গারোহণী। সেই তুষার-সোপান দিয়ে যুধিষ্ঠির উঠে স্বর্গে গিয়েছিলেন, মহাভারত কাহিনীতে তা বলে না; বলে যে ভীমসেনের পতনের পরে দিব্যরথ এসে সশরীরে যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গে নিয়ে গেল। তাও বিশ্বাস্য নয়; তবে এটা সম্ভব যে শতোপন্থ হ্রদের কাছেই আষ্টি´ষেণের আশ্রম ছিল। সেখানে তপস্যা করে যুধিষ্ঠির শেষ জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন।

হঠাৎ দ্রৌপদী পড়ে গেলেন। ভীম প্রশ্ন করলেন, এই রাজপুত্রী কখনও অধর্ম আচরণ করেন নাই, ইনি কেন পড়ে গেলেন? যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের সকলের থেকে অর্জুনের প্রতি তার বেশী ভালবাসা ছিল, ইনি সেই দোষে পড়লেন। আর কিছুদূর অগ্রসর হতে সহদেব পড়ে গেলেন। ভীম প্রশ্ন করলেন, সহদেব নিরহঙ্কার ছিল ও সর্বদা আমাদের সেবায় তৎপর ছিল, সে কেন পড়ে গেল? যুধিষ্ঠির বললেন, সহদেব নিজেকে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ মনে করত, সেই দোষে ওর পতন হ'ল। তাকে ফেলে সকলে অগ্রসর হয়ে গেল, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে নকুলের পতন হ'ল। ভীমের প্রশ্নে যুধিষ্ঠির বললেন, নকুল আপনাকে সর্বাপেক্ষা রূপবান্ মনে করতো, সেই অহঙ্কারে তার পতন হ'ল। আরো কিছুদূর অগ্রসর হলে অর্জুন পড়ে গেলেন। ভীম প্রশ্ন করলেন, অর্জুন পরিহাস ছলেও কখনও মিথ্যা বলে নাই, তার কেন পতন হ'ল? যুধিষ্ঠির বললেন, অর্জুন বলেছিল যে একদিনেই সব শত্রু শেষ করে দেব, কিন্তু সে তা করবার চেষ্টা করে নাই, তাই তার পতন হ'ল। আরো একটু উপরে উঠে ভীমের পতন হল, পড়ে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, কি দোষে আমি পড়লাম? যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি বড় বেশী ভোজন করতে, ও বাহুবলের গর্বে সকলকে অবজ্ঞা করতে, তাই তোমার পতন হ'ল।

তারপর যুধিষ্ঠির একাকী পর্বতের উপরের দিকে উঠতে লাগলেন। চূড়ায় পৌঁছে যোগযুক্ত হয়ে প্রাণ বিসর্জন করতে উদ্যত হলে তাঁর জন্য যে বিমান এসে তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গেল, তা মানুষের স্থূলদৃষ্টির গোচর নয়।

পঞ্চম খণ্ড

বিবিধ প্রসঙ্গ

১। জৈমিনির ভারত কথায় অশ্বমেধ পর্ব

প্রমাণ মহাভারতে আছে যে ব্যাসদেব বেদ ও মহাভারত স্বীয় পুত্র শুককে এবং শিষ্য সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল ও বৈশম্পায়নকে পড়ালেন, তারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভারত সংহিতা রচনা করল (আদি—৬৩/৮৯-৯০)। এই বিবৃতি সম্পূর্ণ গ্রাহ্য না হতে পারে, কারণ বর্তমানে বিবজ্জনের মত যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ভারতসংহিতা রচনা করেন নাই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহুকাল পরে নানা প্রচলিত কিংবদন্তী হতে ভারত কথা বা মহাভারত গ্রথিত ও লিপিবদ্ধ হয়েছিল। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে জৈমিনিকে ভারতকার ও বৈশম্পায়নকে মহাভারতকার বলা হয়েছে, অর্থাৎ জৈমিনি প্রণীত ভারত কথা এককালে ছিল। কিন্তু সেটি সমগ্র পাওয়া যায় নাই, অশ্বমেধ পর্ব মাত্র পাওয়া গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "কৃষ্ণচরিত্র" গ্রন্থে বলেছেন যে বেবর (Weber) সাহেব জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের পুঁথি দেখে তার উল্লেখ করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যে পুঁথি পান নাই। এখন গীতা প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়ায় জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব সহজ প্রাপ্য হয়েছে।

জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব প্রমাণ মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্ব হতে বহুলাংশে ভিন্ন। প্রমাণ মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বে ২৮৪৫ শ্লোক আছে, তার মধ্যে অনুগীতা, ব্রাহ্মণগীতা, উত্তঙ্ক উপাখ্যান পরের কালে যোজিত সন্দেহ নাই, সেগুলি বাদ দিলে অনুমান ১৬০০ শ্লোক অবশিষ্ট থাকে; তার মধ্যে আছে (ক) আশ্বমেধিক, অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞের সংকল্প ও সূচনা; (খ) সংবর্ত মরুত্ত উপাখ্যান, (গ) সুবর্ণ-সংগ্রহ—মরুত্ত রাজার হিমালয়স্থ যজ্ঞস্থল হতে পরিত্যক্ত ও প্রোথিত স্বর্ণপাত্র সংগ্রহ; (ঘ) পরিক্ষিৎ জন্মকথা; (ঙ) যজ্ঞে দীক্ষা ও অশ্ব উৎসর্গ, (চ) অর্জুন কর্তৃক রক্ষিত অশ্বের পরিক্রমা ও অশ্বরক্ষার্থ যুদ্ধ বিবরণ; (ছ) অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা, এবং (জ) সুবর্ণ নকুল উপাখ্যান। জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বে অনুগীতা, ব্রাহ্মণগীতা ও উত্তঙ্ক উপাখ্যান নাই; সংবর্ত-মরুত্ত উপাখ্যানের উল্লেখমাত্র আছে, বিস্তৃত বিবরণ নাই, সুবর্ণ সংগ্রহের বিবরণ নাই, এবং পরিক্ষিৎ জন্ম কথাও নাই, যদিও সেটি

ভারত কথার প্রয়োজনীয় অংশ। জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের অধিকাংশ যজ্ঞের জন্য অশ্ব সংগ্রহ ও তার জন্য যুদ্ধ বিবরণ ও অশ্ব পরিক্রমা কালে যুদ্ধ বিবরণ ও বিভিন্ন রাজার ও অন্য অবান্তর উপাখ্যানে পূর্ণ; সে বিবরণ ও উপাখ্যানসমূহ এত দীর্ঘ যে জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বে ৫১৮২ শ্লোক আছে।

প্রমাণ মহাভারত কাহিনী মতে কৃষ্ণ পরিক্ষিতের জন্মকালে হস্তিনাপুরে আসেন, যুধিষ্ঠির যজ্ঞে দীক্ষা নিয়ে অশ্ব উৎসর্গ করলে কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে যান, এক বৎসর অশ্ব পরিক্রমার পরে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের পূর্বে আর হস্তিনাপুরে আসেন নাই; অশ্ব পরিক্রমাকালে রক্ষীদল সহ অর্জুন একাই রক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। জৈমিনির কাহিনী মতে প্রথম হতেই অশ্বরক্ষার জন্য অর্জুনের সাহায্য করতে আরো পাঁচজন মহারথকে দেওয়া হয়, যথা প্রদ্যুম্ন, বৃষকেতু (কর্ণের পুত্র), অনুশাল্ব, যৌবনাশ্ব ও তার পুত্র সুবেগ, পরে সাত্যকি যোগ দেন; তবু অশ্বরক্ষার জন্য কৃষ্ণকে স্মরণ ও তাঁর সহায়তার প্রয়োজন হয়।

প্রমাণ মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বে অশ্ব পরিক্রমা ও অশ্বরক্ষার জন্য যুদ্ধ-বিবরণ চতুর্থ খণ্ডের আশ্বমেধিক পর্ব শীর্ষক অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বে যজ্ঞের অশ্ব সংগ্রহ ব্যাপার হতেই যুদ্ধ আরম্ভ বর্ণিত। ব্যাস বলেন যে সুলক্ষণ অশ্ব যৌবনাশ্ব রাজা শাসিত ভদ্রাবতী জনপদে আছে; সেখান থেকে অশ্ব সংগ্রহ করতে ভীম সসৈন্য গেলেন, সঙ্গে কর্ণপুত্র বৃষকেতু ও ঘটোৎকচ পুত্র মেঘবর্ণ—জৈমিনির কাহিনী মত তাঁরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে নাই, যুধিষ্ঠির অভিষিক্ত হয়ে তাদের নিজের সেনানী ও সভাসদ করেন। তীব্র যুদ্ধে যৌবনাশ্ব ও তার পুত্র সুবেগ বৃষকেতুর হস্তে পরাজিত হয, বৃষকেতু তাদের প্রাণ সংহার না করায় তারা কৃতজ্ঞ হয়ে হস্তিনাপুরে সঙ্গে যায়, ও সেখানে যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পেয়ে তাদের দ্বারা অভ্যর্থিত হয়ে তাদের বন্ধু হয়, এবং অশ্বরক্ষণে অর্জুনের সাথী হয়। কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেলে যুধিষ্ঠির উদ্বিগ্ন হয়ে ভীমকে দ্বারকায় প্রেরণ করে কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে এসে থাকতে অনুরোধ জানান, কৃষ্ণ ও রুক্মিণী, সত্যভামা, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতিকে নিয়ে হস্তিনাপুরে আসেন; তখনও যুধিষ্ঠির যজ্ঞে দীক্ষা নিয়ে অশ্বমোচন করেন নাই। সৌভপতি শাল্ব কৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়েছিল, তার ভ্রাতা অনুশাল্ব সেই সময় অকস্মাৎ সসৈন্য এসে যজ্ঞীয় অশ্ব ধৃত করে ও বলে যে সে কৃষ্ণকে বন্দী করতে এসেছে। তার সঙ্গে যুদ্ধে প্রদ্যুম্ন বাণাহত হয়ে মূর্চ্ছিত হ'লে সারথি তাকে ফিরিয়ে আনে, ভীমেরও সেই অবস্থা হয়,

কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নকে পরাজিত হয়ে ফিরবার জন্য ভৎর্সনা ও পদাঘাত করেন, কিন্তু নিজে যুদ্ধে গিয়ে বক্ষে নারাচের আঘাতে মূর্চ্ছিত হ'ন ও তাকে নিয়েও সারথি ফিরে আসে, তিনি সংজ্ঞা লাভ করলে সত্যভামা তাকে কথা শোনায়—তুমি প্রদ্যুম্নকে পরাজিত হয়ে ফিরলে পদাঘাত করলে, নিজেও তো পরাজিত হয়ে ফিরলে, তাতে কৃষ্ণ উত্তর দেন যে বিষ্ণুভক্তের কাছে তিনি পরাজয় স্বীকার করেন ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে। তারপর বৃষকেতু অনুশাবকে পরাজিত ও বন্দী করে কৃষ্ণের নিকট নিয়ে আসে; কৃষ্ণের নিকটে এসে অনুশাব তাঁকে বিষ্ণু ভগবান বলে স্তব করে, ও বলে যে কৃষ্ণ তার কাছে পরাজয় স্বীকার করায় তার হৃদয়ের দ্বেষভাব দূর হয়েছে, শুধু ভক্তি আছে; কৃষ্ণ তাকে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন, অনুশাব যজ্ঞীয় অশ্বরক্ষায় সাথী হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল। তারপরে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে দীক্ষা ও অশ্ব উৎসর্গ বর্ণিত হয়েছে, অশ্বরক্ষার ভার অর্জুনের উপর, তার সহায়ক হিসাবে সঙ্গে গেল প্রদ্যুম্ন, বৃষকেতু, অনুশাব ও সুবেগ।

অশ্ব পরিক্রমার বর্ণনায় আছে যে অশ্বটি প্রথমে মাহীষ্মতী রাজ্যে গেল—মাহীষ্মতী ছিল নর্মদা নদীর উত্তর কূলে, বিন্ধ্য ও ঋক্ষবান্ পর্বতের মধ্যে অবস্থিত, বর্তমান জব্বলপুরের নিকটে। সেখানে রাজপুত্র প্রবীর অশ্বটির মস্তকে বদ্ধ স্বর্ণফলকে লেখা লিপি হতে বুঝল যে এটি যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব, অর্জুনের দ্বারা রক্ষিত, জেনে সে অশ্বটি অবরুদ্ধ করল। প্রবীর সহ যুদ্ধে বৃষকেতু মূর্চ্ছিত হয়, অনুশাব সহ যুদ্ধে প্রবীর বিপন্ন হ'লে রাজা নীলধ্বজ এসে প্রবীরকে রক্ষা করে। নীলধ্বজের সহিত অর্জুনের তীব্র যুদ্ধ হয়, নীলধ্বজের জামাতা অগ্নিদেবের প্রভাবে অর্জুনের অনেক সেনা দগ্ধ হয়, অর্জুন তখন নারায়ণাস্ত্র দিয়ে অগ্নি শান্ত করেন ও অগ্নিদেবের স্তব করে তাকে তুষ্ট করেন। অগ্নিদেব অশ্ব ফিরিয়ে দিয়ে সন্ধি করতে উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও রাণী জ্বালার কথায় নীলধ্বজ সপুত্র এসে আবার অর্জুনকে আক্রমণ করে, তীব্র যুদ্ধের ফলে প্রবীর ও তার ভ্রাতা নিহত হয়, নীলধ্বজ ভগ্নরথ ও পরাজিত হয়ে অর্জুনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে অশ্ব ফিরিয়ে দেয় ও ধনরত্ন উপহার দেয়, অর্জুনের কথায় নীলধ্বজও অশ্ব রক্ষায় অর্জুনের সাথী হয়। রাণী জ্বালা তার ভ্রাতা উল্মুকের নিকট গিয়ে প্রবীর বধের প্রতিকার প্রার্থনা করে, কিন্তু উল্মুক তাকে সাহায্য না করে ভৎর্সনা করে, ফলে জ্বালা অর্জুনকে অভিশাপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন করে। বলা হয়েছে যে জ্বালাময় বাণ হয়ে জ্বালা বভ্রুবাহনের তূণে প্রবেশ করে, সেই বাণে পরে অর্জুনের মূর্চ্ছা ও মৃত্যু হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাজসূয়

যজ্ঞের জন্য দিগ্‌বিজয় অন্তপর্বে আছে যে সহদেব দক্ষিণ দিক অভিযান করে মাহীষ্মতী রাজ নীলের নিকট হতে কর আদায় করতে আসলে নীলের জামাতা অগ্নিদেব সহদেবের সৈন্য মধ্যে অগ্নিকাণ্ড করেন, পরে সহদেবের স্তুতিতে তুষ্ট হয়ে অগ্নিদেব নীলকে কর দিতে বলেন এবং কর দেওয়া হয়। জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বে সেই কাহিনীর প্রতিধ্বনি।

মাহীষ্মতী হতে বিন্ধ্য পর্বতের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় যজ্ঞীয় অশ্বটি একটি শিলাগাত্রে আটকে যায়, সৈন্যগণ চেষ্টা করে অশ্বটিকে মুক্ত করে নিতে পারে না; নিকটেই সৌভরি মুনির আশ্রমে গিয়ে অর্জুন জানলেন যে উদ্দালক নামক এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী, চণ্ডী, স্বামীর অভিশাপে শিলারূপে পরিণত হয়েছে, মুনির উপদেশে অর্জুন শিলা স্পর্শ করলে সেটি স্ত্রীরূপ ফিরে পেল এবং অশ্বও মুক্ত হ'ল।

সেখানে থেকে চম্পাপুরী—প্রাগ্‌ মহাভারতে সে নাম নাই। চম্পাপুরীতে অশ্ব অবরুদ্ধ করে রাজা হংসধ্বজ দুন্দুভি বাজিয়ে যোদ্ধাদের সমবেত হবার আদেশ দেন। সেখানকার নিয়ম ছিল যে দুন্দুভি বাদ্য শুনে যে আসতে অযথা দেরী করবে, তাকে তপ্ততৈলের কটাহে ফেলে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। রাজপুত্র সুধন্বা সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রীর অনুরোধে দুন্দুভি বাদ্য শুনেও স্ত্রীসহ সঙ্গমের জন্য দেরী করল, স্নান করে সজ্জিত হয়ে গেলে রাজার আজ্ঞায় তাকে তপ্ততৈল কটাহে নিক্ষেপ করা হ'ল, কিন্তু কৃষ্ণকে স্মরণ করে সে অক্ষত দেহে বের হয়ে এল। সুধন্বা তীব্র যুদ্ধে সাত্যকিকে পরাজিত করে অর্জুনের সারথিকে বধ করে অর্জুনকে বিপন্ন করে, তখন অর্জুন কৃষ্ণকে স্মরণ করলে কৃষ্ণ উপস্থিত হয়ে অর্জুনের সাহায্য করেন, তারপরে অর্জুনের বাণে সুধন্বা নিহত হয়ে শিবের মুণ্ডমালায় স্থান পায়, তার ভ্রাতা সুরথও নিহত হয়ে শিবের মুণ্ডমালায় স্থান পায়। তারপরে হংসধ্বজ যুদ্ধে আসলে কৃষ্ণ তার সঙ্গে অর্জুনের পরিচয় ক'রে দেন ও অর্জুনের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন করেন, হংসধ্বজ ও অশ্বরক্ষার অর্জুনের সাথী হয়, কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে ফিরে যান।

চম্পাপুরী হতে উত্তরদিকে গিয়ে এক সরোবরে অবগাহন করে অশ্বটি অশ্বিনীতে পরিণত হয়, আর একটি সরোবরে অবগাহন করে ব্যাঘ্রীরূপ ধারণ করে। অর্জুন কৃষ্ণকে স্মরণ ক'রে বিপদমুক্তির প্রার্থনা করলে ব্যাঘ্রী আবার অশ্বরূপ ধারণ করে। আরো উত্তরে গিয়ে অশ্বটি একটি স্ত্রীরাজ্যে প্রবেশ করে, ও রক্ষিণীদের দ্বারা ধৃত হয়। রাণী প্রমীলার সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, কিন্তু দৈববাণী শুনে যুদ্ধ বন্ধ করে অর্জুন প্রমীলাকে স্ত্রীরূপে বরণ করে, তাঁকে যজ্ঞকালে হস্তিনাপুরে উপস্থিত হ'তে বলেন।

তারপরে বক রাক্ষসের ভ্রাতা ভীষণ তার রাজ্যের মধ্যে অশ্বটি গেলে তাকে ধরে, কিন্তু যুদ্ধে অর্জুনের হস্তে নিহত হয়। সেখান থেকে অশ্বটি মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করে ; বভ্রুবাহন অশ্ব ও উপহার সহ অর্জুনের নিকট উপস্থিত হ'লে অর্জুন তাকে বীরের মত আচরণ না করায় তিরস্কার করেন, ফলে বভ্রুবাহন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসে, তার সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুন ও বৃষকেতু নিহত হয় ; প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি, অনুশাল্ব, নীলধ্বজ, যৌবনাশ্ব ও হংসধ্বজ একে একে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে পরাজিত ও মূর্চ্ছিত হয়। উলুপী বভ্রুবাহনকে নাগলোক হতে সঞ্জীবনী মণি আন্‌তে বলেন, মন্ত্রীর প্ররোচনায় নাগরাজ অনন্ত প্রথমে মণি দিতে অস্বীকার করে, পরে বভ্রুবাহন বহু নাগসৈন্য ধ্বংস করলে নাগরাজ তাকে ক্ষান্ত হতে বলে ও সঞ্জীবনী মনি দেয়। কিন্তু ইতিমধ্যে অর্জুন ও বৃষকেতুর শির দুষ্ট নাগগণ অপহরণ করে ; কুন্তী দুঃস্বপ্ন দেখে কৃষ্ণকে বলেন, কৃষ্ণ গরুড়ে চড়ে মণিপুর যান, তাঁর আজ্ঞায় নাগগণ অর্জুন ও বৃষকেতুর শির্ এনে দেয়, কৃষ্ণ তখন সঞ্জীবনী মণি স্পর্শে তাদের জীবিত করে দেন।

জৈমিনির কাহিনীতে অনৈসর্গিক ঘটনার আতিশয্য আছে কিন্তু মণিপুর কাহিনীতে প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে অনুমান করা যায় ; কারণ অশ্ব পরিক্রমা শেষ হলে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে এসে যুধিষ্ঠিরকে সংক্ষেপে যখন বিবরণ দেন, তখন বলেন যে উলুপী মণিস্পর্শে অর্জুন ও বৃষকেতুকে সঞ্জীবিত করেছিল, সেখানে নাগলোকে গিয়ে যুদ্ধের কথা এবং দুষ্টনাগ কর্তৃক অর্জুনও বৃষকেতুর শির অপহরণের কথা নাই। অতএব সেসব পরের যোজনা মনে হয়, জৈমিনির কাহিনীর অংশ নয়।

মণিপুর হতে কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত অশ্ব রক্ষণ বাহিনীর সঙ্গে রইলেন, বল্লেন যে বিশেষ বিষ্ণুভক্ত রাজগণের দেশ দিয়ে অশ্বটি এখন যাবে, তাই কৃষ্ণের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে। মণিপুর থেকে অশ্বটি রত্ননগরে গেল, রত্ননগরের নাম প্রমাণ মহাভারতে নাই। রত্ননগরের রাজা ময়ূরধ্বজও অশ্বমেধের জন্য অশ্ব উৎসর্গ করেছিল, তার পুত্র তাম্রধ্বজ সেই অশ্ব রক্ষাকার্যে ব্রতী ছিল। তাম্রধ্বজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব ধৃত করে, তারপর যুদ্ধে কৃষ্ণ-অর্জুনের সঙ্গের সকল বীরকে পরাজিত ও মূর্চ্ছিত করে, অর্জুনসহ সাতদিন সমান যুদ্ধ চালায়, তারপরে তাম্রধ্বজের রথ ভেঙ্গে গেলে তাম্রধ্বজ ভূমিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হ'ল, কৃষ্ণ ও অর্জুনও রথ থেকে নেমে বাহু যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন, বাহুযুদ্ধে তাম্রধ্বজ কৃষ্ণ ও অর্জুন দুজনকে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরলে তিনজনেই প'ড়ে গেলেন, তাম্রধ্বজ প'ড়ে মূর্চ্ছিত হয়ে গেল। চেতনা লাভ ক'রে তাম্রধ্বজ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে আর দেখ্‌তে

পেল না, কিন্তু অশ্বমেধের জন্য উৎসর্গ করা দুটি অশ্বই সেখানে দেখে যে দুটিকে ধরে নিয়ে রত্নগরে পিতার নিকট উপস্থিত হ'ল। এদিকে কৃষ্ণ অর্জুন রত্নগরে গিয়ে রাত্রিবাস করলেন; কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তোমাকে আমি ময়ূরধ্বজের শৌর্য ও মাহাত্ম্য দেখাব। পরদিন ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে কৃষ্ণ অর্জুনকে শিষ্যরূপে নিয়ে ময়ূরধ্বজের রাজসভায় উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন যে নগরের বাইরে বনের মধ্যে তার পুত্র এক সিংহের কবলে পড়েছে, তিনি নিজের দেহ দিয়ে পুত্রকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সিংহটি বলে যে রাজা ময়ূরধ্বজের দেহের অর্দ্ধভাগ পেলে তবে ব্রাহ্মণের পুত্রকে ছেড়ে দেবে। ময়ূরধ্বজ ব্রাহ্মণবেশীর কথায় তার স্ত্রী, পুত্র, অমাত্যদের নিষেধ-সত্ত্বেও নিজদেহ করাত নিয়ে চেরালেন, তখন কৃষ্ণ নিজ পরিচয় দিয়ে ময়ূরধ্বজের দেহ পূর্ববৎ অক্ষত ক'রে দিলেন ও তার প্রশংসা করলেন, তারপর অর্জুনের সঙ্গে তাঁর আসবার কারণ জানালেন। ময়ূরধ্বজ নিজের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব নিয়ে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্বরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলেন।

সেখান থেকে অশ্বটি ঘুরতে ঘুরতে সারস্বতপুরে গেল; সেখানে তখন বীর বর্মা নামক রাজা রাজত্ব করছিলেন, স্বয়ং যমরাজ তাঁর জামাতা। বীরবর্মা যজ্ঞীয় অশ্ব আটকালে অর্জুন ও তার সঙ্গীয় রথীগণ বীরবর্মার বহু সৈন্য নিধন করেন. যমরাজ এসে অর্জুনেরও বহু সৈন্য নিধন করলেন। বীরবর্মা ও অর্জুনের মধ্যে দ্বৈরথ যুদ্ধ কিছুক্ষণ চলবার পরে কৃষ্ণ তাঁদের থামিয়ে তাদের মধ্যে সখ্য স্থাপন করে দিলেন। বীরবর্মা তখন যজ্ঞীয় অশ্ব মুক্ত করে দিয়ে অর্জুন ও তার সঙ্গীয় রথী ও সৈন্যদের মহানদী পার করে দিল। তার থেকে মনে হয় যে সারস্বতপুর উড়িষ্যা বা কলিঙ্গে অবস্থিত ছিল। সারস্বতপুরের কথাও প্রমাণ মহাভারতে নাই।

তারপর কয়েকটি দেশ পার হয়ে কেরল দেশের রাজধানী কুন্তলপুরে এসে অশ্বটি আটক হয়। কুন্তলপুরের রাজা ছিলেন চন্দ্রহাস, অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণ আছেন জেনে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করতে চন্দ্রহাস অশ্বটি ধরতে আদেশ দেন। চন্দ্রহাস নারায়ণ পূজক ও বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। কুন্তলপুরে কৃষ্ণ যুদ্ধ ঘটতে দিলেন না, নিজের চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দেখিয়ে চন্দ্রহাসকে ধন্য করায় চন্দ্রহাস তাঁকে প্রণাম করলেন, কৃষ্ণ তখন অর্জুনের সঙ্গে চন্দ্রহাসের পরিচয় করিয়ে দিলেন। চন্দ্রহাস পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়ে কৃষ্ণ-অর্জুনের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব পরিক্রমার রক্ষাবাহিনীতে যোগ দিলেন। নারদের মুখে অর্জুন-চন্দ্রহাসের জীবন কথা

শোনেন—কেরলের রাজার বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের জন্ম হয়; পুত্র জন্মের অল্পকাল পরে শত্রুগণ রাজধানী অবরোধ করে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে রাজার মৃত্যু হয়, রাণীও সহমৃতা হয়; তারপর ধাত্রী কয়েক বৎসর শিশুটিকে নিয়ে পালন করে, পরে ধাত্রীও বিগত হয়। শিশুপুত্র আপন মনে কুন্তলপুরে খেলা করে বেড়াত, সে শালগ্রাম শিলাকে নারায়ণের প্রতীক ভেবে শ্রদ্ধা করতে শেখে; পাঁচ বৎসর বয়স হলে সে দৈবাৎ মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির ভবনে উপস্থিত হয়. সেদিন মন্ত্রী নানা ভোজ্য দিয়ে ঋষি ও ব্রাহ্মণদের আতিথ্য করছিল, তারা পঞ্চবর্ষীয় বালকটি দেখে প্রশ্ন করে এটি কার পুত্র, এর অঙ্গে রাজ চক্রবর্তীর চিহ্ন আছে। অতিথিরা চলে গেলে মন্ত্রী তার ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করবার জন্য চণ্ডাল ঘাতকদের ডেকে বালকটিকে বনে নিয়ে বধ করে বধ করার প্রমাণ দেখাতে বলে; চণ্ডালগণ বালকটিকে বনে নিয়ে যায়, কিন্তু তার মুখলাবণ্য দেখে তাকে বধ না করে তার বাম পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুল হতে জাত ষষ্ঠ পাদাঙ্গুল কেটে নিয়ে তাকে বনে ছেড়ে দেয়, চণ্ডালগণ কাটা আঙ্গুল ও রক্ত দেখিয়ে তাদের পুরস্কার নিয়ে যায়; ইতিমধ্যে কেরলরাজ্যের অধীন কুলিন্দের সামন্তরাজ বন মৃগয়ায় গিয়ে সুন্দর বালকটিকে দেখে, তার নিজের পুত্র না থাকায় তাকে নিজ গৃহে নিয়ে পালন করতে ও শিক্ষা দিতে থাকে, বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে তাকে কুলিন্দের যৌবরাজ্যে অভিষেক করে; তার নাম দেওয়া হয়েছিল চন্দ্রহাস। চন্দ্রহাস যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে দিগ্‌বিজয় করে ধনরত্ন সংগ্রহ করে, কুলিন্দের রাজার উপদেশমত কিছু উপঢৌকন কেরলের রাজাকে ও মন্ত্রীকে পৃথক পৃথক পাঠিয়ে দেয়। উপঢৌকনের মহার্ঘতা দেখে এবং কুলিন্দের রাজপুত্র সেসব দিগ্‌বিজয় করে অর্জন করেছে জেনে মন্ত্রী কুলিন্দের রাজধানী চন্দনাবতীকে গিয়ে সামন্তরাজাকে প্রশ্ন করে, তোমার পুত্র জন্মের কোন সংবাদ তো আমরা পাই নাই. এই পুত্রকে কোথায় পেলে? কুলিন্দরাজ চন্দ্রহাসকে পাঁচ বৎসর বয়সে মৃগয়া করতে গিয়ে কিভাবে পেয়েছিল তার বিবরণ দিল, তা শুনে মন্ত্রী বুঝল যে এই সেই বালক পুত্র, যার কথা একদিন ঋষিরা বলেছিল যে কুন্তলপুরে রাজচক্রবর্তী হবে; এবং তার বধের উপায় চিন্তা করে স্থির করল যে চন্দ্রহাসকে তার পুত্র মদনের কাছে পাঠিয়ে দেবে সঙ্গে লিপি দিয়ে যে পত্রবাহককে যেন অবিলম্বে বিষ দেওয়া হয়, এই ভাবে চিঠি লিখে চন্দ্রহাসকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল, বলে দিল, চিঠি যেন খুলে প'ড়োনা, তা হলে তোমার পাপ ও অমঙ্গল হবে। চন্দ্রহাস চিঠি নিয়ে কুন্তলপুরে পৌছে

পরিচ্ছন্ন হয়ে মন্ত্রীপুত্রের কাছে যাবে ঠিক করে এক উপবনের সরোবরে স্নান করে ক্লান্তি বশতঃ সরোবর তীরে বৃক্ষ ছায়ায় শু'য় ঘুমিয়ে পড়ল; ইতিমধ্যে সেই সরোবরে কেরলের রাজকন্যা, যে রাজা চন্দ্রহাসের পিতার বিরুদ্ধে অভিযান করে কেরল জয় করেছিল, তার কন্যা ও মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যা সেই সরোবরে সখীজন সহ জলকেলি করতে আসে; মন্ত্রীকন্যা বিষয়া সরোবর তীরে বৃক্ষছায়ায় একজন সুপুরুষ নিদ্রিত দেখে কৌতূহল ভরে তার পেটিকা খুলে চিঠি দেখল, চিঠি খুলে দেখে তার পিতার পত্রবাহককে বিষদানের আজ্ঞা, ইতিমধ্যে বিষয়ার মনে সুদর্শন যুবকের প্রতি প্রীতির সঞ্চার হওয়ায় চিঠিখানি ঈষৎ পরিবর্তিত করে দিল—"বিষমস্মৈ প্রদাতব্য্" স্থলে "বিষযাস্মৈ প্রদাতব্যা"—তার ফলে মদন চিঠি পেয়ে শীঘ্র ব্যবস্থা করে চন্দ্রহাসের সঙ্গে বিষয়ার বিবাহ দিল। ধৃষ্টবুদ্ধি ফিরে এসে ব্যাপার জেনে তৃতীয়বার তার বধের চেষ্টা করে—বলে যে তুমি নগরের বাইরে স্থিত চণ্ডাল'দের মন্দিরে গিয়ে চণ্ডিকা দেবীকে অর্ঘ্য দান কর, বিবাহের পরে জামাতার তা করবার প্রথা আছে; এবং মন্দিরে ঘাতক পাঠিয়ে বলে দিল, মন্দিরে যে অর্ঘ্য নিয়ে আসবে, আমার পুত্র হলেও তাকে বধ করবে। চন্দ্রহাস অর্ঘ্য নিয়ে যখন যায়, মন্ত্রীপুত্র মদন তাকে ডেকে বলে, অর্ঘ্যথালি আমাকে দাও, আমিই অর্ঘ্যদান করে আসি; মদন অর্ঘ্যথালি নিয়ে গেলে ঘাতক তাকেই বধ করে। ধৃষ্টবুদ্ধি সংবাদ পেয়ে নিজে মন্দিরে গিয়ে আত্মহত্যা করে। তারপরে চন্দ্রহাস মন্দিরে গিয়ে চণ্ডিকাকে বৈষ্ণবী শক্তি বলে স্তব করে ধৃষ্টবুদ্ধির ও মদনের পুনর্জীবন প্রার্থনা করে, দেবী তা পূরণ করেন। তারপরে ধৃষ্টবুদ্ধি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে চলে যায়, কেরলের বৃদ্ধ রাজাও তার পুরোহিতের উপদেশ মত তার কন্যা চম্পকমালিনীকে চন্দ্রহাসের হস্তে দিয়ে তাকে সিংহাসন দিয়ে তপস্যার জন্য বনে চলে যায়। চন্দ্রহাস রাজা হয়ে শালগ্রাম শিলার নারায়ণ রূপে অর্চনা ও একাদশীর উপবাস প্রথা প্রবর্তন করে, মদনকে মন্ত্রী করে নিয়ে রাজ্য সুশাসন করতে থাকে।

কেরল থেকে উত্তরে গিয়ে কয়েকটি রাজ্য পার হয়ে অশ্বর সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করে, কৃষ্ণ, অর্জুন ও আর কয়েকজন রথী সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করে বক্দালভ্য মুনির সাক্ষাৎ পান, মুনিকে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে উপস্থিত হতে আমন্ত্রণ করে তাকে শিবিকায় নেবার ব্যবস্থা করে সমুদ্র হতে নির্গত হ'ন, সেনাবাহিনী কয়েকজন রথীসহ স্থলপথে উত্তরে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। সেখান থেকে সিন্ধু—

সৌবীর দেশে অশ্ব আটক হলে কিছুকাল যুদ্ধের পরে দুঃশলা পৌত্রসহ এসে যুদ্ধ থামিয়ে দেয়, তার প্রার্থনায় কৃষ্ণ জয়দ্রথের পুত্রকে পুনর্জীবিত করে দেন—সে অর্জুনের বাহিনীসহ আগমনের সংবাদ পেয়ে ভয়ে প্রাণত্যাগ করেছিল। তারপরে সকলে হস্তিনাপুরে যান, যুধিষ্ঠির সকলের অভ্যর্থনা করেন, কৃষ্ণের নিকট হতে অশ্ব পরিক্রমার কাহিনী শোনেন। তারপরে যথারীতি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে দেখা যায় যে জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব বহু অনৈসর্গিক কাহিনীতে পূর্ণ; তাছাড়া জৈমিনি এমন এক কালের কল্পনা করেছেন যখন ভাগবত ধর্মের বহু প্রচার হয়েছে, কৃষ্ণও বিষ্ণুর অবতাররূপে স্বীকৃত হয়েছেন ও ভারতে নানাদিকে বিষ্ণুভক্ত শক্তিশালী রাজার আবির্ভাব ঘটেছে। সেই অবস্থা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বে আসে নাই। প্রমাণ মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বে যে অবস্থার বর্ণনা দেওয়া আছে—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ভারতে শক্তিশালী রাজা প্রায় অবশিষ্ট ছিল না, সেটিই ঐতিহাসিক সত্য। অতএব জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের বর্ণনা গ্রাহ্য নয়, প্রমাণ মহাভারতের আখ্যান অনেক বেশী প্রামাণ্য। অশ্বমেধ যজ্ঞ বর্ণনা করতেও জৈমিনি নানা অনৈসর্গিক কথা বলেছেন, যথা অশ্ব-বলির পূর্বে যখন যুধিষ্ঠির বৈদিক মন্ত্রে অশ্বের উত্তমলোক প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করলেন, তখন অশ্বটি শির হেলিয়ে কৃষ্ণের দিকে চাইল, অশ্বতত্ত্ববিদ্ নকুল বললেন যে অশ্ব স্বর্গলোক চায় না, কৃষ্ণের দেহে লীন হতে চায়; অশ্ব বলি হ'লে রক্তের পরিবর্তে ক্ষীরধারার প্রবাহ দেখা গেল, অশ্বের শির উপরে উঠে অগ্নিশিখার মত স্বর্গের দিকে চলে গেল, অশ্বের শরীর হতে জ্যোতি বের হয়ে কৃষ্ণের দেহে লীন হ'ল, শরীর কর্পূরে পরিণত হ'ল, সেই কর্পূর দিয়ে হোম করা হ'ল। এইসব কাহিনী গ্রাহ্য নয়।

জৈমিনি যদি সমগ্র ভারত কথা রচনা করে থাকেন, তা বৈশম্পায়নের মহাভারতের বহু শতাব্দী পরে করেছেন মনে হয়। জৈমিনির উল্লেখ ব্রহ্মসূত্রে আছে; ব্রহ্মসূত্রের কাল অনুমান খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী, কিন্তু জৈমিনির নামের সঙ্গে যুক্ত যে অশ্বমেধপর্ব, তা খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর বহু পরে রচিত মনে হয়। ব্যাস শিষ্য জৈমিনির কাল খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দী বা একাদশ শতাব্দী, আলোচিত অশ্বমেধ পর্বে সে কালের পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রমাণ মহাভারতে লিপি-বিদ্যার কোন উল্লেখ নাই—আদিপর্বে গণেশ কর্তৃক শ্রুতলিখনের কথা পশ্চিম;

ভারতের যোজনা হিসাবে বাদ হয়েছে. আর কোথায়ও লিপি ব্যবহারের প্রসঙ্গ নাই। আলোচিত অশ্বমেধ পর্বে পাই উৎসর্গ করা অশ্বের কপালে স্বর্ণ ফলকে লেখা যে অশ্বটি যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞীয় অশ্ব, অর্জুন রক্ষিত, এবং মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি যে লিপি প্রেরণ করেন, সেটি তার কন্যা পরিবর্তন করে দেবার সামর্থ রাখে, অর্থাৎ সেও লিপিবিদ্যায় পারদর্শিনী। চম্পাপুরী, সারস্বতপুর, কুন্তলপুর ইত্যাদি নগরের নামও কৌরব-পাণ্ডব যুগের পরে ব্যবহৃত হয়েছে মনে হয়। এইসব তথ্যও পূর্ব অনুমান সমর্থন করে—যে জৈমিনি নামের সঙ্গে যুক্ত যে অশ্বমেধপর্ব, তা মূল ভারত কাহিনীব অংশ বলে গ্রহণ করা চলে না।

২. কাশীরামদাসেব মহাভারত

কাশীরাম দাস প্রমাণ মহাভারত বা বৈশম্পায়নের আখ্যান সর্বত্র অনুসরণ করেন নাই একথা সকলেই জানেন। কাশীদাসী মহাভারতের একজন সম্পাদক—সুবোধ চন্দ্র মজুমদার—বলেছেন যে কাশীরাম দাস সংস্কৃত ভাষা জানতেন না মনে হয়; কথকদের মুখ হতে ও যাত্রাদি হতে তাঁর মহাভারতের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, তাঁর অশ্বমেধ পর্ব জৈমিনির বা জৈমিনির নামসহ যুক্ত অশ্বমেধ পর্বকে প্রায় অবিকল অনুসরণ কবেছে। সুবর্ণ নকুল কথা প্রমাণ মহাভারতেও আছে, জৈমিনির কাহিনীতেও আছে, সেটি কাশীরাম দাস বাদ দিয়েছেন, তাছাড়া জৈমিনির কাহিনীতে যে সব বৃত্তান্ত আছে, তার প্রায় সবই কাশীরাম দাসের মহাভারতে আছে, কিছু নামের ভিন্নতা আছে—যথা নীলধ্বজের রাণীর নাম জ্বালা স্থানে জনা, চন্দ্রহাসের রাজধানী কুন্তলপুর স্থলে কৌণ্ডিন্যপুর ইত্যাদি। কাশীরাম দাসের মহাভারত খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। তার পূর্বে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীকর নন্দী জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের কাহিনীর বাংলা কাব্য রূপ দেয়। সম্ভবতঃ সেই কাব্য কাশীরামের অশ্বমেধ পর্বের উৎস। শুধু অশ্বমেধ পর্ব নয়, জৈমিনি ভারতের অন্য কিছু কিছু অংশও বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচারিত ছিল। বনপর্বে, স্বর্গারোহণ পর্বে ও অন্য কোথাও কোথাও কাশীরাম দাস যে নূতন উপাখ্যান দিয়েছেন, অর্থাৎ প্রমাণ মহাভারতে নাই এরূপ উপাখ্যান লিখেছেন, তা সম্ভবতঃ জৈমিনির ভারত কথা হতে গৃহীত।

কাশীদাসী মহাভারতেও অষ্টাদশ পর্ব, তবে পর্ব বিভাগ প্রমাণ মহাভারতের পর্ব বিভাগ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। কাশীরাম দাস শান্তি ও অনুশাসন পর্ব যুক্ত করে একটি শান্তি পর্ব করেছেন, শল্য পর্ব ভাগ ক'রে শল্য পর্ব ও গদা পর্ব এই দুটি পর্ব করেছেন ; সৌপ্তিক পর্ব ভাগ করে সৌপ্তিক ও ঐষীক এই দুটি পর্ব করেছেন ; মুষল পর্বের শেষ তিন অধ্যায়ে মহাপ্রস্থান পর্বের প্রথম অংশ বিবৃত করেছেন, এবং মহাপ্রস্থান পর্বের শেষ অংশ ও স্বর্গারোহণ পর্ব যুক্ত করে এক স্বর্গারোহণ পর্ব করেছেন।

সুবোধ মজুমদার তার সংস্করণের ভূমিকায় কবি সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন :—"আদি, সভা, বন, বিরাটের কতদূর। ইহা রচি কাশীরাম গেল স্বর্গপুর।" কিন্তু তাঁর নিজের অনুমান বলেছেন, যে শান্তি পর্ব হ'তে শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ শেষ পাঁচটি পর্ব কাশীরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের রচনা, প্রথম ত্রয়োদশ পর্ব কাশীরাম দাসেরই রচনা। অন্য এক সুধীর মত যে বিরাট পর্বের পরের অংশ কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম কর্তৃক লিখিত হয়। [The Cultural Haritage of India, Vol. 2 (1962)] তবে দেখা যায় যে আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্বের আখ্যান অন্যান্য পর্বের অপেক্ষা বিস্তৃততর ; এই চারটি পর্বে সুবোধ মজুমদারের সম্পাদিত সংস্করণের মোট ১০৯১ পৃষ্ঠার মধ্যে ৫৭৪ পৃষ্ঠা, অর্দ্ধভাগের থেকে কিছু বেশী। আদিপর্বে অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহ কাহিনীর বর্ণনা প্রমাণ ভারত কাহিনী হতে ভিন্ন প্রকার ; প্রথম দর্শনেই সুভদ্রার মনে প্রেম সঞ্চার, বলরামের সুভদ্রার অর্জুন সহ বিবাহে আপত্তি করে বিবাহার্থ দুর্যোধনকে আনয়ন, কৃষ্ণের কথায় অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণ ও যাদবগণ সহ যুদ্ধে সুভদ্রা কর্তৃক অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ, পরে কৃষ্ণের প্রস্তাবে বলরামের সম্মতি দান, ইত্যাদি বিবরণ দিয়ে কাহিনীটিকে রসপূর্ণ করে তোলা হয়েছে। হরিবংশে বিবৃত পারিজাত হরণ কাহিনী ও সত্যভামার ব্রতকথা আদিপর্বে স্থান পেয়েছে। কৃষ্ণের পুত্র সাম্বের সহিত দুর্যোধন কন্যা লক্ষণার বিবাহ কথাও বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ কাহিনী মত কাশীদাসী মহাভারতের আদিপর্বে স্থান পেয়েছে। তদ্ভিন্ন কাশিরাম দাস মোটের উপর প্রমাণ মহাভারতের আদিপর্বের কাহিনী অনুসরণ করেছেন। সভাপর্বেও কিছু নূতন কথা কাশীরাম যোগ করেছেন, যথা দিগ্বিজয়ের পরে পুনঃ অর্জুনের দেবলোকে, দানব-রাজ্যে, পাতালে ও লঙ্কায় গিয়ে দেবগণকে, ময়দানবকে, অনন্তনাগকে ও বিভীষণকে নিমন্ত্রণ করা, দ্রৌপদী ও হিডিম্বার কলহ,

এবং বিভীষণের সভাগৃহে প্রবেশে বাধা ও পরে বিভীষণকে সঙ্গে নিয়ে সভায় গিয়ে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন। এই সব বৃত্তান্ত জৈমিনি-ভারতে ছিল কিনা তা এখন স্থির করা সম্ভব নয়। সভাপর্বের অবশিষ্ট অংশ প্রমাণ মহাভারতের কাহিনীর মতই। বনপর্বে দীর্ঘ শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনী, কৃষ্ণ কথিত বলে কাশীরাম দাস যোগ করেছেন, তা প্রমাণ মহাভারতে নাই, জৈমিনির ভারতকথা হতে তা সংগৃহীত হয়ে থাকতে পারে—সেই উপাখ্যান কৃষ্ণ বলেন, দ্রৌপদী অকারণে দুঃখ পেয়েছেন বলে বিলাপের উত্তরে, এই তত্ত্ব বোঝাতে যে স্বকর্মফলে ও গ্রহদোষে বা দৈবে লোকে সুখ দুঃখ পায়, চিন্তাও অধর্ম না করা সত্ত্বেও দ্রৌপদীর থেকেও বেশী দুঃখ পেয়েছিল। মার্কণ্ডেয় সমাস্যায় কথিত প্রমাণ মহাভারত অন্তর্গত উপাখ্যানগুলি বাদ দিয়ে কাশীরাম দাস মার্কণ্ডেয়ের মুখে জয়-বিজয়ের অভিশাপ কথা ও হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপুর উপাখ্যান বসিয়েছেন, সেগুলি বিষ্ণুপুরাণ থেকে গৃহীত সন্দেহ নাই। তীর্থযাত্রা বিবরণের মধ্যে প্রভাসে পাণ্ডব-গণের সঙ্গে কৃষ্ণ বলরামের সাক্ষাৎ কারের কথা না বলে কাশীরাম দাস বলেছেন যে অর্জুনের ইন্দ্রলোক থেকে ফিরবার পরে পাণ্ডবগণ কাম্যক বনে গেলেন, সেখানে এসে কৃষ্ণ বলরাম তাদের সঙ্গে দেখা করে নানা কথা বললেন, ও সকলে সুখে প্রভাস হ্রদে স্নান করলেন, তারপরে বৃষ্ণিগণ দ্বারকায় ফিরলেন; মনে হয় যে কাশীরাম দাস দ্বৈতবনের পুণ্য সরোবর ও প্রভাস তীর্থের হ্রদ এক করে ফেলেছেন, এবং সরোবরটিকে দ্বৈতবনের স্থলে কাম্যক বনে স্থিত বলে বর্ণনা করেছেন, সেই ভুল ঘোষযাত্রা বর্ণনায়ও করেছেন—বলেছেন কাম্যক বনে প্রভাস তীর্থে স্নান উপলক্ষ করে কৌরবগণ তাদের ঐশ্বর্য দেখিয়ে পাণ্ডবদের সন্তপ্ত করতে এলেন, গন্ধর্ব হস্তে লাঞ্ছিত হলেন, ইত্যাদি। এই ভুল সুবোধ মজুমদার মহাশয়ের অনুমান সমর্থন করে, যে কাশীরাম দাস মূল মহাভারত পড়েন নাই, কথকদের মুখ থেকে শুনেই মহাভারতের সব উপাখ্যান সংগ্রহ করেছেন। তবু বলতে হয় যে কাশীরাম দাস মোটের উপর প্রমাণ মহাভারতই এই পর্বে অনুসরণ করেছেন।

বিরাট পর্বে অর্জুন কর্তৃক উত্তরের নিকট নিজ দশটি নামের অর্থ বলা প্রসঙ্গে কাশীরাম দাস ধনঞ্জয় ও বীভৎসু নামের ব্যাখ্যা করতে দুটি উপাখ্যান যোগ করে দিয়েছেন, যা প্রমাণ মহাভারতে নাই, ক্লীবত্বের সম্বন্ধে উর্বশীর অভিশাপের কথা বলেছেন, কিন্তু প্রমাণ মহাভারতে অর্জুনের উত্তর যে তিনি ক্লীব ন'ন, শুধু নিজেকে সংযত রেখেছেন; এবং উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধের ভীষণতা বোঝাতে চামুণ্ডার

আবির্ভাব ও রক্তপানের কথা বলেছেন, তা প্রমাণ কাহিনীতে নাই। কিন্তু তা ছাড়া বিরাট পর্ব কাহিনী বলতে কাশীরাম দাস প্রমাণ মহাভারতের আখ্যানই অনুসরণ করেছেন।

উদ্যোগপর্বে কাশীরাম দাস প্রমাণ মহাভারতের মূল ঘটনাগুলি রেখেও আখ্যানের বহু পরিবর্তন করেছেন। পাণ্ডবগণের দূত হয়ে কাশীরাম দাস কাহিনী মতে প্রথমে গেলেন ধৌম্য, দ্রুপদ রাজ পুরোহিত নয়; এবং ধৌম্যের দৌত্যকালে কিছু নূতন কথা ও উপাখ্যান যোগ হয়েছে, যথা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের পাণ্ডবগণের দাবীর সমর্থনে উক্তি, ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক তালজঙ্ঘ-হৈহয়-বাহুর উপাখ্যানে জ্ঞাতি-শত্রুতার পরিণাম কথন, বিদুরের উপদেশ ও পুনঃ ধৌম্য কর্তৃক দীর্ঘ বলি বামন উপাখ্যানে ধন-বলের অহঙ্কারের ফলে পতনের কথা—এই সবই অবান্তর যোজনা। প্রমাণ মহাভারতে দ্রুপদ-পুরোহিতের দৌত্যকালে ধৃতরাষ্ট্র সংক্ষেপে বলে দিলেন, তুমি বিশ্রাম নিয়ে ফিরে যাও, আমাদের উত্তর পরে অন্য দূত মুখে জানাব। কৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনবার জন্য দুর্যোধন প্রথমে উলূকের হাতে পত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন, কাশীরামদাসের এই উপাখ্যানও প্রমাণ মহাভারতে নাই; পত্রের কথা জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বে চন্দ্রহাসের হাত দিয়ে লিপি প্রেরণের কথা মনে করিয়ে দেয়; প্রমাণ মহাভারতে লিপিবিদ্যার ব্যবহারের কথা কোথায়ও নাই। যাদব নায়কগণ সহ কৃষ্ণের পরামর্শের কথাও কাশীরামদাস নূতন যোজনা করেছেন, এবং দুর্যোধন ও অর্জুন দুজনেই নিজে কৃষ্ণের কাছে সাহায্য প্রার্থনায় আসলে কৃষ্ণের যে কথা, তাও প্রমাণ মহাভারতের আখ্যান সহ মেলে না। কাশীদাসী মহাভারতে কৃষ্ণ অর্জুনের সারথ্য স্বীকার করে আবার দুর্যোধনকে তাঁকে বা তাঁর সৈন্য-দলকে নিতে বলছেন, তাতে অসঙ্গতি হয়েছে। অর্জুনের দুর্যোধনকে বহু সৈন্য দানে অসন্তোষ প্রকাশ ও কৃষ্ণের প্রবোধবাণী, যে তারা অর্জুনের হাতে মরবে এই নির্বন্ধ আছে, তাও প্রমাণ আখ্যানে নাই। কৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুরের পথে যাত্রা করেছেন, তখন তিনি পৌরজনের কাছ থেকে সম্মান লাভ করেন, সে কথা প্রমাণ আখ্যানে আছে; কাশীরাম দাস তা বাড়িয়ে বলছেন যে কৃষ্ণ অবতার রূপে পূজিত হলেন। প্রমাণ মহাভারতের মধ্যে আছে যে কৃষ্ণের দৌত্যকালে সভায় পরশুরাম, কণ্ব ও নারদ বিভিন্ন উপাখ্যান বললেন, তা বাদ দিয়ে কাশীরাম দাস ভালই করেছেন, কিন্তু কৃষ্ণের অর্দ্ধরাজ্য প্রত্যর্পণের দাবী অগ্রাহ্য করলে পুনঃ পঞ্চগ্রামের জন্য প্রার্থনা করলেন, তা প্রমাণ মহাভারতে কুরু সভায় কৃষ্ণের ভাষণ সমূহের বিবৃতির

মধ্যে উল্লেখ নাই। প্রমাণ মহাভারতে আছে যে সঞ্জয়ের নিকট পাণ্ডবগণের উত্তর শুনবার প্রতীক্ষাকালে ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের নিকট হতে নীতিকথা ও সনৎসুজাতের নিকট হতে অধ্যাত্মতত্ত্ব শুনলেন। কাশীরাম দাস তা বাদ দিয়ে বলেছেন যে সনৎসুজাত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এলেন কৃষ্ণ ও অন্য সকলে কৌরব রাজসভা থেকে চলে গেলে পরে, শুধু ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর যখন ছিলেন, কাশীরাম দাসের আখ্যান মতে ধৃতরাষ্ট্র তাকে অনুরোধ করলেন দুর্যোধনকে বুঝিয়ে অর্দ্ধরাজ্য ফেরত দিয়ে সন্ধি করতে; কিন্তু সনৎসুজাত বললেন যে তা হবার নয়, ক্ষত্রকুলের ধ্বংসই হবে, তা নির্দিষ্ট আছে। এই ভাবের কথা প্রমাণ মহাভারতে নাই। অম্বা-শিখণ্ডীর বিস্তৃত কাহিনী কাশীরাম দাস উদ্যোগ পর্ব হতে বাদ দিয়ে আদিপর্বে সংক্ষেপে বলেছেন।

কাশীরামদাস যুদ্ধপর্বগুলি খুব সংক্ষেপে বলেছেন। ভীষ্মপর্বে এক একদিনের যুদ্ধ বর্ণনা এক এক অধ্যায়ে শেষ করেছেন, গীতার উপদেশ এক পৃষ্ঠায় বলেছেন, ভূবৃত্তান্ত বর্ণনা বাদ দিয়েছেন, চতুর্থ দিনের যুদ্ধশেষে প্রমাণ মহাভারতে যে বিশ্ব উপাখ্যান আছে, তাও বাদ দিয়েছেন। কিন্তু কিছু অবান্তর উপাখ্যান ও কৃষ্ণের অবতার-বাদ তিনি যোগ করেছেন। দ্বিতীয় দিন যুদ্ধ শেষে যুধিষ্ঠির যখন ভীষ্মের প্রতাপের কথা বলে যুদ্ধে জয় বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন, তখন অর্জুন কৃষ্ণের মহিমা যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, দুর্বাসার বহু সহস্র শিষ্যসহ কাম্যক বনে উপস্থিত হয়ে নিশাযোগ ভোজন প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ কিভাবে সে সঙ্কট থেকে মোচন করেছিলেন—অর্থাৎ বনপর্বের সংশোধক মণ্ডলী কর্তৃক বর্জিত উপাখ্যানটি এখানে কাশীরাম দাস যোগ করেছেন। চতুর্থ দিন যুদ্ধশেষে দ্রুপদ রাজা কথিত একটি উপাখ্যানে কৃষ্ণের শরণাগত বৃগাব কথা বলে যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিলেন, এই কথা যোজিত হয়েছে। ষষ্ঠদিন যুদ্ধ বিবরণে কাশীরাম ভীষ্ম কর্তৃক নারায়ণাস্ত্র ক্ষেপণের কথা এবং কৃষ্ণ কর্তৃক অস্ত্র ত্যাগ করে তার প্রতিরোধের উপায় নির্দেশের কথা বলেছেন—দ্রোণ বধের পরে অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্র ক্ষেপণের কথা তিনি বাদ দিয়েছেন। ষষ্ঠদিন যুদ্ধশেষে অর্জুনের মুখে একটি উপাখ্যান বসিয়ে কৃষ্ণের মহিমা প্রকাশ করেছেন—উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এই যে অর্জুন-বনবাসকালে অর্জুন যখন দ্বারকায় ছিলেন, তখন কৃষ্ণের কথায় কদলী বনস্থিত সরোবর থেকে কনকপদ্ম তুলতে গেলেন, হনুমান এসে বাধা দিল ও রামের মহিমার কথা বলল,-অর্জুন রামের কথা শুনে বলেন যে তিনি থাকলে বাণ দিয়ে সমুদ্রের উপর সেতু করে দিতেন, এবং সমুদ্রের উপর বাণ দিয়ে একটি সেতু করে দেখালেন। হনুমান

নিজেকে গুরুভার করে সেতুর উপর উঠ্‌লে বাণের সেতু যাতে ভেঙ্গে না পড়ে অর্জুন সেই প্রার্থনা ক'রে মনে মনে কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন, সেই প্রার্থনায় বিষ্ণু কচ্ছপ রূপে সেতুর নীচে থেকে সেটিকে ধারণ করলেন, কিন্তু হনুমানের ভারে কচ্ছপরূপী বিষ্ণুর মুখ থেকে রক্ত বে'র হয়ে জল রঞ্জিত ক'রল। হনুমান ব্যাপার বুঝে রামের নাম ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রল; তখন বিষ্ণু রাম রূপে আবির্ভূত হ'য়ে অর্জুন ও হনুমানের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন ক'রে দিলেন; এবং হনুমান অর্জুনকে বল্‌লেন, তোমাকে প্রযোজন মত যুদ্ধ কালে সাহায্য করব; এইভাবে সঙ্কটে শরণ নিলে বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ সর্বদা সাহায্য করেন। আর একটি যোজনা আছে সপ্তমদিন যুদ্ধ শেষের বিবরণে—দুর্যোধন সাতদিনে পাণ্ডবদের কেহ হত না হওয়ায় ভীষ্মের কাছে অনুযোগ করলেন, ভীষ্ম পাঁচটি ভীষণ বাণ নিলেন, বললেন এই বাণগুলিতে কাল পাণ্ডবগণ নিহত হবে, সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ ও অর্জুন ছলনা করে সেই পাঁচটি বাণ নিযে গেলেন, শেষে কৃষ্ণকে দেখে ছলনা বুঝে ভীষ্ম বল্‌লেন, তুমি আমাকে প্রতিজ্ঞাচ্যুত করলে, তোমাকে কাল আমি অস্ত্রধারণ করবে না সেই প্রতিজ্ঞা থেকে চ্যুত করব; তাই অষ্টম দিনে ভীষ্ম তীব্র যুদ্ধে পাণ্ডববাহিনীর দুরবস্থা করলেন, অর্জুন নিবারণ করতে পারছেন না দেখে কৃষ্ণ রথ থেকে নেমে রথচক্র ধরে ভীষ্মের দিকে ধাবিত হলেন, এইভাবে অস্ত্রধারণ না করবার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হ'ল। তারপরে অর্জুন কৃষ্ণকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন, যেমন প্রমাণ মহাভারতে তৃতীয় ও নবম দিনের যুদ্ধ বিবরণে আছে। ভক্তের প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে ভগবানের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বেও আছে; এই যোজনা জৈমিনির ভারতকথা হতে গৃহীত হয়ে থাক্‌তে পারে।

দ্রোণ পর্বে জয়দ্রথ বধ বর্ণনায় অর্জুনের রথের অশ্বগণের জলপান ও মার্জনের জন্য জলাশয় সৃষ্টি প্রমাণ মহাভারতে অর্জুনের বরুণাস্ত্র প্রয়োগের ফলে হয় বলা হয়েছে, কাশীরামদাস জলাশয় সৃষ্টি কৃষ্ণের ঐশ্বরিক শক্তিবলে করা হ'ল বলে বর্ণনা করেছেন, নারায়ণাস্ত্র ক্ষেপনের কথা কাশীরাম ভীষ্মপর্বে বলেছেন; তাছাড়া বর্ণনা সংক্ষেপ করে মোটের উপর দ্রোণ পর্বে প্রমাণ মহাভারত অনুসরণ করা হয়েছে। কর্ণ পর্ব হতে স্ত্রীপর্ব পর্যন্ত মোটের উপর প্রমাণ কাহিনী অনুসৃত হয়েছে, সামান্য ব্যতিক্রম উল্লেখযোগ্য নয়।

শান্তিপর্বে কাশীদাস প্রমাণ মহাভারত আখ্যান অনুসরণ করেন নাই বলা যায়; স্ত্রীপর্বের শেষ তিন অধ্যায়ে শান্তি পর্বের প্রমাণ কাহিনীর প্রথমাংশ—যুধিষ্ঠিরের শোকাপনয়ন ও রাজ্যাভিষেক বর্ণিত হয়েছে—তবে বর্ণনায় অনেক পার্থক্য আছে। তারপরে শান্তি পর্বে পঁচিশ অধ্যায়ে প্রমাণ মহাভারতের শান্তি পর্বের ৪৫-৩৬৫ অধ্যায় ও অনুশাসন পর্বের ১ ১৬৭ অধ্যায় কথিত বিষয় সমূহের অধিকাংশ না বলে কয়েকটি অবান্তর বিষয় ভীষ্ম কথিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যথা হরিনামের মাহাত্ম্য, একাদশী ব্রতের কথা, শিবচতুর্দশী ব্রতের মাহাত্ম্য, নরক বর্ণন, পরশুরামের তীর্থপর্যটন বৃত্তান্ত, ইত্যাদি। প্রমাণ মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্বে বিবৃত উত্তঙ্ক-কৃষ্ণ সংবাদ ও উত্তঙ্কের কৃষ্ণস্তব এই পর্বে কাশীদাস দুটি অধ্যায়ে বলেছেন। প্রমাণ মহাভারতের সঙ্গে মেলে শুধ্ ভীষ্মের কৃষ্ণস্তব কথা ও স্বর্গারোহন কথা, যদিও কৃষ্ণস্তব মূলের সঙ্গে মেলে না।

কাশীরাম দাসের অশ্বমেধ পর্ব প্রমাণ মহাভারত বিবৃতি মত নয়, সম্পূর্ণ জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের অনুসরণ তা পূর্বেই বলা হয়েছে। স্বর্ণ নকুল উপাখ্যানটি কাশীদাস বাদ দিয়েছেন, যদিও জৈমিনিতে তা আছে।

কাশীরাম দাসের আশ্রমিক পর্ব মোটের উপর প্রমাণ মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্বের অনুসরণ করেছে। কিন্তু মুসলপর্বের বিবৃতি বহুলাংশে কাশীদাসের স্বকল্পিত, বা জৈমিনি ভারতকথা হতে গৃহীত; কাশীদাসের বিবৃতি-মতে কৃষ্ণ নিজেই যাদবকুল ধ্বংসের উপায় স্থির করে পিতা বসুদেবকে দিয়ে বহু ব্রাহ্মণ ঋষিকে দানযজ্ঞে নিমন্ত্রণ করেন, তাদের দানে ও ভোজ্যে প্রীত করে কৃষ্ণ বলেন, যেখানে যাদব কুমারগণ খেলা করছে, সেই দিক দিয়ে যান; সেদিক দিয়ে ঋষিরা যাবার সময় কুমারগণ সাম্বকে নারী সাজিয়ে কবে সন্তান হবে, কি সন্তান হবে, প্রশ্ন করায় ঋষিগণ যদুকুল ধ্বংসের অভিশাপ দিলেন; তারপরে প্রভাসে গিয়ে উৎসবের মধ্যে কৃষ্ণ নিজেই সাত্যকিকে বিদ্রূপ করে তার উত্তেজনা সৃষ্টি করলেন, তার থেকে যাদবদের দুই দলে ভাগ হয়ে কুলবিধ্বংসী এরকামুসল দিয়ে যুদ্ধ হ'ল, প্রায় সকলেই মৃত্যুমুখে পড়ল। অর্জুন স্ত্রীগণ সহ পঞ্চনদ দিয়ে যাওয়া কালে দস্যুগণের আক্রমণে স্ত্রীগণ হৃত হ'ল, কিন্তু পাষাণে পরিণত হ'ল বলা হয়েছে। অর্জুন বদরিকায় গিয়ে ব্যাসের মুখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে এক অদ্ভুত উপাখ্যান শুনলেন, তা প্রমাণ মহাভারতে নাই, বিষ্ণু পুরাণে অন্যভাবে আছে। মোটকথা কাশীদাসী মুসলপর্বে কাশীদাস কৃষ্ণের সক্রিয় ভাবে যদুবংশধ্বংস ও পৃথিবীর

তার অবতরণ দেখাতে চেয়েছেন, তার সঙ্গে প্রমাণ মহাভারতের বর্ণনা মেলেনা, আর তা কোন মতেই সত্য ঘটনার বর্ণনা নয়।

মুসলপর্বের শেষ তিন অধ্যায়ে ও স্বর্গারোহণ পর্বে প্রমাণ মহাভারতের মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণপর্ব বিবৃত হয়েছে, তবে কাশীদাসের বিবৃতিতে বহু নূতন উপাখ্যান আছে—যথা যাত্রাপথে ভীষণা রাক্ষসীসহ সাক্ষাৎ ও ভীমের হস্তে ভীষণার মৃত্যু, ভদ্রকালী পর্বতে ভদ্রকালীসহ সাক্ষাৎ, সেখানে নারীরাজ্যের রাণী লীলাবতী কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে পতিরূপে গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ ও যুধিষ্ঠির কর্তৃক প্রত্যাখ্যান, বদরিকাশ্রমে অশ্বত্থামাসহ সাক্ষাৎ, রৈবত পর্বতে কিরাতগণের আক্রমণ ও যুধিষ্ঠিরের পুণ্যবলে তাদের বাণের ব্যর্থতা, হরিপর্বত আরোহণ কালে দ্রৌপদীর পতন ও মৃত্যু, ও তার জন্য পাণ্ডবগণের শোক, রৈবত পর্বতে সহদেবের পতন ও মৃত্যু, যুধিষ্ঠিরের শোকপ্রকাশ, চণ্ডকালী পর্বতে নকুলের ও নন্দীঘোষ পর্বতে অর্জুনের পতন, যুধিষ্ঠিরাদির শোকপ্রকাশ, সোমেশ্বর পর্বতে সুন্দরী সোমকন্যাগণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে পতিত্বে আমন্ত্রণ ও যুধিষ্ঠিরের প্রত্যাখ্যান, সোমেশ্বর পর্বতে ভীমের পতন ও যুধিষ্ঠিরের শোক প্রকাশ, ইত্যাদি। প্রমাণ মহাভারতে কারও পতনে শোকপ্রকাশের কথা নাই, এবং সহদেব, নকুল ও অর্জুনের পতনের কারণ সেখানে যা বলা হয়েছে, কাশীদাস তা না বলে অন্য কারণ বলেছেন। শেষে কুকুর রূপে ধর্মের ছলনা, এবং যুধিষ্ঠিরের বিমানে ইন্দ্র ও ধর্ম সহ স্বর্গে আরোহণ বিবৃতিতে প্রমাণ মহাভারত কাহিনী সহ মিল আছে।

প্রমাণ মহাভারত কাহিনী থেকে এই সব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কাশীদাস কৃত বাংলা পয়ারে রচিত "মহাভারতের কথা অমৃত সমান" কয়েক শতাব্দী ধরে বাঙ্গালী পাঠক ও শ্রোতাকে আনন্দ দিয়েছে তাতে সন্দেহ নাই।

৩ অনার্য জাতির দেব শিবের আর্য দেবগণ মধ্যে স্বীকৃতি

পশ্চিম ভারতের নগর-ভিত্তিক প্রাক্-আর্য সভ্যতার ধারকগণ নগরের বহির্দেশে পশুচারণ ও ভূমিকর্ষণ করে শস্য উৎপাদন করত। অনুমান ২৫০০ খৃঃ পূঃ কালে আর্যগণ দলে দলে ভারতে আসতে থাকে, তারা সেই নগর-ভিত্তিক সভ্যতা ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট করে। সেই সভ্যতার ধারকগণ অনেকে নিহত হয়, অনেকে

আর্যদের শাসন মেনে নিয়ে দাসরূপে স্বীকৃতি পায়, অনেকে বনে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের বনে, আশ্রয় নেয়। প্রাক্-আর্য সভ্যতায় পশুপতি শিব ও পৃথিবী মাতার পূজা বা উপাসনা হ'ত। আর্যগণ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ইত্যাদি বৈদিক দেবগণের উপাসক ছিলেন, তাদের উপাসনা যজ্ঞরূপে পরিণত হয়। আর্য অনার্যদের মধ্যে বিরোধ ভূমি ও পশুযূথের স্বত্ব নিয়ে যেমন, তেমন দেবপূজা বা যজ্ঞ নিয়েও হয়। অরণ্যবাসী অসভ্য অনার্যগণ বৈদিক যজ্ঞকে অভিচার-ক্রিয়া মনে করে যজ্ঞ নষ্ট করতে চেষ্টা করত, সভ্য অনার্যগণ তাদের দেবতা শিবের যজ্ঞে ভাগ পাওয়া নিয়ে, অর্থাৎ শিবের আর্যগণ কর্তৃক স্বীকৃতি নিয়ে তাদের অসন্তোষ যজ্ঞ ধ্বংস করে প্রকাশ করত। সভ্য অনার্যদের সঙ্গে যে বিরোধ, তার মীমাংসা হয় আর্যগণের শিবকে আর্যদেবগণের সমান বলে স্বীকৃতি দিয়ে, তাকে রুদ্রদেবের সঙ্গে এক করে নিয়ে তাকে যজ্ঞ ভাগ দিয়ে। অরণ্যবাসী অসভ্য অনার্যগণ আর্যদের সঙ্গে বিবাদে পরাজিত হয়, অনেকে বিনষ্ট হয়।

এই যে শিবপূজক অনার্যগণ কর্তৃক যজ্ঞধ্বংস ও ক্রমে শিবের আর্যদেবতা রুদ্রের সঙ্গে একীকরণ ও আর্যদেবরূপে স্বীকৃতি, তার বিবরণ মহাভারতের মূল কাহিনীতে নাই, কিন্তু মহাভারতে যোজিত পুরাণ কথায় আছে। সৌপ্তিকপর্বে ১৮ অধ্যায়ে শিব কর্তৃক যজ্ঞধ্বংসের বিবরণ আছে। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, অশ্বত্থামা কৃপ কৃতবর্মা এই তিনজন কিসের প্রভাবে ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, অন্যান্য পাঞ্চাল রথী ও দ্রৌপদী পুত্রগণকে ও বহু সৈন্যকে সংহার করতে সমর্থ হয়। উত্তরে কৃষ্ণ শিবের প্রভাবের কথা বলেন, এবং যজ্ঞধ্বংসের কাহিনী বলেন—যে দেবগণ ঋত্বিক ও যজ্ঞসম্ভার সংগ্রহ করে এক বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ করেন, তাতে সব দেবতার ভাগ কল্পিত হয়, কিন্তু স্থাণু বা শিবের ভাগ কল্পিত হয় নাই, শিব তা জেনে একটি বিশাল ধনুক নিয়ে যজ্ঞস্থলে যজ্ঞ ধ্বংস করতে আসেন ও যজ্ঞের হৃদয়ে বাণ মারেন; বাণবিদ্ধ হয়ে যজ্ঞ মৃগরূপ ধারণ করে যজ্ঞাগ্নি সহ আকাশে ধাবিত হয় এবং দিব্যরূপে আকাশে স্থান পায়, যেন শিবের বাণের দ্বারা অনুসৃত হচ্ছে এইভাবে বিরাজিত থাকে। তারপরে শিব কোদণ্ডের অগ্রভাগ দিয়ে সবিতাদেবের বাহু, ভগদেবের চক্ষু ও পূষাদেবের দন্তরাজি উৎপাটন করেন, এবং অন্য দেবগণ ভয়ে পলায়ন করতে চেষ্টা করলে কোদণ্ড দিয়ে তাদের পথ রুদ্ধ করেন; দেবগণ ধনুকের জ্যা কোনমতে ছিন্ন করে দিয়ে শিবের প্রসাদলাভের জন্য স্তব করেন; শিব প্রসন্ন হয়ে সবিতাদেবের বাহু, ভগদেবের চক্ষু ও পূষাদেবের

দন্ত পূর্ববৎ করে দিলেন, যজ্ঞ করতেও অনুমতি দিলেন, সেই যজ্ঞে শিবের ভাগ কল্পিত হ'ল।

এটি হ'ল শিবপূজক অনার্যদের দেবতার যজ্ঞ ধ্বংস করে অবশেষে আর্য-দেবতা বলে স্বীকৃতিলাভের কাহিনীর প্রথম রূপ, এটির মধ্যে শিবের সঙ্গে কোন আর্যকন্যার বিবাহের কথা নাই। ভারতবর্ষে পরে যে পৌরাণিক কাহিনী বহু প্রচারিত হয়—যে শিব দক্ষ প্রজাপতির এক কন্যা সতীকে বিবাহ করেন, দক্ষযজ্ঞে শিবসতীর আমন্ত্রণ না হওয়া সত্ত্বেও সতী পিতৃগৃহে যান ও পিতা কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ায় প্রাণত্যাগ করেন, পরে শিব যজ্ঞ ধ্বংস করেন, স্তবে প্রীত হয়ে দক্ষকে ছাগমুণ্ড ক'রে পুনর্জীবিত করেন ও যজ্ঞ ভাগের স্বীকৃতি পান—সেই কাহিনী বহুকাল পরে কল্পিত হয়েছে। মহাভারতে দক্ষকন্যা সতীর নাম নাই। আদি পর্বে ৬৬ অধ্যায় স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রজাপতি দক্ষের পঞ্চাশটি কন্যার কথা আছে, তাদের মধ্যে দশটি কন্যার ধর্মের সহিত, ত্রয়োদশ কন্যার কশ্যপের সহিত ও সাতাশটি চন্দ্রের সহিত বিবাহের কথা আছে, সতী নামে কোন কন্যার নাম বা শিবের সহিত কোন কন্যার বিবাহের কথা নাই। আদিপর্বে ৭৫ অধ্যায়ে প্রাচেতস দক্ষ সম্বন্ধে ও সেই কথা আছে—তিনি বৈবস্বত মন্বন্তরে পঞ্চাশটি কন্যার জন্ম দেন এবং তাদের দশটি ধর্মকে, তেরটি কশ্যপকে ও সাতাশটি চন্দ্রকে দেন। শান্তি পর্বে পর পর দুটি অধ্যায়ে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ও বৈবস্বত মন্বন্তরে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের কথা আছে। ২৮৩ অধ্যায়ে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কথা:—সুমেরু পর্বতে সাবিত্র শৃঙ্গে শিব শৈলরাজসুতা উমাসহ বাস করতেন; দক্ষ প্রজাপতি গঙ্গাদ্বারে মহাযজ্ঞ আরম্ভ করে, ইন্দ্রাদি দেবগণকে বিমানে যেতে দেখে উমা প্রশ্ন করেন, এরা কোথায় যাচ্ছেন, শিব বলেন, দক্ষ প্রজাপতির অশ্বমেধ যজ্ঞে, উমা বললেন—আপনি কেন যাচ্ছেন না, শিব বলেন যে দেবগণ পূর্ব হতে যজ্ঞ ভাগ কল্পনা করে রেখেছেন, তার মধ্যে শিবের—বা মহেশ্বরের—ভাগ কল্পিত হয় নাই, এখনও তাই শিব যজ্ঞ ভাগ পান না, উমা বলেন, আপনি সর্বদেবের শ্রেষ্ঠ, আপনাকে যজ্ঞভাগ দেওয়া হয় না জেনে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে, শরীর কাঁপছে। দেবীর ভাব বুঝে শিব নন্দীকে সেখানে প্রহরীরূপে রেখে নিজ গণসহ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ ধ্বংস করলেন—গণদের মধ্যে কেহ কেহ চীৎকার করে, কেহ কেহ অট্টহাস্য করে, কেহ কেহ যূপ উৎপাটন ক'রে, কেহ যজ্ঞাগ্নির উপর রক্ত ঢেলে, কেহ কেহ যজ্ঞ-পরিচারকদের গ্রাস করে বীভৎস দৃশ্য সৃষ্টি করল; যজ্ঞ মৃগ হয়ে আকাশে

পালাল, শিব ধনুর্বাণ হস্তে তাকে অনুসরণ করলেন, মহাদেবের স্বেদ ললাট হতে পড়ে কালানল হ'য়ে জ্বলে উঠ্‌ল, সেই অগ্নি হতে এক ভীষণ দর্শন রক্তবাস পরিহিত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ আবির্ভূত হয়ে যজ্ঞ দগ্ধ করল, চারদিকে হাহাকার শব্দ উঠ্‌ল। তখন ব্রহ্মা আবির্ভূত হ'য়ে মহেশ্বরকে বল্‌লেন, এখন থেকে দেবগণ আপনাকে যজ্ঞভাগ দেবে, আপনার ক্রোধে দেব ও ঋষিগণ সন্ত্রস্ত হয়েছে, আপনি ক্রোধ সংবরণ করন। মহেশ্বর প্রসন্ন হলেন, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'ল, মহেশ্বর ভাগ পেলেন, ভীষণ দর্শন পুরুষটিকে খণ্ড খণ্ড করা হ'ল. খণ্ডগু'ল নানা অমঙ্গলরূপে পরিণত হ'ল, যথা মানুষের দেহে জ্বররূপে।

২৮৪ অধ্যায়ে বৈবস্বত যুগে প্রাচেতস দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস কহিনী আছে, কিছু ভিন্ন। গঙ্গাদ্বারে মহাযজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে দেবগণ পত্নীসহ বিমানে সেখানে গেলেন, গন্ধর্বগণ, দানবগণও নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হ'ল। ঋষিদের মধ্যে দধীচি বল্‌লেন, পশুপতি রুদ্রকে যজ্ঞে আমন্ত্রণ করা উচিত ছিল, দক্ষ বল্‌লেন, একাদশ রুদ্র আমন্ত্রিত হয়ে শূলহস্তে উপস্থিত হয়েছেন, পশুপতি রুদ্রকে আমি জানি না। উমা স্বীয় পতি মহেশ্বরের যজ্ঞভাগ নাই জেনে দুঃখিত হয়ে বললেন, আমি কি দান ব্রত তপস্যা কর্‌ব যাতে আপনি যজ্ঞের অর্দ্ধভাগ বা তৃতীয়াংশ পেতে পারেন। মহেশ্বর বল্‌লেন, তুমি জান না যে যজ্ঞে স্তোতা আমারই স্তুতি করে, সামগানকারী আমার উদ্দেশ্যেই গান করে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ আমারই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে, অধ্বর্যুগণ আমাকেই যজ্ঞভাগ দেয়। উমা সে কথায় না ভুলে বল্‌লেন যে সামান্য লোকেও স্ত্রীর নিকট নিজের মহিমা কীর্তন করে। তখন মহেশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে বল্‌লেন, দেখ আমি কি করি, বলে তাঁর মুখ হতে ভয়ানক দর্শন এক পুরুষ সৃষ্টি করলেন. তার নাম বীরভদ্র, উমার ক্রোধ হতে এক ভীষণ দর্শনা নারী উৎপন্ন হয়, নাম ভদ্রকালী। বীরভদ্রের দেহ হতে আরো বহু ভীষণ পুরুষ আবির্ভূত হ'ল, সমষ্টিভাবে তাদের গণ বলে। তারা মহাকোলাহলে যজ্ঞভূমে গিয়ে যজ্ঞ ধ্বংস আরম্ভ করল, যূপ উৎপাটন করে, দক্ষানুচরদের প্রহার ও বধ ক'রে, যজ্ঞপাত্র চূর্ণ করে, ঘৃত পায়স ক্ষীর দধি কিছু ভক্ষণ ক'রে কিছু ভূমিতে নিক্ষেপ ক'রে ভূমি কর্দমাক্ত করে, দেব নারীদের তুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে এক তাণ্ডব কাণ্ডের সৃষ্টি ক'রল। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ হাত জোড করে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কে? বীরভদ্র উত্তর দিল, আমি বীরভদ্র এই নারী ভদ্রকালী, আমরা মহেশ্বর ও উমার ক্রোধ হতে জন্মেছি, মহেশ্বরের আদেশে যজ্ঞ ধ্বংস করতে এসেছি।

তোমরা যদি মঙ্গল চাও তবে উমাপতি মহেশ্বরের শরণ লও; তখন দক্ষ প্রজাপতি যুক্ত হস্তে মহেশ্বরের স্তব করতে লাগলেন। মহেশ্বর অগ্নিকুণ্ড হতে আবির্ভূত হয়ে বললেন, তোমার স্তবে প্রীত হয়েছি, তোমার জন্য কি করতে পারি; দক্ষ বললেন, যদি আমার প্রতি তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে যজ্ঞের যে দ্রব্য সম্ভার আমি বহু যত্নে নানাস্থান হতে সংগ্রহ করেছিলাম, তার যা নষ্ট, ভক্ষিত, চূর্ণিত হয়েছে, তা সব পূর্ববৎ অনষ্টরূপ প্রাপ্ত হোক, যাতে যজ্ঞ সুসম্পন্ন করতে পারি। মহেশ্বর বললেন, তাই হোক, দেখতে দেখতে সেখানে সব যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার পূর্ববৎ অনষ্ট রূপে স্থিত হয়ে গেল। তখন দক্ষ নতজানু হয়ে মহেশ্বরের সহস্র নাম কীর্তন করে আরো স্তব করলেন, পূর্বে মোহবশে মহেশ্বরের যজ্ঞভাগ কল্পিত করেন নাই, তার জন্য মার্জনা চাইলেন। মহেশ্বর তাকে মিষ্ট কথা বলে তার চিত্তগ্লানি দূর করে দিলেন। মহেশ্বরের জন্য যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট করে মহাসমারোহে যজ্ঞ শেষ করা হ'ল, মহেশ্বর যজ্ঞভাগ গ্রহণ করে সস্ত্রীক সগণ অন্তর্হিত হলেন।

হরিবংশে ভবিষ্যপর্বের ৩২ অধ্যায়ে প্রাচেতস দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংসের কথা কিছু ভিন্নরূপে বর্ণিত হয়েছে। সেই বর্ণনায় উমার প্রসঙ্গ নাই। সেই কাহিনী মতে বৃহস্পতি প্রাচেতস দক্ষকে অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত করলেন, যজ্ঞ যখন হয়, তখন রুদ্রের ভাগ কল্পনা করা হ'ল না। রুদ্র তাই উপস্থিত হয়ে নিজ দেহ ভাগ করে নন্দী নামক নিজের সমান বলবিশিষ্ট পুরুষ উৎপন্ন করলেন, রুদ্র ও নন্দী রুদ্রের গণদের নিয়ে যজ্ঞ ধ্বংস করলেন—যূপ উৎপাটন করে, মুনি ঋষিদের ত্রাস উৎপন্ন ক'রে তাদের দূরে তাড়িয়ে দিয়ে, সোমরস নষ্ট করে, যজ্ঞাগ্নিতে জল ঢেলে, যজ্ঞ পাত্র নষ্ট করে, যজ্ঞের কুশতৃণ পদদলিত করে, যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত পুরোডাশ ভক্ষণ করে ও বাণ দিয়ে সদস্যদের বিত্রাসিত করে। যজ্ঞ ভয় পেয়ে মৃগরূপ ধরে পালাবার চেষ্টা করে, রুদ্র তাকে বাণবিদ্ধ করেন, সেই অবস্থায় মর্ত্যে কোন রক্ষার আশা না দেখে আকাশ পথে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হ'ল, ব্রহ্মা তাকে মৃগশিরা নক্ষত্ররূপে আকাশে স্থাপন করলেন। নন্দী ও গণ সমূহ প্রাচেতস দক্ষ ও তার দলকে যখন ধনুর্বাণ হস্তে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন বিষ্ণু শার্ঙ্গ ধনু ও চক্র হস্তে আবির্ভূত হয়ে রুদ্রকে প্রশমিত করতে চেষ্টা করলেন, দুই পক্ষেই দেব দানব গন্ধর্বগণ যোগ দিল। নন্দী তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে বিষ্ণু তাকে স্তম্ভিত চলৎশক্তিহীন করে দিলেন, রুদ্র ও বিষ্ণু পরস্পরের

বাণাহত হয়েও অকম্পিত রইলেন, তারপরে অকস্মাৎ বিষ্ণু বাহু দিয়ে রুদ্রের গলা জড়িয়ে ধরে তাকে অনাদি অনন্ত দেবতা বলে সম্বর্ধনা করলেন, তারপরে বিষ্ণুর শক্তিতে যজ্ঞ সম্ভার পূর্ববৎ অক্ষত অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল, রুদ্রের যজ্ঞভাগ কল্পনা করে দক্ষ যজ্ঞ সম্পাদন করলেন।

হরিবংশের দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস বিবরণে বিষ্ণুর মহিমা দেখাবার প্রয়াস করা হয়েছে, কিন্তু রুদ্র বা শিবকেও অসম্মান করা হয় নাই, বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধে রুদ্র বা শিব অপরাজিত রইলেন, তারপর বিষ্ণু তার দেবত্ব স্বীকার করে নিলেন—শুধু দেবত্ব নয়, যেন ত্রিদেবের একজন বলে স্বীকার করে নিলেন। সেই হিসাবে এই কাহিনী শিবের পূজকদের সঙ্গে আর্যদেবের পূজকদের প্রথম সংঘর্ষের চিত্র বলে মনে হয় না। প্রথমে শিব সংঘর্ষের ফলে আর্য দেবতারূপে মর্যাদা পেলেন, তার বহুকাল পরে তিনি ত্রিদেবের একজন বলে গণিত হয়েছেন। শান্তিপর্বের ২৮৪ অধ্যায়ে কথিত বিবরণে বিষ্ণুর কোন অংশ নাই; তবে তখন দেখা যায় যে অন্ততঃ একজন আর্য ঋষির মনে হয়েছে যে শিবকেও আর্যদেবগণের মত সম্মান করা কর্তব্য।

মহাভারতোক্ত দুটি বিবরণ মতেই দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের সময় হিমবান কন্যা উমা মহেশ্বরের পত্নী, সতী নয়; দক্ষযজ্ঞ কালে শিবপত্নী সতীর দেহত্যাগ ও তার হিমবনে কন্যা উমা রূপে পুনর্জন্ম ও পুনঃ শিবের সহিত বিবাহের কথার সঙ্গে সেই বিবরণের সামঞ্জস্য হয় না। সে সমস্ত কথা আরো পরে কল্পিত মনে হয়। বিষ্ণু পুরাণে তার ইঙ্গিত আছে, ১/৭/২২-২৭ শ্লোকে আছে যে দক্ষ ও প্রসূতির চতুর্বিংশতি কন্যা, তার মধ্যে একটি সতী, ভবের বা শিবের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। বিষ্ণুপুরাণের ১/৮ অধ্যায়ে রুদ্রসর্গ, তার ১২-১৪ শ্লোক আছে যে শিব বা রুদ্র দক্ষকন্যা সতীকে বিবাহ করেছিলেন, সতী দক্ষের প্রতি কোপে দেহত্যাগ করে, হিমবান দুহিতা উমা রূপে জন্ম নিলে রুদ্র পুনঃ উমাকে বিবাহ করেন। এই পুরাণে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের কোন বিবরণ বা সতীর দেহত্যাগের বিস্তৃত বিবরণ নাই। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও বিষ্ণুপুরাণের মত সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, সতীর দেহত্যাগের কথা ও উমা রূপে জন্মে পুনঃ শিবের পত্নী হওয়ার কথা আছে, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের বিবরণ বা সতীর দেহত্যাগের বিস্তৃত বিবরণ নাই। তা পাই ভাগবত পুরাণে, যেটি অনুমান খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে অন্ধ্র বা দ্রাবিড়ে রচিত হয়েছিল। ভাগবত পুরাণের চতুর্থ স্কন্ধে ১-৮ অধ্যায়ে দক্ষকন্যা সতী সহ ভব বা মহেশ্বরের বিবাহ কথা

ও পরে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের কথা আছে। ভাগবত পুরাণ কাহিনী মতে ব্রহ্মা একটি যজ্ঞ করেন, দক্ষ প্রজাপতি সেখানে আসলে অন্য সকলে তাকে দাঁড়িয়ে উঠে সম্মান দেখান, কিন্তু জামাতা মহেশ্বর সেইভাবে সম্মান না দেখানোতে দক্ষ প্রজাপতি ক্রুদ্ধ হয়ে তার হস্তে ব্রহ্মার পরামর্শমত কন্যাদান করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন, অভিশাপ দেন যে মহেশ্বর যজ্ঞভাগ পাবে না। শিবানুচর নন্দী ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেয় যে দক্ষের ছাগমুণ্ড হবে। তার কিছুকাল পরে দক্ষ প্রজাপতি একটি বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করেন, বিমানে সতীর ভগ্নীগণ ও অন্যান্য দেবদেবী সেই যজ্ঞবাটে উপস্থিত হয়, তাদের যেতে দেখে সতী নিমন্ত্রিত না হলেও ও পতির নিষেধবাক্য সত্ত্বেও পিতৃগৃহে যান, সেখানে দক্ষ তার সঙ্গে কথা বলেন না; সতীর মাতা ও ভগ্নীগণ যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করেন, কিন্তু সতী পিতায় অনাদর দেখে ও পতির জন্য যজ্ঞভাগ কল্পিত হয় নাই জেনে পিতার প্রতি রাগে অভিমানে যোগস্থ হয়ে প্রাণ উৎসর্গ করেন। সে কথা শুনে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে জটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলেন, তার থেকে বীরভদ্র নামক এক ভয়ানক পুরুষের উদ্ভব হয়, শিবের আজ্ঞায় বীরভদ্র অন্য শিবানুচর সহ গিয়ে দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করে, দক্ষের শিরশ্ছেদ করে তার শির অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দেয়, পূষা দেবতার দাঁত ভেঙ্গে দেয়, ভৃগু ঋষির শ্মশ্রু উৎপাটন করে, ভগদেবের দুই চক্ষু নষ্ট করে দেয়। দেবগণ ব্রহ্মাকে জানালে ব্রহ্মা কৈলাসে গিয়ে শিবকে তুষ্ট করেন, শিব যজ্ঞবাটে গিয়ে দক্ষকে পুনর্জীবিত করে দিলেন, কিন্তু তার ছাগমুণ্ড হ'ল, ভৃগুর শ্মশ্রুও ছাগের শ্মশ্রুর মত করা হ'ল। শিবের যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট হ'ল ও যজ্ঞ সম্পন্ন হ'ল। সতী পরে হিমবান মেনকার কন্যারূপে জন্মলাভ করে পুনঃ শিবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হ'ন।

সতীর দেহ স্কন্ধে নিয়ে শিবের উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ভ্রমণের কথা, ও সতীর দেহ কর্তিত হয়ে নানা খণ্ড নানা স্থানে প'ড়ে পীঠস্থান সৃষ্টির কথা কোন মহাপুরাণে, অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণের কোনটিতে নাই, তা আছে একটি উপপুরাণে—কালিকা পুরাণ নামক উপপুরাণ, যেটি খৃষ্টীয় অনুমান একাদশ শতাব্দীতে পূর্ব ভারতে, সম্ভবতঃ আসামের কামরূপে, রচিত হয়। কালিকা পুরাণমতে কালিকা বা বিষ্ণুমায়া বা যোগনিদ্রা প্রথমে সতীরূপে দক্ষকন্যা হয়ে শিবকে পতিত্বে বরণ করেন, দেহত্যাগ করে হিমাচল কন্যা উমা বা কালিকা হয়ে পুনঃ শিবকে পতিরূপে তপস্যা করে পান, শিব তাকে একদিন "কালি ভিন্নাঞ্জন শ্যামে" বলে সম্বোধন করলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে তপস্যা করতে চলে যান ও গৌরবর্ণা হয়ে ফিরে আসেন। সতীর দেহত্যাগ

কাহিনী এই উপপুরাণমতে এই যে দক্ষ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে শিব যজ্ঞভাগ প্রাপ্তির যোগ্য নয় স্থির করে শিব সতীকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, সে কথা জেনেই—পিতৃগৃহে না গিয়েই—সতী অভিমানে দেহত্যাগ করেন; শিব হিমবৎ পৃষ্ঠে নিজ আবাসে ফিরে সতীর সখী বিজয়ার কাছে সতীর দেহত্যাগ বিবরণ জেনে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন; ধ্বংস করে ফিরে এসে সতীর দেহ স্কন্ধে নিয়ে সর্বত্র ঘুরতে থাকেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি মায়াযোগে সতীর দেহের মধ্যে প্রবেশ করে সেটি খণ্ড খণ্ড করে ফেলে দেন—যেখানে একখণ্ড পড়ে, সেখানে পীঠস্থান হয়; যেখানে শিব পাতিত হয়, সেখানে শিব বসে পড়েন; পরে ব্রহ্মার সান্ত্বনা বাক্যে উঠে ব্রহ্মার সঙ্গে জগত পরিক্রমা করে শোকের অপনোদন করেন, ব্রহ্মা তাকে বলেন যে সতী হিমবান কন্যারূপে জন্মে আবার তাঁর স্ত্রী হবে। উমার জন্মকথা, তপস্যা, শিব কর্তৃক তাঁর নিষ্ঠা পরীক্ষা, পরে সপ্তর্ষিগণকে পাঠিয়ে হিমবানের নিকট বিবাহ প্রস্তাব করা ও বিবাহ উৎসবের বর্ণনা, অনেকটা কালিদাসের কুমার সম্ভব কাব্যের বর্ণনার মত মনে হয়। তবে কালিদাসের কাব্যে কালিকা একজন মাতৃকা, উমার সঙ্গে তার সম্পর্ক নাই।

৪· দুর্গার স্তব বা উপাসনার প্রবর্তন

প্রাক্-আর্য সভ্যতার ধারক জাতির দেবতা পশুপতি শিব কিছুকাল সংঘর্ষের পরে আর্যগণের দেব-সভায় স্থান পান, এবং অনুমান খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে ত্রিদেব মধ্যে স্থান লাভ করেন ও পূজিত হতে থাকেন। কিন্তু তাদের স্ত্রীদেবতা পৃথিবী মাতা সেভাবে আর্যদেব সজ্ঞে স্থান পান নাই; আর্যদের দ্যাবা—পৃথিব্যৌ-দ্যৌ এবং পৃথিবী এক গণনা মতে তেত্রিশ বৈদিক দেবগণের মধ্যে গণিত কিন্তু সেই পৃথিবী দেবী আর্যদেরই স্বাধীন কল্পনা প্রসূত। শবরগণ অরণ্যবাসী অনার্য জাতি, তাদের মধ্যে চণ্ডিকা দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। বাণভট্টের কাদম্বরী খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত, তার মধ্যে শুকের আত্মকাহিনী অংশে শবর সেনাপতির বর্ণনা আছে—আজানুলম্বিত দুটি হাত, চণ্ডিকাকে রক্ত অর্ঘ্য দিতে বহুবার তা ধারালো অস্ত্র দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে। চণ্ডী বা দুর্গাসপ্তশতীর মধ্যে দেবীর পূজা-বিধিতে আছে যে তাকে স্বদেহের রক্তমাখা ফুল দিয়ে পূজা করতে হবে—সেই পূজা পদ্ধতি শবরদের পূজা পদ্ধতি থেকে

এসেছে। কাদম্বরীর প্রথম ভাগের শেষাংশে দাক্ষিণাত্যে ঘন অরণ্য মধ্যে চণ্ডিকা দেবীর মন্দির ও তার দ্রাবিড়জাতীর পুরোহিতের কথা আছে—বলির পশুর রক্তে সেই মন্দিরের অঙ্গন সিক্ত। তখনও চণ্ডিকা দেবী অরণ্যচারী শবর কিরাত প্রভৃতি জাতির দ্বারা পূজিত হতেন, তবে আর্যগণ তাকে স্বীকার করতে আরম্ভ করেছে—বাণভট্ট রচিত চণ্ডিকাশতক আছে—বাণভট্ট চণ্ডিকাদেবীকে ভক্তি করতেন, যদিও আর্য যজ্ঞবিধিতেই তাঁর শিক্ষা। জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বে কেরলরাজ চন্দ্রহাসের কাহিনী থেকে দেখি যে রাজধানীর বাইরে চণ্ডালগণ পূজিত চণ্ডিকাদেবীর মন্দির ছিল, মনু মন্দিরে মূর্তিপূজা সমর্থন করেন নাই, চণ্ডিকা-দেবীর পূজাও চন্দ্রহাসের কালে আর্যগণ মধ্যে আরম্ভ হয় নাই, তবে বিশেষ উপলক্ষ্যে সেখানে সভ্যজন—আর্য বা অনার্য যাই হোন—সে মন্দিরে অর্ঘ্য প্রেরণ করতেন; অর্থাৎ সভ্য সমাজে ধীরে ধীরে চণ্ডিকা দেবীর স্বীকৃতি হচ্ছিল।

প্রমাণ মহাভারতে দুর্গাস্তব দুবার আছে, বিরাট পর্বে ৬ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির কৃত বলে উল্লেখ, এবং ভীষ্ম পর্বে ২৩ অধ্যায়ে অর্জুন কৃত বলে উল্লেখ আছে। পুনার গবেষক মণ্ডলী এই দুটি অধ্যায়কেই পূর্বভারতে পরবর্তীকালের যোজনা সাব্যস্তে বাদ দিয়েছেন—কিন্তু যোজিত বা প্রক্ষিপ্ত অংশ থেকে মহাভারত যুগের পরে কিভাবে নূতন দেবদেবীর পূজার প্রবর্তন হ'ল, বা নূতন ধর্মতত্ত্ব উদ্ভূত হ'ল, তা বুঝতে পারা যায়।

যুধিষ্ঠির কৃত বলে যে দুর্গাস্তব আছে তাতে দুর্গাকে কুমারী, কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণা, যশোদাগর্ভসম্ভূতা নন্দকুলে জাতা কালী, মহাকালী, বিন্ধ্যবাসিনী, সঙ্কটে ত্রাণকারিণী, ইত্যাদি বলা হয়েছে; মহিষাসুরনাশিনী বলে বর্ণনাও আছে ৬।১৫ শ্লোকে, কিন্তু সেটি অতিরিক্ত পংক্তিতে, প্রক্ষিপ্তের উপর প্রক্ষিপ্ত বলা চলে।

অর্জুন কৃত বলে যে দুর্গাস্তব আছে, সেটিতে দুর্গাকে কুমারী, কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণা, নন্দকুলোদ্ভূতা, কালী, মহাকালী, ভদ্রকালী ইত্যাদি বলে আবার তাকে স্কন্দের মাতা, ভগবতী, দুর্গা, উমা, ব্রহ্মবিদ্যা, মহানিদ্রা ইত্যাদি বলা হয়েছে।

হরিবংশে বিষ্ণুপর্বের ১২০ অধ্যায়ে বাণ রাজার গৃহে পাশবদ্ধ অবস্থাতে অনিরুদ্ধের দুর্গাস্তবের কথা আছে, দুর্গাস্তবে তার নাগ পাশ বন্ধন থেকে মুক্তি; কিন্তু ১২১ অধ্যায়ে আছে যে কৃষ্ণ সংবাদ পেয়ে গরুড়ে আরোহণ করে এলেন, গরুড়কে দেখেই নাগগণ পলায়ন করে, তাতে অনিরুদ্ধের পাশমুক্তি হয়। অতএব ১২০ অধ্যায় বর্ণিত দুর্গাস্তবও পরে যোজিত সন্দেহ নাই।

কিন্তু হরিবংশেই দুর্গার কল্পনার প্রথম পর্যায় বর্ণিত আছে, বিষ্ণু পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। সেই বর্ণনা মতে কালনেমির ছয়টি গর্ভস্থ পুত্র গর্ভে শয়ান থেকেই পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে উপেক্ষা ক'রে ব্রহ্মার আরাধনা করে, হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেয় যে তোমরা দেবকীগর্ভে স্থান পাবে কিন্তু গর্ভস্থ অবস্থাতেই (? জন্মের পরেই) কংসের হস্তে নিহত হবে। বিষ্ণু তা জেনে কালনেমির গর্ভস্থ পুত্রগণের দেহে প্রবিষ্ট হ'য়ে তাদের আত্মা গ্রহণ করে নিদ্রাদেবীর হাতে দিলেন, বল্লেন যে তুমি একটি একটি করে এদের দেবকীর গর্ভে স্থাপন করবে, এদের জন্ম হলেই কংস তাদের বধ করবে, তারপরে দেবকীর সপ্তম গর্ভস্থ শিশুকে আকর্ষণ করে নিয়ে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করবে, দেবকীর সপ্তমগর্ভ নষ্ট হয়েছে প্রচার হবে, তারপরে আমি দেবকীর অষ্টম গর্ভস্থ শিশু হয়ে জন্মাব, তুমি সেই সঙ্গে এককালে নন্দগোপের স্ত্রী যশোদার কন্যা হয়ে জন্মাবে—আমাকে নন্দের কাছে দিয়ে তোমাকে দেবকীর কাছে নেওয়া হবে, তোমাকে শিলাতলে কংস নিক্ষেপ করলে তুমি আকাশস্থ দীপ্তিময়ী দেবীরূপ ধারণ করবে; এই সব কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তুমি স্বর্গের দেবতার সমান পদ লাভ করবে, ইন্দ্র তোমাকে ভগ্নী বলে স্বীকার করবে, তুমি কৌমার ব্রতধারিণী হয়ে বিন্ধ্য পর্বতে বাস করবে, শুম্ভ নিশুম্ভ নামক দুর্জয় দানবদ্বয়কে বিনাশ করে নরলোকে দেবীরূপে পূজিতা হবে।

এখানে মহিষাসুর বধের কথা নাই; মহাভারতে মার্কণ্ডেয় সমাস্যাতে—যাকে মার্কণ্ডেয় কথিত পুরাণ বলা চলে—কার্তিকেয়ের জন্মকাহিনী ও দেব-সেনাপতি পদে অভিষেক, এবং কার্তিকেয় কর্তৃক তারকাসুর ও মহিষাসুর বধের কাহিনী আছে (বনপর্ব, ২১৭-২৩২ অধ্যায়)। মহাভারতের কালে যে স্কন্দ বা কার্তিকেয় বা ষডানন কর্তৃক মহিষাসুর বধ কাহিনী সাধারণের মধ্যে প্রচারিত ছিল, তার পরিচয় কয়েকটি শ্লোক হতে পাওয়া যায়—যথা দ্রোণ পর্বে ১৬৬।১৩ শ্লোকে ঘটোৎকচের উক্তি—"তিষ্ঠ তিষ্ঠ ন মে জীবন্ দ্রোণপুত্র গমিষ্যসি। এষ ত্বাং নিহনিষ্যামি মহিষং ষন্মুখো যথা॥" এবং কর্ণপর্বে ৫।৫৭। শ্লোক সঞ্জয় কর্তৃক কর্ণ-অর্জুন যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়—"যথা স্কন্দেন মহিষো যথা রুদ্রেণ চান্ধকঃ। তথার্জুনেন স হতো দ্বৈরথে যুদ্ধদুর্মদঃ॥"

কিন্তু পরবর্তীকালে কয়েকটি পুরাণে ক্রমে কার্তিকেয়কে উপেক্ষা করে চণ্ডিকা দেবীর বীর্যকে উজ্জ্বল করে চিত্রিত করা হয়েছে, চণ্ডিকাকেই মহিষাসুর নাশিনী

বলা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মধ্যে চণ্ডী বা দেবী মাহাত্ম্য সেই পুরাণের ১৩৪ অধ্যায়ের মধ্যে ১৩টি অধ্যায় নিয়ে, যেমন মহাভারতে ভীষ্মপর্বে ১৮টি অধ্যায় নিয়ে ভগবদ্গীতা। দেবীমাহাত্ম্যে চণ্ডীর দ্বিতীয় চরিত্র হ'ল মহিষাসুর মর্দিনী-রূপা, সেখানে চণ্ডীদেবীর উৎপত্তি নানা দেবতার মিশ্রিত তেজ হ'তে হল এই অনৈসর্গিক বিবরণ আছে। তৃতীয় চরিত্র শুম্ভ-নিশুম্ভ হন্ত্রীরূপা। প্রথম চরিত্র অবান্তর। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী বা দেবী মাহাত্ম্য শীর্ষক ১৩টি অধ্যায় একটি প্রাচীন পুরাণে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের যোজনা মনে করবার কারণ আছে। এই পুরাণের বিষয় সূচিতে চণ্ডী বা দেবী মাহাত্ম্যের কোন উল্লেখ নাই, চতুর্দশ মনু ও মন্বন্তর কথা মধ্যে বিবস্বান্ পুত্র সাবর্ণি মনুর কথা সংক্ষেপে বলে তারপরে চণ্ডী কাহিনী বলা হয়েছে—যে সুরথ রাজা মেধা মুনির আশ্রমে রাজ্যচ্যুত হয়ে গেলেন, সেখানে চণ্ডীর তিন চরিত্র শুনে মাটির মূর্তি গড়ে নিজের রক্তমাখা ফুল দিয়ে দেবীর পূজা করে বর পেলেন যে তিনি পরজন্মে সাবর্ণি মনু হবেন। একজন পার্থিব হীনবীর্য রাজা বিবস্বান পুত্র সাবর্ণি হয়ে জন্মাবেন সে কল্পনা অশ্রদ্ধেয়। মার্কণ্ডেয় মুনি মহাভারতে মহিষাসুর বধের কাহিনী যে ভাবে বলেছেন, পুরাণে ভিন্ন ভাবে বলবেন তা মনে করা যায় না। তবে মার্কণ্ডেয় পুরাণে যোজিত দেবী মাহাত্ম্য বাদ দিলেও দেবী ভাগবত নামক উপপুরাণে সেই কাহিনী আছে, উপপুরাণটি কালিকা পুরাণের মত দশম বা একাদশ খৃষ্টীয় শতাব্দীতে রচনা মনে করা যেতে পারে।

হরিবংশে বিষ্ণু পর্বের তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাস রচিত বলে একটি আর্যা-স্তুতি বা চণ্ডিকা স্তুতি আছে, সেটি হরিবংশের কোন চরিত্রের কৃত নয়, এমনি একটি স্তবের উদাহরণ। কিন্তু তার মধ্যে দেবীকে শবর, বর্বর ও পুলিন্দ ইত্যাদি অনার্য জাতি পূজিতা বলে আবার বলা হয়েছে যে লোকে তাকে সম্বৎসর কাল পূজা অর্চনা করলেই যে কোন ঈপ্সিত ফল পেতে পারে; দেবীকে নিদ্রারূপী, নন্দকুলে জাতা বলে তাকে পুনঃ ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী বলা হয়েছে, তাকে কার্ত্তিকেয়ের মাতা বলা হয়েছে, যদিও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছিল যে তিনি কৌমার-ব্রতধারিণী হবেন।

দক্ষিণ ভারতে নিদ্রাদেবী বা রাত্রিরূপা চণ্ডিকা দেবীকে কুমারী বলে পূজা করা হয়। উত্তর ভারতে যোগনিদ্রা বা বিষ্ণুমায়া বা কালিকা বলে তাকে সতী ও উমার সঙ্গে এক করে দিয়ে শিবের স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। একদিকে রাত্রি বা নিদ্রাদেবী, অপর দিকে শবরদের পূজিতা দেবী চণ্ডিকা, এই দুটি কল্পনা

মিলিয়ে দুর্গাদেবীর কল্পনা করা হয়েছে। দুর্গাকে বিশ্বমাতা, পরমেশ্বরী, জগতের সৃষ্টি-পালন-সংহার-কারিণী রূপে পূজা প্রথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রচলিত হয়েছে। শ্রুতি মতে পরম দেবতাকে পুরুষ বা স্ত্রী, বালক বা বালিকা রূপে কল্পনা করা চলে। অতএব দুর্গার কল্পনা যে ভাবেই হয়ে থাকে, তাঁকে পরম দেবতা বলে পূজা বা আরাধনা করতে কোন বাধা নাই। তবে মহিষাসুর মর্দিনী রূপে পূজা অপেক্ষা শুম্ভ নিশুম্ভ ঘাতিনী রূপে পূজার প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে বেশী মিল আছে মনে হয়।

৫. মহাভারত কাহিনীর কয়েকটি মুখ্য চরিত্র

(ক) কৃষ্ণ: মহাভারতের মুখ্য চরিত্র সমূহের মধ্যে কৃষ্ণ অন্যতম। তাঁর চরিত্র সঠিক ভাবে বুঝতে প্রমাণ মহাভারত-পুঁথির বহির্ভূত কিছু কিছু তথ্য মনে রাখা প্রয়োজন। প্রমাণ মহাভারতে বহু প্রক্ষিপ্ত বা পরের কালের যোজনা আছে, সে কথা সকলেই স্বীকার করেন, তবে কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত সে সম্বন্ধে সকলে একমত ন'ন। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে বিচার করে কৃষ্ণের উপর আরোপিত মিথ্যাচারগুলি প্রক্ষিপ্ত বলে বর্জন করেছেন, তাঁর পরবর্তী কোন লেখক সেই বিচার পদ্ধতি পক্ষপাত-দুষ্ট বলে উপেক্ষা ক'রে কৃষ্ণের উপর আরোপিত সব কলঙ্ক সত্য বলে স্থির করেছেন, কৃষ্ণের কূটকৌশলত্ব প্রমাণ করতে কেবল মহাভারত কাহিনীর উপর সিদ্ধান্ত স্থাপন না করে ভাগবত পুরাণ কথিত কাহিনীও আশ্রয় ক'রেছেন, যথা জরাসন্ধ বধের উপায় নির্দেশ সম্বন্ধে। ভীষ্ম বধের উপায় জান্‌তে ভীষ্মের কাছেই যাওয়ার কল্পনা কৃষ্ণের মাথায়ই প্রথমে আসে বলে কোন কোন লেখক কৃষ্ণের কূট বুদ্ধির প্রমাণ দিতে চেয়েছেন, কিন্তু প্রমাণ মহাভারতে ভীষ্ম পর্ব ১০৭।৪৭ শ্লোক হ'তে দেখা যায় যে সে কথা যুধিষ্ঠিরই প্রথম বলেছিলেন। যুদ্ধের প্রথমদিন বিশ্বরূপ দেখিয়ে তত্ত্বকথা বলে কৃষ্ণ একবার ঈশ্বরীয় রূপ দেখিয়ে তারপর ক্রমাগত নীচে নেমে গেছেন, কারণ কুরুবীরদের বধের জন্য তিনি পাপের পথে পাণ্ডবদের নিয়ে গেছেন, এবং শেষে তাঁর বামপদতলে শরবিদ্ধ হবে মৃত্যু এক কুৎসিৎ মৃত্যু, কিন্তু সেটাই তাঁর নীচে নামার কারণে প্রাপ্য ছিল, এইরূপ মন্তব্য সেই লেখকগণ করেছেন। এই সমস্ত মত ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভে কৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন

নাই, তা পরের কবির কল্পনা, গীতায় গ্রথিত উপদেশও বলেন নাই; গীতা মহাভারতে বহু কাল পরে যোজিত হয়েছে। কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় থেকে ক্রমাগত নীচে নেমে গেছেন সে কথা সত্য নয়—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে কৃষ্ণের জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান—পঞ্চরাত্র বা ভাগবত ধর্ম প্রচার। সেই ধর্মমত অনুসারে চতুর্ব্যূহে ভগবান বা নারায়ণের সৃষ্টি বা প্রকাশ—ভগবান বা নারায়ণ পরম দেবতা, সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম উভয়ের গুণ যুক্ত, তাঁর প্রথম অভিব্যক্তি বা ব্যূহ বাসুদেব, অর্থাৎ পৃথিবীও অন্য সব জড়জগৎ—"সর্বেষাত্মাশ্রয়ো বিষ্ণু রৈশ্বরং বিধিমাস্থিতঃ। সর্বভূত কৃতাবাসং বাসুদেবে চোচ্যতে॥" (শান্তি ৩৪৭।৯৪)—অর্থাৎ তিনি (বিষ্ণু) সকলের বাসস্থান বলিয়া মহর্ষিগণ তাঁহাকে বাসুদেব নামে কীর্তন করিয়া থাকেন (কাঃ মঃ ৩৪)। বাসুদেব রূপ হতে সঙ্কর্ষণ রূপের উদ্ভব—জীব বা প্রাণের উদ্ভব শৈবাল, তৃণ গুল্ম বৃক্ষ লতা কীট পতঙ্গ সরীসৃপ পশু পক্ষীরূপে ক্রমাগত বিকাশ। সঙ্কর্ষণ ব্যূহ হতে প্রদ্যুম্ন ব্যূহরূপে অর্থাৎ প্রাণীদের মধ্যে মনরূপে তাঁর প্রকাশ। প্রদ্যুম্ন ব্যূহ হতে অনিরুদ্ধ ব্যূহ—অর্থাৎ মানুষের মধ্যে মন বিকশিত হয়ে অহঙ্কারের আবির্ভাব, প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করবার ইচ্ছা ও শক্তির আবির্ভাব। এই ধর্মের অঙ্গরূপে কৃষ্ণ নীতিমূলক আচরণের কথা বলেন—সত্য, অহিংসা, ঋজু ব্যবহার, দান ও তপস্যা হবে দৈনন্দিন জীবনের ভিত্তি, সেই সঙ্গে এক ভগবানে ভক্তি করে দুই বেলা আরাধনা করতে হবে। এই ধর্ম "প্রবৃত্তি লক্ষণ"—অর্থাৎ ধর্মময় বিবাহিত জীবন নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করে গৃহস্থের সব কর্তব্য সুসম্পন্ন করা এতে উপদিষ্ট, জীবনকেই যজ্ঞ মনে করার উপদেশ দিয়ে বৈদিক দ্রব্যযজ্ঞ বা কর্মকাণ্ড নিরর্থক বলে বর্জন করতে বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩।১৭ খণ্ডে দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ও ঘোর ঋষি-সংবাদ আছে, ৩।১৪ খণ্ডে শাণ্ডিল্য বিদ্যা আছে। বালগঙ্গাধর তিলক, ডঃ গ্রীয়ার্সন ডঃ রিচার্ড গার্বে মত প্রকাশ করেছেন যে ছান্দোগ্য কথিত দেবকী পুত্র কৃষ্ণই মহাভারতের কৃষ্ণ। বলরাম বা সঙ্কর্ষণের নিকট পঞ্চরাত্র ধর্ম শিক্ষা করে শাণ্ডিল্য এক সংহিতা প্রণয়ন করেন—সেটি এখন পাওয়া যায় না, শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র তাঁর পরবর্তী আর একজন শাণ্ডিল্যের রচনা, কিন্তু শঙ্করাচার্যের কালে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সেটি প্রাপ্তব্য ছিল, ব্রহ্ম সূত্রের ২।২।৪২-৪৫ সূত্রের শঙ্কর ভাষ্য থেকে তাই মনে হয়। এই সূত্র কয়টির ভাষ্যই এখন পঞ্চরাত্র ধর্মের প্রধান বিবৃতি; মহাভারতের শান্তিপর্বে ৩৩৬-৩৩৯ অধ্যায় ভীষ্ম কথিত এবং ৩৪০-

৩৫১ অধ্যায় সৌতি কথিত নারায়ণীয় খণ্ডে চতুর্ব্যূহ তত্ত্বের বা পঞ্চরাত্র ধর্মের মূল রূপ নাই, অনেকটা ব্রাহ্মণ্য ধর্মসহ বিরোধ বর্জিত রূপ আছে, তবু তার থেকেও কিছু কিছু ধারণা করা যায়। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর তিনটি শিলালিপিও বাসুদেবের বা বাসুদেব ও সংকর্ষণের ভাগবতরূপে পুজা প্রাপ্তির নিদর্শন ভিল্‌সার নিকট বেসনগরে প্রাপ্ত গরুড়ধ্বজ স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি, এবং রাজস্থানে ঘাসুণ্ডি গ্রামে ও মহারাষ্ট্রে নানাঘাট পর্বতে উৎকীর্ণ লিপি। ব্রহ্মসূত্রের ২।২।৪৫ সূত্রের ভাষ্যে কথিত হয়েছে যে শাণ্ডিল্য চাংবেদে ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে শ্রেয়ঃ নাই মনে করে পঞ্চরাত্র ধর্ম আয়ত্ত করলেন, তাতেই দেখা যায় যে এই ধর্ম বেদ-বিরোধী। অর্থাৎ এই ধর্মে বৈদিক কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে ভক্তিমূলক উপাসনা বিহিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বহু পল্লবিত যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডের যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভক্তি ধর্মের যুগ যখন ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইল, তখন সেই সন্ধিক্ষণে একটি বড় ঝড় আসিয়াছিল। আসিবারই কথা। এই বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকার যাহাদের হাতে, এবং সেই অধিকার লইয়া যাহারা সমাজে বিশেষ আদর পাইয়াছিলেন, তাহারা সহজে তার বেড়া ভাঙ্গিতে দেন নাই। এই ভক্তির বৈষ্ণব ধর্ম যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, তাহার একটি প্রমাণ—একদা ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এই ধর্মের গুরুরূপে দেখিতে পাই, এবং তাঁহার উপদেশের মধ্যে বৈদিক মন্ত্র ও আচারের বিরুদ্ধে আঘাতের পরিচয় পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় প্রমাণ এই—পুরাণে যে দুইজন মানবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তাঁহারা দুইজনই ক্ষত্রিয়,—একজন শ্রীকৃষ্ণ, আর একজন শ্রীরামচন্দ্র। *** ক্ষত্রিয়দলের এই ভক্তি-ধর্ম যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে তেমনি শ্রীরামের জীবনের দ্বারাও বিশেষভাবে প্রচার লাভ করিয়াছিল। **** শ্রীকৃষ্ণ কর্মকাণ্ডের নিরর্থকতা হইতে সমাজকে মুক্তি দিতে দাঁড়াইয়াছিলেন[১]।"

প্রভাসে যাদবকুল ধ্বংস হল নারদ-কণ্ব বিশ্বামিত্রের অভিশাপের ফলে নয়, কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরোধিতার ও চেষ্টায়, তা কৌটিল্যের ধর্মশাস্ত্রের ১।৬ ৩ প্রকরণে পাওয়া যায়—অতিমাত্রায় হর্ষের বশীভূত হয়ে দ্বৈপায়ন ঋষিকে আক্রমণ করে

১। পরিচয়—ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা—রবীন্দ্র রচনাবলী ১৮, পৃঃ ১৪৮-১৪৯

বৃষ্ণিকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তার থেকে অনুমান করা যায় যে প্রভাসে যাদবদের উৎসবকালে দ্বৈপাযন ঋষিও উপস্থিত ছিলেন, তিনি অক্রূর প্রভৃতি ভোজ অন্ধক নায়কগণের বৈদিক অনুষ্ঠানের সমর্থনে ও বৃষ্ণি নায়কগণের যজ্ঞ নিন্দার বিরুদ্ধে কথা বলেন, মদ্য প্রভাবে উত্তেজিত বৃষ্ণিগণ দ্বৈপায়ন ঋষির সমর্থক অন্ধক ভোজদের আক্রমণ করে নিজেরাও বিনষ্ট হয়, অন্ধক ভোজদেরও বিনষ্ট করে।

ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণের মতানুযায়ী তত্বকথা কিছু আছে, কিন্তু তার মতবিরুদ্ধ কথাও অনেক আছে। ডঃ রিচার্ড গার্বের মতে মূল গীতা অনুমান খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রণীত ও মহাভারতে সন্নিবেশিত হয়, পরে অনুমান খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাতে বৈদান্তিক ব্রহ্মতত্ব ও বৈদিক যজ্ঞের সমর্থনে শ্লোক যোজিত হয়। গীতায় একবার কৃষ্ণের ঐশ্বরিক রূপের প্রকাশ, তারপরে ক্রমে তাঁর অবনতি সে কথা কোন মতেই বলা যায় না।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দ্রোণ বধের উপায় করা হয় কৃষ্ণের মন্ত্রণায় অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ রটনা করে, সেটা যে মিথ্যা তা চতুর্দশ-পঞ্চদশ দিনের যুদ্ধ বিবরণ ভাল করে পড়লেই বোঝা যায়। চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধে দ্রোণ তাকে অতিক্রম করে অর্জুন, সাত্যকি, ভীমকে পরপর কৌরবব্যূহ ভেদ করে যেতে কেন দিলেন, দুর্যোধনের সেই প্রশ্নের উত্তরে দ্রোণ বলেছেন যে তাঁর বয়স পঁচাশী বৎসর হয়েছে, তার তুলনায় যুবক ক্ষিপ্রকর্মা যোদ্ধাদের আটকাবার তার সামর্থ্য নাই। চতুর্দশ দিবস সারাদিন তীব্র যুদ্ধের পরে দুর্যোধনের কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে দ্রোণ অবহার না করে সারারাত যুদ্ধের আদেশ দিলেন। ফলে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন; বিরাটরাজ ও দ্রুপদরাজ সেই ক্লান্তির ফলে দ্রোণের হস্তে প্রাণ দিলেন। ক্লান্ত দ্রোণও তাঁর তুলনায় যুবক ধৃষ্টদ্যুম্নের তীব্র আক্রমণ শেষ পর্যন্ত ঠেকাতে না পেরে নিহত হলেন, তা আশ্বমেধিক পর্বে বলা হয়েছে (৬০।১৮)। চতুর্দশ দিবসে এবং সারারাত যুদ্ধের পরে দ্রোণের দেহে নূতন করে অমিত বীর্য আবির্ভাবের কথা গ্রাহ্য নয়, তা শুধু কৃষ্ণের কলঙ্ক রটনার ভূমিকা প্রস্তুতি। কৃষ্ণের উপর আরোপিত যুদ্ধকালে অন্যান্য অন্যায় আচরণ কথাগুলিও গ্রাহ্য নয়, সে কথার পূর্বে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

কৃষ্ণ অপরাজেয় বীর ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, উত্তর ভারতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রস্থাপনের যে চেষ্টা তিনি করেছিলেন, তা প্রথমে যুধিষ্ঠিরের দ্যূতান্ধতার ও পরে ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনের লোভে ও ভীষ্ম দ্রোণের দুর্যোধনের দাবী অন্যায় জেনেও তার

পক্ষে যুদ্ধ করায় ব্যর্থ হয়। শেষ জীবনে নূতন নীতিমূলক ভক্তিবাদী প্রবৃত্তি লক্ষণ যে ধর্ম তিনি প্রচার করেছিলেন, তা দ্বৈপায়ন ঋষি ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের চেষ্টায় অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু তবু তার থেকে ভারতবর্ষে ক্রমে ভক্তিবাদী ভাগবত ধর্মের বিকাশ হয়, মূল শাণ্ডিল্য সংহিতা নষ্ট হওয়ায় সেই ধর্মের সরল বর্ণনা আর পাওয়া যায় না।

(খ) যুধিষ্ঠির: যুধিষ্ঠির মহাভারত কাহিনীর নায়ক। ভীম অর্জুনের মত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বা ধনুর্ধর তিনি নন, তবু শুধু তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলে নয়, নিজ চরিত্রগুণেও তিনি তাদের মান্য। তাঁকে দ্রোণের ইস্কুলের ফেল করা ছাত্র কোন মতেই বলা যায় না; বহু ছাত্রের মধ্যে একজন দু'জনই শ্রেষ্ঠ হয় দ্রোণের শিষ্যগণ মধ্যে একমাত্র অর্জুন দ্রোণ কর্তৃক একাগ্রতার পরীক্ষায় সফল হতে পেরেছিলেন; অবশিষ্ট ছাত্রগণ সাধারণভাবে শিক্ষিত, ফেল করা ছাত্র সেযুগে অস্ত্র শিক্ষকদের ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ কেহ থাকৃত না। যুধিষ্ঠির উত্তম রথী ছিলেন, রথাতিরথ সংখ্যান কালে ভীষ্ম তাঁকে রথোদার বা উত্তম রথী বলেছেন, দুর্যোধনকেও তাই বলেছেন—রথ যুদ্ধে একাধিকবার যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে পরাজিত করেছেন, যথা দ্রোণপর্বে ১৫০ অধ্যায়ে বিবৃত ঘটোৎকচ বধ পর্বের যুদ্ধারম্ভকালে এবং কর্ণপর্বে প্রথম দিনের যুদ্ধ বিবৃতির ২৮ ও ২৯ অধ্যায়ে বর্ণিত যুদ্ধে। ২৯ অধ্যায়ে ইঙ্গিত আছে যে যুধিষ্ঠির দুর্যোধনকে মারাত্মক আঘাত দিতে পারতেন, কিন্তু ভীমের কথায় নিবৃত্ত হ'লেন। শাস্ত্র বিদ্যায় যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তার বিরুদ্ধে কুন্তী একবার বলেছিলেন যে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের মত তিনি অধ্যয়ন ও যজ্ঞ নিয়ে থাকতে চান, তা ছেড়ে তাঁকে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম অনুসারে কাজ করতে হবে। হস্তিনাপুরে শিক্ষাকালে তিনি ম্লেচ্ছ ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, বারণাবতে নির্বাসন কালে বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় গৃহদাহের সম্বন্ধে সতর্ক করে দিলেন, তা যুধিষ্ঠিরই শুধু বুঝলেন। বনবাস কালে ব্যাস এসে তাকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যা শিখিয়ে অর্জুনকে শিখিয়ে ইন্দ্রলোকে অস্ত্রশিক্ষার জন্য প্রেরণ করতে বলেন। প্রতিস্মৃতি বিদ্যা ইন্দ্রলোকে বা মধ্য এশিয়ার আর্য নিবাসে প্রচলিত ভাষা, এই অনুমান অসঙ্গত নয়, ব্যাস অর্জুনকেই না শিখিয়ে যুধিষ্ঠিরকে শেখালেন, তার কারণ এই যে যুধিষ্ঠির শীঘ্র ভাষা শিখ্তে পারতেন, ব্যাস তাকে অল্প সময়ের মধ্যে তা শিখিয়ে চলে যান, পরে অর্জুন যুধিষ্ঠিরের কাছে শিখে তা আয়ত্ত করেন।

সমস্যা উপস্থিত হ'লে তার সমাধান নিজের উপরে নির্ভর করে যুধিষ্ঠির শুধু শেষ জীবনে নয়, প্রথম জীবনেও করেছেন। হিড়িম্ব বধের পরে হিড়িম্বা যখন ভীমের সঙ্গ কামনা করে, তখন ভীম ও কুন্তী কি উত্তর দেবেন স্থির করতে পারেন নাই, যুধিষ্ঠির স্থির করে দিলেন যে একটা বিবাহ অনুষ্ঠান করে—"কৃতকৌতুক-মঙ্গলম্" হিড়িম্বা সারাদিন ধরে ভীমের সঙ্গ করতে পারবে, কিন্তু রাত্রি হলেই ভীম ফিরে এসে কুন্তী, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সঙ্গে থাকবে। তারপর অর্জুন যখন লক্ষ্যবেধ করে দ্রৌপদীকে লাভ করেন, তখন যুধিষ্ঠির প্রথমে অর্জুনকে বলেছিলেন, তুমি লক্ষ্যবেধ করে কন্যাকে জয় করেছ, তুমি একে যথারীতি বিবাহ কর; কিন্তু অর্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ না হতে বিবাহ না করতে চাইলে, এবং সব ভাইদের দ্রৌপদীর উপর নিবদ্ধ মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে যুধিষ্ঠিরই স্থির করলেন যে দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী হবে। দ্রুপদ রাজ সেরূপ বিবাহে প্রথমে আপত্তি করেছিলেন, তাকে যুধিষ্ঠিরই পুরাতন কালের উদাহরণ দিয়ে সম্মত করেন, ব্যাস কথিত অনৈসর্গিক কথায় দ্রুপদ রাজ ভুলেছিলেন তা মনে করবার কারণ নাই; তা ছাড়া ব্যাস কথিত উপাখ্যানদ্বয় পরের কালে প্রক্ষিপ্ত। যুধিষ্ঠিরের সংকল্পের দৃঢ়তায় ও অন্য পাণ্ডব ভ্রাতাদের নীরব সমর্থনে দ্রুপদরাজ তাঁর কন্যার পঞ্চপতিত্ব মেনে নিতে বাধ্য হ'ন।

অজ্ঞাতবাসের পরে জ্ঞাতিবধ গুরু বধ করে রাজ্য উদ্ধার করা উচিত হবে কিনা, তা নিয়ে স্বভাবতঃ যুধিষ্ঠির দ্বিধা করেছেন, কৃষ্ণ অর্জুন প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, কিন্তু যুদ্ধকালে যুধিষ্ঠির দৃঢপদে জয়ের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন, জ্ঞাতিবধ বা গুরুবধ হবে বলে দ্বিধা করেন নাই। প্রথম দিন অর্জুন পূর্ণ বিক্রমে যুদ্ধ করলেন না, ভীষ্ম দ্রোণের তীব্র যুদ্ধের যথাযোগ্য প্রতিকার করলেন না, সে বিষয়ে কৃষ্ণের নিকট যুধিষ্ঠির দুঃখ জানিয়েছেন, তবে যুদ্ধ হতে বিরতির কথা চিন্তা করেন নাই। নিজে যথাসাধ্য যুদ্ধ করেছেন, প্রতিপক্ষের অতিরথদের সঙ্গে তিনি পেরে উঠবেন না, তা তাঁর জানা ছিল, তবু তারা সম্মুখীন হ'লে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছেন। জয়দ্রথ বধের দিন সাত্যকি ও ভীমকে অর্জুনের সাহায্যে পাঠিয়ে তিনি যুদ্ধে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ঘটোৎকচের মৃত্যুতে তাঁর দুঃখ প্রকাশ সহজে উদ্বেলিত অশ্রুবর্ষণ নয়, কিন্তু স্বপক্ষীয় একজন অতিরথের মৃত্যু সম্বন্ধে স্বপক্ষীয় বীরদের উদাসীনতার প্রতি ভৎসনা।

যুদ্ধশেষে জ্ঞাতি পুত্র বন্ধু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণ প্রভৃতির মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয়ে যুধিষ্ঠির রাজ্যত্যাগ করে অরণ্যে বাসের কথা বলেছিলেন, এইরূপ সাময়িক প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক বলা যায় না। তাঁর সংকল্প সমর্থনে বিতর্ক বহু দীর্ঘ মনে হয়, কিন্তু ভীষ্মের শরশয্যা শায়িত অবস্থায় দীর্ঘ উপদেশের পটভূমি প্রস্তুত করতে এইভাবে যুধিষ্ঠিরের বৈরাগ্য সমর্থনে তর্ক প্রলম্বিত করা হয়েছে অনুমান করা চলে। রাজ্যভার নিয়ে বহু বৎসর ধ'রে যুধিষ্ঠির সুষ্ঠুভাবে রাজ্যশাসন করেন। অর্জুনের নিকট হতে কৃষ্ণের মৃত্যু ও প্রভাসে যাদব কুলের ধ্বংসের কথা শুনে তিনি যে রাজ্য পরিক্ষিতের হাতে দিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণের সংকল্প করেন, সেই তার প্রথম একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদাহরণ নয়। সেই সময় পাণ্ডবগণের জীবনের কর্মভূমি হতে বিদায় নেবার সময় হয়ে এসেছিল, তাই যুধিষ্ঠিরের প্রব্রজ্যা গ্রহণের সিদ্ধান্তে তাঁর ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণা সমর্থন জানিয়েছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে কলঙ্ক তার মিথ্যা ভাষণ নয় কোন মিথ্যা ভাষণ তিনি করেন নাই; তাঁর কলঙ্ক দ্যূতমত্ততায় শুভবুদ্ধি আচ্ছন্ন হতে দেওয়া, তার ভ্রাতৃগণকে, নিজেকে ও দ্রৌপদীকে দ্যূতের পণ করা। এই পণের ফলেই ভ্রাতৃগণের ও দ্রৌপদীর কুরুসভায় অপমান, ও তার ফলে অবশেষে কুরুকুল ধ্বংস। দ্রৌপদীকে পণ করায় ভীম ক্রুদ্ধ হ'য়ে যুধিষ্ঠিরের বাহু জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। জ্বালিয়ে দেওয়া সমর্থনযোগ্য হ'ত না, কিন্তু এইভাবে যুধিষ্ঠির যে অন্যায় করেছেন, ভীমের মুখে তার প্রকাশ যুক্তিযুক্ত হয়েছে। সত্যপালনের ও ধর্মরক্ষার মান যুধিষ্ঠির খুব উচ্চে রেখে তার ফলে দুঃখ ভোগ করেছেন। বনপর্বে ৩৪ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির তাঁর মনোভাব বুঝিয়ে বলেছেন—দ্যূতকালে পাশার দান প্রতিবারই শকুনির বাঞ্ছিতভাবে পড়ে, দেখে তিনি অনুমান করেন যে শকুনি শঠতা করছে, কিন্তু ক্রোধবশতঃ নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না; সব হারিয়ে দ্রৌপদীর লব্ধ বরের ফলে সব আবার ফিরে পেয়ে যখন পুনর্দ্যূতে আহুত হ'লেন, তখন দ্যূতের পণ শুনে ভীম বা অর্জুন কোন আপত্তি তুললেন না, তিনিও পণ স্বীকার করে নিলেন, সকলের সম্মুখে পণের সর্ত স্বীকার করে তা পালন করাই তিনি ধর্ম বিবেচনা করেছেন। দ্যূতের জয়ে শঠতা থাকলে সেই দ্যূতের পণের সর্ত কার্যকর নয়, সেই কথা যুধিষ্ঠির স্বীকার করতে চান নাই, কৃষ্ণ প্রভৃতি বনবাসের আরম্ভ কালেই এসে যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তৎনই অভিযান ক'রে রাজ্য উদ্ধার ক'রে দেবার প্রস্তাব করেন, তা যুধিষ্ঠির প্রত্যাখ্যান করেন; কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে

নিজের ধর্মবুদ্ধি অনুসারে চলতে দেন ; তাকে সত্য কখন পালনীয়, কখন পালনীয় নয়, সে কথা বোঝাতে চেষ্টা করেন নাই—যে তত্ত্ব অর্জুনকে বোঝাবার প্রয়োজন হয়েছিল কর্ণের সেনাপতিত্ব কালে যুদ্ধের সময়। যুধিষ্ঠির যদি কৃষ্ণের কথামত দ্যূতের পণের সর্ত পালনীয় নয় মেনে নিয়ে সত্ত যুদ্ধে সম্মতি দিতেন, তাহলে বোধহয় যুদ্ধ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মত ততটা ক্ষত্র বিধ্বংসী হ'ত না। তবু যুধিষ্ঠিরকে তাঁর স্বকীয় সত্য পালন ও ধর্মরক্ষার মানের জন্য শ্রদ্ধা না ক'রে পারা যায় না।

(গ) দুর্যোধন : দুর্যোধন মহাভারত কাহিনীতে প্রতিনায়ক। তাঁর ধারণা ছিল যে হস্তিনাপুরের সমস্ত রাজ্য তাঁর প্রাপ্য, কারণ যদিও প্রথমে তাঁর পিতা ধৃতরাষ্ট্র অন্ধত্ব হেতু রাজ্য পান নাই, তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডু রাজ্যলাভ করেছিলেন, তবু পাণ্ডু রাজ্যভার ত্যাগ করে গেলে তা ধৃতরাষ্ট্রের হস্তেই আসে, ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে দুর্যোধনের দাবী। বাল্যকাল হতেই দুর্যোধন পাণ্ডবদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন, ভীমকে হত্যা করবার চেষ্টা তিনি তিনবার করেছেন, পরে দ্রোণের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হলে দুর্যোধনের নির্বন্ধাতিশয়ে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বারণাবতে নির্বাসিত করেন, সেখানে পাণ্ডবগণকে জীবন্তে দগ্ধ করা দুর্যোধনের অভিপ্রায় ছিল। তারপর হস্তিনাপুর রাজ্য ভাগ করা হ'ল, ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করে পাণ্ডবগণ তাদের রাজ্যার্দ্ধ সুসমৃদ্ধ ক'রে তুললেন। দুর্যোধন তখন কপট দ্যূতে ত্রয়োদশ বর্ষের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য জিতে নিলেন, ত্রয়োদশ বর্ষ-শেষে উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী লোকে পাণ্ডবগণকে তাদের রাজ্যভাগ ফিরিয়ে দিতে বললে দুর্যোধন তা উপেক্ষা করেন। ইন্দ্রপ্রস্থের অদূরে যখন কৃষ্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি সৈন্যসহ এসে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সত্ত সত্ত যুদ্ধে পাণ্ডবগণের রাজ্য উদ্ধার করে দেবার প্রস্তাব করেন, দুর্যোধন সেকথা জেনে ভীষ্মাদির নিকট বলেন যে যাদব-পাঞ্চালদের বাহিনীর সম্মুখীন না হয়ে পাণ্ডবগণের রাজ্য ছেড়ে দেওয়া ভাল হবে (উদ্যোগ ৫৫ অধ্যায়), কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা বলেন যে যাদব-পাঞ্চাল বাহিনী তাঁদের পরাজিত করতে পারবে না। এইভাবে শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা ভীষ্ম, দ্রোণাদির কথাতেই নষ্ট হয়ে গেল। পাণ্ডবগণের বনবাস ও অজ্ঞাতবাসকাল শেষ হ'লেও দুর্যোধনের মনে ভীষ্মাদির দেওয়া সেই আশ্বাস কাজ করছে, তিনি ভেবেছেন যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, এবং অন্যান্য বহু বীরকে পাণ্ডব পাঞ্চালগণ কখনও পরাজিত করতে পারবে না। এই বিশ্বাস

না থাকলে দুর্যোধন সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হ'তেন মনে হয়। দৌত্যকালে দুর্যোধন কৃষ্ণের সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সভা ছেড়ে গেলে ভীষ্ম বলেন যে দুর্যোধন দুর্বিনীত, তার কয়েকজন পরামর্শদাতা আছে, সে মনে করছে যে যুদ্ধে পাণ্ডব-পাঞ্চালগণ জয়লাভ করতে পারবে না, তাই সে যুক্তিতে কর্ণপাত না করে সকলকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে; তার উত্তরে কৃষ্ণ পরিষ্কার ভাষায় বললেন, শুধু দুর্যোধনের দোষ নয়, কুরুবৃদ্ধদেরও দোষ আছে, তাঁরা যদি বোঝেন যে দুর্যোধন কুরুকুলকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে, তারা কেন তাকে শাসন করেন না? কিন্তু ভীষ্ম, বাহ্লীক, সোমদত্ত ইত্যাদি কুরুকুলের প্রবীণগণ শুধু যে দুর্যোধনকে শাসন করবার চেষ্টা করলেন না তা নয়, যুদ্ধ হ'লে তারা দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করবেন না, সে কথাও বললেন না। এই কুরুবৃদ্ধগণ ও দ্রোণ যুদ্ধে বিরত থাকবেন বললেই সন্ধি হয়ে যেত। অতএব ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসকারী যুদ্ধের জন্য দায়িত্ব একা দুর্যোধনের নয়।

দুর্যোধন দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর অপমান করে তাঁর চরিত্রের হীনতা প্রকাশ করেছিলেন। নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম করা সমর্থন ক'রে তিনি বলেছেন, যে ঈশ্বর—শাস্তা—তাকে জন্মের পূর্বে যে প্রবৃত্তি ও প্রবণতা দিয়ে গঠন করেছেন, তিনি সেই অনুসারেই চলেছেন।[১] সেইকথা উদ্যোগ পর্বেও তিনি বলেছেন।[২] কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রবণতার ঊর্দ্ধে উঠ্‌বার ক্ষমতা আছে, চেষ্টা করলে মানুষ স্বভাবগত প্রবণতা জয় করে ধর্মের পথে অগ্রসর হতে পারে, সে কথা যেন দুর্যোধন মান্‌তে চান নাই। নিজের ভ্রান্ত সংস্কার বশে জীবন চালিত করে দুর্যোধন নিজেকে ও ক্ষত্রিয় কুলকে বিরাট ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছেন।

(ঘ) ধৃতরাষ্ট্র: ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম কি তা ভালো করে জানতেন, ধর্মকথা শোনার ব্যাপারে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। তবু তিনি অন্যায় অধর্ম জেনেও অনেক কাজ করেছেন, যথা পাণ্ডবগণকে বারণাবতে নির্বাসন দিয়ে তাদের মৃত্যুর মুখে ফেলা,

---

১। সভাপর্ব ৬৪৮:

"একঃ শাস্তা ন দ্বিতীয়োঽস্তি শাস্তা গর্ভেশয়ানং পুরুষং শাস্তি শাস্তা।
তেনানুশিষ্টঃ প্রবণাদিবাম্ভো যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা ভবামি॥"

২। উদ্যোগপর্ব ১০৫।৪০: "যথৈবেশ্বরসৃষ্টোঽস্মি যদ্ ভাবি যা চ মে গতিঃ।
তথা মহর্ষে বর্তামি কিং প্রলাপঃ করিষ্যতি॥"

দ্যূতক্রীড়া হতে নানা অমঙ্গল উদ্ভূত হয় জেনেও দ্যূতক্রীড়ার আহ্বান করা, দ্রৌপদী কুরু সভায় নীত হয়ে অপমানিত হচ্ছেন জেনে যথাকালে তার প্রতিকার না করা, দুর্যোধনের পাপমতি অর্থাৎ পাণ্ডবগণের রাজ্যাংশ ফিরে না দেবার ইচ্ছা আছে জেনেও সমগ্র রাজ্যভার তার হাতে ছেড়ে দেওয়া, এবং কৃষ্ণের সন্ধির প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত বুঝেও দুর্যোধনকে যে প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য না করা। রাজ্যভার ও শেষ সিদ্ধান্তের দায়িত্ব দুর্যোধনের হাতে, ব'লে তিনি নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তিনি চেষ্টা করলে দুর্যোধনকে বাধ্য করতে পারতেন—তিনি যদি বল্'তেন যে দুর্যোধন সম্মত না হলে তিনি ভীষ্ম ও বাহ্লীককে নিয়ে অরণ্য বাসে চলে যাবেন, তা হলে দুর্যোধনের সম্মত না হয়ে উপায় থাকত না। ধৃতরাষ্ট্র সম্বন্ধে বহু প্রচলিত একটি শ্লোক প্রযোজ্য, যদিও শ্লোকটি মহাভারতে স্থান পায় নাই—"জানামি ধর্ম ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম ন চ মে নিবৃত্তি :।

কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম কি জেনে তা অবলম্বন করেন নাই, অধর্ম বুঝেও অধর্ম হতে নিবৃত্ত হ'ন নাই, তাঁর হৃদয়স্থিত প্রবৃত্তি—লোভ ও পুত্রের প্রতি অন্ধ স্নেহ অনুসারেই তিনি চলেছেন, সেই লোভ ও অন্ধ স্নেহই যেন অপদেবতা হয়ে তাকে চালিত করেছে। প্রসঙ্গতঃ বলা কর্তব্য যে শ্লোকটির দ্বিতীয় পংক্তির পাঠভেদ হৃষীকেশরূপী ভগবানের নামে কুৎসা প্রচার—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" একথা যিনি ধর্ম জেনেও ধর্মপথে চলেন না, অধর্ম জেনেও তার থেকে নিবৃত্ত হন না, তার পক্ষে বলা ভগবানকে উপহাস করা মাত্র।

৬. মহাভারতে ধর্ম ও নীতিকথা

প্রমাণ মহাভারতে ধর্ম ও নীতিকথা বার বার বিবৃত হয়েছে। শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যা ও আরাধনার কথা বহু প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক পরের কালে যোজিত উপাখ্যানে ও সন্দর্ভে বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণুর মহিমার কথা ও তাঁর উদ্দেশ্যে আরাধনার কথাও যথেষ্ট আছে। ব্রহ্মার উল্লেখ অপেক্ষাকৃত কম, তবু অনেক স্থানে আছে; সুন্দ উপসুন্দ উপাখ্যানে, রাম উপাখ্যানে তাকে পরম দেবরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এই ত্রিদেবের উপাসনা কৌরব পাণ্ডবকালের পরে ভারতবর্ষে প্রচলিত

হয়; তাদের কালে বৈদিক কর্মকাণ্ডের প্রাধান্য ছিল, যুধিষ্ঠির নির্বাসন কালেও অগ্নিহোত্রের ব্যবস্থা নিয়ে অরণ্যে গিয়েছেন। আদিপর্বে আছে যে ব্যাস ঋষি বেদের কর্মকাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড, যোগতত্ত্ব, ধর্ম অর্থ ও কামের তত্ত্ব, ধর্মার্থকামযুক্ত শাস্ত্র সমূহ সবই আয়ত্ত করেছিলেন, এবং মহাভারতে এই সব তত্ত্ব সন্নিবেশিত করেছিলেন।[১] এখানে মোক্ষের কথা নাই। কিন্তু শান্তিপর্বে মোক্ষ-ধর্মানুশাসন অনেক অধ্যায় নিয়ে বিবৃত হয়েছে। মোক্ষের প্রধানতঃ তিনটি পথ বলা হয়েছে—কর্মসন্ন্যাসের পথ—যা শুকদেব অবলম্বন করেছিলেন; কর্ম-যোগের পথ—যা রাজর্ষি জনক অনুসরণ করেছিলেন, এবং ঐকান্তিক ধর্ম বা শুদ্ধা ভক্তির পথ, যা নারদ কথিত বলা হয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণ যার আদি রূপের প্রবর্তক। কৃষ্ণ উপদিষ্ট ভাগবত বা নারায়ণীয় ধর্ম ভক্তিমূলক প্রবৃত্তি মার্গ শিক্ষা দেয়, শান্তিপর্বে এই ধর্মকে প্রবৃত্তি লক্ষণ বলা হয়েছে[২], কিন্তু তারপরে ঐকান্তিক নাম দিয়ে নিবৃত্তিমূলক শুদ্ধাভক্তির ধর্মে পরিণত করার চেষ্টা হয়েছে।[৩]

মহাভারতের যুগে আর্যজাতির উদ্দাম প্রাণশক্তি ছিল, বৈরাগ্যমূলক মোক্ষ-ধর্মের অনুসরণ দুই একজন মহর্ষি ও রাজর্ষি করে থাকতে পারেন, জনসাধারণ ও তাদের নেতৃবর্গ ধর্মার্থকামযুক্ত জীবনযাত্রা পথেই বলেছেন। অর্থার্জন ও কামভোগ যেন ধর্ম অতিক্রম করে না হয়, সেদিকেই সবার লক্ষ্য ছিল, শান্তিপর্বে ১৬৭ অধ্যায়ে ভীষ্মের উপদেশ বিরতির সময় পাণ্ডবগণ বিদুরসহ তত্ত্ব আলোচনা করেন, বিদুর বলেন, অধ্যয়ন, তপ, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞানুষ্ঠান, ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সত্য ও সংযম ধর্মের অঙ্গ, ধর্মে অবিচলিত থাকলে অর্থ ও কাম লাভ হয়। অর্জুন বলেন, পৃথিবী কর্মভূমি, কৃষি বাণিজ্য পশুপালন শিল্প ইত্যাদি সব কর্মের আরম্ভেই অর্থের প্রয়োজন, অর্থ না থাকলে যজ্ঞদানাদিও করা যায় না, অতএব অর্থই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, অর্থোপার্জনে প্রথমে মন দিতে হবে। নকুল ও সহদেব বলেন, ধর্মকে আশ্রয় করে অর্থোপার্জন করা কর্তব্য। ভীম বলেন, মানুষের মনে কামনা না থাকলে কর্মে বা ধর্মে প্রবৃত্তি হয় না, তাই কামই সর্বশ্রেষ্ঠ। যুধিষ্ঠির বলেন, মোক্ষ কি জানি না, কিন্তু ঋষিগণ বলেন যে যিনি পাপ ও পুণ্য কর্ম করেন না,

১। আদি: ১।৪৮-৫০

২। শান্তি: ৩৩৭।৮৩

৩। শান্তি: ৩৪৮ অধ্যায় (কা৷ ম ৩৪৭ অধ্যায়।)

লোষ্ট্র ও কাঞ্চনকে সমান মনে করেন, তিনি সুখ দুঃখের অতীত হয়ে মোক্ষ-লাভ করতে পারেন; মোক্ষই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। যুধিষ্ঠিরের ভাষণে নিজের প্রত্যয়ের অভাব মনে হয়, তিনি আজীবন বৈদিক কর্মকাণ্ডের পথই ধরে চলেছেন। অতএব এখানে তাঁর কথার উপর বেশী মূল্য দেওয়া যায় না। মহাভারতের যুগে ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গই জীবনের লক্ষ্য ছিল বলা যায়।

কুরুক্ষেত্রের ত্রিলোকবিধ্বংসী যুদ্ধের পরে জাগতিক সুখ সমৃদ্ধির অনিত্যতার কথা মানুষের মনে আসে। বিদুর স্ত্রীপর্বে ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে বলেছেন—"সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ। সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্।"[১] অর্থাৎ সব স্তূপ, প্রস্তর মৃত্তিকাদির ঢিপি, ক্ষয় হ'তে হ'তে শেষ হয়, পতনে উন্নতির অবসান হয়, সংযোগের পরে বিয়োগ আসে, জীবন মৃত্যুতে শেষ হয়। কিন্তু মৃত্যু সত্ত্বেও জীবনের ধারা অবিচ্ছন্ন থাকে, নূতন জাতকের জন্ম হয়, নূতন আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে যোগ হয়, পতনের পরে দেশে বা সমাজে আবার উন্নতি আসে, স্তূপ যেমন কালে বা ব্যবহারে ক্ষয় হয়, তেমন মানুষের কর্মফলে বা স্বাভাবিক উৎপাতের ফলে নূতন স্তূপ গড়ে ওঠে। সাধারণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ উপদেশ হল "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থং চ চিন্তয়েৎ। গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ॥" স্ত্রীপর্বেই বলা হয়েছে "আদাবেব মনুষ্যেণ বর্তিতব্যং যথাক্ষমম্। যথা নাতীতমর্থং বৈ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে॥[২]" অর্থাৎ মানুষের প্রথমেই বিচার করে যথাসাধ্য কর্ম করা কর্তব্য, যাতে পরে কৃত বা অকৃত কর্মের জন্য অনুতাপ করতে না হয়।

কৃষ্ণ সর্বদা কর্মপথে চলবার, কর্তব্য স্থির করে নিয়ে সেই কর্ম অতন্দ্রিত হয়ে করবার উপদেশ দিয়েছেন। মহাভারতে বৈরাগ্য প্রশংসিত হয়েছে প্রধানতঃ মোক্ষধর্মানুশাসন অনুপর্বে; তাছাড়া প্রায় সর্বত্র গার্হস্থ্য ধর্ম প্রশংসিত হয়েছে। পিতৃঋণ শোধ করতে বিবাহ ও সন্তানোৎপাদন সব সমর্থ পুরুষের কর্তব্য তা বলা হয়েছে। আধুনিক ভাষায় বলা যায় যে স্বজাতির ধারা ক্ষীণ হয়ে না আসে তা প্রত্যেক সমর্থ পুরুষের দেখা কর্তব্য বা ধর্মের অঙ্গ, তা মহাভারতে একাধিক বার বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ ও মহাভারতের অন্যান্য অনেক পুরুষ শতবর্ষ

১। স্ত্রীঃ ২।৩

২। স্ত্রীঃ ১।৩৫

বা ততোধিক কাল কর্মময় জীবন যাপন করেছেন, পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ, মনুর সে উপদেশ সেকালে কারো কল্পনায় আসে নাই। ঈশোপনিষদে "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ"—কর্ম করে শতবর্ষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে—এই ছিল তখনকার আদর্শ।

কোন জাতি যদি পৃথিবীতে সমৃদ্ধভাবে বেঁচে থাকতে চায়, কর্মমূলক জীবনবাদী ধর্ম সে জাতির একমাত্র পথ; ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ তাঁর ভারতবর্ষের ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন, বৌদ্ধগণ তাদের ধর্মের লক্ষ্য নির্বাণের মতই ভারতবর্ষ থেকে ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল। মধ্যযুগে পাশ্চাত্য খৃষ্টানদের পরলোকের দিকে লক্ষ্য ছিল, পৃথিবীকে দুঃখময় লোক[১] মনে করত, তখন তারা জীবনধর্মী মুসলিম শক্তির নিকট পরাজিত হয়েছে, মধ্যযুগের পরলোকমুখী ধর্মভাব কাটিয়ে উঠে তারা প্রবল হয়ে উঠেছে। ভারতে বৈদিক আর্যগণ প্রাণধর্মী ছিলেন, ক্রমে মুক্তিকামী বৈরাগ্যধর্মাশ্রয়ী হয়ে তাদের দুর্বলতা এসেছে। সৃষ্টির মধ্যে জীব বা প্রাণ ভগবানের একটি আশ্চর্য অভিব্যক্তি, সৌরমণ্ডলে নয়টি গ্রহের মধ্যে শুধু পৃথিবীতেই প্রাণের বিকাশ আছে। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে সেই প্রাণকে অস্বীকার করার চেষ্টা, মোক্ষকে নিশ্রেয়স বলে জীবন হতে পলায়নের চেষ্টা যারা করে, তারা সৃষ্টিতে যে ক্রমবিকাশ অন্তর্লীন পরমাত্মার প্রেরণায় প্রকৃতি সাধন করছে, তাকে অস্বীকার করে বিনাশের পথে চলেছে তাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—তা কেবল একজন দ্রষ্টা কবির পক্ষে নয়, যে জাতি পৃথিবীতে টিকে থাকতে, পৃথিবীতে সমৃদ্ধিলাভ করতে চায়, যে জাতির সকলের পক্ষেই সত্য। একদিকে পৃথিবীর সমৃদ্ধ শক্তিশালী জাতিদের সমান হবার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে ত্যাগ বৈরাগ্যমূলক মোক্ষধর্মের প্রচার, এই দুটির মধ্যে যে আলো অন্ধকারের সম্পর্ক, সে কথা আমাদের ভালো করে বোঝা প্রয়োজন। মহাভারতে শান্তিপর্বে মোক্ষধর্মের বিবৃতি আছে, কিন্তু তা পরের কালের যোজনা, মহাভারতের যুগে যে অন্য আদর্শ ছিল, তা শান্তিপর্বের ১৬৭ অধ্যায়ে ভীম, অর্জুন, নকুল সহদেবের কথা হতেই প্রমাণ হয়, আদিপর্বের ১।৪৮-৫০ শ্লোক থেকেও তা স্পষ্ট দেখা যায়। সমৃদ্ধ জাতিদের সমান হতে হলে এখন আমাদের মহাভারত যুগের প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম, বা তার আধুনিক সংস্করণ, অনুসরণ করতে হবে।

১। Vale of tears.

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ প্রচারিত মূল ভাগবত ধর্মের কথা আসে। আর্য জাতির উদ্দাম প্রাণ চঞ্চলতা একদিকে রুদ্ধ করে আনছিল ক্রমবর্দ্ধমান যজ্ঞানুষ্ঠানের জটিলতা, অন্যদিকে জীবনকে দুঃখময় বলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে পরিহার ক'রে বৈরাগ্যের পথে মোক্ষ বা মুক্তির আদর্শ প্রচার। কৃষ্ণের প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম দ্রব্য যজ্ঞানুষ্ঠান ও বৈরাগ্যের পথে মোক্ষলাভ সাধনা, এই দুটি পথকেই অস্বীকার করে সত্য, ঋজুতা, তপ, অহিংসাকে ভিত্তি করে নরনারীকে তাদের মিলিত জীবনকে সোমযজ্ঞের মত মনে করে নিষ্ঠাভরে সংসারের কর্তব্যপালন করতে বলেছে; সেই সঙ্গে বলেছে যে নারায়ণ বা ভগবান নিজেকে সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করেছেন প্রথমে জড়জগতরূপে, পরে পৃথিবী আদি লোকে প্রাণ বা জীবরূপে, পরে জীবের মধ্যে মন রূপে, এবং তারপরে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে অহঙ্কার বা অহম্‌ভাব (ego-sense) রূপে—যার বলে মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে; ভগবানের এই চতুর্ব্যূহে প্রকাশ স্মরণ করে প্রতিদিন ভক্তিভরে ভগবানের পূজা বা আরাধনা করে হৃদয়ের মধ্যে ও উর্দ্ধলোকে আত্মার ও ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করতে চেষ্টা করতে হবে। এই কৃষ্ণ প্রচারিত মূল ভাগবৎ ধর্মকে বৈদিক যজ্ঞবিধির ধারক ব্রাহ্মণদের তীব্র আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে, এবং এই ধর্ম নিবৃত্তিমূলক ধর্মের প্রচারকগণের দ্বারাও নিন্দিত হয়েছে। নানা বিরোধিতা সত্বেও কৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম ভক্তির ধর্ম রূপে থেকে গেছে, তবে সেই ভক্তিধর্ম বা ভাগবতধর্ম কৃষ্ণ প্রচারিত ধর্ম থেকে অনেকাংশ ভিন্ন রকম হয়ে গেছে, তার মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের আবশ্যকতাকে গৌণ স্থান দেওয়ায় ধর্ম কিছু প্রাণহীন হয়ে গেছে।

পণ্ডিচেরীর ঋষি অরবিন্দ তাঁর Life Divine গ্রন্থে যে দর্শন ও ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা কৃষ্ণ প্রচারিত মূল ভাগবত ধর্মের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়, আর তার মধ্যে যে কথা অস্পষ্ট ছিল তাকে পরিস্ফুট করেছে। তিনিও বলেছেন যে ব্রহ্মের সত্তা প্রথমে নানা জড়জগতরূপে প্রকাশ পেয়েছে, তার মধ্যেই ব্রহ্মের চিৎশক্তি অন্তর্লীন আছে; তার থেকে উপযুক্ত অবস্থায় প্রাণ বা জীবের সৃষ্টি হয়েছে, জীবের মধ্যে মনের ও মানুষের মধ্যে অহং ভাবের প্রকাশ হয়েছে—এই যে ক্রমবিকাশ, তাকে মানুষ তার অহং ভাব প্রভাবে সাধনা করে ত্বরান্বিত করতে পারে; লক্ষ্য হ'ল মনুষ্য সাধারণের দিব্য জীবন প্রাপ্তি—সেই পথে চলতে কেউ-কেউ মোক্ষের পথে ব্রহ্মে লীন হতে পারে, কেউ পরা ভক্তির পথে ভগবানের

সালোক্যলাভ করতে পারে, কিন্তু এইভাবে দুই একজনের পার্থিব জীবনযাত্রা হতে বিচ্যুতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়—এরূপ সিদ্ধজনের বিচ্যুতিতে মনুষ্য সাধারণের জীবন উপকৃত হয় না এবং সাধারণের জীবনযাত্রার মান নেমে যায়—ভগবানের উদ্দেশ্য যে সমগ্র মানব সমাজ দিব্য জীবনের পথে গিয়ে পৃথিবীতেই নূতন স্বর্গ গড়ে তুলবে ; যারা নিজ চেষ্টায় শীঘ্র উন্নতি লাভ করেন, তাদের কর্তব্য সংসার হতে অপসৃত না হয়ে কর্ম করে সমস্ত মানব জাতিকে উন্নতির পথে নেবার চেষ্টা করা। অরবিন্দ তাঁর "সাবিত্রী" নামক কাব্যে বলেছেন যে রাজা অশ্বপতি আত্মদর্শন করে ভগবানের কৃপা পেয়েও সংসারে থেকে সাবিত্রীর জন্ম দিলেন, যাতে নবজাতিকা মানুষকে দিব্য জীবনের পথে নিতে সাহায্য করতে পারে ; এবং সাবিত্রী ও বিবাহের পরে সাংসারিক জীবনের মধ্যেই আত্মদর্শন করে শক্তিলাভ করে সেই শক্তিবলে মৃত্যুদেবতার সম্মুখীন হয়ে স্বামীকে মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে আনলেন, ও স্বর্গে সুখের জীবনের প্রলোভন ত্যাগ করে সংসারে ফিরে পুত্র কন্যার জন্ম দিলেন, যাতে তারা মানুষকে দিব্য জীবনের পথে নিতে চেষ্টা করতে পারে। অর্থাৎ দিব্যজীবন লক্ষ্য করে তার জন্য সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে, তাই হ'ল এই ধর্মের মূল কথা।

পৃথিবীতে সমৃদ্ধজাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করলে কৃষ্ণ ও অরবিন্দ নির্দিষ্ট পথই একমাত্র পথ, তাতে সন্দেহ নাই।

আর্য হিন্দু সমাজে পৌরাণিক ও মধ্য যুগে বহু ক্ষয়কারী ছিদ্র প্রবেশ করেছিল। আহারশুদ্ধি ও স্পর্শশুদ্ধির ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে সমাজপতিগণ বহু পুরুষকে সমাজ থেকে বহিস্কৃত করেছেন, আহারশুদ্ধি বা স্পর্শশুদ্ধি সম্বন্ধে দোষ দূর করতে তাঁরা তুষানলে প্রবেশ বা জলন্ত ঘৃতপান রূপ কষ্টকর মৃত্যুকে প্রায়শ্চিত্ত রূপে নির্দিষ্ট করেছেন, যার ফলে সমাজে ফিরে আসতে যারা উৎসুক ছিল, তারা বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে কালাপাহাড়ের মত হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রভূত ক্ষতি করেছে—তার জন্য সমাজপতিদের ভ্রান্ত জীবন দর্শনই দায়ী। কাশ্মীরের ছলে বলে ধর্মান্তরিত বহু প্রজা যখন স্বধর্মে ফিরতে চেয়েছে, কাশ্মীর পণ্ডিতদের আত্মঘাতী বিধানের ফলে তা সম্ভব হয়নি, সে কথা ধর্ম নিরপেক্ষ জবাহারলাল নেহরু তাঁর Discovery of India গ্রন্থে বলে গেছেন। সমাজের পুষ্টির জন্য নারীরক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন, সে কথাও মধ্যযুগে সমাজপতিরা বুঝতে চান নাই, কারণে অকারণে সামান্য বিচ্যুতি হেতু বা বিচ্যুতির অপবাদ হেতু তাঁরা নারীকে সমাজভ্রষ্ট করে বিধর্মীর

আশ্রয় নিতে বাধা করেছেন। কিন্তু মহাভারতের খিলপর্ব হরিবংশেই আছে যে অকামা নারী ধর্ষিতা হলেও ত্যাজ্যা বা দুষ্যা হয় না—"ভানোঃ প্রভা শিখা বহ্নের্বেদীহোত্রে তথাহুতিঃ। পরামৃষ্টাপ্যসংসক্তা নোপদুষ্যন্তি যোষিতঃ"[১] সেকথা অন্য ধর্মশাস্ত্রেও আছে, কিন্তু সমাজপতিগণ তা গ্রাহ্য করেন নাই। শত্রুর আক্রমণের মুখে স্ত্রী কন্যা ফেলে পলায়নের দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে অনেক দেখা গেছে, যদিও তা কাপুরুষতার চূড়ান্ত। "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" এই প্রবচন কে রচনা করেছিল তা এখন অজ্ঞাত, কিন্তু শ্লোক রচনা করলেই তা ধর্ম বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। স্ত্রী যে সর্বদা রক্ষণীয়, সেকথা মহাভারতে ও হরিবংশে আছে—"শাশ্বতোঽয়ং ধর্মপথঃ সদ্ভিরাচরিতঃ সদা। যদ্ভার্যাং পরিরক্ষন্তি ভর্তারোঽল্পবলা অপি ॥"[২] অর্থাৎ পতি দুর্বল হ'লেও স্ত্রীকে প্রাণপণে রক্ষা করবে তাই চিরকালের ধর্ম। "কলত্ররক্ষণং কার্য্যং সর্বোপায়ৈঃ সদা বুধৈঃ। কলত্র ধর্ষণং লোকে মরণাদতিরিচ্যতে ॥"[৩] অর্থাৎ যেভাবে পারা যায়, স্ত্রীকে রক্ষা করতে হবে, স্ত্রীর ধর্ষণ পতির পক্ষে মরণ হতেও অধিক ক্লেশদায়ক। সেই যুগে স্ত্রীরক্ষায় আর্যগণ সর্বদা অবহিত ছিলেন।

জাতিভেদের বিষমতা, তথাকথিত নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচার, মহাভারত যুগে বিশেষ ছিল না মনে হয়। কৃষ্ণ অরণ্যচারী আদিবাসী কন্যা জাম্ববতী রোহিণীকে বিবাহ করে তাকে আর্য কুলোদ্ভবা স্ত্রীগণের সমান সম্মান দিয়েছিলেন, তার পুত্র সাম্ব রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নের প্রায় সমপর্যায়ের অতিরথ ছিল। ভীমও নরমাংসভোজী অরণ্যচারী জাতির কন্যা হিড়িম্বাকে বিবাহ করেছিলেন, ও পাণ্ডবগণ রাজ্যলাভ করলে তাকে রাজ অন্তঃপুরে স্থান দিয়েছিলেন, সেকথা জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব হতে পাই। নিষাদ রাজ একলব্য যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, নিষাদ বলে অপাংক্তেয় ছিলেন না। এই উদার মনোভাব ব্রাহ্মণ ধর্মশাস্ত্রকারদের বিধান মতে ক্রমে পরিবর্তিত হয়। ফলে সমাজের ক্ষতি হয়েছে, আর্যসমাজ যাদের দূরে ঠেলেছে, তারা ধর্মান্তর গ্রহণ করে আর্যসমাজকে শত্রুভাবে আক্রমণ করে অনেক ক্ষয়ক্ষতি করেছে।

সমাজের এই সব ছিদ্রের দিকে হিন্দুসমাজের নবজাগরণের পরে অনেক মনীষীর দৃষ্টি পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আজকে দেখতে হবে, আমাদের হিন্দু-

---

১। হরিবংশ ৩।৫।৩৯ ২। বনপর্ব, ১২।৬৮ ৩। বিষ্ণুপর্ব, ৯৬।৬৪

সমাজের কোথায় কোন ছিদ্র কোন পাপ আছে ; অতি নির্মমভাবে তাকে আক্রমণ করা চাই। এই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে আজ হিন্দু সমাজকে আহ্বান করে বলতে হবে—পীড়িত হয়েছি আমরা, লজ্জিত হয়েছি আমরা—বাইরের আঘাতের জন্য নয়, আমাদের ভিতরে পাপের জন্য। এসো, সেই পাপ দূর করতে সকলে মিলি।"[১]

মহাভারতে কৃষ্ণ অর্জুনকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাই প্রায় সর্বত্র কর্তব্য বা ধর্ম নির্ণয়ের মানদণ্ড রূপে ব্যবহার করা যায়—

"ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহু ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎস্যাদ্ধারণ সংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥ কর্ণপর্ব ৬৯।৫৮

অর্থাৎ সমাজকে, প্রজা সাধারণকে ধারণ করে রাখে যা তাই ধর্ম, কিসে প্রজার, সমাজের সমৃদ্ধি, কল্যাণ হয়, তাই বিচার করে সেটিই ধর্ম, তাই স্থির করতে হবে। কৃষ্ণ কথিত এই মানদণ্ড ব্যবহার করে যদি আমরা ধর্ম ও কর্তব্য নির্ণয় করি, তাহলেই আমাদের সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ আসবে। মহাভারতের কথা অমৃত সমান, বলেছেন কবি কাশীরাম দাস ; মহাভারতের এই একটি নির্দেশ সমগ্রভাবে অনুসরণ করতে পারলে আমরা অমৃতত্ব লাভ করব।

১। কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩, ৩৬৯ পৃঃ